দরসুল ফিকহ

প্রথম খণ্ড

গবেষণামূলক ফিকহী প্রবন্ধ-সংকলন

তত্ত্বাবধান

ফাতওয়া বিভাগ

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

দরসুল ফিক্হ

প্রথম খণ্ড

গবেষণামূলক ফিক্হী প্রবন্ধ-সংকলন

দরসুল ফিক্‌হ

প্রথম খণ্ড

গবেষণামূলক ফিক্‌হী প্রবন্ধ-সংকলন

তত্ত্বাবধান

ফাতওয়া বিভাগ

দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

দরসুল ফিক্হ (১ম খণ্ড)

গবেষণামূলক ফিক্হী প্রবন্ধ-সংকলন

পৃষ্ঠপোষক: শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা.বা.
মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

তত্ত্বাবধান: ফাত্ওয়া বিভাগ, দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

দ্বিতীয় সংস্করণ: রবিউস সানী ১৪৪০ হিজরী
ডিসেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী

সম্পাদনা: মুফতী আব্দুল্লাহ নাজীব হাফিযাহুল্লাহ

প্রথম সংস্করণ: রজব ১৪৩৫ হিজরী
বৈশাখ ১৪২১ বাংলা
মে ২০১৪ ঈসায়ী

সম্পাদনা পরিষদ: আব্দুল্লাহ নাজীব
ইসমাঈল হুসাইন নারায়ণগঞ্জী
খান মুহাম্মদ মাহবুবুল হক
আবুল বাশার সোহাইল সিরাজী
আব্দুল্লাহ মোস্তফা ঢাকা
শহীদুল ইসলাম

সংকলন ও প্রকাশনায়: কিসমুত তাখাস্সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী
(সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ- ১৪৩৫হিজরী)

শব্দবিন্যাস: আব্দুর রহীম শাহ্ নওগাঁ

ক্যালিগ্রাফি ও প্রচ্ছদ: বশির মিছবাহ

হাদিয়া: **৫৫০/- (পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র)**

শাইখুল ইসলাম সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী রাহ. এর সুযোগ্য খলীফা, আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মহাপরিচালক ও শাইখুল হাদীস, বাংলাদেশ কওমী মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক) এর সম্মানিত চেয়ারম্যান

আল্লামা শাহ আহমদ শফি সাহেব দা.বা. এর

দু'আ ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي كفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، أما بعد!

দারুল উলূমের প্রতিষ্ঠাকাল এক শতাব্দী পেরিয়েছে। শুরু থেকে বিশিষ্ট উস্তাযগণ সমসাময়িক সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছেন। হযরত মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ. এর মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দারুল ইফতার কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে التخصص في الفقه الإسلامي বিভাগও খোলা হয় । সর্বোপরি দারুল উলূম শুরু থেকেই যুগ সমস্যার সমাধানে নিয়োজিত। ফিক্‌হুন-নাওয়াযিল বিষয়ে জোরালোভাবে কাজ করার জন্য মুফতিয়ানে কেরামের তত্ত্বাবধানে (مجمع الفقه الإسلامي) নামে ফিক্‌হ বোর্ড গঠন করা হয়। দারুল উলূমের মুফতিয়ানে কেরামও বিভিন্নভাবে সমকালীন বিভিন্ন বিষয়াদির সমাধান দিয়ে আসছেন। মৌখিকভাবে, প্রবন্ধাকারে ও বই পুস্তক রচনা করে।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৩৫ হিজরীর قسم التخصص في الفقه الإسلامي দ্বিতীয় বর্ষের তালেবে ইলমরা আসাতেযায়ে কেরামের তত্ত্বাবধানে ফিক্‌হুন-নাওয়াযিলের কিছু বিষয় নিয়ে মুতাআলা করে প্রবন্ধাকারে পেশ করে এবং উস্তাযগণের সত্যায়ন নেয়। যেগুলো এখন 'দরসুল ফিক্‌হ' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের পথে। বিষয়বস্তু ও প্রবন্ধের ইলমী আন্দায দেখে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। এতে প্রয়োজনীয় অনেক বিষয় স্থান পেয়েছে। দারুল ইফতার আসাতেযায়ে কেরামের তদারকী ও সত্যায়নে প্রকাশিত এই গ্রন্থ দ্বারা তালেবে ইলম, ওলামায়ে কেরামের পাশাপাশি জনসাধারণও উপকৃত হবে বলে আশা রাখি। ফিক্‌হুন-নাওয়াযিলের পরিচয় ও নীতিমালা সম্বলিত ভূমিকা অনেক তালেবে ইলমকে পথ দেখাবে বলে মনে করি।

পরিশেষে দারুল ইফতার আসাতিযায়ে কেরামের শুকরিয়া আদায় করছি। যে সকল তালেবে ইলম কষ্ট করে প্রবন্ধ লিখেছে এবং পরিশ্রম করে তাকে বই উপযোগী করে সাজিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সবাইকে উত্তম বিনিময় দান করুন, তাদের এ মেহনতকে কবুল করুন এবং ভবিষ্যতে ফিকহের খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমীন॥

আল্লামা শাহ আহমদ শফি দা.বা.
মহাপরিচালক
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
০৮ রজব ১৪৩৫ হিজরী

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন করাচী পাকিস্তান এর সাবেক প্রধান মুফতী ও আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতী আ'যম

আল্লামা মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ এর

অভিমত ও দু'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي خلق الإنسان ثم هدى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى، وعلى آله وأصحابه القائمين على التقى، أما بعد!

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَسْـَٔلُوٓاْ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾ [النحل: ٤٣، الأنبياء: ٧]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। 'যারা জানে না তাদের কর্তব্য হলো, যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞেস করে আমল করবে।'

হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযি. নানাবিধ সমস্যার সমাধান সরাসরি রাসূল ﷺ থেকে জেনে নিতেন। তাঁদের প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে আয়াতও নাযিল হতো। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এর বর্ণনা এসেছে।

فِيٓ أَيْمَٰنِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم [البقرة: ٢٢٠] وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِۖ [البقرة: ٢٢٢]

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِۖ [البقرة: ٢١٩] وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَآءِۖ [النساء: ١٢٧]

আর যারা রাসূল ﷺ এর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারতেন না, তারা তাদের সমস্যাবলীর শর'য়ী সমাধান জেনে নিতেন অন্যান্য ফকীহ সাহাবীদের কাছ থেকে। আবার রাসূল ﷺ ও তাঁর সান্নিধ্যধন্য সাহাবীদেরকে বিভিন্ন সময় দূর-দূরান্তের মুসলমানদের দ্বীন শিক্ষা ও তাদের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের জন্য পাঠাতেন। এদের মধ্যে হযরত মু'আয ইবনে জাবাল রাযি. এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাসূল ﷺ এর ইন্তেকালের পর মুসলমানদের সমস্যাবলীর সমাধান দিতেন ফকীহ সাহাবীগণ। ইতিহাসের পাতায় এ সকল মুফতী সাহাবীর দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। যাদের অন্যতম হলেন, চার খলীফা, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (৩২হি.), আবু মূসা আশআরী (৫২হি.), মু'আয ইবনে জাবাল (১৮/১৯হি.), উবাই ইবনে কা'ব (২২হি.), যায়েদ ইবনে ছাবেত (৪৫হি.), উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (৫৭হি.),

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (৭৩হি.), আবু হুরায়রা (৫৮হি.), আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (৬৫হি.) আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (৬৮হি.), আনাস ইবনে মালেক (৯৩হি.), আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল ও ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি.প্রমুখ।

হযরত সাহাবায়ে কেরামের পর ফিকহ-ফাতাওয়ার দায়িত্ব পালন করেছেন তাবেয়ীদের বিরাট জামাত। যেমন, **মদীনায়-** সাঈদ ইবনুল মুসায়্যিব (৯৪হি.), উরওয়া ইবনে যুবাইর (৯৪হি.), আবু বকর ইবনে আব্দুর রহমান মাখযুমী (৯৪হি.), আলী ইবনে হুসাইন (৯৪হি.), উবাইদল্লাহ ইবনে আব্দুল্লাহ (৯৮হি.), সালেম ইবনে আব্দুল্লাহ (১০৬হি.), কাসেম ইবনে মুহাম্মদ (১০৬হি.), সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (১০৭হি.), আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হুসাইন (১১৪হি.), নাফে' মাওলা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (১১৭হি.), মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (১২৪হি.), আবুয্ যিনাদ আব্দুল্লাহ ইবনে যাওয়ান (১৩১হি.), ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আনসারী (১৪৬হি.), রবিআতুর রায় (১৩৬হি.) রাহ.। **মক্কায়-** মুজাহিদ (১০৬হি.), ইকরিমা (১০৭হি.), আতা ইবনে আবী রবাহ (১১৪হি.), আবু যুবাইর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম (১২৭হি.) রাহ.। **কুফায়-** আলকামা (৬২হি.), মাসরূক (৬৩হি.), কাযী শুরাইহ (৭৮হি.), আবীদা সালমানী (৯৫হি.), আসওয়াদ (৯৫হি.), ইবরাহীম নাখায়ী (৯৫হি.), সাঈদ ইবনে জুবাইর (৯৫হি.), আমের ইবনে শুরাহবীল (১০৪হি.), ইমাম আ'যম আবু হানীফা (১৫০হি.) রাহ.। **বসরায়-** আবুল আলিয়া (৯০হি.), হাসান মাওলা যায়েদ ইবনে ছাবেত (১১০হি.), মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (১১০হি.), কাতাদা (১১৮হি.) রাহ.। **শামে-** আব্দুর রহমান ইবনে গানিম (৭৮হি.), আবু ইদরীস খাওলানী (৮০হি.), ইবনে যুআইব (৮৬হি.), ওমর ইবনে আব্দুল আযীয (১০১হি.), রাজা ইবনে হাইওয়াহ (১১২হি.), মাকহুল ইবনে আবু মুসলিম (১১৩হি.) রাহ.। **মিসরে-** আবুল খায়ের ইবনে আব্দুল্লাহ (৯০হি.), ইয়াযিদ ইবনে আবু হাবীব (১২৮হি.) রাহ.। **ইয়ামান-** তাউস (১০৬হি.), ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ (১১৪হি.), ইয়াহইয়া ইবনে আবু কাছীর (১২৯হি.) রাহ.।
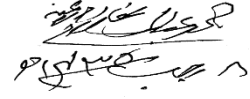
গতিশীল এই পৃথিবী প্রতিনিয়তই পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনের ধারা বেয়ে মানব জীবনে আসে নতুন নতুন অনেক সমস্যা। তাই সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীদের পরও প্রত্যেক যুগে ইমাম ও ফকীহদের বিশাল এক জামাত মানুষের নানাবিধ সমস্যার সুষ্ঠু, সুন্দর ও সর্বোত্তম সমাধান দিয়ে ইসলামের সর্বজনিনতা ও পূর্ণতা প্রমাণ করে আসছেন। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার এর উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করছে। জিজ্ঞাসা ও সমাধানের এ ধারা এখনো অব্যাহত আছে।

হাটহাজারী মাদরাসার শুরু থেকেই অভিজ্ঞ উস্তায ও মুফতীগণ এ ধরনের নানাবিধ নতুন সমস্যার সমাধান দিয়ে আসছেন। আজও সে ধারা অব্যাহত রয়েছে। ইন্‌শাআল্লাহ কিয়ামত অবধি থাকবে।

আমি জেনে অত্যন্ত খুশি হয়েছি যে, التخصص في الفقه الإسلامي বিভাগে অধ্যয়নরত সমাপনী বর্ষের ছাত্ররা সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৪৫টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ তৈরি করেছে। আমি প্রবন্ধগুলোর সারসংক্ষেপ শুনেছি এবং বিভিন্ন জায়গায় প্রয়োজনীয় সংশোধনী দিয়েছি।

আলহামদুলিল্লাহ বহুল প্রতীক্ষিত অনেক কষ্টসাধ্য একটা কাজ তারা আঞ্জাম দিয়েছে। আল্লাহ তা'আলা সংশ্লিষ্ট সকলকে দ্বীনের যোগ্য দায়ী ও মুখলেস খাদেম হিসেবে কবুল করুন। আশা করি বাংলা ভাষাভাষি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করবে এবং সকলের আমলের জন্য উপকারী হবে।

آمين، يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

মুজাদ্দিদে মিল্লাত, মুসলিহে উম্মাত, মুফতীয়ে আ'যম হযরত মাওলানা মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ. এর বিশিষ্ট খলিফা, ফকীহুয যামান, দারুল উলূম হাটহাজারীর রঈসে দারুল ইফতা

আল্লামা মুফতী নূর আহমদ দা.বা. এর

বাণী ও দু'আ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل العلماء ورثة الأنبياء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء، أما بعد! فقد قال الله تبارك وتعالى: فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُوا۟ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓا۟ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿١٢٢﴾ وقال رسول الله ﷺ: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. (متفق عليه)

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়াতে চলার জন্য সংবিধান হিসেবে কুরআন ও হাদীস দান করেছেন। কিয়ামত পর্যন্ত নবসংঘটিত ঘটনাসমূহের সঠিক সমাধান ও নবাবিস্কৃত জিনিসের শর'য়ী বিধিবিধান জানার জন্য উসূলভিত্তিক ইজতেহাদের ব্যবস্থা রেখেছেন। এর উপর ভিত্তি করেই সাহাবা যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুজতাহিদ ইমাম ও ফকীহগণ সময়ে সময়ে ঘটিত যে সকল সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন ও হাদীসে নেই উসূলভিত্তিক ইজতেহাদের মাধ্যমে সে সকল সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। পরবর্তী ফকীহগণও তাদের সমসাময়িক নিত্যনতুন যে সকল ঘটনাবলীর সমাধান ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহ. থেকে পাওয়া যায় না ফিক্‌হে হানাফীর উসূল ও কাওয়ায়িদের ভিত্তিতে সেগুলোর সমাধান দিয়েছেন।

এ সুবাদে التخصص في الفقه الإسلامي বিভাগের প্রিয় ছাত্ররা দীর্ঘ সময় মেহনত করে নির্বাচিত বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ে দালাইলের আলোকে উসূলভিত্তিক তথ্য ও তত্ত্বনির্ভর একটি প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করেছে এবং এর মাধ্যমে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়েছে। জেনে খুব আনন্দিত হলাম। বিভিন্ন ব্যস্ততা ও শারীরিক দুর্বলতার দরুন পুরোটা দেখা সম্ভব না হলেও উল্লেখযোগ্য অংশ শুনেছি। প্রয়োজনে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছি। আমার আশা, বইটি সকলের জন্য উপকারী হবে। সাথে সাথে আল্লাহর নিকট দু'আ করছি, যেন তিনি এটাকে ব্যাপকভাবে কবুল করেন। যারা এর পিছনে মেহনত করেছে সকলেরই ইলমী ও আমলী উন্নতি দান করেন। আমীন॥

নূর আহমদ

আল্লামা মুফতী নূর আহমদ দা.বা.
মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম
০৭ রজব ১৪৩৫ হিজরী

মুফতিয়ে আ'যম হযরত আহমদুল হক রাহ. এর খলীফা দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর তাফসীর, হাদীস ও ইফতা বিভাগের উস্তায

মুফতী জসিম উদ্দীন দা.বা. এর

দু'আ ও অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدا ومصليا ومسلما أما بعد! قال الله تعالى: فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'আলার জন্য। অসংখ্য দরূদ ও সালাম প্রেরিত হোক রাসূলে আকরাম ﷺ এর প্রতি। আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন, 'তোমরা জ্ঞাত নও এমন সব বিষয় জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করে নাও।' (সূরা নাহল: ৪৩)
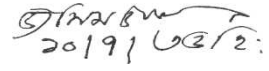
আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির সেরা হিসেবে মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জীবন পরিচালনার জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সংবিধান দান করেছেন। যা কুরআন-হাদীস এবং ফিক্হের সমন্বিত রূপ। কিয়ামত পর্যন্ত আগত সকল সমস্যা এই তিন মূলনীতির আলোকে সমাধানযোগ্য।

এ কারণে প্রত্যেক যুগেই মুজতাহিদ ইমামগণ সমকালীন সকল নবউদ্ভাবিত বিষয়ের সমাধানের জন্য অসামান্য সাধনা করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রগামী হলেন ইমাম আ'যম আবু হানীফা নু'মান ইবনে ছাবেত রাহ.। কিন্তু তিনি শুধু নিজের ইলমের উপর নির্ভর করেননি বরং মুজতাহিদদের চল্লিশ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরামর্শ সভা বা 'মাজলিশে মাশওয়ারা' গঠন করেছেন। তাই তো হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাব থেকে অগ্রগামী এবং তাঁদের ইজতেহাদ কুরআন-সুন্নাহর সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারই ধারাবাহিকতায় পরবর্তী যুগের মুহাক্কিক ওলামায়ে কেরাম এবং মুফতীগণ নবউদ্ভাবিত সমস্যাবলীর সমাধানের জন্য 'ফিকহী বোর্ড' এবং 'ইসলামী সেমিনার' নামে বোর্ড গঠন করে নিজ নিজ দেশে এ মহা দায়িত্ব পালন করে আসছেন। যেমন সৌদির 'মাজমাউল ফিক্হিল ইসলামী' পাকিস্তানের 'মাজলিসে মাসাইলে হাযেরাহ' হিন্দুস্তানের 'ইসলামিক ফিক্হ একাডেমী' এবং মিসরের 'মাজমাউল বুহুসিল ইসলামী' বাংলাদেশে আজ প্রায় ১২৫ বছর যাবৎ সাংগঠনিক ও অসাংগঠনিকভাবে মুসলিম উম্মাহর এ দায়িত্ব দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী আঞ্জাম দিয়ে আসছে। যেমন প্রথম মুফতী আ'যম মুফতী ফয়জুল্লাহ রাহ. যাঁকে আল্লাহ তা'আলা ফকীহুন নাফস হিসেবে মনোনীত করেছিলেন এ দায়িত্ব এত সুচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন যে, জাতি তাঁকে 'মুজাদ্দিদে উম্মত' উপাধিতে ভূষিত করেছে। তারপর দ্বিতীয় মুফতী আ'যম মুফতী আহমদুল হক রাহ.ও এক্ষেত্রে শীর্ষস্থান অর্জন করেছেন। তাঁরই অধীনে 'আল বাহসুল ইসলামী ফিক্হ বোর্ড' গঠন করে এখনও এ গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় সমকালীন কিছু জটিল বিষয়ের প্রামাণিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সম্বলিত সমাধান জাতির সামনে পেশ করা হচ্ছে। আর এ কাজের জন্য ১৪৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ইফতা সমাপনকারী স্নেহাস্পদ ছাত্ররা আসাতিযায়ে

কেরামের তত্ত্বাবধানে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। মহান আল্লাহর দরবারে হাত তুলে দু‘আ করছি, তিনি স্বীয় কৃপা ও অনুগ্রহে তাদের এ প্রয়াসকে কবুল করেন এবং গোটা জাতিকে এ থেকে উপকৃত করুন। এতে মেহনতকারী, সমর্থনকারী এবং প্রতি স্তরে সাহায্যকারীকে দ্বীনের একনিষ্ঠ খাদেম এবং উম্মতের রাহবার হিসেবে কবুল করেন।

آمين بحرمة سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

জসিম উদ্দীন
২০/৭/ ০৫/২:

মুফতী জসিম উদ্দীন দা.বা.
মুফতী ও মুহাদ্দিস
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

আল জামিয়াতুল আহলিয়া দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর মুফতী ও উস্তায
মাওলানা মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ এর

অভিমত

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

পৃথিবীর তাবৎ সৃষ্টিরাজি মহান আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। বিশেষত আমরা আশরাফুল মাখলুকাত মানুষেরা প্রতিনিয়তই যে সীমাহীন দয়া আর নেয়ামত ভোগ করছি, তার কোনো সীমা পরিসীমা নেই। যা মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত।

এক. প্রকাশ্য বা দৃশ্যমান নেয়ামত। যেমন, পার্থিব ধন-দৌলত, জমি-জমা ইত্যাদি। **দুই.** অপ্রকাশিত নেয়ামত। যেমন, সুকূন-শান্তি, মেধা, ইলম ও হিকমত ইত্যাদি। তন্মধ্যে ইল্ম ও হিকমত আল্লাহ্ তা'আলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

আর বলাবাহুল্য, মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সর্বাধিক সম্পর্কিত কিংবা তার চে' এগিয়ে বলা যায়- 'ওতপ্রোতভাবে জড়িত' ইলমে ফিক্হ-ই এক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বের দাবীদার। স্বয়ং আল্লাহ্ পাক রাব্বুল আলামীন ফরমান-

وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا -[البقرة:٢٦٩]

"আর যাকে দ্বীনের সুগভীর জ্ঞান দান করা হয়, সে প্রভূত কল্যাণকর বস্তু প্রাপ্ত হয়।"

হাদীস শরীফে ইরশাদ হয়েছে- من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "আল্লাহ্ তা'আলা যার কল্যাণ কামনা করেন, তাকে দ্বীনের সুগভীর বোধশক্তি দান করেন"।

নবী করীম ﷺ আরো বলেন- فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد "শয়তানের মোকাবেলায় একজন (খোদাভীরু) ফকীহ এক হাজার সাধারণ আবেদের চেয়ে বেশি শক্তিমান।"

যুগ চাহিদার প্রেক্ষিত ও জীবন জিজ্ঞাসার জবাব সম্বলিত ইলমের এই অপরিহার্য অনুষঙ্গের পরিচয় প্রদানে ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাহ. বলেন- الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها "ফিক্হ বলতে, নিজের কল্যাণ অকল্যাণের বোধশক্তিই উদ্দেশ্য।"

ইমাম শাফে'য়ী রাহ. এর মতে, ইলম দু' প্রকার। দ্বীনি বিষয়ে ইলমে ফিক্হ। আর শারীরিক বিষয়ে ইলমে ত্বীব তথা ডাক্তারী বিদ্যা। তিনি বলেন- العلم علمان، ، علم الفقه للأديان، وعلم الطب للأبدان، وما وراء ذلك بلغة مجلس. "ইলম দু' প্রকার। দ্বীনি বিষয়ে ইলমে ফিক্হ এবং শারীরিক বিষয়ে ইলমে ত্বীব তথা ডাক্তারী বিদ্যা। এছাড়া যা কিছু আছে, সবই মাহফিলের সৌন্দর্য আনয়নকারী।"

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. আরো একধাপ এগিয়ে। তাঁর মতে, إن صناعتنا هذه من المهد إلى اللحد، فمن أراد أن يترك علمنا هذا ساعة، فليتركه الساعة. "আমাদের এই কাজের (ইলম অর্জন) সূচনা হয় শৈশব থেকে কবর পর্যন্ত। যে ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্যও তা থেকে বিমুখতা প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করবে, সময় তার প্রতি অবহেলা প্রদর্শন করুক।"

জনৈক কবি খুব সুন্দর বলেছেন- إذا ما اعتز ذو علم بعلم ✶ فعلم الفقه أولى باعتزاز "আহলে ইলমদের যে কেউ ইলমের মাধ্যমে ইজ্জতওয়ালা হতে চায়, তার উচিত ইলমে ফিক্‌হের দ্বারস্থ হওয়া। কেননা তা মর্যাদা বৃদ্ধিতে সর্বোত্তম সহায়ক, মূলত ইলমে ফিক্‌হ কুরআন সুন্নাহ বহির্ভূত কোনো ইলম নয়; বরং তারই সারনির্যাস। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াস এর সমন্বিতরূপ। মুমিন জিন্দেগীর সার্বক্ষণিক নির্দেশনার যে অপূর্ব আলোকচিত্র ফুটে উঠে এই ইলমে ফিক্‌হের দর্পণে, তা অস্বীকারের দুঃসাহস কে রাখে? বস্তুত ইলমে ফিক্‌হকে তুলনা করা যায় কেবল সাগর নয়; মহাসাগরের সাথে। এজন্য একযুগেই এ বিষয়ক সকল শাখা প্রশাখা মলাটবদ্ধ হয়ে যাওয়ার প্রত্যাশা বোকামি বৈ আর কিছু নয়। যুগে যুগে মুজতাহিদ ফকীহগণ এ সম্পর্কিত জ্ঞানের বিশাল বিশাল ভান্ডার রেখে গেছেন উম্মাহর কল্যাণ চিন্তায়। তবু দিনে দিনে ও সময়ের পরিবর্তনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের নব নব উদ্ভাবন আবিষ্কারের ফলে পরিবর্তন ঘটছে মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদায় ও দৈনন্দিন জীবন চালনায়। উদ্ভব হচ্ছে নতুন নতুন সমস্যা ও তার সমাধান অনুসন্ধিৎসার। সঙ্গত কারণেই তখন যুগের ফকীহ উলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়, এগুলোর যথোপযুক্ত সমাধান পেশ করা। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নব উদ্ভাবিত এসব সমস্যার সুস্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া না গেলে কুরআন, সুন্নাহ ও মুজতাহিদ ফকীহগণের রেখে যাওয়া মৌলিক নীতিমালার আলোকে চিন্তা গবেষণা করে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম যে সমন্বিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন, মূলত তা শরী'আতের হুকুম বলেই বিবেচিত। আলমু'জামুল আউসাত-তাবারানীতে উল্লেখিত হয়েছে হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

يا رسول الله! إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي، فما تأمرنا؟ قال : «تشاورون الفقهاء والعابدين، ولا تمضوا فيه رأي خاصة» (رواه الطبراني في المعجم الأوسط: ١/٤٤١؛ وكذا في مجمع الزوائد: ١/١٧٨)

"একবার আমি রাসূল ﷺ এর নিকট আরয করলাম- ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন আমরা এমন বিষয়ের সম্মুখীন হই, যার প্রত্যক্ষ বিধি-নিষেধ কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই তখন আমাদের কী করণীয়? জবাবে নবীজী ﷺ বললেন, তোমরা খোদাভীরু ফকীহদের সাথে পরামর্শ করো। এক্ষেত্রে ব্যক্তিমত কার্যকর করো না।"
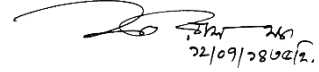
এই একটি মাত্র হাদীসে গভীরভাবে চিন্তা করলেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, নব উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে একক ফায়সালার পরিবর্তে বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত প্রদান করা জরুরী।

মূলত এ দায়িত্ব পালনার্থেই প্রখর মেধা সম্পন্ন, বিজ্ঞ ফুকাহায়ে কেরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন নিরলস-নিরবচ্ছিন্নভাবে। যুগ জিজ্ঞাসার যথোপযুক্ত সমাধান পেশ করছেন অত্যন্ত

আমানতদারীর সাথে তালীম তাসনীফের মাধ্যমে তা সংরক্ষণের ব্যবস্থাও করছেন যথাসাধ্য।

আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের দারুল উলূম হাটহাজারীও পিছিয়ে নেই এ খেদমত থেকে। সূচনালগ্ন থেকেই তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছেন জামিয়ার নিষ্ঠাবান মুফতীয়ানে কেরাম (আল্লাহ পাক সবাইকে জাযায়ে খায়ের দান করুন)। প্রকাশিত 'ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম হাটহাজারী' ও 'আশরাফুল ফাতাওয়া' সহ যুগোপযোগী কিতাবাদি, রিসালাহ, স্মারক ও সাময়িকী যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষের ইফতা সমাপনী শিক্ষার্থীরা রচনা করেছে 'দরসুল ফিক্‌হ' নামের একটি মূল্যবান ফিক্‌হী প্রবন্ধ সংকলন। নিজ মাতৃভাষায় রচিত এ মহৎ উদ্যোগকে আমরা স্বাগত জানাই। প্রবন্ধগুলো দারুল ইফতা সংশ্লিষ্ট প্রায় সকল মুহতারাম উস্তায দেখেছেন। আমার নিজেরও অনেকাংশে চোখ বুলানোর সুযোগ হয়েছে। ঈষৎ পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংশোধন করে দিয়েছি প্রয়োজনে। তাও ব্যস্ততা ও সময়ের স্বল্পতার মধ্য দিয়ে। ফলে কোথাও অনিচ্ছাকৃত ভুল দৃষ্টিগোচর হলে পাঠকমহল সমালোচনায় না জড়িয়ে অবগত করবেন বলে দৃঢ় প্রত্যাশী।

দু'আ করি, আল্লাহ্ তাদের এই খেদমতটুকু কবুল করেন। তাদেরকে আজীবন ফিক্‌হের খেদমতে নিয়োজিত রাখেন এবং এ গ্রন্থকে তার লেখক, পাঠক, সম্পাদক, প্রকাশক ও সমর্থক-শুভাকাঙ্ক্ষীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের হিদায়াত ও নাজাতের ওসীলা বানান। আমীন ॥

১২/০৭/১৪৩৫হি.

ফরিদুল হক
খাদেমে তুলাবা, দারুল উলূম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

দ্বিতীয় সংস্করণের বাণী ও দু' আ

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد:

আলহামদুল্লিাহ, আল্লাহ তায়ালার অশেষ মেহেরবানিতে দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত **"দরসুল ফিকহ"** (১ম খণ্ড) 'আম' ও 'খাস' পাঠকমহলে ব্যাপকভাকে সমাদৃত হয়েছে। প্রকাশের অল্প কিছু দিনের মধ্যেই কিতাবটির প্রথম সংস্করণ ফুরিয়ে যায়। এদিকে দিন দিন কিতাবটির চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে । বিভিন্ন মহল থেকে কিতাবটির পুনঃমুদ্রণের তাগাদা আসতে থাকে । তাই কিতাবটির দ্বিতীয় সংস্করণ বের কারার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । এ উপলক্ষে কিতাবের সবগুলো প্রবন্ধ আমি পুনরায় শুনেছি। প্রয়োজনীয় কিছু সংশোধনী আনার জন্য পরামর্শও দিয়েছি। ইনশা আল্লাহ, এ সংস্করণ আরো উন্নত ও পরিমার্জিত হবে।

আল্লাহ তায়ালা এর সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের মেহনতকে কবুল করেন। এবং এ কিতাবের ফায়দা ও মাকবুলিয়াতকে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করেন। আমীন॥

নূর আহমদ

আল্লামা মুফতী নূর আহমাদ দা:বা:
মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম মুঈনুল ইসলাম
হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
১৭ রবিউস সানী ১৪৪০হি.

সংক্ষিপ্ত সূচি

বিস্তারিত সূচি

অধ্যায়: যাকাত

যাকাত, ফিত্‌রা, হজ্ব ও কুরবানীর নেসাব ১৫৬

সমিতি ও কোম্পানির উপর যাকাত ১৬৭

প্রভিডেন্ট ফান্ডের শর'য়ী বিধান ও যাকাত প্রসঙ্গ ১৭৩

ঋণের যাকাতের বিধান ১৭৯

শেয়ার ও প্রাইজবন্ডের যাকাতের বিধান ১৯১

ওশর ও খারাজের বিধান ১৯৬

অধ্যায়: রোযা

রমযান ও ঈদের চাঁদ: কিছু সমস্যা ও সমাধান ২০৮

ভূমিকা

ফিকহুন নাওয়াযিলঃ কিছু মৌলিক কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين، أما بعد!

কুরআন-সুন্নাহ নিসৃত বিধিবিধান সংক্রান্ত সঠিক বুঝকে ফিক্হ বলে। ফিকহই একক মাধ্যম কুরআন-সুন্নাহ মুতাবেক আমল করার। নবীজী ﷺ এর হাদীস, সাহাবা রাযি. এর আমল ও সালাফের কর্মপদ্ধতি এ কথার প্রমাণ বহন করে। তাই কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে হলে ফিক্হ অপরিহার্য। ফিক্হের নানাবিধ শাখা রয়েছে। যার অন্যতম হলো 'ফিক্হুন নাওয়াযিল' (فقه النوازل)। যা সাহাবা যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুজতাহিদ, ফকীহ ও মুফতীদের গবেষণার অন্যতম ময়দান।

ফিকহুন নাওয়াযিল (فقه النوازل) **এর পরিচয় ও ক্রমবিকাশ**

نوازل (নাওয়াযিল) বহুবচন, একবচনে نازلة (নাযেলা) অর্থ, আকস্মিক ঘটনা। নবঘটিত কোনো বিষয়। আরবী ভাষার বিশ্লেষণধর্মী অভিধান ও ফিক্হ সংক্রান্ত অভিধান অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় 'নাযেলা'র অর্থে নির্দিষ্ট পরিধি ও সীমারেখা রয়েছে। যে কোনো ঘটনাকে 'নাযেলা' বলা হয় না। কোনো ঘটনা 'নাযেলা' হতে হলে দু'টি গুণ থাকতে হবে। **ক.** নবঘটিত হতে হবে। **খ.** নিগূঢ় ও জটিল হতে হবে। অর্থাৎ 'নাযেলা' বলা হয় এমন ঘটনাকে যা নবঘটিত ও নিগূঢ়।

النوازل এর পারিভাষিক অর্থেও এ দিকটি সবিশেষ লক্ষণীয়। তাই 'নাওয়াযিল' এর পারিভাষিক অর্থ হবে নবঘটিত, নিগূঢ় ও জটিল এমন বিষয় যা চিন্তা-গবেষণালব্ধ শর'য়ী সমাধানের দাবি রাখে। বলার অপেক্ষা রাখে না, নবঘটিত হওয়ার অর্থই হলো ইতিপূর্বে এর সমাধান দেয়া হয়নি, নতুন ইজতেহাদের প্রয়োজন। আর শর'য়ী কোনো বিষয় পূর্বমীমাংসিত না হলে জটিল হওয়াটা বিচিত্র নয়।

ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহ. (জন্ম ৩৬৮ মৃ.৪৬৩) 'ফিকহুন-নাওয়াযিল' (فقه النوازل) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার শিরোনামটাই ফিকহুন নাওয়াযিল এর পারিভাষিক পরিচয় হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। তিনি বলেন-

اجتهاد الرأي على الأصول عند عدم النصوص في حين نزول النازلة. (جامع بيان العلم وفضله: ٣١٧/١ ط، دار الكتب العلمية)

"নবঘটিত কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে 'নস' না পাওয়ায় উসূলের ভিত্তিতে ইজতেহাদ করা।"
ফিকহুন-নাওয়াযিলের এই অর্থ অনেক ব্যাপক। পারিভাষিক অর্থ আরো একটু গুছিয়ে এভাবে বলা যায়-

معرفة الأحكام الشرعية للوقائع المستجدة الملحة. (فقه النوازل للجيزاني: ٢٦/١ ط دار ابن الجوزي،

الطبعة الثانية ١٤٢٧ هـ ٢٠٠٦ م)

"নবঘটিত যে সমস্যাগুলো শর'য়ী সমাধানের দাবী রাখে, সেগুলোর শর'য়ী হুকুম আহকাম জানা।"

ফিকহে হানাফীতে 'নাওয়াযিল' (النوازل) এর পরিচয় ও প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন। অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার মাসাইল। ফিকহে হানাফীর সংকলিত মাসাইল তিন ভাগে ভাগ করা হয়। ক. الأصول খ. النوادر গ. الفتاوى والواقعات। তৃতীয় প্রকারকে 'নাওয়াযিল'ও (نوازل) বলা হয়। অর্থাৎ এমন কিছু মাসাইল যার সমাধান ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. ও ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর থেকে সরাসরি পাওয়া যায় না। পরবর্তী ফকীহগণ ফিকহে হানাফীর উসূল ও কাওয়ায়েদের ভিত্তিতে ইজতেহাদ করে সমাধান দিয়েছেন। ফকীহ আবুল লাইস সামারকান্দী রাহ. (মৃ.৩৭৩) এর 'কিতাবুন নাওয়াযিল' এর ভূমিকায় নাওয়াযিলের পরিচয়ের ইঙ্গিত রয়েছে। ভূমিকার একাংশ হাজী খলীফা রাহ. (জন্ম ১০১৭-মৃ.১০৬৭) এভাবে উল্লেখ করেছেন-

أنه جمع من كلام محمد بن شجاع الثلجي ومحمد بن مقاتل الرازي ومحمد بن سلمة ... فإنهم وفقوا النظر فيما وقع لهم من النوازل قال: وصنفت كتابين من أقاويلهم أحدهما: (عيون المسائل) والآخر : (النوازل) وأوردت في ... (النوازل) : من أقاويل المشايخ وشيئا من أقاويل أصحابنا ما لا رواية عنهم أيضا في الكتاب ليسهل على الناظر فيها طريق الاجتهاد. (كشف الظنون: ١٩٨١/٢)

"মুহাম্মাদ ইবনে শুজা আছ-ছালজী, মুহাম্মাদ ইবনে মুকাতিল আর-রাযী ও মুহাম্মাদ ইবনে সালামা প্রমুখের বক্তব্য তিনি সংকলন করেছেন। কেননা তাঁরা নবঘটিত সমস্যাবলীর শর'য়ী সমাধান চিন্তা-গবেষণা করে বের করার তাওফীক পেয়েছেন। তিনি বলেন, ইমামদের বক্তব্যের দু'টি সংকলন আমি প্রস্তুত করেছি। একটির নাম 'উয়ূনুল মাসাইল', অপরটি হলো 'নাওয়াযিল'। আমি নাওয়াযিলে সন্নিবেশিত করেছি মাশাইখদের বক্তব্য এবং আমাদের ইমামদের এমন কিছু বক্তব্য, যার বর্ণনা কিতাবে তাঁদের থেকে পাওয়া যায় না। যাতে নাওয়াযিলের নবঘটিত সমস্যার উপর যারা চিন্তা-গবেষণা করতে চায় তাদের জন্য ইজতেহাদের পথ সুগম হয়।"

ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী রাহ. 'নাওয়াযিল' বলে মূলত পরবর্তী ইমাম ও ফকীহদের বক্তব্য ও ফাতাওয়া বুঝিয়েছেন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. (জন্ম ১১৯৮-মৃ.১২৫২) এর বিস্তারিত পরিচয় এভাবে তুলে ধরেছেন-

هي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عن ذلك ولم يجدوا فيها رواية عن أهل المذهب المتقدمين. (شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين رحمه الله: ٨٢ مكتبة شيخ الإسلام)

"তা এমন কিছু মাসআলা যা ইস্তেম্বাত করে বের করেছেন পরবর্তী যুগের (মুতাআখখিরীন) মুজতাহিদগণ, যখন এগুলো সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে আর তারা মাযহাবের প্রথম সারির (মুতাকাদ্দিমীন) ইমামদের থেকে এর সমাধানমূলক কোনো বক্তব্য পাননি।"

বর্তমান যুগেও যে সব মাসআলার সরাসরি সমাধান পূর্বের ইমামদের থেকে পাওয়া যায় না,

সমাধানের জন্যে ইজতেহাদের প্রয়োজন হয়, তাও 'নাওয়াযিল'র অন্তর্ভুক্ত। এ মাসআলাগুলো ফিকহের যে কোনো অধ্যায়ের হতে পারে। ইবাদত, মুআমালাত বা অন্য কোনো অধ্যায়। এগুলো বিশেষ কোনো অধ্যায়ে সীমাবদ্ধ নয়। তবে অবস্থার বিচারে বলা যায়, লেনদেন অধ্যায়ে 'নাওয়াযিল'র আধিক্য রয়েছে। আর ইজতেহাদ ও গবেষণা করে এর শর'য়ী সমাধান জানা বা স্থির করার নামই فقه النوازل।

পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, 'ফিকহুন-নাওয়াযিল' কোনো যুগের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এটি একটি চলমান প্রক্রিয়া। সাহাবা যুগ থেকে প্রতিটি যুগে যা ছিলো, এখনও আছে। ফকীহ সাহাবায়ে কেরামের নিকট সমকালীন বিভিন্ন সমস্যা উপস্থাপন করা হতো। তাঁরা সমাধান দিতেন। ইবনুল কাইয়িম রাহ. (জন্ম ৬৯১-মৃ. ৭৫১) বলেন-

وقد كان أصحاب رسول الله ﷺ يجتهدون في النوازل، ويقيسون بعض الأحكام على بعض، ويعتبرون النظير بنظيره. (إعلام الموقعين: ١٦٣/١ دار الحديث القاهرة، بتحقيق عصام الدين الصبابطي)

"আর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাহাবীগণ নাওয়াযিলের (নবঘটিত সমস্যাবলী) ক্ষেত্রে ইজতেহাদ করতেন। এক হুকুমকে আরেক হুকুমের উপর কিয়াস করতেন। এবং এক মাসআলাকে তার সমশ্রেণীর মাসআলার সাথে তুলনা করতেন।"

ফকীহ সাহাবায়ে কেরাম এবং তাবেঈনদের সমাধান ও ফাতাওয়া 'মুসান্নাফ', 'মুসনাদ' ও 'সুনান' শিরোনামের কিতাবে সংকলিত হয়েছে। আর তা তাঁদের যামানায় 'ফিক্হুন নাওয়াযিল' (فقه النوازل) থাকলেও পরবর্তী الفقه المتوارث এর রূপ নিয়েছে। এছাড়া পরবর্তী ইমামদের 'নাওয়াযিল' সংক্রান্ত ফাতাওয়াও সংকলিত হয়েছে নিজ কিতাবে বা শাগরিদদের কিতাবে।

ফিকহে হানাফীতে দ্বিতীয় অর্থে নাওয়াযিলের সর্বপ্রথম সংকলন ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দি রাহ. এর সংকলিত كتاب النوازل। আল্লামা শামী রাহ. (জন্ম ১১৯৮-মৃ.১২৫২) বলেন-

وأول كتاب جمع في فتواهم فيما بلغنا كتاب النوازل للفقيه أبي الليث السمرقندي، ثم جمع المشايخ بعده كتبا أخر. (شرح عقود رسم المفتي: ٨٦)

"আমাদের জানামতে ইমামদের ফাতাওয়ার প্রথম সংকলন হলো ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী রাহ. এর কিতাবুন নাওয়াযিল। তারপর বিভিন্ন ইমাম এমন আরো সংকলন তৈরি করেছেন।"

দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে ফকীহগণ যুগ যুগ ধরে সমকালীন সমস্যাদির অনুপম সমাধান দিয়ে আসছেন। এর ধারাবাহিকতা এখনো বিদ্যমান। তাঁদের সমাধান সম্বলিত আলোচনা ও গবেষণার সারনির্যাস বিভিন্ন কিতাবে সন্নিবেশিত হয়েছে এবং হচ্ছে।

فقه النوازل : কিছু নীতিমালা

এক.

ফিকহুন-নাওয়াযিল ইজতেহাদের একটি অংশ। ইজতেহাদের জন্য যে সকল মূলনীতি ও

নিয়মকানুন রয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য। তাই 'নাওয়াযিল'র সমাধান উসূলুল ফিকহি ওয়াল ইজতেহাদ (أصول الفقه والاجتهاد) এর ভিত্তিতে হবে। আর أصول الفقه والاجتهاد এর আলোচনা সংশ্লিষ্ট কিতাবে আছে। তাই এখানে নতুন করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। আলোচ্যবিষয়টি সহজ করণার্থে সাহাবায়ে কেরাম ও পরবর্তী ইমামদের নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

সাহাবায়ে কেরাম ইজতেহাদ করেছেন। নাযেলার সমাধান দিয়েছেন। তারা সর্বাবস্থায় দলীলের অনুসরণ করেছেন এবং উসূল ও কানুনের আওতায় থেকেছেন। যদিও সব উসূল (কিছু কিছু উসূল ইজতেহাদী হওয়ায়) সবার জন্য মানা আবশ্যক ছিলো না। আর তা সম্ভবও নয়। তবে স্বতঃসিদ্ধ উসূল সবাই মেনে চলতেন। মোটকথা সাহাবা যুগে ইজতেহাদ ছিলো, উসূলও ছিলো। যার প্রমাণ তাঁদের ইজতেহাদ বিষয়ক দিক-নির্দেশনা থেকে সহজেই অনুমেয়। সুতরাং এ কথা বলার সুযোগ নেই, উসূলুল ইজতেহাদ বা উসূলুল ফিকহ পরবর্তী ফকীহদের আবিষ্কার। হ্যাঁ, সংকলন ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে পরবর্তী ফকীহদের হাতে।

সাহাবায়ে কেরামের ফাতাওয়া ও তাঁদের ইজতেহাদ বিষয়ক আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা নাযেলার সমাধানের ক্ষেত্রে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহ থেকে ইজতেহাদ করার পাশাপাশি নিম্নের উসূল ও পদ্ধতি অনুসরণ করতেন।

ক. التخر يج على المجمع عليه

খ. التخريج على نازلة متقدمة أو فتوى صحابي

গ. التخريج على أصل شرعي

সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা অনুসরণের আলোচনা বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। বিশেষ করে ফকীহ সাহাবীদের ইজতেহাদী কর্মপদ্ধতি ও দিক-নির্দেশনামূলক বর্ণনায়। যা أصول الإفتاء، أدب القضاء، أصول الفقه এর মুদাল্লাল কিতাবে এবং 'সুনান' ও 'মাসানীদে'র কিতাবে উল্লেখিত হয়েছে। নিম্নে নমুনা হিসেবে কিছু পেশ করা হলো।

শুরাইহ রাহ. হযরত ওমর রাযি. এর মনোনীত কুফার কাযী ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই বিচার বিভাগ জটিল ও স্পর্শকাতর। মানুষের দৈনন্দিন বিভিন্ন জটিলতা ও সমস্যা উপস্থাপিত হয় কাযীর দরবারে। কাযীকে এর সমাধান দিতে হয়। হযরত ওমর রাযি. তাঁকে কিছু মৌলিক নীতিমালা লিখে পাঠান।

إذا أتاك أمر فاقض فيه بما في كتاب الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله، فاقض بما سن فيه رسول الله، فإن أتاك ما ليس في كتاب، ولم يسن فيه رسول الله ﷺ، فاقض بما اجتمع عليه الناس، وإن أتاك ما ليس في كتاب الله، ولم يسنه رسول الله، ولم يتكلم فيه أحد، فأي الأمرين شئت فخذ به. [أخرجه الدارمي في «سننه» (١٦٩) (باب الفتيا وما فيه من الشدة) بإسناد جيد]

"যদি তোমার কাছে কোনো সমস্যা উত্থাপিত হয়, তাহলে কুরআন অনুযায়ী তার ফায়সালা করবে। যদি কুরআনে এর কোনো সমাধান না পাও, তাহলে রাসূল ﷺ এর সুন্নাহ অনুযায়ী

ফায়সালা করবে। যদি সে সমস্যার সমাধান কুরআন বা রাসূলের সুন্নাহ কোথাও না পাও, তাহলে উম্মতের ইজমা অনুযায়ী ফায়সালা করবে। আর যদি কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা কোথাও কোনো সমাধান না পাও, তাহলে ইজতেহাদ করতে পারো বা বিরত থাকতে পারো।
হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. ফকীহ সাহাবীদের অন্যতম। অনেক সাহাবী তাঁর বিচক্ষণতা ও সুবুদ্ধির স্বীকৃতি দিয়েছেন। তিনি ইজতেহাদ করতেন। বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দিতেন। ইজতেহাদের ক্ষেত্রে তিনি কী নীতিমালা অনুসরণ করতেন তা এক বর্ণনায় আলোচিত হয়েছে। একজন ফকীহর নিকট কোনো নতুন সমস্যা উপস্থাপিত হলে তার কর্মধারা কী হওয়া উচিত এ বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন-

فإن أتاه ما ليس في كتاب الله ولم يقل فيه نبيه ﷺ فليقض بما قضى به الصالحون ، فإن أتاه أمر لم يقض به الصالحون وليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ﷺ، فليجتهد رأيه. (أخرجه الإمام النسائي في «سننه الكبرى» باب الحكم بما اتفق عليه أهل العلم، وقال: هذا الحديث جيد، جيد، ٥٩٠٩- ترقيم شعيب الأرناؤوط)

"যদি কোনো ফকীহর কাছে এমন কোনো সমস্যা আসে যার পরিষ্কার সমাধান কুরআনে নেই, রাসূল ﷺও এর কোনো সুনির্দিষ্ট সমাধান বলে যাননি, তাহলে উম্মাহর দ্বীনদার ফকীহগণ যে পরিষ্কার ফায়সালা করে গেছেন সে অনুযায়ী ফায়সালা করবে। আর যদি সমস্যাটা এমন হয় যার ফায়সালা কুরআনে নেই, রাসূল ﷺও এ ব্যাপারে কিছু বলে যাননি এবং উম্মাহর নেককারদের কোনো সমাধানও পাওয়া যায় না তাহলে সে যেন ইজতেহাদ করে।"
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. ফকীহ সাহাবী, তিনিও ইজতেহাদ করতেন। তাঁর ইজতেহাদের নীতিমালা এক বর্ণনায় উল্লেখ হয়েছে-

فإن لم يكن في كتاب الله ولم يقله رسول الله ﷺ، وقاله أبو بكر أو عمر رضي الله عنهما قال به ، وإلا اجتهد رأيه (رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (٩١١) ص٣٢٠)

"কোন সমস্যার সমাধান যদি কুরআনে বা রাসূল ﷺ এর সুন্নাহয় না পেতেন, কিন্তু হযরত আবু বকর রাযি. বা হযরত ওমর রাযি. এর বক্তব্যে পেতেন তাহলে তাই গ্রহণ করতেন। আর কোথাও না পেলে ইজতেহাদ করতেন।"

দুই.

সাহাবায়ে কেরামের ইজতেহাদের মৌলিক কর্মধারা ও নীতিমালার কিছু নমুনা আমরা দেখলাম। তাঁরা নিজেরা ইজতেহাদ করতে এগুলোর অনুসরণ করতেন। অন্যদেরকে এই ধারা অনুসরণের তাকীদ দিতেন। এছাড়া অনেক ফকীহ সাহাবী ইজতেহাদের বিশেষ পদ্ধতির তালীমও দিয়েছেন। যেমন হযরত ওমর রাযি. সমকালীন সমস্যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহয় না পেলে التخريج على الأشباه والنظائر এর ভিত্তিতে সমাধান বের করার তালীম দিয়েছেন। এর নমুনা রাসূল ﷺ এর হাদীসেও বিদ্যমান। ইমাম নাসায়ী রাহ. এ বিষয়ে তাঁর 'আস সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে স্বতন্ত্র অধ্যায় লিখেছেন (باب حكم التمثيل والتشبيه)। হযরত

ওমর রাযি. আবু মূসা আশআরী রাযি. কে কাযা ও বিচার বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ কিছু মৌলিক নীতিমালা লিখে পাঠান। যার মাঝে তিনি বলেন-

الفهمَ الفهمَ فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله، ولا سنة النبي ﷺ. ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها. واعمد إلى أحبها إلى الله، وأشبهها بالحق. (المدخل الفقهي العام: ٨٠/١ ط. دار القلم دمشق) [وقد توسع في تخريجه من كتب السنة المطهرة والفقه والأدب والتاريخ والسير، الأستاذ العلامة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله في مقاله المنشور في مجلة كلية أصول الدين العدد الرابع سنة ١٤٠٢ بعنوان: تحقيق لثبوت كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري في شأن القضاء، وفي العمل بالقياس. ص ٢٩٩-٣٠٨]

"কুরআনে বা রাসূল ﷺ এর সুন্নাহয় পরিষ্কার নেই এমন বিষয় সম্পর্কে অন্তরে যা উদয় হয় তা খুব ভালো করে বোঝ! খুব ভালো করে বোঝ!! অর্থাৎ প্রথমে আশবাহ ও আমছাল ভালো করে জেনে নেবে। এরপর একেকটা বিষয় তার নযীরের সাথে কিয়াস করবে। এর মধ্য থেকে আল্লাহ তা'আলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও হকের সঙ্গে যেটা বেশি সঙ্গতিপূর্ণ তা গ্রহণ করবে।"

التخريج على الأشباه والنظائر পদ্ধতিটির ফিকহুন নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ফকীহ সাহাবীগণ নাযেলার সমাধান করতে এ পদ্ধতি ব্যবহার করতেন। যার প্রমাণ মেলে ইবনুল কাইয়িম রাহ. (জন্ম ৬৯১-মৃ.৭৫১) এর বক্তব্য থেকে-

فالصحابة رضي الله عنهم مثلوا الوقائع بنظائرها، وشبهوها بأمثالها، وردوا بعضها إلى بعض في أحكامها، وفتحوا للعلماء باب الاجتهاد، ونهجوا لهم طريقه، وبينوا لهم سبيله. (إعلام الموقعين: ١٧٣/١)

"সাহাবায়ে কেরাম নবঘটিত সমস্যাবলীকে অনুরূপ মাসআলার সঙ্গে মিলাতেন, সমশ্রেণীর মাসআলাগুলোর একটিকে অপরটির সঙ্গে তুলনা করতেন এবং একটার হুকুম অন্যটায় আরোপ করতেন। এভাবে তারা উলামায়ে কেরামের জন্য ইজতেহাদের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন। তাদেরকে ইজতেহাদের পথ দেখিয়েছেন এবং এ পথকে তাদের জন্য পরিষ্কার করে গেছেন।"

তিন.

তাবেঈনদের শুরু ও মধ্য যুগেও এ ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তীতে (অন্য ইমামদের মত) ইমাম আবু হানীফা রাহ. কুরআন-সুন্নাহ ও সাহাবা, তাবেঈনের আমল ও ফাতাওয়া অধ্যায়ন ও নিরীক্ষণ করে কিছু উসূল বা মূলনীতি স্থির করেন, যেগুলো বাস্তব অর্থে কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবা তাবেঈনের কর্মধারার সারনির্যাস। অর্থাৎ প্রত্যেকটি উসূলের দলীল সমষ্টিগতভাবে কুরআন-সুন্নাহসহ সাহাবা তাবেঈনের আমল ও ফাতাওয়া। আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, একটা 'আসলের' পক্ষে একটা দলীল থাকা আর অন্য একটি 'আসলের' পক্ষে সমষ্টিগতভাবে কুরআন-সুন্নাহ থাকা দু'টো এক নয়। বরং দ্বিতীয়টি সর্বগুণে প্রথমটির চেয়ে অগ্রগণ্য। আল্লামা যাহেদ কাওসারী রাহ. (মৃ.১৩৭১) বলেন-

أن هؤلاء الفقهاء بالغوا في استقصاء موارد النصوص من الكتاب، والسنة وأقضية الصحابة، إلى أن أرجعوا

النظائر المنصوص عليها، والمتلقاة بالقبول إلى أصل تتفرع هي منه، وقاعدة تندرج تلك النظائر تحتها. وهكذا فعلوا في النظائر الأخرى، إلى أن أتموا الفحص والاستقراء، فاجتمعت عندهم أصول. (فقه أهل العراق وحديثهم: ٤٦، مقدمة نصب الراية بتحقيق الشيخ محمد عوامة حفظه الله تعالى)

"ফিকহে হানাফীর ইমামগণ কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবায়ে কেরামের ফায়সালাসমূহের পরিপূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে মানসূস আলাইহি ও সর্বজন গৃহীত নযীরগুলো এমন এক মূলনীতির অধীন করেছেন, যে মূলনীতি থেকে এ সমশ্রেণীর শাখা মাসাইল বের হয় এবং এমন এক কায়দার সঙ্গে মিলিয়েছেন যে কায়দার অধীনে সেই নযীরগুলো দাখেল হয়ে যায়। এভাবেই তাঁরা আরো বিভিন্ন নযীরের বিশ্লেষণ যাচাই-বাছাই করে অনুসন্ধান ও যাস-পরতাল পরিপূর্ণ করেছেন। এভাবে তাদের কাছে উসূল (মূলনীতি) স্থির হয়।"

ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইজতেহাদ করতেন কুরআন-সুন্নাহ ও তা দ্বারা সমর্থিত উসূলের আলোকে। নিজ শাগরিদদেরকেও এর আলোকে ইজতেহাদ করার যোগ্য করে গড়ে তুলতে থাকেন। এভাবে ফিকহে হানাফী একটি মাকতাবায়ে ফিকরের রূপ লাভ করে।

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এককভাবে ইজতেহাদ না করে শুরা পদ্ধতি গ্রহণ করেছিলেন। মুজতাহিদ শাগরিদদের সমন্বয়ে মাসআলার গবেষণা, চিন্তা ফিকির ও আলোচনা-পর্যালোচনা চলতো। এক পর্যায়ে যখন নিশ্চিত হতেন যে, এই সিদ্ধান্তটি সঠিক, কুরআন-সুন্নাহসম্মত এবং অন্যরা এতে একমত হতেন, তখন তা লিপিবদ্ধ করার নির্দেশ দিতেন।

عن إسحاق بن إبراهيم قال: كان أصحاب أبي حنيفة يخوضون معه في المسألة، فإذا لم يحضر عافية بن يزيد قال أبو حنيفة: لا ترفعوا المسألة حتى يحضر عافية، فإذا حضر ووافقهم قال أبو حنيفة: أثبتوها، وإن لم يوافقهم قال أبو حنيفة: لا تثبتوها. (السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي للدكتور مصطفى السباعي: ٣٨٩ ط. دار الوراق بيروت، ويراجع أخبار أبي حنيفة للصيمري)

"ইসহাক ইবনে ইবরাহীম রাহ. বলেন, 'ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ছাত্ররা তাঁর সঙ্গে একেকটি মাসআলায় গভীর চিন্তা-গবেষণা করতেন। তবে যখন ইমাম আফিয়া ইবনে ইয়াযিদ মজলিসে উপস্থিত না থাকতেন, তখন ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলতেন, মাসআলা চূড়ান্ত করো না যতক্ষণ না আফিয়া উপস্থিত হয়। অতঃপর যখন আফিয়া উপস্থিত হতেন এবং সে বিষয়ে সহমত পোষণ করতেন তখন আবু হানীফা রাহ. বলতেন, সিদ্ধান্তটি লিপিবদ্ধ করে রাখ। আর যদি তিনি সহমত পোষণ না করতেন তখন বলতেন, এটি লিখো না।"

যেহেতু ঐ সিদ্ধান্ত ও ফাতাওয়া যৌথ গবেষণার মাধ্যমে স্থির হতো এবং কুরআন-সুন্নাহসম্মত হওয়াটাও পরিষ্কার ছিলো, তাই পরবর্তী ফিকহে হানাফীর অনুগামী ফকীহগণ নাযেলার সমাধানের ক্ষেত্রে তা ফাতাওয়ার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে তার উপরে তাখরীজ করে সমকালীন সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। এক্ষেত্রে তাঁরা ضوابط التخريج والاختيار এর পূর্ণ অনুসরণ করতেন।

একজন সাহাবী আরেকজন সাহাবীর ফাতওয়ার উপর তাখরীজ করে সমাধান দিতেন।

কারণ সাহাবীর ফাতওয়া দলীল নির্ভর হবে এটাই স্বাভাবিক, তাই এই ফাতওয়ার উপর ভিত্তি করে অন্য আরেকটি সমস্যার সমাধান দিতেন। তেমনি মাযহাবের ইমামগণের সিদ্ধান্ত ও ফাতাওয়া দলীল নির্ভর হওয়ায় মাযহাবের অনুসারী ফকীহগণ তাঁদের সিদ্ধান্ত ও ফাতাওয়ার উপর তাখরীজ করে সমকালীন সমস্যার সমাধান দিয়েছেন। প্রয়োজনে ইজতেহাদ করেছেন কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত ফিকহে হানাফীর উসূলের আলোকে। তবে التخريج الفقهي-ই ছিল নাযেলার সমাধান উদ্ভাবন করার অন্যতম মাধ্যম। এমনকি আমাদের ইমামদের ফাতাওয়া থেকে মাসআলার তাখরীজ করতে উসূলুল ফিকহের শব্দগত আলোচনাও (بحث دلالات الألفاظ) তারা কাজে লাগিয়েছেন। যার প্রমাণ মেলে ইমামদের মুতুন শিরোনামে কিতাবের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে।

চার.

এভাবে ফিকহে হানাফীতে ফিকহুন নাওয়াযিলের যাত্রা শুরু হয় এবং পূর্বের ধারার সাথে আরো কিছু উপধারা যুক্ত হয়। ফিকহে হানাফীর পরবর্তী ইমামদের নাযেলার সমাধানের প্রকার ও পদ্ধতি সম্পর্কে মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুমুল্লাহ বলেন-

وبما أن الفتاوى والواقعات تشتمل على مسائل لم ينص عليها أصحاب المذهب

أ. فإنها قد تكون استنباطا جديدا من القرآن والسنة على أصل الحنفية.

ب. وقد تكون تخريجا أو قياسا على بعض المسائل التي نصوا عليها.

ج. وقد تكون ترجيحا لبعض الأقوال المروية عنهم على بعض. (أصول الإفتاء وآدابه: ١٤٧)

"ফাতাওয়া ও নবঘটিত বিষয়গুলো এমন কিছু মাসআলা, যেগুলোর ব্যাপারে মাযহাবের মূল ইমামদের কোনো বক্তব্য নেই। তাই সেই নতুন বিষয়গুলোর সমাধান বিভিন্নভাবে করা হয়ে থাকে-

১. হানাফী মাযহাবের 'আসল' ও মূলনীতি মেনে কুরআন-সুন্নাহ থেকে নতুনভাবে ইসতিম্বাত করা।

২. ইমামদের থেকে স্পষ্টভাবে বর্ণিত মাসআলার উপর কিয়াস বা তাখরীজ করে সমাধান করা।

৩. তাঁদের থেকে বর্ণিত একাধিক বক্তব্যের কোনো একটিকে প্রাধান্য দিয়ে সমাধানে পৌঁছা।"

এভাবে সমাধান দিতে গিয়ে ফকীহগণ কোনো কোনো সময় ইমামের মতকেও ছেড়ে দিয়েছেন। আল্লামা শামী রাহ. (১১৯৮হি.-১২৫২হি.) বলেছেন-

وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب لدلائل وأسباب ظهرت لهم. (شرح عقود رسم المفتي: ٨٦)

"কখনো কখনো তারা মাযহাবের ইমামদের সঙ্গেও ইখতেলাফ করেছেন তাদের কাছে প্রকাশিত দলীল ও সাবাবের (কারণ) ভিত্তিতে।"

পাঁচ.

দৈনন্দিন নতুন নতুন ঘটনা সামনে আসছে। পুরনো মাসাইল ও নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যার শর'য়ী সমাধান স্থির করা একজন যোগ্য ফকীহর দ্বীনি দায়িত্ব। আল্লামা আব্দুল কারীম আশ্‌শাহরাস্তানী রাহ. (জন্ম ৪৬৯-মৃ.৫৪৮) বলেন-

وبالجملة نعلم قطعا ويقينا أن الحوادث والوقائع في العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحصر والعد، ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضا، والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار، حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. (الملل والنحل: ١/١٩٩ ط. مطبعة محمد علي صبيح، القاهرة)

"মোটকথা আমরা নিশ্চিত ও অকাট্যভাবে জানি যে, নতুন নতুন সমস্যা প্রতিনিয়ত ঘটতেই থাকবে। যার কোনো সীমা নেই এবং এটাও আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে, প্রতিটি নতুন ঘটনা সমাধানের জন্য শরী'আতের স্পষ্ট নির্দেশনা নেই। আর এটা কল্পনা করাও যায় না। শরী'আতের 'নস' যখন সীমিত এবং সমস্যা অসীম আর সসীমের মাঝে অসীমের নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, তখন এটা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হলো যে, ইজতেহাদ ও কিয়াস আবশ্যক। এমনকি প্রতিটি নতুন ঘটনায় ইজতেহাদ করতে হয়।"

যদি বর্তমানে কোনো নাযেলা সামনে আসে, তখন একজন যোগ্য মুফতীর কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে তার বিস্তারিত আলোচনা آداب القاضي وأصول الإفتاء বিষয়ক কিতাবে রয়েছে। নিম্নে সারসংক্ষেপ তুলে ধরা হলো-

ক. সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, এ বিষয়ে মাযহাবের ইমামদের থেকে কোনো না কোনো 'নস' খুঁজে বের করার। কারণ তাঁরা কুরআন-সুন্নাহ ও উসূলের আলোকে বা তাখরীজের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক মাসআলার সমাধান দিয়েছেন। বর্তমানে কোনো মাসআলা নতুন করে ঘটলে তার সঠিক সমাধান পূর্ববর্তী ফকীহগণের আলোচনায় পাওয়া খুব স্বাভাবিক। তাই সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে সমাধান বের করার। এক্ষেত্রে দুই একটি কিতাব দেখে একথা ভাবা উচিত হবে না যে, এ বিষয়ের সমাধান পূর্ববর্তী কোনো ইমাম দিয়ে যাননি। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

والغالب أن عدم وجدانه النص بقلة اطلاعه، أو عدم معرفته بموضع المسألة المذكورة فيه، إذ قلما تقع حادثة إلا ولها ذكر في كتب المذهب. إما بعينها، أو بذكر قاعدة كلية تشتملها... (شرح عقود رسم المفتي: ١٠٥ مكتبة شيخ الإسلام، داكا)

"সাধরণত কেউ 'নস' পায় না কম অনুসন্ধানের কারণে। অথবা কাঙ্ক্ষিত মাসআলা উল্লেখ করার স্থান জানা না থাকার কারণে। কেননা খুব কম সমস্যা এমন থাকে যে ব্যাপারে মাযহাবের কিতাবে কোনো 'নস' থাকে না। হয়তো হুবহু ঐ মাসআলা থাকে অথবা এমন কোনো কায়দা উল্লেখ থাকে যা সেই মাসআলাকে শামিল করে নেয়।"

যদি পূর্ববর্তী ইমামদের আলোচনায় সমাধান পাওয়া যায়, তাহলে সে হিসেবেই ফাতওয়া দিবে।

খ. যদি অনেক চেষ্টার পরেও কোনো সমাধান খুঁজে পাওয়া না যায়, ইজতেহাদের যোগ্যতা

না থাকলে অপারগতা প্রকাশ করবে এবং অন্য যোগ্য মুফতীর সোপর্দ করে দিবে। অথবা নিজে যোগ্য কোনো মুফতীর শরণাপন্ন হয়ে সমাধান জেনে নিবে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এধরনের সমস্যা সমাধান দিতে যারা অক্ষম তাদের সম্পর্কে বলেন-

ولا يكتفى بوجود نظيرها، مما يقاربها. فإنه لا يأمن أن يكون بين حادثته وما وجده فرق، لا يصل إليه فهمه. فكم من مسألة فرقوا بينها وبين نظيرتها، حتى ألفوا كتب الفروق لذلك. ولو وكل الأمر إلى أفهامنا لم يدرك الفرق بينهما... (شرح عقود رسم المفتي: ١٥٥)

"শুধুমাত্র মাসআলার কাছাকাছি নযীর পাওয়াই যথেষ্ট নয়। কেননা নতুন মাসআলা আর সে যে নযীর পেয়েছে দুইয়ের মাঝে সূক্ষ্ম পার্থক্য থেকে যেতে পারে যা হয়তো তার চিন্তায়ও আসবে না। কেননা অনেক মাসআলা এমন আছে যেগুলোকে তার নযীরের সাথে পার্থক্য করে দেখানো হয়েছে। এমনকি তাঁরা এই পার্থক্যের উপর স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন।"

ইমাম কাযীখান রাহ. (মৃ. ৫৯২) বলেন-

وإن كان المفتي مقلدا غير مجتهد يأخذ بقول من هو أفقه الناس عنده، ويضيف الجواب إليه، فإن كان أفقه الناس عنده في مصر آخر يرجع إليه بالكتاب، ويكتب بالجواب، ولا يجازف خوفا من الافتراء على الله تعالى بتحريم الحلال وضده. انتهى. (مقدمة الفتاوى الخانية: ٣/١ بهامش الهندية ط. زكريا)

"মুফতী যদি মুকাল্লিদ হয় এবং মুজতাহিদ না হয়, তাহলে তার উচিত হলো, তার কাছে সবচে বড় ফকীহর বক্তব্য সে গ্রহণ করবে এবং কাউকে জবাব দিলে সেই ফকীহের দিকে জওয়াবের সম্বন্ধ করবে। আর তার জানা বড় ফকীহ যদি অন্য শহরে হয় তাহলে সে পত্রযোগে তার সঙ্গে যোগাযোগ করবে এবং লিখিতভাবে জওয়াব জেনে নিবে। অনুমান করে হালালকে হারাম বলে বা হারামকে হালাল বলে আল্লাহ তা'আলার উপর মিথ্যা আরোপের দুঃসাহস যেন না দেখায়।"

গ. কিছু কিছু 'নাযেলা' এমন আছে যার সমাধান পূর্ববর্তী ইমামদের আলোচনায় সরাসরি নেই। তবে ঐ 'নাযেলা'র সমশ্রেণী ও সামঞ্জস্যপূর্ণ 'নাযেলা'র সমাধান আছে। এক্ষেত্রে যদি কেউ যোগ্য ফকীহ হয় এবং অন্যান্য ফকীহ তাঁর যোগ্যতার স্বীকৃতি দেন, তাহলে ফিকহে হানাফীর উসূল ও নিয়ম-কানুনের আলোকে التخريج على النظائر বা التخريج الفقهي এর ভিত্তিতে সমাধান দিতে পারে।

ঘ. আর যদি সরাসরি সমাধান বা সমশ্রেণীর নযীর কোনোটাই না পাওয়া যায়, তাহলে যোগ্য ফকীহগণ (المتبحرون في المذهب) যারা মাযহাবের উসূল ও ফুরূ'র মেযাজ ও নিয়মকানুনের অগাধ জ্ঞান রাখেন, অন্যান্য ফকীহের কাছে তাদের যোগ্যতাও স্বীকৃত। কুরআন-সুন্নাহ থেকে উসূলুল ফিকহের আলোকে তারা সমাধান দেয়ার চেষ্টা করবেন। তবে এককভাবে সমাধান না দিয়ে যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাধান দেয়া সর্বোত্তম।

এ প্রসঙ্গে হযরত মাওলানা সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা.বা. বলেন-

کام کا صحیح طریقہ اپنایا جائے یعنی نئے مسائل کا حل فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں قرآن وحدیث میں تلاش کیا جائے، صرف فقہی نظائر پر اکتفانہ کی جائے۔ کیونکہ قرآن وحدیث اللہ پاک کی نازل فرمودہ ہیں، جن میں قیامت تک کے تمام احوال کی نہ صرف رعایت ملحوظ ہے بلکہ صاف اشارے موجود ہیں۔ نئے مسائل کے حل کا یہ طریقہ نامناسب ہے کہ صرف فقہی نظائر پر نظر روک دی جائے ورنہ اسکا نتیجہ وہی ہوگا جو ماضی میں سامنے آتا رہا مثلاً جب ٹرین چلی تو اس میں نماز پڑھنے کے عدم جواز کو چھکڑے پر نماز پڑھنے کے عدم جواز پر قیاس کیا گیا، لاؤڈ اسپیکر ایجاد ہوا تو اس کو صدی (آواز بازگشت) کے جزئیہ پر قیاس کیا گیا، دستی گھڑی آئی تو اس کو چوڑی پر قیاس کیا گیا مگر بالآخر یہ تمام رائیں بدلنی پڑیں اور یہ صورت حال قیاس در قیاس کے نتیجہ میں پیش آئی، اس لئے نئے مسائل کے حل کے لئے جو فطری صورت ہے اس کو اپنایا جائے، یعنی فقہ اور اصول فقہ کی روشنی میں اصل مصادر سے مسائل کا اخذ و استنباط عمل میں لایا جائے۔ ...شورائی طریق استنباط کی بنیاد ڈالی جائے ... (اسلام تغیر پذیر دنیا میں، ص۳۸ – ۳۹)

ফিকহুন নাওয়াযিলের স্পর্শকাতরতা

ফিকহুন নাওয়াযিল যেহেতু ইজতেহাদের অংশ, তাই ইমামগণ ইজতেহাদের ক্ষেত্রে যেভাবে সতর্কতা অবলম্বন করতেন তা এখানেও করতে হবে এবং ইজতেহাদের সকল শর্ত এখানে কার্যকর থাকবে। যেভাবে ইজতেহাদে অযোগ্যের পদচারণা হলে দ্বীনের বরবাদি অনিবার্য, এখানেও কোনো অযোগ্যের হস্তক্ষেপ হলে বরবাদি অনিবার্য।

عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله ﷺ يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رءوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. (أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (١٠٠) والإمام مسلم في صحيحه (٢٦٧٣)

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ইলমকে সরাসরি ওলামায়ে কেরামের সিনা থেকে তুলে নেবেন না; বরং আলেমকে তার ইলমসহ তুলে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন পৃথিবীতে কোনো আলেম অবশিষ্ট থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খদেরকে নেতৃত্বের আসনে বসাবে এবং তাদের কাছেই বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চাইবে। তখন তারাও জ্ঞানহীন ফায়সালা দিবে। ফলে তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে, অন্যদেরকে পথভ্রষ্ট করবে।"

অনেকেই আছেন যারা মনে করেন, আরবী ভাষা জেনে হাদীসের বাহ্যিক অর্থ বুঝলেই যে কেউ ইজতেহাদের যোগ্য হয়ে যায়। অনেকে তো এ অবস্থায় অবিবেচক হয়ে সরাসরি ইজতেহাদও শুরু করে দেন। অথচ এ চিন্তা কুরআন-সুন্নাহ, সাহাবার আমল ও সালাফের কর্মধারার পরিপন্থী। তাদের ভেবে দেখার জন্য দুই একটি 'নস' পেশ করা হলো। রাসূল ﷺ বলেন-

رب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه عنه. [أخرجه الإمام أحمد في مسنده

(٢١٥٩٠) بإسناد صحيح والترمذي في جامعه (٢٨٦٨) وحسنه.]

"ফিকহের অনেক বর্ণনাকারী এমন যারা ফকীহ নন। অনেকে এমন ব্যক্তির কাছে ফিকহ বর্ণনা করেছেন যে তার চেয়ে বড় ফকীহ।"

ইমাম যারকাশী রাহ. (জন্ম.৭৪৫-মৃ.৭৯৪) হাদীসটি উল্লেখ করে ব্যাখ্যা করেছেন-

قال رسول الله ﷺ: رب حامل فقه غير فقيه أي غير مستنبط، ومعناه أنه يحمل الرواية من غير أن يكون له استدلال واستنباط منها. (مقدمة المنثور في القواعد)

"রাসূল ﷺ এর বক্তব্য ফিকহের অনেক বর্ণনাকারী ফকীহ নয় অর্থাৎ মুজতাহিদ নয় একথার অর্থ হলো, সে তো ফিকহ সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করছে কিন্তু সে হাদীস থেকে ইজতেহাদ করে হুকুম বের করার ক্ষমতা তার নেই।"

এ হাদীসে রাসূল ﷺ ফিকহ সম্বলিত হাদীস সুন্নাহর বর্ণনাকারীকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন। **প্রথম প্রকার:** যারা ফিকহ সম্বলিত হাদীসের বাহক ও বর্ণনাকারী হওয়া সত্ত্বেও ঐ ফিকহ দ্বারা উপকৃত হতে পারে না। বরং অন্য ফকীহের শরণাপন্ন হতে হয়। অথচ সেও আরবী ভাষা জানে। **দ্বিতীয় প্রকার:** যারা তা দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

এ হাদীসটি একথার পরিষ্কার দলীল যে, কেউ হাদীস জানলেই সে ইজতেহাদ করতে পারবে না; বরং হাদীস থেকে বিধান উদ্ধার করতে হলে শরী'আত স্বীকৃত যোগ্যতা আবশ্যক। আর যোগ্যতা না থাকলে তাকে ফকীহের শরণাপন্ন হতে হবে। অনেকে তো মনে করে, কুরআন ও সুনানে আবু দাউদ থাকলেই ইজতেহাদের শর্ত পূর্ণ হয়ে যায়। তাহলে যোগ্যতা ও তাকওয়া, যা এক্ষেত্রে মেরুদন্ড এর কথা গেলো কোথায়?

আরো বর্ণিত হয়েছে-

أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. (رواه الدارمي في سننه في المقدمة مرسلا)

"তোমাদের মাঝে ফাতওয়ার ব্যাপারে সবচে দুঃসাহসী সেই যে জাহান্নামের ব্যাপারে দুঃসাহসী।"

যোগ্যতা অর্জন করা ব্যতীত ফাতওয়া দেয়াই 'জুরআতের' শামিল। সুতরাং এ হাদীসটি অযোগ্যের ইজতেহাদের ব্যাপারে কঠিন হুঁশিয়ারী। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. যাদের ইজতেহাদের যোগ্যতা নেই তাদেরকে ইজতেহাদ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। এমনকি লজ্জাকর পরিস্থিতির শিকার হলে লজ্জাকে হজম করার উপদেশ দিয়েছেন, ইজতেহাদের অনুমতি দেননি।

فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ﷺ ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه ، فإن لم يحسن فليقر ولا يستحي. (جامع بيان العلم وفضله: ٣١٩)

"মুফতীর সামনে যদি এমন কোনো নতুন সমস্যা আসে যার সমাধান কুরআনে না থাকে বা রাসূল ﷺও সে ব্যাপারে কোনো সমাধান না দিয়ে থাকেন। কিংবা সালেহীনের কোনো ফায়সালাও সে ব্যাপারে পাওয়া না যায়, তাহলে সে ইজতেহাদ করবে। যদি তার ইজতেহাদের ক্ষমতা না থাকে তাহলে সে যেন তা অকপটে স্বীকার করে (ইজতেহাদ থেকে বিরত থাকে)। কোনো রকম লজ্জাবোধ না করে।"

যোগ্যরাই ইজতেহাদ করবে, অযোগ্যরা বিরত থাকবে। এমনকি যোগ্য ফকীহর নিকট কোনো বিষয় অস্পষ্ট থাকলে নিছক অনুমান করে সমাধান দেয়ারও অনুমতি নেই। এ ব্যাপারে উম্মাহর সকল আলেম একমত। ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহ. (জন্ম ৩৬৮- মৃ.৪৬৩) হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর আরেকটি বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন-

هذا يوضح لك أن الاجتهاد لا يكون إلا على أصول يضاف إليها التحليل والتحريم ، وأنه لا يجتهد إلا عالم بها ومن أشكل عليه شيء لزمه الوقوف ، ولم يجز له أن يحيل على الله قولا في دينه لا نظير له من أصل ولا هو في معنى أصل وهذا الذي لا خلاف فيه بين أئمة الأمصار قديما وحديثا فتدبره. (جامع بيان العلم وفضله: ٣١٩)

"এই বক্তব্য এ বিষয়টি সাফ করে দিচ্ছে যে, ইজতেহাদ করতে হবে এমন কিছু উসূল বা মূলনীতির ভিত্তিতে যা হারাম-হালালের দলীল হতে পারে। আর ইজতেহাদের অধিকার সে আলেমই রাখে যার এই উসূল সম্বন্ধে জানা আছে। তার কাছে কোনো বিষয় সন্দেহপূর্ণ হলে বা অস্পষ্ট হলে ইজতেহাদ থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য। তার জন্য দ্বীন সংক্রান্ত এমন কোনো কথা আল্লাহর ব্যাপারে আরোপ করা জায়েয হবে না, যার না আছে কোনো উসূলনির্ভর নযীর (দৃষ্টান্ত)। আর না সে নযীর কোনো উসূলের পর্যায়ে। এটা এমন স্বতঃসিদ্ধ বিষয়, যে ব্যাপারে পূর্বাপর কোনো ইমামের ভিন্নমত নেই।"

একজন ফকীহ কখন নিজেকে ফাতাওয়ার যোগ্য মনে করবে এবং ফাতাওয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করবে। এ বিষয়ে ইমাম মালেক রাহ. (জন্ম- ৯৫, মৃ.১৭৯) মৌলিক নির্দেশনা দিয়েছেন-

ليس كل من أحب أن يجلس في المسجد للحديث والفتيا جلس. حتى يشاور فيه أهل الصلاح والفضل وأهل الجهة من المسجد. فإن رأوه لذلك أهلاً جلس. وما جلست حتى شهد لي سبعون شيخاً من أهل العلم أني لموضع لذلك.

قال ابن وهب: جاء رجل يسأل مالكاً عن مسألة. فبادر ابن القاسم فأفتاه فأقبل عليه مالك كالمغضب وقال له: جسرت على أن تفتي يا عبد الرحمن؟ يكررها عليه، ما أفتيت حتى سألت هل أنا للفتيا موضع. فلما سكن غضبه قيل له من سألت؟ قال: الزهري وربيعة الرأي. (ترتيب المدارك: ١/١٤٢)

"হাদীস বর্ণনা ও ফাতাওয়া দেওয়ার ফাকে যে কেউ নিজেকে নিয়োজিত করতে চাইলে তার জন্য তা জায়েয হবে না, যতক্ষণ না সে সংশ্লিষ্ট আহলে ইলম ও সালাহের সাথে পরামর্শ করবে। তাঁরা যদি তাকে যোগ্য মনে করেন, তাহলে সে নিজেকে নিয়োজিত করবে। আমি হাদীস বর্ণনা ও ফাতাওয়া দেয়ার জন্য বসেছি সত্তর জন বিশিষ্ট আহলে ইলম আমার উপযুক্ততার সাক্ষ্য দেয়ার পর।

ইবনে ওয়াহাব রাহ. বলেন, এক ব্যক্তি ইমাম মালেক রাহ. এর কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে এলে ইবনে কাসেম রাহ. আগে বেড়ে ফাতাওয়া দিয়ে ছিলেন। তখন মালেক রাহ. ক্রুদ্ধ হয়ে তার দিকে এগিয়ে বললেন, আব্দুর রহমান, তুমি ফাতাওয়া দেয়ার মত দুঃসাহস দেখালে! একথা বারবার বলতে থাকলেন। আমি ফাতাওয়া দেইনি যতক্ষণ না

বিশিষ্ট ওলামায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করেছি, আমি এর যোগ্য কি না? যখন ইমাম মালেক রাহ. এর রাগ থামলো তখন তাঁকে বলা হলো, আপনি কাকে জিজ্ঞেস করেছেন? তিনি বললেন, জুহরী ও রবীআতুর-রাইকে।"

মোটকথা, ইজতেহাদ অধিকার নয়। যে কোনো উপায়েই হোক আমাকে এ অধিকার লাভ করতেই হবে; এমন নয়। বরং এটি একটি দায়িত্ব। অত্যন্ত নাযুক ও স্পর্শকাতর দায়িত্ব। ইজতেহাদ মানেই শরী'আতের ব্যাখ্যা দেয়া। বৈধ, অবৈধ, হালাল, হারাম চিহ্নিত করা। তাই অযোগ্যতা সত্ত্বেও ইজতেহাদের চেষ্টা করা অনধিকার চর্চার শামিল, আর তা দ্বীনের বরবাদীও।

ফিকহুন নাওয়াযিল ও যৌথ ইজতেহাদ

নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো, এককভাবে সিদ্ধান্ত না নিয়ে যৌথ চিন্তা-ফিকর করা। হযরত আলী রাযি. রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করেছিলেন, যদি আমাদের সামনে এমন নাযেলা আসে যার সমাধান আমরা কুরআন-সুন্নাহয় না পাই, তখন কী করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ উত্তরে বলেছেন-

[وعن علي قال: قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرني قال:] شاوروا فيه الفقهاء والعابدين ولا تمضوا فيه رأي خاصة. (رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثوقون من أهل الصحيح. (مجمع الزوائد: ١/١٧٨)

"এব্যাপারে ফকীহ ও আবেদদের সঙ্গে পরামর্শ করবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তি বিশেষের রায়কে কার্যকর করবে না।"

আল্লামা মুহাম্মাদ তাহের ইবনে আশুর রাহ. (মৃত্যু ১২৯৬হি.) যৌথ ইজতেহাদের গুরুত্ব, উপকারিতা এবং ফিকহ বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে বলেন-

...فالاجتهاد فرض كفاية على الأمة بمقدار حاجة أقطارها وأحوالها، وقد أثمت الأمة بالتفريط فيه مع الاستطاعة ومكنة الأسباب والآلات... وإن أقل ما يجب على العلماء في هذا العصر أن يبدأوا به: هو أن يسعوا إلى جمع مجمع علمي يحضره من أكبر علماء كل قطر إسلامي، ويصدروا فيها عن وفاق فيما يتعين عمل الأمة عليه، ويعلموا أقطار الإسلام بمقرراتهم، فلا أحسب أحدا ينصرف عن اتباعهم.

(مقاصد الشريعة الإسلامية: ١٥١-١٥٢ ط. الشركة التونسية للتوزيع، الطبعة الأولى ١٩٧٨م)

"অবস্থা ও অবস্থানের প্রয়োজন অনুপাতে ইজতেহাদ ফরযে কিফায়া। সামর্থ্য ও সব ধরনের উপায় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যদি উম্মত এ কাজে শিথিলতা করে তাহলে গুনাহগার হবে। বর্তমানে ওলামায়ে কেরামকে এ কাজ শুরু করার জন্য 'কমছেকম' এতটুকু দায়িত্ব পালন করতে হবে যে, এ উদ্দেশ্যে ইলমী মজলিস করা হবে যেখানে উপস্থিত হবে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম দেশের বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরাম। সে মজলিসে তারা সম্মিলিত মতামতের ভিত্তিতে উম্মতের জন্য কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে এবং এই সিদ্ধান্ত মুসলিম দেশগুলোতে পৌঁছে দিবে। আমার মনে হয় এরপর আর কেউ তাদের অনুসরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না।"

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. ও ওমর ফারুক রাযি. এর কর্মপন্থা এমনই ছিলো। তারা নতুন কোনো বিষয় সামনে এলে এককভাবে সিদ্ধান্ত নিতেন না। বরং অন্যান্য সাহাবীর সাথে পরামর্শ করতেন। ইমাম বায়হাকী রাহ. বর্ণনা করেন-

عن ميمون بن مهران قال: كان أبو بكر ﷺ إذا ورد عليه خصم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضى به قضى به بينهم، فإن لم يجد في الكتاب نظر هل كانت من النبي ﷺ فيه سنة، فإن علمها قضى بها، وإن لم يعلم خرج، فسأل المسلمين فقال، أتاني كذا وكذا، فنظرت في كتاب الله وفي سنة رسول الله ﷺ، فلم أجد في ذلك شيئا فهل تعلمون أن نبي الله ﷺ قضى في ذلك بقضاء؟ فربما قام إليه الرهط فقالوا: نعم قضى فيه بكذا وكذا، فيأخذ بقضاء رسول الله ﷺ.

قال جعفر: وحدثني غير ميمون أن أبا بكر ﷺ كان يقول عند ذلك: الحمد لله الذي جعل فينا من يحفظ عن نبينا ﷺ وإن أعياه ذلك دعا رؤس المسلمين وعلمائهم فاستشارهم، فإذا اجتمع رأيهم على الامر قضى به.

قال جعفر: وحدثني ميمون أن عمر بن الخطاب ﷺ كان يفعل ذلك، فإن أعياه أن يجد في القرآن والسنة نظر هل كان لأبي بكر ﷺ فيه قضاء، فإن وجد أبا بكر ﷺ قد قضى فيه بقضاء قضى به وإلا دعا رؤس المسلمين وعلمائهم فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على الأمر قضى بينهم. (السنن الكبرى للبيهقي: كتاب آداب القاضي)

"হযরত মাইমুন ইবনে মিহরান রাহ. বলেন, হযরত আবু বকর রাযি. এর কাছে যখন কোনো মোকাদ্দমা উত্থাপিত হতো, তখন প্রথমে কুরআনে অনুসন্ধান করতেন। যদি তাতে কোনো ফায়সালা পেয়ে যেতেন সে অনুসারে ফায়সালা করতেন। না পেলে রাসূল ﷺ এর ফায়সালা খুঁজতেন। যদি পেয়ে যেতেন তাহলে সে ফায়সালাই দিতেন। যদি রাসূল ﷺ এর কোনো ফায়সালা না পেতেন তাহলে মুসলমানদের মাঝে ঘোষণা করতেন, আমার কাছে এই মোকাদ্দমা এসেছে। কুরআনে এবং রাসূল ﷺ এর সুন্নাহয় খুঁজেছি কিন্তু পাইনি। তোমাদের কারো কি এ সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর কোনো ফায়সালা জানা আছে? তখন কখনো কোনো জামাত দাঁড়িয়ে বলতো, হ্যাঁ, এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ এই ফায়সালা করেছেন। তখন হযরত আবু বকর রাযি. রাসূল ﷺ এর সে ফায়সালাই গ্রহণ করতেন।
জা'ফর রাহ. বলেন, মাইমুন আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন, তখন হযরত আবু বকর রাযি. বলতেন, সকল প্রশংসা সেই মহান সত্তা আল্লাহ তা'আলার জন্য যিনি আমাদের মাঝে এমন লোক রেখেছেন, যে রাসূল ﷺ এর ফায়সালা সংরক্ষণ করেছে। আর যদি ফায়সালা বের করা সম্ভব না হতো তখন শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত করতেন এবং তাদের সাথে মাশওয়ারা করতেন। সবার সমন্বয়ে সিদ্ধান্ত হলে সে অনুযায়ী ফায়সালা করতেন।
জা'ফর রাহ. বলেন, মাইমুন বর্ণনা করেন, হযরত ওমর রাযি.ও এ পন্থাই অবলম্বন করতেন। যদি কুরআন-সুন্নাহতে কোনো ফায়সালা পাওয়া সম্ভব না হতো, তাহলে তিনি দেখতেন হযরত আবু বকর রাযি. এর এ ব্যাপারে কোনো ফায়সালা আছে কি না? হযরত

আবু বকর রাযি. এর কোনো সিদ্ধান্ত পেয়ে গেলে তা অনুসারে ফায়সালা করতেন। অন্যথায় শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামকে দাওয়াত দিয়ে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। যদি তারা কোনো হুকুমের উপর সম্মিলিত সম্মতি প্রকাশ করতেন, তাহলে তা গ্রহণ করে ফায়সালা করতেন।”

ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মাযহাব শুরাভিত্তিক ছিলো। ইমাম খাওয়ারেযমী রাহ. (জন্ম ৬০৩- মৃ. ৬৫৫) আবু হানীফা রাহ. এর নাযেলা বিষয়ক ইজতেহাদের পদ্ধতি এভাবে উল্লেখ করেন-

...وكان -الإمام أبو حنيفة رحمه الله- إذا وقعت واقعة شاورهم وناظرهم وحاورهم وسألهم، فيسمع ما عندهم من الأخبار والآثار، ويقول ما عنده، ويناظرهم شهرا أو أكثر حتى يستقر أحد الأقوال، فيثبته أبو يوسف رحمه الله حتى أثبت الأصول على هذا المنهج. (مقدمة جامع مسانيد الإمام الأعظم لمحمد بن محمود الخوارزمي: ط. حيدرآباد ١٣٣٢هـ)

“যখন নতুন কোনো ঘটনা ঘটতো তখন ইমাম আবু হানীফা রাহ. তার সঙ্গীদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন, দীর্ঘ আলোচনা ও প্রশ্ন উত্তর করতেন। তাদের কাছে হাদীস ও আছারের যত দলীল আছে সব শুনতেন। তার কাছে যে দলীল আছে তাও তিনি বলতেন। কোনো একটা সিদ্ধান্ত স্থির হওয়া পর্যন্ত মাসের পর মাস আলোচনা পর্যালোচনা চলতো। কোনো একটি মত স্থির হলে ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. লিপিবদ্ধ করতেন। এ পদ্ধতিতেই উসূলী মাসাইল লিপিবদ্ধ করেছেন।”

বর্তমানে বিভিন্ন কারণে যৌথ ইজতেহাদের গুরুত্ব আরো বেড়ে গেছে। তাই সমকালীন সমস্যাবলীর শর‘য়ী সমাধান নিয়ে গবেষণা ও চিন্তা-ফিকির করার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। অনেক বড় বড় জামে‘আয়ে যৌথ চিন্তা-ফিকিরের জন্য যোগ্য মুফতীদের সমন্বয়ে কমিটি রয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় দারুল উলূম হাটহাজারীতে যোগ্য মুফতীয়ানে কেরামের সমন্বয়ে ‘মাজমাউল ফিকহিল ইসলামী’ নামে একটি ফিকহ বোর্ড গঠিত হয়েছে। সমকালীন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণা, আলোচনা-পর্যালোচনা হতে থাকে। বহুল আলোচিত ইন্স্যুরেন্স বিষয়ে একটি ফিকহী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ১৫/১১/১৪৩২হি. সনে। যেখানে ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় মুফতীয়ানে কেরাম উপস্থিত ছিলেন। এর পূর্ণ বিবরণ উস্তাদে মুহতারাম মুফতী কিফায়াতুল্লাহ সাহেব হাফিযাহুল্লাহ এর ‘আসাসুল মুওয়াসাতিল ইসলামিয়া’ নামক রিসালায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

التخريج الفقهي : কিছু কথা

ফিকহুন-নাওয়াযিলের ক্ষেত্রে তাখরীজে ফিকহীর ভূমিকা অনেক। কেউ নাওয়াযিল বিষয়ে যোগ্যতা অর্জন করতে চাইলে তাকে তাখরীজে ফিকহীতে পারদর্শী হতে হবে। প্রত্যেক মাযহাবেই এর নিয়ম-কানুন ও ধারানীতি আছে, যা সংশ্লিষ্ট কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন ফনেই ‘তাখরীজ’ শব্দটি পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। এখানে তাখরীজের অর্থ আমরা সহজে এভাবে বুঝতে পারি যে, إخراج شيء عن شيء অর্থাৎ এক জিনিস থেকে আরেক জিনিস উদ্ভাবন করা। এর কাছাকাছি অর্থে ইমাম ফযলল্লাহ তুরবিশতী রাহ. (মৃ.৬৬১) ফিকহ শব্দের

ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন-

الفقه هو التوصل إلى علم غائب بعلم شاهد. (الميسر في شرح مصابيح السنة: ٩٧/١ مكتبة نزار مصطفى باز، سعودية، الطبعة الثانية ١٤٢٩هـ)

মোটকথা, উসূল থেকে মাসআলা বা মাসআলা থেকে মাসআলা উদ্ভাবন করার নাম তাখরীজে ফিকহী। তাখরীজে ফিকহী সাধারণত চার ভাবে হয়ে থাকে।

১. تخريج الفروع على الأصول

২. تخريج الفروع على الفروع

৩. تخريج الأصول على الفروع

৪. تخريج الأصول على الأصول

প্রত্যেকটির পরিচয়, পদ্ধতি, নিয়ম কানুন, ক্ষেত্র ও প্রয়োগক্ষমতা বিশদ আলোচনার দাবি রাখে, যা এ ছোট ভূমিকায় সম্ভব নয়।

একজন ফিকহের তালেবে ইলমের জন্য অপরিহার্য হলো পূর্বের ইমামদের নাওয়াযিল বিষয়ক তাখরীজকৃত মাসাইল যথাযথ অনুধাবন করার চেষ্টা করা, তাই التخصص في الفقه الإسلامي বিভাগের তালেবে ইলমদের তামরীন হিসেবে ফিকহুন নাওয়াযিলের মুতালা'আ ও তামরীন করানো হয়।

দরসুল ফিক্‌হ প্রসঙ্গ

দারুল উলূম হাটহাজারীর التخصص في الفقه الإسلامي বিভাগে দ্বিতীয় বছরের তালেবে ইলমদের ফিকহুন নাওয়াযিল বিষয়ে মুতালাআ ও তামরীন হয়। সুবাদে ১৪৩৪-৩৫ হিজরী শিক্ষাবর্ষের সাথীবৃন্দ সমকালীন কিছু বিষয়ের সমাধান প্রবন্ধাকারে জমা করে কিতাবে সেমতে রূপ দেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কিছু বিষয় বাছাই করে সাথীদের মাঝে বিতরণ করা হয়। তারাও আসাতেযায়ে কেরামের নেগরানীতে মুতালা'আ করে মুতালা'আর সারনির্যাস প্রবন্ধাকারে পেশ করার চেষ্টা করতে থাকে।

বিষয়টি একান্ত ঐচ্ছিক থাকায় সবাই আগ্রহী হওয়ার পরও নির্দিষ্ট সময়ে ৪৫টি প্রবন্ধ জমা হয়। এগুলোর সম্পাদনার জন্য দরসে ফিক্‌হ শিরোনামে অধমসহ ইফতা সমাপনী বর্ষের আরো পাঁচজন সাথীকে জিম্মাদারী দেয়া হয়। যারা হলেন- ইসমাঈল হুসাইন, মাহবুবুল হক, আবুল বাশার সোহাইল, আব্দুল্লাহ মুস্তফা ও শহীদুল ইসলাম। কম্পোজ ও অক্ষরবিন্যাসের জিম্মাদারী দেয়া হয় আবু হানীফ ভাইকে। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবে কাজটি আঞ্জাম দিতে না পারায় এ জিম্মাদারী অর্পন করা হয় আব্দুর রহীমকে এবং শেষ পর্যন্ত সে কাজটি করে যায়।

প্রবন্ধ সংগ্রহের পর দেখা গেলো প্রবন্ধগুলো এখনো প্রাথমিক অবস্থায় থেকে গেছে। তাই বাধ্য হয়ে দু'একটি বাদ দিয়ে প্রবন্ধ সবগুলো আগাগোড়া নতুন করে ঢেলে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন করে প্রস্তুত করা ও সম্পাদনার সময় যে দিকগুলো লক্ষণীয় ছিল তা নিম্নরূপ-

ক. ফিক্হী দলীলের সাথে প্রয়োজনীয় আয়াত ও হাদীস যুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আল-ফিক্হুল মুদাল্লাল ও আল-ফিক্হুল মুকারান বিষয়ক কিতাবে যে হাদীসগুলোকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলো মূল কিতাব থেকে তাখরীজ করে প্রয়োজনে সংক্ষেপে হাদীসের মান উল্লেখ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

খ. প্রত্যেক প্রবন্ধে মাসআলার আলোচনার ক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরামের আলোচনা থেকে ‘মানাত’ উল্লেখ করে তা বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

গ. কোনো মাসআলার নযীর ও উসূল পূর্ববর্তী ইমামদের কিতাবে থাকলে التخريج الفقهي অনুকরণে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘ. প্রত্যেকটি প্রবন্ধ পুনঃপ্রস্তুত করার সময় এক আন্দাযে সাজানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ঙ. অনুবাদের সময় ভাবানুবাদকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

উল্লিখিত বিষয়াবলী আমাদের লক্ষণীয় ছিলো, যা প্রায় সকল প্রবন্ধে সাধ্যমত রক্ষা করার চেষ্টা করেছি। তবে চূড়ান্ত বা যথাযথ হয়েছে বলার সাধ্য নেই। প্রচেষ্টা ও প্রয়াস মাত্র। যোগ্যতার সীমাবদ্ধতা এবং সময়ের স্বল্পতা পূর্ণ কার্যকর ছিলো। এভাবে প্রত্যেকটি প্রবন্ধকে পুনঃপ্রস্তুত ও সম্পাদনার পর বারবার প্রুফ দেখে ছাপানোর উপযুক্ত করা হয়। অতঃপর আসাতেযায়ে কেরামের নিকট সত্যায়নের জন্য পাঠানো হয়। হযরত আসাতেযায়ে কেরাম শত ব্যস্ততার মাঝেও যথাসম্ভব প্রবন্ধগুলো দেখে ও শুনে সত্যায়ন করেন এবং প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে দেন। আল্লাহ তা‘আলা সকল আসাতেযায়ে কেরামকে দীর্ঘায়ু দান করুন। ইলম আমলে বরকত দিন। তাঁদের ইলম ও আমল দ্বারা সবাইকে আরো বেশি উপকৃত করুন। আমীন॥

পরবর্তীতে আবার প্রুফ দেখা হয় এবং যথাসম্ভব বানান নির্ভুল করার চেষ্টা চলতে থাকে। এরপরও ভুল থেকে যাওয়া বিচিত্র কিছু নয়। বারবার দেখার পরও ভুল থেকে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে হযরত মা‘মার রাহ. বলেন-

لو عورض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط أو خطأ. (جامع بيان العلم: باب في معارضة الكتاب)*

---

* وقد ورد في ذلك عن الإمام الشافعي و صاحبه المزني رحمهما الله تعالى ما يشهد لقول معمر ويصدقه، كما روى البيهقي في «مناقب الشافعي» ٣٦/٢ (تحقيق السيد أحمد صقر.) عن الربيع بن سليمان يقول: قرأت كتاب الرسالة المصرية على الشافعي نيفا وثلاثين مرة، فما من مرة إلا كان يصححه، ثم قال الشافعي في آخره: أبى الله أن يكون كتابا صحيح غير كتابه. انتهى.

وذكر ابن مفلح في «الآداب الشرعية» (فصل في خطأ الثقات وكونه لا يسلم منه بشر) : قال البويطي: سمعت الشافعي يقول: قد ألفت هذه الكتب ولم آل فيها، ولابد أن يوجد فيها الخطأ، إن الله تعالى يقول: وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُوا۟ فِيهِ ٱخْتِلَـٰفًا كَثِيرًا ﴿٨٢﴾

وروى الخطيب البغدادي في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٦/١ (تحقيق المعلمي) عن المزني تلميذ الشافعي رحمه الله قال: لو عورض كتاب سبعين مرة، لوجد فيه خطأ، أبى الله أن يكون كتاب صحيحا غير كتابه.اه

وليس معناه أن يغفل لأجل ذلك الكتاب طره ويهمل كله فأي كتاب ينجو من ذلك غير كتاب الله ؟! ونعم ما قال الحافظ ابن رجب الحنبلي (المتوفى ٧٩٥): يأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه، والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير من صوابه. (القواعد في الفقه الإسلامي: ٣ ط. دار الكتب العلمية، بيروت)

"একটা কিতাব যদি একশ বারও 'দেখা' হয় তবুও তাতে কোনো না কোনো ভুল না থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া যায় না।"

আহলে ইলমের কাছে আমাদের সবিনয় দরখাস্ত যে, যদি বক্ষ্যমাণ কিতাবে কোনো ভুল দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে আমাদের অবগত করবেন। সঠিক বিষয় পরিষ্কার হওয়ার পর আমাদের গ্রহণ করতে কোনো কুণ্ঠা নেই। তবে ফিকহী নুসূস ও ভাষ্য থেকে মাসআলা উদ্ধার করার ক্ষেত্রে মতভিন্নতা হওয়া খুব স্বাভাবিক। এটি প্রত্যেক যুগেই ছিল। এক্ষেত্রেও যদি দলীল প্রমাণের মাধ্যমে কোনো দিক সঠিক হওয়া অগ্রগণ্য হয় তাহলে আমরা গ্রহণ করবো, ইন্‌শাআল্লাহ।

اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.

"হে আল্লাহ! আমাদের সামনে সত্যকে সত্যরূপেই দেখান এবং এর অনুসরণ করার তাওফীক দিন। আর বাতিলকে বাতিলরূপেই দেখান এবং তা থেকে দূরে থাকার তাওফীক দিন।"

পাঠকের সুবিধার্থে প্রবন্ধে উল্লিখিত রিজালের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রয়োজনীয় টিকা টিপ্পনী যোগ করা হয়েছে এবং গ্রন্থপঞ্জিতে কিতাবের পূর্ণ বিবরণ দেয়া হয়েছে।

প্রবন্ধ থেকে বইয়ে রূপ দেয়ার ক্ষেত্রে দরসে ফিকহের সাথী ও প্রাবন্ধিকবৃন্দ এবং আরো অনেক সাথী ভাই বিভিন্নভাবে শ্রম দিয়েছেন, সহযোগিতা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে কবুল করুন। দ্বীনের মুখলিস মুতকিন খাদেম বানান। ইলমে আমলে তারাক্কী দান করুন। কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহের খেদমতে নিয়োজিত রাখুন। আমাদের আজেযানা এই খেদমতটুকু কবুল করে নিন। নিজ জিম্মায় ইশা'আত ও প্রচার প্রসারের ব্যবস্থা করুন। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য উপকারী বানান। আমীন ॥

هذا وصلى الله تعالى وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

বিনীত
আব্দুল্লাহ নাজীব
১২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫ হিজরী
১৩ এপ্রিল ২০১৪ খ্রিস্টাব্দ

অধ্যায়ঃ নামায

মসজিদ ও ঈদগাহে মহিলাদের জামা'আতে অংশগ্রহণ

মাওলানা মুহাম্মাদ জোবায়ের আহসানল্লাহ

নারী ও পুরুষ মানব সমাজের দু'টি অপরিহার্য অঙ্গ। কোনোটিকে বাদ দিয়ে মানবসমাজ গঠিত হতে পারে না। উভয় অঙ্গ একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক। এক আত্মা থেকেই উভয়ের সূচনা ও সৃষ্টি এবং উভয়ের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এক ও অভিন্ন। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"শুধু আমার ইবাদত করার জন্য আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি।"[১]

মানবসমাজ নারী-পুরুষ উভয় দ্বারা গঠিত। সুতরাং এ আয়াত দ্বারা একথা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, নারী-পুরুষ উভয়কে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। আর ইবাদতের মধ্যে নামায হলো অন্যতম ইবাদত। তা পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে আদায় করতে হয়। মহিলাদের ক্ষেত্রে হুকুমটির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। তাই মহিলাদের নিজ এলাকার মসজিদ কিংবা ঈদগাহের জামা'আতে উপস্থিত হয়ে নামায পড়ার ব্যাপারে শরী'আতের বিধান সম্পর্কে এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করা হবে। ইন্‌শাআল্লাহ।

পুরুষদের জন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ হুকুম। রাসূল ﷺ পুরুষদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে খুবই তাকীদ দিয়েছেন। কখনো জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার সরাসরি নির্দেশ দিয়েছেন, কখনো জামা'আতে অনুপস্থিতির ব্যাপারে বিভিন্ন ধমকি দিয়েছেন। অনেক হাদীসে তা বর্ণিত হয়েছে। নিম্নে তা থেকে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হলো-

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ قال: والذى نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم.

"রাসূল ﷺ বলেন, ঐ সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার ইচ্ছে হয় যে কাউকে লাকড়ি জমা করার নির্দেশ দেই এবং তা জমা করা হবে। অতঃপর নামাযের জন্য আযান দেয়ার আদেশ করি। এরপর কাউকে ইমাম বানিয়ে নামায পড়ানোর হুকুম করি। আর আমি যারা জামা'আতে উপস্থিত হয়নি তাদের নিকট গিয়ে লাকড়ি দ্বারা তাদেরকে তাদের ঘর বাড়িসহ জ্বালিয়ে দেই।"[২]

হাদীস থেকে বোঝা যায়, পুরুষদের জন্য জামা'আতে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। পক্ষান্তরে

---

[১] সূরা যারিয়াত: ৫৬

[২] সহীহ বুখারী: ১/১৮৯, হাদীস নং ৬৪৪

মহিলাদের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ পাঁচ ওয়াক্তে মসজিদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার সরাসরি নির্দেশ দেননি। বরং তাদেরকে ঘরে নামায পড়ার প্রতি উৎসাহ দিয়েছেন। যেমন হযরত উম্মে হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত-

أنها جائت إلي النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله ! إني أحب الصلاة معك فقال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك وصلاتك في دارك، خير من صلاتك في مسجد قومك وصلاتك، في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي، قال: فأمرت فبني المسجد في أقصى شيء من بيتها وأظلمها وكانت تصلي فيه، حتى لقي الله عز وجل.[৩]

"তিনি রাসূল ﷺ এর দরবারে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি আপনার সাথে জামা'আতে নামায পড়তে পছন্দ করি। রাসূল ﷺ বলেন, আমি জানি তুমি আমার সাথে নামায পড়তে পছন্দ কর। কিন্তু তোমার কামরায় নামায পড়া বারান্দায় নামায পড়া থেকে উত্তম। বারান্দায় নামায পড়া আঙ্গিনায় পড়ার চেয়ে উত্তম। আঙ্গিনায় নামায পড়া এলাকার মসজিদে পড়া থেকে উত্তম। এলাকার মসজিদে নামায পড়া আমার মসজিদে নামায পড়া থেকে উত্তম। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর তার নির্দেশে ঘরের সর্বাধিক গোপন অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। আর তিনি মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই নামায আদায় করেছেন।"[৪]

ইমাম ইবনে খুযাইমা রাহ.[৫] তাঁর 'আস সহীহ' গ্রন্থে "মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম" অধ্যায়ে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, যা দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে খুযায়মার নিকটেও মহিলাদের ঘরে নামায পড়াই উত্তম। হযরত ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن.

"তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মসজিদে যাওয়া থেকে বাধা দিয়ো না। আর ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম।"[৬]

উক্ত হাদীসদ্বয় দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মহিলাদের জন্য তাদের ঘরের সর্বাধিক সংকীর্ণ ও অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রকোষ্ঠে নামায আদায় করা মসজিদে নববীতে রাসূল ﷺ এর পিছনে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করার চেয়ে বহুগুণ উত্তম। তাদের বাড়িতে নামায আদায় করার গুরুত্ব প্রমাণের জন্য এ হাদীসটিই যথেষ্ট। কারণ মসজিদে নববীতে এক ওয়াক্ত

---

[৩] رواه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٧٠٩٠) وابن حبان في «صحيحه» (٢٢١٧)، وحسنه الحافظ في «فتح الباري» (باب انتظار الناس قيام الإمام العالم)

[৪] সহীহ ইবনে খুযায়মা: ৩/৯৫ হাদীস নং ১৬৮৯, আল মাকতাবুল ইসলামী, তাহকীক: ড. মুহাম্মদ মুস্তফা আ'জমী

[৫] আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমা ইবনে মুগিরা নিশাপুরী শাফে'য়ী রাহ.। ইবনে খুযাইমা নামে প্রসিদ্ধ। ৩২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইবনে হিবক্ষান রাহ. এর শায়েখ ছিলেন। ৩১১ হিজরীর যিলকদে ইন্তেকাল করেন। তিনি মুহাদ্দিসীনের মাঝে 'ইমামুল আইম্মা' নামে পরিচিত ছিলেন। তাযকিরাতুল হুফফাযে হাকেম থেকে বর্ণিত, তাঁর রচনার সংখ্যা ১৪০টিরও বেশি। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/২৯; আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা: ২০

[৬] সুনানে আবু দাউদ: ১/৮৪ হাদীস নং ৫৬৭, সহীহ ইবনে খুযায়মা: হাদীস নং ১৬৮৪; মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৫৪৬৮

নামায আদায় করা (মসজিদে হারাম ব্যতীত) অন্যান্য মসজিদে ৫০,০০০ ওয়াক্ত নামায আদায় করার সমতুল্য হওয়ার কথা রাসূল ﷺ নিজেই ঘোষণা করেছেন। তা সত্ত্বেও মহিলাদের ঘরে নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন।

তাছাড়া ঘরে মহিলাদের নিরাপত্তা সংযম যেভাবে নিশ্চিত করা যায় তা বাহিরে নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। পরবর্তী যামানায় ফেতনা বেড়ে যাওয়ায় মহিলাদের নিরাপদে মসজিদে আসা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। তাই অনেক সাহাবীই পরবর্তী সময়ে মহিলাদের মসজিদে নামায আদায় করতে বারণ করেছেন।

হযরত আয়েশা রাযি.[৭] বর্ণনা করেন-

لو أدرك رسول الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل .

"যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ মহিলাদের পরবর্তীতে আবিষ্কৃত বিষয়গুলি দেখতেন, তাহলে তাদেরকে মসজিদে উপস্থিত হতে নিষেধ করতেন। যেমনটি বনী ইসরাঈলের মহিলাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।"[৮]

বনী ইসরাঈলের মহিলারা কী করেছিলো তার বিবরণ হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন-

كان نساء بني إسرائيل يتخذن أرجلا من خشب يتشرفن للرجال، في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلطت عليهن الحيضة.[٩]

"বনী ইসরাঈলের মহিলারা কাঠের পা তৈরী করে যেগুলোতে চড়ে মসজিদে পুরুষদের দিকে উঁকি মেরে দেখত। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য মসজিদে আসাকে হারাম করে দেন এবং তাদের উপর হায়েয চাপিয়ে দেন (পূর্বের তুলনায় বাড়িয়ে দেন)।"[১০]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি.[১১] বর্ণনা করেন-

كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا ، فكانت المرأة لها الخليل ، تلبس القالبين تطول بهما لخليلها ، فألقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول : أخروهن حيث أخرهن الله فقلنا لأبي بكر : ما القالبين ؟ قال : رفيصين من خشب.[١٢]

"বনী ইসরাঈলে পুরুষ মহিলা এক সাথে (মসজিদে) নামায আদায় করত। অতঃপর

[৭] উম্মুল মুমিনীন আয়েশা বিনতে আবু বকর সিদ্দীক রাযি.। তিনি হিজরতের পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৮ হিজরীর ১৭ই রমযান মদীনায় ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬১২

[৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৮৬৯; সহীহ মুসলিম: হদীস নং ৪৪৫

[٩] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (٣٥٠/٢ دار المعرفة، بيروت، ط.١٣٧٩) باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس: أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح.

[১০] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৩/১৪৯ হাদীস নং ৫১১৪, মাজলিসে ইলমী, করাচী

[১১] আবু আব্দুর রহমান আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ হুযাইলী রাযি.। ফকীহ সাহাবী ছিলেন। হযরত ওমর রাযি. তাঁকে কুফায় মুআল্লিম হিসেবে প্রেরণ করেন। তাঁর ও অন্যান্য সাহাবার প্রচেষ্টায় কুফা ইলমের শহরে পরিণত হয়। তিনি মদীনায় ৩২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬০৫; ফিকহু আহলিল ইরাক: ৫১

[١٢] قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في «فتح الباري» (٣٥٠/٢) باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس: روى عبد الرزاق بإسناد صحيح.

(তাদের মাঝে এ ফেতনা দেখা দিলো যে) কোনো মহিলার অন্তরঙ্গ পুরুষ বন্ধু থাকত, সে তার বন্ধুর জন্য উঁচু পাদুকা পরিধান করে লম্বা হতো (যাতে বন্ধু তাকে চিনে নিতে পারে) ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর ঋতুস্রাব চাপিয়ে দিয়েছেন। এ কারণেই ইবনে মাসউদ রাযি. বলতেন, তাদেরকে পিছিয়ে দাও যেমন আল্লাহ তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন। আমরা আবু বকর রাযি.কে জিজ্ঞাসা করলাম, কালেবাইন কী? তিনি বলেন, কাঠের উঁচু পাদুকা।"[১৩]

উক্ত হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে আসার কারণে ফেতনার আশঙ্কা থাকায় সাহাবাগণও ঘরে নামায পড়ার প্রতি তাকীদ দিয়েছেন। যেমন আবু আমর শাইবানী রাযি. থেকে বর্ণিত-

أنه رأى عبد الله يخرج النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: اخرجن إلى بيوتكن خير لكن.[১৪]

"তিনি ইবনে মাসউদ রাযি.কে জুম'আর দিনে মহিলাদেরকে মসজিদ থেকে এ কথা বলে বের করে দিতে দেখেছেন, তোমরা ঘরে ফিরে যাও, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম হবে।"[১৫]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. এর আমল আরো বর্ণিত হয়েছে-

كان ابن مسعود ﵁ يحصب النساء يخرجهن من المسجد يوم الجمعة.[১৬]

"ইবনে মাসউদ রাযি. জুম'আর দিন মহিলাদেরকে কংকর নিক্ষেপ করতেন এবং তাদেরকে মসজিদ থেকে বের করে দিতেন।"[১৭]

হযরত নাফে রাহ. বর্ণনা করেন-

عن ابن عمر كان لا يخرج نسائه في العيدين.[১৮]

"ইবনে ওমর রাযি.[১৯] তাঁর স্ত্রীগণকে দুই ঈদের নামাযে বের হতে দিতেন না।"[২০]

এছাড়া আরো অনেক দলীল রয়েছে, যেগুলোর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, সাহাবা রাযি. মহিলাদেরকে ঈদগাহসহ সব ধরনের জামা'আতে অংশগ্রহণ করাকে অপছন্দ করতেন।

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কিছু হাদীস দ্বারা মহিলাদের মসজিদে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়টি বুঝা যায়। কিন্তু সেখানেও লক্ষণীয় যে, রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে সম্বোধন করে জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং পুরুষদেরকে বলেছেন, যদি মহিলারা উপস্থিত হওয়ার অনুমতি চায়, তাহলে তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না।

---

[১৩] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৩/১৪৯ হাদীস নং ৫১১৫ মাজলিসে ইলমী, করাচী

[১৪] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»، باب خروج النساء إلى المساجد (دار الفكر، بيروت، ط. ١٤١٢) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله موثقون.

[১৫] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৩/১৭৩, মাজলিসে ইলমী, করাচী

[১৬] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ١٧٣/٣ ورجاله رجال الصحيح.

[১৭] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৫/২০২, হাদীস নং ৭৬৯৯

[১৮] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» و رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن جابر، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وحسن له الترمذي في «سننه» (٤٤٢)

[১৯] আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে খাত্তাব আল কুরাইশী রাযি.। তিনি ৭৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬০৫

[২০] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৪/২৩৪, হাদীস নং ৫৮৪৫

যেমন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বলেন-

سمعت رسول الله ﷺ يقول لا تمنعوا نسائكم المساجد اذا استأذنكم اليها.

"আমি রাসূল ﷺ -কে বলতে শুনেছি যে, যখন তোমাদের স্ত্রীগণ মসজিদে যাওয়ার অনুমতি চায়, তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না।"[২১]

কিছু হাদীসে অনুমতি চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখিত না হলেও উক্ত হাদীস দ্বারা ঐ হাদীসগুলোর ব্যাখ্যা করা হবে।

মোটকথা, জামা'আতে উপস্থিত হওয়ার বিষয়ে পুরুষ ও মহিলা এক নয়। একদিকে পুরুষদেরকে মসজিদে নামায পড়ার জোর তাকীদ দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে মহিলাদেরকে ঘরে নামায পড়ার উৎসাহ দেয়া হয়েছে। যেহেতু মহিলারা প্রাকৃতিকভাবেই নিয়ন্ত্রিত জাতি যাদের সংযমিত চলা-ফেরা নিজেদের জন্য নিরাপদ, পুরুষদের জন্যও শৃঙ্খলার কারণ। কারণে একাধিক হাদীসে রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে চলা-ফেরার ক্ষেত্রে সংযমী হওয়ার তাকীদ দিয়েছেন। এমনকি তারা ঘরের বাইরে এলে বিভিন্ন ফেতনা হওয়ার আশঙ্কারও ইঙ্গিত করেছেন। তাই মহিলাদের ঘরে ইবাদত করা নিরাপদ ও উত্তম। যেমন ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন-

إنما النساء عورة، وإن المرأة لتخرج من بيتها، وما بها من بأس، فيستشرفها الشيطان، فيقول: إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبته، وإن المرأة لتلبس ثيابها فيقال: أين تريدين؟ فتقول: أعود مريضا أو أشهد جنازة، أو أصلي في مسجد، وما عبدت امرأة ربها بمثل أن تعبده في بيتها.[২২]

"নিশ্চয় নারী জাতি আবরণীয়। আর যদি মহিলারা শরী'আত পরিপন্থী কোনো উপায়-উপকরণ অবলম্বন না করে (অর্থাৎ সুগন্ধি, সাজ-সজ্জা ইত্যাদি) স্বীয় ঘর থেকে বের হয় তবুও শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায় এবং তাকে লক্ষ্য করে বলতে থাকে, নিশ্চয় তুমি যার পাশ দিয়ে অতিক্রম কর না কেন সে তোমাকে পছন্দ করবে। আর কোনো মহিলা যখন (বাড়ি থেকে বের হওয়ার জন্য) পোষাক পরিধান করে তখন তাকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো যে, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলে, আমি অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষার জন্য যাচ্ছি। অথবা বলে, জানাযার নামাযে শরীক হতে যাচ্ছি। কিংবা বলে, কোনো মসজিদে নামায পড়তে যাচ্ছি (অর্থাৎ সে বিভিন্ন প্রকার নেক কাজের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়) অথচ মহিলারা ঘরের প্রকোষ্ঠে অবস্থান করে যেরূপ আপন প্রভুর ইবাদত করতে পারে তদ্রূপ উত্তম ইবাদত আর কোনো স্থানে করতে পারে না।"[২৩]

কয়েকটি হাদীসে মহিলাদের ঈদের জামাতে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ রয়েছে। কিন্তু ঈদের নামাযে উপস্থিত হওয়ার যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তা অনেকটাই নামায শিক্ষা, দ্বীনী

---

[২১] সহীহ মুসলিম: ১/১৮৩

[২২] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢١١٨) وقال: رواه الطبراني في «الكبير»، ورجاله ثقات.

[২৩] আল মু'জামুল কাবীর, তবারানীঃ হাদীস নং ৯৩৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন। আল্লামা হাইছামী রাহ. এই হাদীসের রাবীদেরকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আলোচনা ও দু'আয় শরিক হওয়ার জন্য। এ কারণেই হায়েযা মহিলা যার উপর নামায ওয়াজিব নয় তাকেও ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয় যে, মহিলাদের মসজিদে উপস্থিত হওয়া আবশ্যকীয় নয়। এ বিষয়ে প্রসিদ্ধ চার ইমামের দ্বিমত নেই। তবে তাঁরা এ বিষয়েও একমত যে, মহিলাদের ঘরে নামায পড়া উত্তম। হ্যাঁ, যদি এরপরও কোনো মহিলা মসজিদে আসতে চায়, তাহলে আসতে পারবে কী না এক্ষেত্রে ইমামদের মাঝে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

ইমামগণের বক্তব্য

১. হানাফী মাযহাব: ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ.[২৪] বলেন-

ويكره لهن حضور الجماعات يعنى الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة. ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

وقالا: يخرجن في الصلوات كلها، لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فلا يكره. كما في العيد، وله أن فرط الشبق حامل، فتقع الفتنة غير أن الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة، أما في الفجر والعشاء هم نائمون، وفي المغرب بالطعام مشغولون، والجبانة متسعة فيمكنها الاعتزال عن الرجال فلا يكره .

"হানাফী মাযহাবের সকল ইমামগণের মতে যুবতিদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া মাকরূহে তাহরীমী ফেতনার আশংকা থাকার কারণে। আর বৃদ্ধাদের ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। ইমাম আবু হানিফা রাহ. বৃদ্ধাদের ফজর, মাগরিব ও ইশার জামা'আতে হাজির হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। আর ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহ. সকল নামাজের ক্ষেত্রে অনুমতি দিয়েছেন। তবে বৃদ্ধাদেরকে সকলেই ঈদগাহে আসার অনুমতি প্রদান করেছেন ফেতনার আশংকা না থাকার কারণে।"[২৫]

কিন্তু বর্তমানে ফেতনা বেড়ে যাওয়ায় ফুকাহায়ে কেরাম ব্যাপকভাবে নিষেধ করে থাকেন। যেমন ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ.[২৬] বলেন-

عمم المتأخرون المنع للعجائز والشواب في الصلوات كلها لغلبة الفساد في سائر الأوقات.

"পরবর্তী মাশায়েখগণ নিষেধটি ব্যাপক করে দিয়েছেন বৃদ্ধা ও যুবতিদের জন্য সকল নামাযের ক্ষেত্রে সর্বদা ফাসাদের আধিক্যের কারণে।"[২৭]

---

[২৪] আলী ইবনে আবু বকর ইবনে আব্দুল জলীল আল ফারগানী আল মারগীনানী রাহ.। হেদায়া গ্রন্থপ্রণেতা। নাজমুদ্দীন ওমর আন নাসাফী রাহ. তাঁর উস্তায ছিলেন এবং শামসুল আইম্মা আল কারদারী ও জালালুদ্দীন মাহমুদ ইবনুল হুসাইন প্রমুখ তাঁর ছাত্র। তিনি ৫৯৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী ফিকহের অনেক খেদমত করেছেন। তাঁর অমর রচনা 'আল হেদায়া' ইসলামী আইন শাস্ত্রের রেফারেন্স বুক হিসেবে সর্বজন স্বীকৃত। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/৭২০ -আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা: ১৪১-১৪২

[২৫] হেদায়া: ১/১২৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২৬] মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ ইবনে আব্দুল হামীদ কামালুদ্দীন রাহ.। তিনি ইবনে হুমাম নামে প্রসিদ্ধ। তাফসীর, হাদীস, ফিকহ, উসূল, নাহু, মানতিক, কালামসহ অনেক শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। তাঁর সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থ হলো 'ফাতহুল কাদীর শরহুল হিদায়া'। তিনি ৮৬১ হিজরীর ৭ই রমযান শুক্রবার ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা: ১৮০

[২৭] ফাতহুল কাদীর: ১/৩৭৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

والفتوى اليوم على الكراهة في كل الصلوات، لظهور الفساد، كذا في الكافي وهو المختار كذا في التبيين.

"বর্তমানে ফাতওয়া হলো, (মহিলাদের জামা'আতে শরীক হওয়া ব্যাপারে সকল নামাযের ক্ষেত্রেই তা মাকরূহ, ফেতনা-ফাসাদ প্রকাশ পাওয়ার কারণে। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত।"[২৮]

২. মালেকী মাযহাব: মহিলাদের জামা'আতের উদ্দেশ্যে ঈদগাহে কিংবা মসজিদে আসার ব্যাপারে মালেকী মাযহাবের প্রসিদ্ধ কিতাব আশ শারহুল কাবীর গ্রন্থে ইমাম মালেক রাহ. এর মতামত এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে-

وجاز خروج متجالة لا إرب للرجال فيها غالبا لعيد و استسقاء، فالفرض أولى. وجاز خروج شابة لصلاة الجماعة بشرط عدم الطيب والزينة، وأن لا تكون مخشية الفتنة... وإلا حرم. قال الدسوقي: قوله: جاز خروج متجالة أي جوازا مرجوعا بمعنى أنه خلاف الأولى. وقوله: شابة أي غير فارهة في الشباب والنجابة، وأما الفارهة فلا تخرج أصلا. وقوله: لصلاة الجماعة أي غير الجمعة والعيد والاستسقاء؛ لأنها مظنة الازدحام.

"এমন বৃদ্ধা যার প্রতি পুরুষদের জৈবিক চাহিদা অবশিষ্ট নেই তার জন্য ঈদ ও ইসতেসকার নামাযে উপস্থিত হওয়া বৈধ। সুতরাং ফরয নামাযের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া তো তার জন্য আরো সাধারণ বিষয়। যুবতী মেয়ের জন্য জামা'আতে শরিক হওয়ার উদ্দেশ্যে মসজিদে যাওয়া কিছু শর্ত সাপেক্ষে বৈধ। যেমন, কোনো ধরনের সুগন্ধি ও সাজ-সজ্জা গ্রহণ করতে পারবে না। তার উপর ফেতনার আশঙ্কা থাকতে পারবে না ইত্যাদি। উপরোক্ত শর্তগুলো পাওয়া না গেলে তাদের জন্য মসজিদে গমন করা হারাম। ইমাম দুসুকী রাহ. বলেন, বৃদ্ধাদের জন্য মসজিদ ও ঈদগাহে যাওয়া বৈধ হলেও তা অনুত্তম। আর যুবতী মেয়ে বলতে যে মেয়ে সুন্দর ও সম্ভ্রান্ত নয়। কেননা রূপবতী সম্ভ্রান্ত যুবতীর জন্য কোনো জামা'আতে উপস্থিত হওয়া জায়েয নেই। আর জামা'আত জুমু'আ, ঈদ ও ইসতেসকা ব্যতীত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের জামা'আত উদ্দেশ্যে। কেননা তাতে (ঈদ, জুম'আ ও ইসতেসকা) ভিড় থাকার সম্ভাবনা বেশি।"[২৯]

৩. শাফে'য়ী মাযহাব: শাফে'য়ী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফকীহ ও মুহাদ্দিস ইমাম নববী রাহ.[৩০] বলেন-

وإن أرادت المرأة حضور المسجد للصلاة قال أصحابنا: إن كانت شابة أو كبيرة تشتهي كره لها وكره

[২৮] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৯] আওজাযুল মাসালেক: ৪/১০৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৩০] ইমাম মহিউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহইয়া ইবনে শরফ আন নববী আশ শাফে'য়ী রাহ.। তিনি ইমাম নববী নামে প্রসিদ্ধ। ৬৩১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৭৬ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ফিকহ ও হাদীস শাস্ত্রে অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তাঁর রচিত 'রিয়াদুস সালেহীন' সর্বাধিক পঠিত কিতাবসমূহের অন্তর্ভুক্ত। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/৫২৪

لزوجها ووليها تمكينها منه ، وإن كانت عجوزا لا تشتهي لم يكره.

"যদি কোনো মহিলা মসজিদে নামাযের জন্য আসতে চায়, তাহলে আমাদের ফকিহগণ বলেন, যদি সে যুবতি কিংবা এমন বৃদ্ধা হয় যে, তার প্রতি কামভাব সৃষ্টি হয়, তাহলে তার জন্য মসজিদে আসা মাকরূহ এবং তার স্বামী অথবা অভিভাবকের জন্য তাকে সুযোগ দেয়াও মাকরূহ হবে। আর যদি সে এমন বৃদ্ধা হয়, যে তার প্রতি কামভাব সৃষ্টি হয় না, তাহলে তার জন্য তা বৈধ হবে।"[৩১]

৪. হাম্বলী মাযহাব: মহিলাদের মসজিদে এসে জামা'আতে নামায আদায় করা সম্পর্কে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ.[৩২] এর মত বর্ণনা করতে গিয়ে ইবনে কুদামা রাহ. বলেন-

ويباح لهم حضور الجماعة مع الرجال؛ لأن النساء كن يصلين مع رسول الله ﷺ...وصلاتها في بيتها خير لها وأفضل.

"মহিলাদের জামা'আতে উপস্থিত হওয়া বৈধ। তবে ঘরে নামায পড়া তাদের জন্য উত্তম।"[৩৩]

আর মহিলাদের ঈদগাহে এসে ঈদের নামায আদায় করার ব্যাপারে তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে তার ছেলে আবুল ফজল সালেহ রাহ. বলেন-

سمعت أبي سئل عن النساء يخرجن إلى العيدين؟ قال: لا يعجبني في زماننا هذا؛ لأنه فتنة.

"আমার পিতাকে প্রশ্ন করা হলো যে, মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়ার ব্যাপারে আপনার মতামত কী? উত্তরে তিনি বলেন, এ যুগে মহিলাদের ঈদগাহে যাওয়া আমার নিকট পছন্দনীয় নয়।"[৩৪]

মহিলাদের মসজিদে গমনের শর্তসমূহ

মহানবী ﷺ মহিলাদেরকে পুরুষদের ন্যায় কোনো শর্ত ছাড়াই স্বাধীনভাবে মসজিদে আসার অনুমতি দেননি। বরং সুনির্ধারিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত কিছু শর্ত সাপেক্ষে তাদের মসজিদে আসার অনুমতি দেন। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো।

১. খুশবু জাতীয় কোনো দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবে না। এ সম্পর্কে যয়নব রাযি. বর্ণনা করেন-

إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمسّ طيبا.

''তোমাদের কেউ যখন মসজিদে আসার ইচ্ছা করবে, তখন সে খুশবু ব্যবহার করবে

---

[৩১] আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব: ৪/১৯৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৩২] ইমাম আবু আব্দিল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল আশ শাইবানী আল মারওয়াযী আল বাগদাদী রাহ.। আহমদ ইবনে হাম্বল নামে প্রসিদ্ধ। ১৬৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৪১ হিজরী সনে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। হাম্বলী মাযহাবের সম্বন্ধ তাঁর দিকেই করা হয়। তাঁর রচিত 'মুসনাদ' হাদীস শাস্ত্রের বিশাল ভাণ্ডার। -আর রিসালাতুল মুসতাতরাফা: ১৮

[৩৩] আল মুগনী: ২/৩৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৩৪] মাসায়েলে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল: ১/১২৮

না।"[৩৫]

উল্লেখ্য, পূর্বে ব্যবহারকৃত খুশবুর ঘ্রাণ বিদ্যমান থাকলে তা নিয়েও মসজিদে আসা যাবে না।

২. কোনো প্রকার সাজ-সজ্জা গ্রহণ করা যাবে না। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ولكن ليخرجن وهن تفلات.[৩৬]

"তোমরা আল্লাহর বাঁদীদেরকে আল্লাহর ঘরে যেতে বাধা দিয়ো না। যদি সাজ-সজ্জা ও খুশবু ছাড়া বের হয়।"[৩৭]

৩. পুরুষদের সাথে মেলামেশা না হতে হবে। মহিলারা পুরুষদের পিছনে থাকবে। ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, أخروهن حيث أخرهن الله[৩৮] "তোমরা তাদেরকে পিছিয়ে দাও, যেভাবে আল্লাহ তাদেরকে পিছিয়ে দিয়েছেন।"[৩৯]

৪. কোনো ধরনের ফেতনার আশঙ্কা না থাকতে হবে।

রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

والموت خير للمؤمن من الفتنة.[৪০]

"মুমিনের জন্য ফেতনায় পড়া থেকে মৃত্যুবরণ করাই উত্তম।"[৪১]

এগুলো হলো মৌলিক শর্ত, তাই এগুলোর কোনো একটি ছুটে গেলে মহিলাদের জন্য মসজিদে আসা বৈধ হবে না।

আর বর্তমানে অধিকাংশ মহিলার শর্তগুলোর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে না। কেননা তারা বাহিরে যাওয়ার সময় খুশবু ও অতিরিক্ত সাজ-সজ্জা করে; যা ঘরে করে না। আবার যামানার ফেতনার কথা তো বলারও অপেক্ষা রাখে না। তাই ব্যাপকভাবে তাদের নিষেধ করা হয়েছে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে, মহিলাদের ফেতনার কারণে মসজিদে উপস্থিত হওয়া নিষেধ। এর অর্থ এই নয় যে, মহিলারা কখনই মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না। অনেক সময় সফর অবস্থায় মহিলাদের নামায পড়ার ভিন্ন কোনো জায়গা থাকে না। কিন্তু এই অজুহাতে নামায বাদ দেয়ারও সুযোগ নেই। তাই এ পরিস্থিতিতে মসজিদে গিয়ে এক কোণায় নামায আদায় করবে।

---

[৩৫] সহীহ মুসলিম: ১/১৮৩, হদীস নং ৪৪৩

[৩৬] أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٩٦٤٥)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٧٩)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٢١٤)

[৩৭] সুনানে আবু দাউদ: ১/৮৪, হাদীস নং ৫৬৫

[৩৮] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» موقوفا بإسناد صحيح.

[৩৯] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৩/১৪৯, হাদীস নং ৫১১৫

[৪০] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٣٩٠٤) وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح.

[৪১] মুসনাদে আহমদ: ৩৯/৩৬, হাদীস নং ২৩৬২৫, হাদীসটি সহীহ।

মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ[৪২] বলেন-

فائدہ: مگر اس مسئلہ سے کہ عورتوں کو مسجد نہیں جانا چاہئے ذہن غلط بن گیا ہے، عورتیں بازار میں، اسٹیشن پر یا پبلک مقامات میں ہوتی ہیں اور نماز کا وقت آجاتا ہے اور نماز پڑھنے کے لئے کوئی جگہ میسر نہیں ہوتی چنانچہ وہ نماز قضا کر دیتی ہیں، مگر مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتیں، کیونکہ ذہن یہ بن گیا ہے کہ عورتوں کو مسجد میں نہیں جانا چاہئے، حالانکہ مسجدیں مردوں کی جاگیر نہیں ہیں، ایسی مجبوری میں عورتوں کو مسجد میں جا کر کسی علاحدہ جگہ میں نماز پڑھنی چاہئے۔ اور اتفاقا جماعت ہو رہی ہو تو وہ جماعت میں شرکت بھی کر سکتی ہیں، ان کو نماز قضا نہیں کرنی چاہئے۔

"মহিলাদের মসজিদে জামা‘আতে হাজির হওয়া মাকরূহ। এ মাসআলা থেকে একটি ভুল মনোভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। মহিলারা বাজারে, স্টেশনে ও যাত্রি ছাউনিতে থাকা অবস্থায় নামাযের সময় হয়ে গেলে এবং নামায পড়ার কোনো জায়গা পাওয়া না গেলে তখন তারা নামায কাযা করে। মসজিদে এসে নামায আদায় করে না। কেননা সবার মন-মানসিকতা এমন হয়ে গেছে যে, মহিলাদের মসজিদে যাওয়া উচিত নয়। অথচ মসজিদ পুরুষদের জায়গীর নয়। এ পরিস্থিতিতে তাদের মসজিদে এসে আলাদা জায়গায় নামায পড়ে নেওয়া জরুরী। আর ঘটনাক্রমে যদি মসজিদে জামাত চলতে থাকে তাহলে তারা জামা‘আতেও শরীক হতে পারবে। মোটকথা, নামায কোনো অবস্থায় কাযা করবে না।"[৪৩]

পরিশেষে মূল বক্তব্য হলো, মহিলাদের জামা‘আতে এসে নামায পড়া নবী যুগে একটি অনুত্তম বৈধ কাজ ছিল। কেননা, রাসূল ﷺ মহিলাদেকে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়ার পরিবর্তে ঘরে নামায পড়াকে উত্তম বলেছেন। এক হাদীসে এসেছে, "মহিলাদের জন্য বারান্দা অপেক্ষা অন্দর-মহলের নামায উত্তম তদুপরী খাস কুঠরীর নামায সর্বোত্তম।"[৪৪]

এছাড়াও মহিলাদের মসজিদে ও ঈদগাহে জামা‘আতে আসার বিষয়টি অনেক শর্তে শর্তযুক্ত, যা ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। আর এ শর্তগুলো সাহাবীদের যামানা থেকেই বিলীন হতে শুরু করেছে। ফলে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা, ওমর, ইবনে ওমর ও ইবনে মাসউদ রাযি. প্রমুখ বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম মহিলাদেরকে যে কোনো জামা‘আতে উপস্থিত হতে বাঁধা দিতে শুরু করলেন। ফলে সকল ইমামের ইজমা ও ঐক্যমত হলো, কিশোরী যুবতিদেরকে কোনো ক্রমেই ঈদ, জুম‘আ, জামাত ইত্যাদিতে শরীক হতে দেয়া যাবে না। অতঃপর পরবর্তী ফুকাহা ও মাশায়েখগণ যামানার ফেতনা পূর্বের সকল রেকর্ডকে ভঙ্গ করে সীমা

---
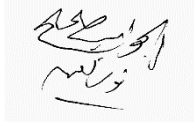
[৪২] মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী হাফিযাহুল্লাহ। গুজরাটের পালনপুর এলাকায় ১৯৪০ ঈসায়ীতে জন্মগ্রহণ করেন। সাইয়িদ আখতার হুসাইন দেওবন্দী, শাইখ আব্দুল জলীল কিরানভী ও ইবরাহীম বেরলভী তাঁর হাদীসের বিশিষ্ট উস্তায ছিলেন। রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিআ, ফয়জুল মুনঈম, জামে তিরমিযী ও সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থসহ বহু কিতাব তিনি রচনা করেছেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দে শাইখুল হাদীস পদে আছেন। -আল কালামুল মুফীদ ফী তাহরীরিল আসানীদ: ৫২৭-৫২৯

[৪৩] তুহফাতুল কারী: ২/১২৪, মাকতাবায়ে হেজায, দেওবন্দ

[৪৪] সুনানে আবু দাউদ: ১/৮৪ হাদীস নং-৫৭০;
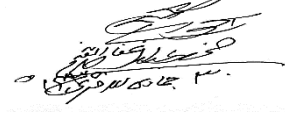
أخرجه ابن خزيمة في «صحيحه» (١٦٩٠) وقال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» باب صلاة الجماعة: رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم.

অতিক্রম করার কারণে বৃদ্ধাদের উপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, হাদীসে উম্মে হুমাইদ সহ আরো অনেক হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, রাসূল ﷺ এর মানশা ও সন্তুষ্টিও ছিল তাই। সুতরাং আসুন আমরা মহিলাদেরকে ঘরের কোণে নামায পড়তে উৎসাহিত করি। রাসূল ﷺ এর আদর্শে জীবন গড়ি।
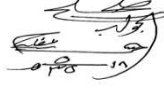
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

কেবলা নির্ধারণ পদ্ধতি

মাওলানা ফজলুল হক মুরতাজা মোমেনশাহী

নামাযের শর্তসমূহের একটি হলো (استقبال القبلة) কেবলামুখি হয়ে নামায আদায় করা। এটা একটি ব্যাপক বিধান যা সারা দুনিয়ার সকল মানুষ (তথা শহরবাসী, গ্রামবাসী ও মক্কার কাছে বা দূরে অবস্থিত সকলের জন্যই) ফরয। তবে দূরে বসবাস করার কারণে কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে হারামের দিকে মুখ করলেই চলবে। তাই দূরবর্তীদের উপর কেবলা নির্ণয় করা অপরিহার্য বিষয়। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হলো।

নামাযে কেবলা সামনে রাখার গুরুত্ব

যে ব্যক্তি কা'বা শরীফকে সামনে রেখে নামায আদায় করতে সক্ষম তার জন্য ফরয হলো স্বয়ং কা'বা শরীফকে সামনে রেখে নামায আদায় করা। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সম্বোধন করে বলেন-

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ

"এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন। এবং তোমরা যেখানেই থাক সে দিকে মুখ কর।"[৪৫]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.[৪৬] বলেন-

لما دخل النبي ﷺ البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل حتى خرج منه فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন বাইতুল্লাহর ভেতর প্রবেশ করলেন বাইতুল্লাহর চতুর্দিকে দু'আ করলেন এবং নামায না পড়ে বেরিয়ে যান। এরপর কা'বাকে সামনে রেখে দুই রাকা'আত নামায আদায় করে বলেন, এটাই কেবলা।"[৪৭]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

قال النبي ﷺ استقبل القبلة وكبر.[৪৮]

---

[৪৫] সূরা বাকারা: ১৪৪

[৪৬] আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব রাযি.। তিনি হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮ হিজরী সনে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬০৪

[৪৭] সহীহ বুখারী: ১/৫৭, হাদীস নং ৩৯৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৩৩০

[৪৮] أورده البخاري في »صحيحه« تعليقا باب التوجه نحو القبلة حيث كان ، ورواه الإمام مسلم موصولا في »صحيحه« (٣٩٧)

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেবলামুখি হও এবং তাকবীর বলো।"[৪৯]

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها.

"যারা মক্কায় থাকবে তাদের জন্য ফরয হলো স্বয়ং কাবা শরীফকে সামনে নিয়ে নামায আদায় করা।"[৫০]

দূরবর্তীদের ক্ষেত্রে কেবলা নির্ণয়

যারা দূরবর্তী শহর বা গ্রামে অবস্থান করে, বাইতুল্লাহ দেখতে পায় না তাদের জন্য বিধান হলো, কমপক্ষে কেবলার দিক নির্ণয় করে সে দিকে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে। নিম্নে দিক নির্ণয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা হলো।

মূল আলোচনার পূর্বে আমাদের জানা প্রয়োজন যে, শরী'আতের সকল হুকুমের ভিত্তি সহজতার উপর। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ

"আল্লাহ তা'আলা কোনো ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের বাহিরে কোনো কিছু আরোপিত করেন না।"[৫১]

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা বুঝা গেলো যে, শরী'আতের সকল বিধান মানুষের সাধ্যের ভেতর। আর নামায, রোযা আল্লাহ তা'আলার এমন হুকুম যা সুস্থমস্তিস্ক প্রাপ্তবয়ষ্ক সকল মুসলমানের উপর ফরয। সে যেখানেই (অর্থাৎ শহর, গ্রাম, পাহাড়-পর্বত, মরুভুমি বা সমুদ্র-সৈকতে) বসবাস করুক।

তাই আল্লাহ তা'আলা নামায ও রোযার সময়ের ভিত্তি সূর্যের উদয়, অস্ত ও সূর্যের ছায়া পরবর্তী লালিমা ইত্যাদি সহজ ও বাহ্যিক নিদর্শনের উপর রেখেছেন।

অতএব, যারা সরাসরি বাইতুল্লাহ দেখতে পান না তাদের জন্য সরাসরি কেবলা না হলেও কেবলার দিক সামনে থাকতে হবে। এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, কেবলার দিক কিভাবে নির্ণয় করা হবে। এক্ষেত্রে আমরা সর্বপ্রথম দেখবো যে, সাহাবায়ে কেরাম দূর দূরান্তে দ্বীন প্রচারের জন্য সফর করেছেন এবং অনেক সাহাবী বিভিন্ন দেশে বাসস্থানও করেছেন। সর্বোপরি রাসূল ﷺ দূর দেশে জিহাদ করতে যেতেন। তখন তাঁরা কেবলা নির্ণয়ের যে পদ্ধতি অবলম্বন

---

[৪৯] সহীহ বুখারী: ১/৫৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৫০] হেদায়া: ১/৯৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৫১] সূরা বাকারা: ২৮৬

করেছেন দূরবর্তী যে কোনো ব্যক্তির জন্য তা হবে আদর্শ ও অনুসরণীয়। হাদীস এবং আছারে সাহাবা থেকে বুঝা যায় যে, তাঁরা কেবলা নির্ণয় করতেন 'তাহাররী' (অনুমান) করে। আর এতটুকু সুবিধা কুরআন থেকেও অনুধাবন করা যায়। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُۥ

"এখন আপনি মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করুন। এবং তোমরা যেখানেই থাক সে দিকে মুখ কর।"[৫২]

উক্ত আয়াতে কা'বা অথবা বাইতুল্লাহ বলার পরিবর্তে মসজিদে হারাম বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয়। বরং পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের মধ্য থেকে যেদিকে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে।[৫৩]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রাবী'আ তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করে বলেন-

كنا مع النبي ﷺ في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على خياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي ﷺ فنزل فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ ۚ [৫৪]

"আমরা রাসূল ﷺ এর সাথে অন্ধকার রাতে সফররত ছিলাম। আমাদের কারো কেবলার দিক জানা ছিলো না বিধায় প্রত্যেকে নিজ অনুমান অনুযায়ী নামায আদায় করে নিয়েছে। অতঃপর ভোরে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জানালে (কুরআনের এই আয়াত) অবতীর্ণ হয়, 'তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ আছেন।"[৫৫]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, (মদীনাবাসীর) কেবলা পূর্ব পশ্চিমের মাঝে অর্থাৎ দক্ষিণ

---

[৫২] সূরা বাকারা: ১৪৪

[৫৩] সংক্ষিপ্ত বাংলা মা'আরিফুল কুরআন:৭২, (সৌদী নুসখা); দ্রষ্টব্য, শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ১/৫৬৮, মাকতাবাতুল কারীমিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান

[৫৪] قال الإمام الترمذي: قد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا ، قالوا : إذا صلى في الغيم لغير القبلة، ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة، فإن صلاته جائزة وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. والحديث يشهد له ما عند الحاكم في «المستدرك» (٢٠٦/١) وقد حسنه الشيخ أحمد شاكر في شرح «سنن الترمذي» (١٧٧/٢)

[৫৫] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ৩৪৬

দিক।"[৫৬]

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ.[৫৭] বলেন-

ومحاريب الدنيا كلها نصبت بالتحري حتى منى... وهذا خلاف ما نقل عن أبي بكر الرازي في محاريب المدينة أنه مقطوع به، فإنه إنما نصبه رسول الله ﷺ بالوحي.

"মসজিদে নববী ব্যতীত দুনিয়ার সকল মেহরাব বা মসজিদ অনুমানের উপর ভিত্তি করে নির্মাণ করা হয়েছে, এমনকি মিনা'র মসজিদও। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ মু'জেযা স্বরূপ বাইতুল্লাহকে দেখে মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।"[৫৮]

জমহুরে উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, দুনিয়ার সকল মসজিদের কেবলার দিক চিন্তা ভাবনা ও অনুমানের মাধ্যমে স্থাপন করা হয়েছে মসজিদে নববী ব্যতীত। কারণ তা স্থাপন করার সময় আল্লাহ তা'আলা বাইতুল্লাহকে রাসূল ﷺ এর সামনে রেখেছেন মু'জেযা স্বরূপ। রাসূল ﷺ তা দেখে মসজিদে নববীর ভিত্তি স্থাপন করেছেন।

হযরত ওমর রাযি. এর শাসনামলে সকল ইসলামী সাম্রাজ্যের প্রত্যেক শাখার গভর্নরের নিকট তিনি এই মর্মে ফরমান পাঠালেন যে, প্রতিটি শাখায় যেন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। সরকারী কর্মকর্তাগণ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করলেন। কিন্তু কেবলার দিক নির্ণয়ের জন্য হযরত উমর রাযি. বা গভর্নররা যন্ত্রের ব্যবস্থা করেননি এবং কোনো অংকশাস্ত্রও ব্যবহার করেননি।[৫৯]

جهة الكعبة تعرف بالدليل، والدليل في الأمصار والقرى المحاريب التي نصبها الصحابة والتابعون فعلينا اتباعهم.

"কা'বার দিক নির্ণয় করা যায় নিদর্শন বা দলীলের মাধ্যমে। আর শহর ও গ্রামে (কেবলার দিক নির্ণয়ের) নিদর্শন হলো সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের নির্মিত মেহরাব বা মসজিদ সমূহ। সুতরাং তাদের অনুসরণ আমাদের জন্য অপরিহার্য।"[৬০]

وجهة الكعبة تعرف بالدليل (إلى أن قال) فعلينا اتباعهم في استقبال المحاريب المنصوبة.

---

[৫৬] জামে তিরমিযী: ১/৭৯, হাদীস নং ৩৪৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ; ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৫৭] যাইনুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে নুজাইম আল মিসরী রাহ.। তিনি ৯২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৯৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মধ্যে 'আল বাহরুর রায়েক' ও 'আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের' অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/৩৭৮

[৫৮] আল বাহরুর রায়েক: ১/৫০০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৫৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩৮২, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান; আহসানুল ফাতাওয়া: ২/৩২৫

[৬০] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১২০, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

"আর কা'বা শরীফ বা কেবলার দিক চেনা যায় নিদর্শনের মাধ্যমে। সুতরাং আমাদের উপর পূর্ববর্তীদের নির্মিত মেহরাব সমূহকে সামনে রেখে তাদের অনুসরণ করা আবশ্যক।"[৬১]

নফল নামায যদি উট বা সাওয়ারীতে আদায় করা হয় তাহলে বিষয়টি আরো সহজ। কারণ তখন কেবলার দিকে সোজা হয়ে নামায শুরু করার পর কেবলার দিক ঠিক রাখা জরুরী নয় বরং সাওয়ারী যেদিকে ঘুরে যাক না কেনো, নামায নষ্ট হবে না।

فَأَيۡنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجۡهُ ٱللَّهِۚ

"তোমরা যেদিকেই মুখ ফিরাও সেদিকেই আল্লাহ আছেন।"[৬২]

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.[৬৩] বর্ণনা করেন-

كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সাওয়ারীতে আরোহণ অবস্থায় নামায আদায় করতেন, সাওয়ারী যেদিকেই ঘুরে থাক না কেন। তবে ফরয নামায আদায়ের জন্য সাওয়ারী থেকে নেমে কিবলামুখি হয়ে দাঁড়াতেন।"[৬৪]

বলাবাহুল্য যে, তাহাররী বা অনুমান নিশ্চয় কোনো না কোনো একটি আলামত নির্ভর হবে। যেমন সূর্য, চন্দ্র বা তারকা অথবা আরো যা কিছু আলামত হওয়ার উপযুক্ত তা কেবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। কতটুকুর মাঝে থাকলে একজন ব্যক্তিকে বলা যাবে সে কেবলার দিকে আছে তা সহজে বোঝার জন্য নিম্নে ডিগ্রির হিসাব তুলে ধরা হলো।

ডিগ্রির পরিচয়

ডিগ্রি বোঝার জন্য আমাদের প্রথমে স্বরণ রাখতে হবে, পৃথিবীর মৌলিক দিক চারটি। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম। এই দিকগুলোর আয়তন ও পরিধি নির্ণয় করার জন্য একটি গোল বৃত্ত আকা হয়। এই বৃত্তের চারিদিকের মাঝের স্থান নির্ণয়ের জন্য দুটি রেখা টানা হয়। একটিকে 'বিষুব রেখা' ও অন্যটিকে 'গ্রিনিচ রেখা' বলা হয়।

উত্তর ও দক্ষিণের মাঝের স্থান নির্ণয়ের জন্য মাঝ বরাবর যে কল্পিত রেখা টানা হয়, তাকে বিষুব রেখা বলে। আর পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝামাঝি অঞ্চল নির্ণয়ের জন্য যে রেখা টানা হয় তাকে গ্রিনিচ রেখা বলে।

---

[৬১] আল বাহরুর রায়েক: ১/৪৯৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬২] সূরা বাকারা: ১১৫

[৬৩] আবু আব্দুল্লাহ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ আল আনসারী আস সুলামী রাযি.। তিনি অধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে থেকে একজন। তিনি বারোটি যুদ্ধে রাসূল সা. এর সাথে শরিক ছিলেন। ৭৪ হিজরীতে ৯৪ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

[৬৪] সহীহ বুখারী: ১/৫৮, হাদীস নং ৪০০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
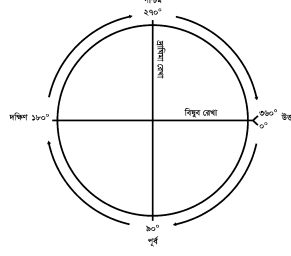
বৃত্তের ডান পাশের দিক হলো উত্তর। উত্তর দিকের মূল কেন্দ্রকে ০° ডিগ্রি বিবেচনা করা হয়। আর এখান থেকে অন্যান্য দিকের ডিগ্রির পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

প্রত্যেক দুদিকের মাঝে ৯০° ডিগ্রি দূরত্ব থাকবে। সুতরাং উত্তরের ০° ডিগ্রি থেকে পূর্ব দিকের মূল কেন্দ্র পর্যন্ত ৯০° ডিগ্রি হবে। এই ৯০° ডিগ্রি হলো পূর্ব দিকের মূল কেন্দ্র। এমনিভাবে পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ দিক পর্যন্ত ৯০° ডিগ্রি হবে। এই ৯০° +৯০° = ১৮০° এটি হলো দক্ষিণ দিকের মূল কেন্দ্র। অনুরূপ দক্ষিণ দিক থেকে পশ্চিম দিক পর্যন্তও ৯০° ডিগ্রি হবে। তাহলে ১৮০°+৯০°= ২৭০° হলো পশ্চিম দিকের মূল কেন্দ্র। এই ২৭০° ডিগ্রিই হলো আমাদের জন্য মূল কেবলা। আর এই পশ্চিম দিক থেকে উত্তর পর্যন্ত ৯০° ডিগ্রি হবে। সুতরাং ২৭০°+৯০°= ৩৬০° ডিগ্রি হলো পৃথিবীর মূল আয়তন।

আমরা দেখতে পেলাম, পাশাপাশি দুদিকের মাঝে দূরত্ব হলো ৯০° ডিগ্রি। এই ৯০° ডিগ্রির অর্ধেক (তথা ৪৫° ডিগ্রি) পার্শ্ববর্তী প্রত্যেক দিকের অংশ বলে বিবেচিত হবে। যেমন, পশ্চিম থেকে উত্তর ৯০° ডিগ্রি; এর মাঝে ৪৫° ডিগ্রি পশ্চিমের অংশ ও বাকি ৪৫° ডিগ্রি উত্তরের অংশ। আর প্রত্যেক দিকের এই ৪৫° ডিগ্রি পরিমাণ স্থান ঐ দিকের 'জিহাত' বলে বিবেচিত হবে।

সর্বোপরি পশ্চিম তথা ২৭০° ডিগ্রি হলো আমাদের মূল কেবলা। আর ২৭০° ডিগ্রির উভয় পাশের ৪৫°+৪৫°= ৯০° ডিগ্রি হলো জিহাতে কেবলা। এমনিভাবে পৃথিবীর যে কোন স্থানের মূল কেবলা স্থির হওয়ার পর তার দুপাশের ৪৫°+৪৫°=৯০° ডিগ্রি হলো জিহাতে কেবলা। এই জিহাতে কেবলার ভিতরে যে কোনো দিকে নামায পড়া বৈধ হবে।

যাই হোক, কোনো মুসল্লি যদি মূল কেবলার দু'পাশের ৪৫°+৪৫°=৯০° ডিগ্রির ভিতরে থাকে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে। আর যদি ৯০° ডিগ্রির বাইরে চলে যায়, তাহলে তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। ৯০° ডিগ্রির ভিতরে বা বাইরে থাকার একটি চিত্র

চিত্র নং ১- সোজা কেবলা ও জিহাতে কেবলা। ১নং মুসল্লির কেবলা সোজা কেবলা। ২ ও ৩ নং মুসল্লির কেবলা জিহাতের কেবলার (৪৫ ডিগ্রির) মধ্যে। আর ৪ ও ৫ নং মুসল্লির কেবলা জিহাতে কেবলার বাইরে।
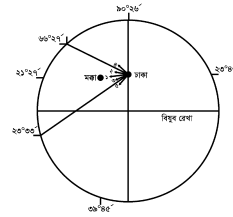
ধ্রুব তারকার মাধ্যমে কেবলা নির্ণয় করে যে মসজিদগুলোর মিহরাব স্থির করা হয়েছে তা যদি জিহাতে কেবলার ভেতরে থাকে তাহলে নামায আদায় হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে আধুনিক কম্পাসের হিসেব দেখিয়ে ঝগড়া বা বাড়াবাড়ি করা উচিৎ নয়। হাঁ, যদি জিহাতে কেবলার বাহিরে চলে যাওয়া হয় তখন সংশোধন করতে হবে।

বর্তমানে বিভিন্ন কম্পাস দিয়েও কেবলা নির্ধারণ করা যায়। কারণ কম্পাসে কোনো এক দিক নির্ধারণ করা হলে অন্য সবদিকও নির্ধারণ হয়ে যায়। কম্পাসে মূলত উত্তর দিক নির্ধারিত থাকে। কারণ পৃথিবীর উত্তর মেরুতে লৌহাকর্ষক চুম্বকীয় শক্তি আছে। সুতরাং কম্পাস দিয়ে উত্তর দিক নির্ধারণ করা হলে পশ্চিম দিকও নির্ধারিত হয়ে যায়।

নিম্নে একটি কম্পাসের চিত্র দেওয়া হলো (চিত্রটিতে পূর্বের ন্যায় উত্তরকে আমরা ধরেছি শূন্য ডিগ্রি। এর পর ৯০° ডিগ্রিতে পূর্বদিক, ১৮০° ডিগ্রিতে দক্ষিণ দিক,

২৭০° ডিগ্রিতে পশ্চিম দিক। আবার উত্তর পর্যন্ত ফিরে আসলে ৩৬০° ডিগ্রিতে গিয়ে পৌঁছবে।)
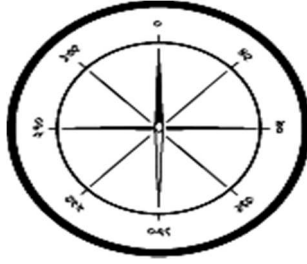
ইন্টারন্যাশনাল শিপে ব্যবহৃত জাইরো কম্পাস ব্যতীত অন্য কম্পাস দ্বারা কেবলা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমাদের স্বরণ রাখতে হবে, কম্পাস ম্যাগটেনিক হওয়ার কারণে প্রকৃত ভৌগলিক উত্তর দিক প্রদর্শিত না হয়ে চৌম্বক উত্তর দিক প্রদর্শিত হয়। আর চৌম্বক উত্তর দিক ও ভৌগলিক উত্তর দিকের মাঝে কিছুটা পার্থক্য আছে। তাই কম্পাস দিয়ে প্রথমে চৌম্বক উত্তর নির্ণয় করতে হবে। এর পর চৌম্বক উত্তর থেকে ভৌগলিক উত্তর বের করতে হবে। অত:পর ভৌগোলিক উত্তর থেকে আইনে কেবলা ও জিহাতে কেবলা নির্ণয় করতে হবে।

পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র ও মরুভূমিতে কেবলা নির্ধারণ

এ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কথা হলো নীতিকথা, যেখানে পুরোনো মসজিদ নেই যেমন সমুদ্র, মরুভূমিতে সেখানে চন্দ্র, সূর্য ও তারকা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের মাধ্যমে কেবলা নির্ধারণ করবে। এটা সাহাবা, তাবেয়ী ও সালাফে সালেহীনের পদ্ধতি। এমনকি চন্দ্র, সূর্যকে নিদর্শন হিসেবে ব্যবহারের কথা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ

"তিনিই তোমাদের জন্য নক্ষত্রপুঞ্জ সৃজন করেছেন- যাতে তোমরা স্থল ও জলের অন্ধকারে পথ প্রাপ্ত হও।"[৬৫]

ইমাম কাযীখান রাহ. বলেন-

وأما في البحار والمفاوز، فدليل القبلة النجوم لما روي عن عمر ﷺ أنه قال: تعلموا من النجوم ما تهتدون به إلى القبلة.

"সাগরে মরুভূমিতে কেবলার নিদর্শন হচ্ছে তারকারাজি। তাই ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমরা তারকাশাস্ত্র শিক্ষা গ্রহণ কর, যার দ্বারা তোমরা কেবলার দিক সম্পর্কে জানতে পারবে।"[৬৬]

তারকারাজির মধ্যে যে তারকাটির মাধ্যমে সহজে কেবলা নির্ধারণ করা যায় তা হলো ধ্রুবতারা। আরবীতে যাকে النجم القطبى বলে। এই তারকাটি পুরো আকাশে সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও উত্তর আকাশে স্থীর হয়।

হিন্দুস্তানে সহজে কেবলা নির্ধারণের পদ্ধতি

হিন্দুস্তানবাসীদের কেবলার দিক তিনদিকে হওয়ায় কেবলা নির্ধারণ তিনভাবে হয়ে থাকে। ১. বরাবর পশ্চিমে। ২. কিছুটা উত্তরে। ৩. কিছুটা দক্ষিণে। সুতরাং, যেখানে কেবলা বরাবর পশ্চিমে সেখানে ধ্রুবতারাকে[৬৭] মাথার মাঝখান বরাবর রাখবে। আর যেখানে কেবলা কিছুটা উত্তরে সেখানে ধ্রুবতারাকে মাথার সামনের অংশে রাখবে। আর যেখানে কেবলা কিছুটা দক্ষিণে সেখানে ধ্রুবতারাকে মাথার পিছন দিকে রাখবে।[৬৮]

আর সূর্য দেখে কেবলা নির্ধারণের পদ্ধতি (যা হিন্দুস্তানের জন্য উত্তম পন্থা) বছরের সব চেয়ে বড় দিন তথা ২২শে জুন অনুরূপ বছরের সবচেয়ে ছোট দিন তথা ২২শে ডিসেম্বর সূর্য অস্ত যাওয়ার স্থান দেখা হবে। দুই স্থান নির্ণয় করার পরে তার মধ্যবর্তী স্থানই হবে কেবলা। অর্থাৎ এ দুই স্থানের মাঝামাঝি যেই নুকতাটি থাকবে সে দিকে ফিরে নামায আদায় করলে নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে।[৬৯]

এছাড়া কেউ কেউ কেবলা নির্ধারণে একটি সহজ পদ্ধতি এভাবে বলে থাকেন যে, প্রতি বছর ২৭ মে ও ১৬ জুলাই সৌদি আরবের ঠিক বেলা ১২টায় সূর্য কা'বা বরাবর থাকে। অতএব,

---

[৬৫] সূরা আন'আম: ৯৭

[৬৬] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান: ১/৪৬ দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৬৭] ধ্রুবতারা, যা দিগন্ত থেকে ২৩ ডিগ্রি উপরে থাকে। এটা ঢাকার হিসেবে। এজন্য যে, যত মেরুর দিকে যাবেন তারাটিকে তত উপরের দিকে মনে হবে। উত্তর মেরুর দিকে গেলে মনে হবে এটা মাথার উপরে। উদাহরণস্বরূপ: আমরা কোনো তারাকে মাথার উপর দেখার পর যত দক্ষিণ দিকে যাব ঐ তারাটিকে উত্তরের দিকে হেলে থাকতে দেখবো।

[৬৮] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩৯১, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৬৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ২/৩৭২, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

যারা নিজের ঘর বা মসজিদের কেবলা নির্ধারণ করতে আগ্রহী তারা উক্ত তারিখদ্বয়ে সৌদি আরবের ঠিক বেলা **১২**টায় অর্থাৎ বাংলাদেশের **৩.১৭** মিনিটে সূর্যের অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করে কেবলা নির্ধারণ করতে পারবেন। কেননা ঐ সময়ে প্রত্যেক জিনিসের ছায়া কেবলামুখী হয়ে থাকে।[৭০]

এখন প্রশ্ন হলো, যদি কোনো ব্যক্তি কেবলা নির্ধারণের জন্য অংকশাস্ত্র বা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে তাহলে তা জায়েয হবে কি না? এবং নির্ধারিত দিকটি গ্রহণযোগ্য হবে কিনা?

উত্তর: আল্লামা শামী রাহ. এ বিষয়ে ফয়সালা দিতে গিয়ে লিখেছেন, যে সকল স্থানে পুরোনো মসজিদ নেই সে সকল স্থানে তারকারাজী, অংকশাস্ত্র বা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করে কেবলার দিক নির্ধারণ করা জায়েয আছে বরং উচিত হলো, যে ব্যক্তি এ শাস্ত্র জানে তার মাধ্যমে কাজ নেয়া। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

فينبغي وجوب اعتبار النجوم ونحوها في المفازة لتصريح علماءنا وغيرهم لكونها علامة معتبرة فينبغي الاعتماد في أوقات الصلاة وفي القبلة.

"মরুভূমিতে তারকারাজী বা তার অনুরূপ কোনো বস্তুর বিবেচনা আবশ্যকীয় হওয়ায় উচিত। কেননা, হানাফী ও অন্যান্য মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম তারকারাজীকে গ্রহণযোগ্য নিদর্শন বলেছেন। সুতরাং তারকারাজীর মাধ্যমে নামাযের সময়সূচি ও কেবলা নির্ধারণ করা উচিত।"[৭১]

আর যে স্থানে পুরোনো মসজিদ রয়েছে, সেখানে যান্ত্রিক কোনো বস্তু দ্বারা কেবলা নির্ধারণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের মত পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

والظاهر أن الخلاف في عدم اعتبارها إنما هو عند وجود المحاريب القديمة إذ لا يجوز التحري معها.

"পুরোনো মেহরাব থাকা অবস্থায় তারকারাজী নিদর্শন হওয়ার ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে। কেননা পুরোনো মেহরাব থাকলে (কেবলার দিক নির্ণয়ে) অনুমানের কোনো সুযোগ নেই।"[৭২]

তবে আহনাফের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, মসজিদের অনুসরণ করা। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

فعلينا اتباعهم فى استقبال المحاريب المنصوبة.

"পূর্ববর্তীদের নির্মিত মেহরাবের অনুসরণ করা আবশ্যক।"[৭৩]

---

[৭০] আহসানুল ফাতাওয়া: ২/৩৫৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭১] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১১২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১১২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৩] আল বাহরুর রায়েক: ১/৪৯৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

তাই যেখানে পুরোনো মসজিদ আছে সেখানে পুরোনো মসজিদেরই অনুসরণ করা হবে। আর যেখানে পুরোনো মসজিদ নেই সেখানে চন্দ্র, সূর্য, তারকা অথবা অন্য কোনো যন্ত্র ব্যবহার করা হবে।
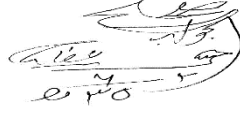
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

চেয়ারে বসে নামায

মাওলানা আব্দুল ফাত্তাহ শেরপুরী

মানুষের জীবন-মরণ সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই মহান আল্লাহ তা'আলার কুদরতী হাতে। তাই প্রত্যেক মুমিনের উচিত হলো, জীবন চলার পথে সে যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হবে, সর্বাবস্থায় সে তাঁরই বিধান জানবে এবং তদনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট হবে। কেননা, শরী'আত শারীরিক অবস্থার সাথে সঙ্গতি বজায় রেখে অসুস্থতা ও অপারগতার সময় তার উপর অর্পিত বিধান কখনো শিথিল করেছে, কখনো অবস্থার ভিত্তিতে তার সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে অনেকে শরী'আতের সঠিক বিধান না জানার কারণে কখনো শিথিলতা গ্রহণে সীমালঙ্ঘন করে থাকে। এমনকি অনেকে বলে বসে যে, "ওযরের কোনো মাসআলা নেই" বরং মা'যুর ব্যক্তি শর'য়ী হুকুমের আওতামুক্ত। আবার কখনো সহজ বিধানকে কঠিন করে ফেলে, ফলে শরী'আতের বিভিন্ন বিধান হয়ে ওঠে প্রশ্নবিদ্ধ। অথচ, ইসলামী শরী'আহ্ একটি পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন জীবন বিধান। এতে নেই কোনো কঠোরতা, নেই কোনো শিথিলতা। তাই শরী'আত অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিষয়ে কতটুকু রুখসাত বা ছাড় দিয়েছে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অতীব জরুরী।

চেয়ারে বসে নামাযের বিধান

এক সময় তো এমন ছিলো যে, মসজিদে চেয়ার আনা এবং তাতে বসে নামায পড়ার কল্পনাও করা যেত না। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে মসজিদে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারীর সংখ্যা এমন বৃদ্ধি পেয়েছে, যা দেখে সত্যি হতবাক হতে হয়। তাদের মধ্যে অনেকে তো শরী'আতসম্মত ওযরের কারণেই চেয়ারে বসে নামায আদায় করে। আবার কেউ শরী'আতসম্মত ওযর ছাড়া নিছক আরামের জন্য এরূপ করে থাকেন। এমনকি কতিপয় মুসল্লি রুকু-সিজদার মাধ্যমে মাটিতে বসে নামায আদায়ে সক্ষম, এতদসত্ত্বেও তারা নির্দ্বিধায় চেয়ারে বসে নামায আদায় করে চলেছেন। আর এসব অবস্থা মূলত চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান না জানার কারণেই হচ্ছে। তাই উক্ত বিষয়ের শর'য়ী সমাধান নিম্নে আলোচনা করা হলো।

যে ব্যক্তি কিয়াম, রুকু-সিজদা কোনোটাই করতে সক্ষম নয়, সে যদি জমিনে বসে নামায পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে তার জন্য যেভাবে বসতে সহজ হয় সেভাবেই জমিনে বসে ইশারায় নামায আদায় করবে (তবে তাশাহহুদের বৈঠকের ন্যায় বসা ভালো)। এধরনের ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয আছে তবে অনুত্তম। আর রুকু-সিজদা করতে সক্ষম ব্যক্তি যদি এমনটি করে তাহলে তার নামাযই হবে না।

তবে হ্যাঁ, যে ব্যক্তি জমিনে বসে থাকতে সক্ষম নয়, অথবা তার জমিনে বসে নামায পড়তে খুব কষ্ট হয়। এমন ব্যক্তিও যদি জমিনে বসে কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে নামায পড়তে সক্ষম হয় তাহলে তার জন্য সেভাবেই নামায পড়া উত্তম। তবে চেয়ারে বসে নামায পড়ার সুযোগ আছে। কিন্তু ইশারায় নামায আদায় করার জন্যও যথাসম্ভব চেয়ার ব্যবহার না করা

উচিত। কেননা, জমিনে বসে নামায আদায় করাই উত্তম ও মাসনূন তরীকা। এর উপরই সাহাবায়ে কেরাম রাযি. এবং পরবর্তী ফকীহগণের আমল চলে আসছে। খাইরুল কুরূনে চেয়ারে নামায পড়ার কোনো নযীর পাওয়া যায় না। অথচ, সে যুগে মা'যূরও ছিল, চেয়ারও ছিল। তাই ইশারায় নামায আদায় করার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব চেয়ার ব্যবহার না করা উচিত।

সম্ভবত সে কারণেই অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন বিধান আলোচনার ক্ষেত্রে চেয়ার বা উঁচু জায়গায় বসার বিষয়টি আলোচিত হয়নি। যেমন-

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال : «يصلي المريض قائما، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يؤمي برأسه، فإن نالته مشقة سبح».[৭৪]

"রাসূলুলাহ ﷺ বলেন, অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। যদি এতে কষ্ট হয় তাহলে বসে নামায পড়বে। যদি এতেও কষ্ট হয় তাহলে শুয়ে মাথার ইশারায় নামায পড়বে। যদি তাতেও কষ্ট হয় তাহলে তাসবীহ পাঠ করতে থাকবে।"[৭৫]

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

وكذا إذا عجز عن القعود، وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة، لا يجزئه إلا كذلك، ولو استلقى لا يجزئه.

"যদি অসুস্থ ব্যক্তি নিজের শক্তিতে বসতে অক্ষম হয়, কিন্তু কোনো কিছুর উপর ঠেস লাগিয়ে অথবা মানুষ, দেয়াল বা বালিশের সাথে হেলান দিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই নামায পড়তে হবে। যদি শুয়ে পড়ে তাহলে জায়েয হবে না।"[৭৬]

উল্লিখিত দলীলদ্বয়ে অসুস্থ ব্যক্তির বিভিন্ন পর্যায় ও তার বিধানের আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চেয়ার বা কোনো উঁচু স্থানে বসার কথা উল্লেখ হয়নি। অথচ চেয়ার তখনো ছিলো এবং উঁচু কোনো জিনিসের ব্যবস্থাও ছিলো যা অসুস্থ ব্যক্তির জন্য আরামদায়ক। কিন্তু এ বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, অসুস্থ ব্যক্তির জমিনে বসে নামায আদায় করা সম্ভব হলে চেয়ারে না বসা উত্তম।

দাঁড়াতে অক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদায় সক্ষম ব্যক্তির নামায

যে ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে দাঁড়াতে পারে না কিন্তু রুকু-সিজদা করতে পারে। তবে লাঠি, দেয়াল বা কোনো কিছুর সাথে হেলান দিয়ে কিয়ামের পূর্ণ সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, তাহলে তার জন্য হেলান দিয়েই দাঁড়িয়ে নামায পড়া জরুরী। বসে নামায পড়লে নামায হবে না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

---

[৭৪] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٩٧) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وقال: لم يرو عن ابن جريج إلا حلس بن محمد الضبعي، قلت: ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله ثقات. قلت: ويشهد له ما عند الدارقطني في «سننه»، كتاب الوتر، باب صلاة المريض عن علي.

[৭৫] আল মু'জামুল আওসাত: ৩/১০৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৭৬] আল বিনায়া: ২/৬৩৫, মাকতাবা নাঈমিয়া দেওবন্দ; আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ولو قدر على القيام متكئا الصحيح أنه يصلي قائما متكئا، ولا يجزيه غير ذلك، وكذا لو قدر أن يعتمد على عصا أو على خادم له، فإنه يقوم ويتكئ.

"সহীহ মত হলো, অসুস্থ ব্যক্তি যদি কোনো কিছুতে ঠেস লাগিয়ে অথবা লাঠি বা খাদেমের কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পারে, তাহলে সে সেভাবেই দাঁড়িয়ে নামায পড়বে। এছাড়া অন্য কোনোভাবে নামায পড়া জায়েয হবে না।"[৭৭]

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি রুকু-সিজদা করতে পারে, কিন্তু কেরাতের পূর্ণ সময় লাঠি, দেয়াল বা অন্য কিছুর সাথে হেলান দিয়েও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না, সে ব্যক্তি যতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, ততক্ষণ দাঁড়িয়েই নামায পড়া ফরয। এমনকি তাকবীরে তাহরীমা বলতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময়ও যদি দাঁড়িয়ে থাকতে পারে তাহলে তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়েই বলতে হবে। তারপর যখন অপারগ হয়ে যাবে তখন বসে পড়বে। এ ধরনের কেউ যদি প্রথম থেকেই জমিনে বসে নামায শুরু করে, তাহলে তার নামায শুদ্ধ হবে না। আর এমন কারো জন্য চেয়ার টেবিলে বসেও নামায পড়ার সুযোগ নেই।

আল্লামা যাইনুদ্দীন ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

قال الهندواني: إذا قدر على بعض القيام يقوم ذلك، ولو قدر آية أو تكبيرة ثم يقعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه.

"আবু জা'ফর আল হিন্দুওয়ানী রাহ. বলেন, যদি কিছু সময় দাঁড়াতে সক্ষম হয়, তাহলে ততটুকুই দাঁড়াবে। যদিও তা এক আয়াত বা তাকবীর বলা পরিমাণ সময় হোক না কেন। তারপর প্রয়োজনে বসতে পারবে। যদি এমনটি না করে, তাহলে আমি আশঙ্কা করছি যে, তার নামায নষ্ট হয়ে যাবে। আর এটি সঠিক মত। আমাদের ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এর বিপরীত কোনো মত বর্ণিত নেই।"[৭৮]

দাঁড়াতে সক্ষম কিন্তু রুকু সিজদায় অক্ষম ব্যক্তির নামায

যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম, অথবা রুকু করতে সক্ষম, কিন্তু সিজদা করতে অক্ষম। সে দাঁড়িয়ে বা বসে যেভাবে ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। কিন্তু উত্তম হলো, সে জমিনে বসে নামায আদায় করবে এবং ইশারায় রুকু সিজদা করবে। এমন ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়ারও সুযোগ রয়েছে। তবে সেটা সুন্নত পরিপন্থী হওয়ার কারণে মাকরূহ বা অনুত্তম। যেমন-

আল্লামা আবুল হুসাইন আহমদ ইবনে আবু বকর আল কুদুরী রাহ.[৭৯] বলেন-

---

[৭৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৭৮] আল বাহরুর রায়েক : ২/১৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৯] আবুল হুসাইন আল কুদূরী আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামদান আল বাগদাদী রাহ.। ৩৬২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিকহে হানাফীর অনেক খেদমত করেছেন। আদাবুল কাযী, আত তাজরীদ, আত তাকরীব, আল মুখতাসার ও শরহু মুখতাসারিল কারখী তাঁরই জগত বিখ্যাত রচনা। قال ابن خلكان: انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق، وكان حسن العبارة في النظر وسمع الحديث। তিনি ৪২৮ হিজরীর রজব মাসে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা: ৩০; হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/৭৪

فإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، وجاز أن يصلي قاعدا يؤمئ إيماء.

"যদি কেউ দাঁড়াতে সক্ষম, কিন্তু রুকু সিজদা করতে অক্ষম, তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। সে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করতে পারবে।"[৮০]

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

وإن قدر على القيام، ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام، ويصلي قاعدا يومئ إيماء، لأن ركنية القيام للتوسل به إلى السجدة لما فيها من نهاية التعظيم، فإذا كان لا يتعقبه السجود لايكون ركنا فيتخير، والأفضل هو الإيماء قاعدا، لأنه أشبه بالسجود.

"যদি অসুস্থ ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয় তবে রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার জন্য দাঁড়ানো আবশ্যক নয়। বরং সে বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করে নামায আদায় করবে। কারণ, কিয়াম নামাযের রোকন হয়েছে তা সিজদায় যাওয়ার মাধ্যম হওয়ার কারণে। কেননা, এতেই সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশ পায়। সুতরাং যে কিয়ামের পর সিজদা থাকবে না সে কিয়ামটা রোকন হবে না। অতএব, সেক্ষেত্রে সে স্বাধীন। তবে উত্তম হলো বসে ইশারায় রুকু সিজদা করে নামায আদায় করা। কেননা, সেটা সিজদার সাথে বেশি সামঞ্জস্যশীল।"[৮১]

উপরোক্ত বক্তব্যটিই হানাফী ফকীহগণের প্রসিদ্ধ মত। কিন্তু দলীলের বিচারে অনেক মুহাক্কিক ফকীহের দৃষ্টিতে এ মাসআলায় ফিক্‌হে হানাফীর ঐ বক্তব্য বেশি শক্তিশালী যা ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল রাহ. এর মাযহাব। আর সেটিই অন্য তিন ইমাম তথা ইমাম মালেক[৮২], ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. প্রমুখের মাযহাব। আর তা হলো- যে ব্যক্তি জমিনের উপর সিজদা করতে অক্ষম সে যদি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে সক্ষম হয়, তাহলে তাকে দাঁড়িয়েই নামায আদায় করতে হবে। আর যেহেতু সে সিজদা করতে অক্ষম সেহেতু সে বসে ইশারায় সিজদা করবে। জমিনে সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম ছাড়া যাবে না। কেননা কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয। কিয়াম শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তির উপর ফরয নয় যে ব্যক্তি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে পারে না। তাই সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে কিয়াম মাফ হবে না। আল্লামা সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে নুজাইম

---

[৮০] কুদূরী: ৩৩, মাকতাবাতুল আযীয, দেওবন্দ

[৮১] হেদায়া : ১/১৬২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৮২] আবু আব্দুল্লাহ মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালেক ইবনে আবু আমর ইবনুল হারেস রাহ.। তিনি ৯৫ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মদীনার সর্বজনবরেণ্য ইমাম ছিলেন। তাই তাঁকে ইমামু দারিল হিজরাহ বলে সম্বোধন করা হয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, 'অচিরেই মানুষ ইলম অন্বেষণের জন্য পৃথিবীর দিক-বিদিক ছুটবে। তারা মদীনার আলেম থেকে আর কোন আলেম পাবে না।' হযরত সুফিয়ান সাওরী রাহ. বলেন, আমি মনে করি এই হাদীসের মধ্যে বর্ণিত মদীনার আলেম হলেন, ইমাম মালেক রাহ.। ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্ব ও সতর্কতা ছিল সর্বোচ্চ পর্যায়ের। তিনি বলেছেন, মদীনায় আহলে ইলমদের বিরাট এক জামাত পেয়েছি কিন্তু আমি তাদের থেকে ইলম গ্রহণ করিনি। এ ব্যাপারে তাঁর বিখ্যাত উক্তি হলো, لا يؤخذ العلم من أربعة، ويؤخذ ممن سواهم. لا يؤخذ من سفيه ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإن كان لا يتهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة، إذا كان لا يعرف ما يحمل وما يحدث به. । তিনি ১৭৯ হিজরীর ১৪ই রবিউল আওয়াল মাসে ৮৫ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন এবং জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। -আল ইনতিকা: ৩৬

রাহ.[৮৩] এ মতটিকেই উত্তম ও যথার্থ বলেছেন। যেমনটি তিনি "আন্ নাহরুল ফায়েকে" উল্লেখ করেছেন-

وهذا أولى من قول بعضهم: «صلى قاعدا»؛ إذ يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا.

"এবং এটি অর্থাৎ রুকু-সিজদার জন্য বসে ইশারা করবে- এ মতটি তাদের মত থেকে উত্তম, যারা বলেন শুরু থেকেই বসে নামায পড়বে। কেননা, এমন ব্যক্তির জন্য কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে কেরাত পড়া ফরয। আর যখন রুকু-সিজদার সময় হবে, তখন বসে ইশারায় রুকু-সিজদা করবে।"[৮৪]

আল্লামা আহমদ ইবনে ইসমাইল আত তাহতাবী রাহ. ইবনে নুজাইম রাহ. এর কথার সমর্থন করে "মারাকিল ফালাহ" এর টিকাতে এভাবে বলেছেন-

وفي النهرما يفيد أنه عند العجز عن السجود يفترض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود يقعد ويؤمي بهما.

"আন-নাহরুল ফায়েক গ্রন্থের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, সিজদায় অপারগ ব্যক্তি কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে যাবে এবং রুকু-সিজদার সময় উভয়টার জন্য বসে ইশারা করবে।"[৮৫]

আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. এর আলোচনা থেকে উক্ত মতের সমর্থন বোঝা যায়। তিনি 'ফাতহুল কাদীরে' বলেন-

وقد يمنع أن شرعيته لهذا على وجه الحصر، بل له ولما فيه نفسه من التعظيم، كما يشاهد في الشاهد من اعتباره كذلك، حتى يحبه أهل التجبر لذلك، فإذا فات أحد التعظيمين صار مطلوبا بما فيه نفسه. ويدل على نفي هذه الدعوى أن من قدر على القعود والركوع والسجود لا القيام، وجب القعود، مع أنه ليس في السجود عقيبه تلك النهاية، لعدم مسبوقيته بالقيام.

"কিয়ামের বিধানটি শুধু সিজদার মাঝে সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশ করার জন্যই" এমনটি বলা প্রশ্নমুক্ত নয়। বরং দাঁড়ানো থেকে সিজদায় লুটে পড়ার মধ্যে যেমন সম্মান প্রকাশিত হয় তেমনি স্বয়ং দাঁড়ানোর মধ্যেও সম্মান প্রকাশিত হয়। দাঁড়ানোর মধ্যে যে সম্মান আছে, তা সাক্ষীর ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই তো প্রতাপশালী ব্যক্তিরা সম্মানের জন্য তাদের সামনে দাঁড়ানোকে পছন্দ করে থাকে। সুতরাং এখন যেহেতু সিজদার মধ্যে যে সম্মান ছিল তা ছুটে গেছে, অন্তত কিয়ামের মধ্যে যে সম্মান আছে তা প্রদর্শনের জন্য কিয়ামের বিধানকে ওয়াজিব বলা হবে।

হেদায়া প্রণেতার উপরোক্ত দাবিটি এ মাসআলার দ্বারাও খণ্ডিত হয়, যে ব্যক্তি কিয়াম ব্যতীত

---

[৮৩] সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুজাইম (ইবনে নুজাইম মিসরী) রাহ.। তিনি ১০০৫ হিজরীর ৬ই রবিউল আউয়াল মঙ্গলবারে ইন্তেকাল করেন। আন নাহরুল ফায়েক, ইজাবাতুস সায়েল ও ইকদুল জাওহার তাঁর অন্যতম রচনা। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ১/৭৯৬

[৮৪] আন নাহরুল ফায়েক: ১/৩৩৬-৩৩৭, কদীমী কুতুবখানা আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

[৮৫] হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ: ৪৩১, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

বসতে ও রুকু-সিজদা করতে সক্ষম তার উপর বসে নামায পড়া ওয়াজিব। অথচ বসা থেকে সিজদায় যাওয়ার মাঝে সেই সর্বোচ্চ সম্মান নেই, তার পূর্বে কিয়াম না থাকার কারণে।"[৮৬]

নিকট অতীত আলিমদের মাঝে আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ.[৮৭] এ মতটিকে হাদীস দ্বারা প্রমাণিত করে, দলীলের দিক থেকে শক্তিশালী বলেছেন। যেমনটি তিনি "ই'লাউস সুনানে" বলেন-

الظاهر من حديث عمران (أنه قال : كانت بي بواسير، فسألت رسول الله ﷺ عن الصلاة؟ فقال : «صل قائما فإن لم تستطع فعلى جنب». رواه البخاري.) أن القادر على القيام العاجز عن الركوع والسجود يجب عليه القيام للقراءة، ويؤمي للركوع والسجود، لما فيه من تعليق الجواز قاعدا بشرط العجز عن القيام، ولا عجز في هذه الصورة، ولأن القيام ركن، فلا يجوز تركه مع القدرة عليه، وبه قال زفر والشافعي رحمهما الله كما في «البدائع». وهو مذهب أحمد كما في «المغني» قال: لم يسقط عنه القيام ويصلي قائما فيؤمي بالركوع ثم يجلس فيؤمي بالسجود اهـ. وهو قول مالك رحمه الله كما في «المدونة». وهذا هو الذي ذكره في «النهر» من كتبنا معشر الحنفية، فقال : يفرض عليه أن يقوم للقراءة، فإذا جاء أوان الركوع والسجود أومأ قاعدا.

"ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি. এর বর্ণিত হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম তবে রুকু-সিজদা করতে অক্ষম তার উপর রুকু-সিজদার জন্য ইশারা করা এবং কেরাতের জন্য দাঁড়ানো ওয়াজিব। কেননা, হাদীস শরীফে দাঁড়াতে অক্ষম হওয়ার শর্তে বসার বৈধতাকে অনুমোদন করা হয়েছে। অথচ উপরোল্লিখিত সূরতে কোনো অক্ষমতা নেই। আর কিয়াম হলো একটি স্বতন্ত্র রোকন। সুতরাং তা সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দেয়া জায়েয নেই। এমনটি বলেছেন ইমাম যুফার রাহ.ও ইমাম শাফে'য়ী রাহ.। আর এটাই ইমাম আহমদ রাহ. এর মাযহাব, যেমনটি রয়েছে 'আল-মুগনী' গ্রন্থে। তিনি বলেন, এ ধরনের ব্যক্তির জন্য কিয়াম মওকুফ হবে না। তাই সে দাঁড়িয়ে নামায পড়বে এবং ইশারায় রুকু করবে। অতঃপর বসে ইশারায় সিজদা করবে। এটাই ইমাম মালেক রাহ. এর মাযহাব। এটিকেই 'আন্ নাহরুল ফায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি বলেন, এধরনের ব্যক্তির উপর কেরাতের জন্য দাঁড়ানো ফরয অতঃপর রুকু সিজদা বসে ইশারায় আদায় করবে।"[৮৮]

তিনি আরো বলেন-

والأحوط عندي ما ذكره في «النهر» من وجوب القيام عليه للقراءة، وإنما الخلاف في وجوب القيام للإيماء بالركوع والسجود، فالأفضل عندنا الإيماء بهما قاعدا، ولا يجب القيام للإيماء بواحد منهما، وعند الشافعية

---

[৮৬] ফাতহুল কাদীর: ২/৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৮৭] যফর আহমদ ইবনে লতীফ আল উসমানী আত থানভী রাহ.। দারুল উলূম দেওবন্দের অদূরে অবস্থিত তার বাবার বাড়িতে ১৩১০ হিজরী সনে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আশরাফ আলী থানভী ও আব্দুল্লাহ গঙ্গুহী রাহ. তাঁর উস্তাযদের অন্যতম। ফারেগ হওয়ার পার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা আলিয়াসহ আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপনা করেন। ই'লাউস সুনান তাঁর অনন্য সংকলন। যাহেরী ও বাতেনী ইলমে পরিপূর্ণ এ ব্যক্তিত্ব ১৩৯৪ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। -ই'লাউস সুনান এর ভূমিকা

[৮৮] ই'লাউস সুনান: ৭/১৯৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন।

ومن وافقهم يؤمي للركوع قائما وللسجود قاعدا كما مر. وهذا وإن تفرد صاحب «النهر» بذكره، ولم يوافقه عليه أحد من ناقلي المذهب، ولكنه قوي من حيث الدليل، فإن ظاهر حديث عمران مؤيد له كما لا يخفى.

"সেটিই আমার নিকট অধিক সতর্কতামূলক কথা যা 'আন্ নাহরুল ফায়েক' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, অর্থাৎ 'কেরাতের জন্য কিয়াম ওয়াজিব'। তবে ইখতেলাফ হলো ইশারার জন্য কিয়াম ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের নিকট উত্তম হলো রুকু সিজদা উভয়টার জন্য বসে ইশারা করবে। ইশারার জন্য কিয়াম ওয়াজিব নয়। তবে ইমাম শাফে'য়ী[৮৯], আহমদ ও মালেক রাহ. প্রমুখের নিকট রুকুর জন্য দাঁড়িয়ে ইশারা করবে। আর সিজদার জন্য বসে ইশারা করবে। যদিও উপরোক্ত মতটি একমাত্র "আন্ নাহরুল ফায়েক" গ্রন্থ প্রণেতা গ্রহণ করেছেন, কিন্তু দলীলের বিচারে এটিই বেশি শক্তিশালী। কেননা, ইমরান ইবনে হুসাইন রাযি.[৯০] এর সূত্রে বর্ণিত হাদীসটির বাহ্যিক অর্থ থেকে এ মতটির পক্ষেই সমর্থন পাওয়া যায়।"[৯১]

পেছনে উল্লিখিত আবু জা'ফর হিন্দুওয়ানীর বক্তব্য থেকেও এ মতটির সমর্থন পাওয়া যায়। কারণ তাঁর বক্তব্য হলো, যে ব্যক্তি কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়াতে পারে তাকেও দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে। বলাবাহুল্য যে, কোনো ব্যক্তি হয়ত তাকবীরের সময়টুকুই দাঁড়াতে পারে। রুকু পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনা বরং অসুস্থতার কারণে বসতে হয়, তার দাঁড়ানো সেজদায় সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশের মাধ্যম না হলেও তাকে দাঁড়াতে হবে। এখান থেকে বুঝা যায় যে, দাঁড়ানোকে সেজদায় সর্বোচ্চ সম্মান প্রকাশের মাধ্যম হিসেবেই ফরয করা হয়েছে তা সর্বাবস্থার জন্য নয়।

আল্লামা মুফতী তাকী উসমানী দা.বা.[৯২] দালাইলের আলোকে এই মতটিকে শক্তিশালী বলেছেন। এ উক্তি খন্ডন করেছেন যে, 'শুধু সিজদার জন্য কিয়াম ফরয করা হয়েছে। তাই সিজদা করতে অক্ষম হলে কিয়াম জরুরী থাকে না।' এমনকি তিনি একাধিক দলীল দ্বারা এ কথাও প্রমাণ করেছেন যে, কিয়াম নামাযের একটি স্বতন্ত্র ফরয, তা শুধু সিজদার জন্য ফরয করা হয়েছে এমনটি নয়।[৯৩]

---

[৮৯] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্রীস ইবনে আবক্ষাস ইবনে উসমান ইবনে শাফে আশ শাফে'য়ী আল কুরাশী আল মক্কী রাহ.। তিনি ইমাম শাফে'য়ী নামে প্রসিদ্ধ। ১৫০ হিজরীতে আসকালানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০৪ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। ইমাম মালেক ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. তাঁর অন্যতম উস্তায। তাঁর দিকে সম্বন্ধ করেই ফিকহে শাফে'য়ীর নামকরণ করা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এর মাঝে ইছবাতুন নবুওয়াহ, আহকামুল কুরআন, ইখতিলাফুল হাদীস, কিতাবুল উম ইত্যাদি অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/৯

[৯০] ইমরান ইবনে হুসাইন আবু নুযাইদ আল খুযায়ী আল কা'বী রাযি.। ৫২ হিজরীতে তিনি বসরায় ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬০৭

[৯১] ই'লাউস সুনান: ৭/১৯৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৯২] মুফতী তকী উসমানী ইবনে মুফতী মুহাম্মদ শফী ইবনে মাওলানা ইয়াসিন দা.বা.। তিনি ১৩৬২ হিজরী সনের ৫ই শাওয়াল ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাফসীর, হাদীস ও ফিকহ বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের শারী'আহ বোর্ডের জাস্টিস ছিলেন। বর্তমানে তিনি দারুল উলূম করাচীর নায়েবে সদর। -ইসলাম আওর জাদীদ মাআশী মাসাইল: ১ম খণ্ডের পরিশিষ্ট

[৯৩] আল্লামা মুফতী তকী উসমানী দা.বা. এর লিখিত চেয়ারে বসে নামায পড়া সংক্রান্ত প্রবন্ধ থেকে গৃহীত

চেয়ারে বসে টেবিলে সিজদা করা

যে ব্যক্তি জমিনে সিজদা করতে অক্ষম, সে দাঁড়িয়ে হোক বা বসে ইশারা করেই সিজদা করবে। সামনে তখতা, টেবিল, বালিশ অথবা অন্য কোনো উঁচু জিনিস রেখে তার উপর সিজদা করবে না। কেউ যদি এমনটি করে তাহলে তা যথারীতি সিজদা বলে গণ্য হবে না। বরং তা ইশারা হিসাবেই ধর্তব্য হবে। অতএব, সেক্ষেত্রে নামায হয়ে গেলেও নিয়ম বহির্ভূত হওয়ার কারণে এমনটি করা উচিত নয়। কারণ, চেয়ারে বসে সামনে টেবিল ইত্যাদির উপর কপাল রাখাকে দুই কারণে সিজদা বলা যায় না।

১. সিজদার জন্য শর্ত হলো উভয় হাঁটু জমিনে রাখা।

২. সিজদার সময় কপালের অংশ কোমরের অংশ থেকে নিচু হওয়া।

কিন্তু চেয়ারে বসে সামনে কোনো কিছুর উপর কপাল রাখলে উল্লিখিত কোনো শর্তই পাওয়া যায় না। তাই সেটা হাকীকী সিজদা তথা নিয়মতান্ত্রিক সিজদা হিসেবে বিবেচিত হবে না। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন-

عاد رسول الله ﷺ مريضا وأنا معه، فرآه يصلي ويسجد على وسادة، فنهاه وقال: إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد، وإلا فأوم إيماء، واجعل السجود أخفض من الركوع.[৯৪]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক রোগীকে দেখতে গেলেন, আমি তাঁর সাথে ছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে বালিশের উপর সেজদা দিয়ে নামায পড়তে দেখে তা করতে নিষেধ করে বললেন, যদি জমিনে সিজদা করতে পার তাহলে জমিনেই সেজদা কর। অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়। তবে সেক্ষেত্রে রুকুর ইশারা থেকে সিজদার ইশারায় বেশি ঝুঁকবে।"[৯৫]

আল্লামা জামালুদ্দীন যায়লায়ী রাহ.[৯৬] বলেন-

قال رحمه الله: (ولا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، فإن فعل) أي رفع شيئا يسجد عليه (وهو يخفض رأسه صح) لوجود الإيماء، وقيل: هو سجود، ذكره في «الغاية»، وكان ينبغي أن يقال: لوكان الشيء الموضوع بحال لو سجد عليه الصحيح تجوز، جاز للمريض على أنه سجود، وإن لم يجز للصحيح أن يسجد عليه فهو إيماء، فيجوز للمريض إن لم يقدر على السجود.

"সিজদার জন্য কোনো জিনিস চেহারার দিকে উঁচু করবে না। আর যদি কোনো জিনিস উঁচু করে এবং সেখানে সিজদার জন্য মাথা ঝুঁকিয়ে দেয়, তাহলে তার নামায হয়ে যাবে। কেননা এখানে ইশারা পাওয়া গেছে। মোটকথা, সে উঁচুকৃত বস্তুটা যদি এতটুকু উঁচু হয় যে, একজন সুস্থ মানুষ তাতে সিজদা করলে তা জায়েয হয়ে যায়। তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য এটা

---

[৯৪] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٢٨٩٤) وقال: رواه أبو يعلى والبزار نحوه إلا أنه قال: إن رسول الله ﷺ عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فرمى بها، فأخذ عودا يصلي عليه فرمى به. ورجال البزار رجال الصحيح. اهـ

[৯৫] মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ: ২/৩৪৭

[৯৬] জামালুদ্দীন ইবনে ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে ইউনুস ইবনে মুহাম্মদ আয যাইলায়ী আল হানাফী রাহ.। তিনি ৭৬২ হিজরীর ১১ই মুহাররমে ইন্তেকাল করেন। রচনার জগতে 'নাসবুর রায়া' তাঁর অমর কীর্তি। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ২/৫৫৭

সিজদা বলে গণ্য হবে। আর যদি সুস্থ ব্যক্তির জন্য তাতে সিজদা করা জায়েয না, তাহলে অসুস্থ ব্যক্তির জন্য তা ইশারা হবে।"[৯৭]

কাতারের মাঝে বসে নামাযের বিধান

জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী লোকদের কাতারের মাঝে বা ইমামের পিছনে নামায পড়া জায়েয। কিন্তু তাদের জন্য কাতারের কিনারায় নামায পড়া উত্তম, যাতে কাতারের মাঝে চেয়ার রেখে বা জমিনে বসে নামায পড়ার কারণে কাতারে কোনো বক্রতা বা শূণ্যতা দেখা না যায়। হাদীস শরীফে কাতার সোজা রাখা এবং পরস্পর খুব মিলে দাঁড়ানোর প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

হযরত আবু মাসউদ রাযি. বলেন-

كان رسول الله ﷺ يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: «استووا ولا تختلفوا، فتختلف قلوبكم. ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم».

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নামাজের আগে আমাদের কাঁধে হাত বুলাতেন ও বলতেন, তোমরা সোজা হয়ে দাঁড়াও আগপিছ হয়ো না। অন্যথায় তোমাদের মাঝে অন্তর্বিবাদ সৃষ্টি হবে। তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক এবং জ্ঞানী তারা আমার নিকটবর্তী দাঁড়াবে, এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যরা দাঁড়াবে।"[৯৮]

তবে কেউ যদি কাতারের মাঝখানে বা ইমামের পিছনে বসে নামায পড়ে, তাহলে কারো এই অধিকার নেই যে, সে উক্ত ব্যক্তিকে কাতারের কিনারায় চলে যাওয়ার হুকুম দেবে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ সময় লোকেরা জমিনে বা চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তিদের জন্য কাতারের কিনারায় দাঁড়ানো জরুরী মনে করে থাকে, এটি সঠিক নয়।

কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি

শর'য়ী ওযরবশত মসজিদে জামা'আতের সাথে চেয়ারে নামায আদায়ের সময় চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো- চেয়ারের পিছনের পায়া কাতারে দাঁড়ানো মুসল্লীদের পায়ের গোড়ালি বরাবর থাকবে, যেন বসা অবস্থায় মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

আর যদি কোনো ব্যক্তি পূর্ণ নামায বসে আদায় না করে বরং দাঁড়াতে সক্ষম হওয়ার কারণে কেরাতের সময় দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হওয়ার কারণে চেয়ারে বসে রুকু-সিজদা আদায় করে, তাহলে এমতাবস্থায় কাতারে চেয়ার রাখার পদ্ধতি হলো- চেয়ার এমনভাবে রাখবে যেন চেয়ারের সামনের পায়া কাতারের বরাবর থাকে আর অবশিষ্টাংশ পিছনের দিকে থাকে। যেন দাঁড়ানোর সময় উক্ত মাযূর ব্যক্তির কাঁধ অন্যান্য নামাযীদের কাঁধ বরাবর সোজা হয়ে যায়।

বাকী থাকলো তার পিছনের কাতারের সমস্যার কথা। তার সমাধান হলো- মাযূর ব্যক্তিরা

---

[৯৭] তাবঈনুল হাকায়েক: ১/৪৮৯

[৯৮] সহীহ মুসলিম: ১/১৮১-১৮২, হাদীস নং-৪৩২

কাতারের এক পার্শ্বে একজনের পিছনে আরেকজন বসতে থাকবে, যেন তাদের বসার কারণে অন্যদের সমস্যা না হয়।

চেয়ারে বসে নামায পড়ার কয়েকটি ক্ষতিকর দিক

জমিনে বসে নামায আদায় করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও চেয়ারে বসে নামায পড়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের শর'য়ী ক্ষতি পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. নামাযের মধ্যে বিনয় ও নম্রতা হচ্ছে প্রধান লক্ষ্য আর চেয়ারে বসে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে তা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায় না। বসে আদায় করার সময় এর থেকে তুলনামূলক বেশি পাওয়া যায়।

২. মসজিদে চেয়ারের আধিক্যের কারণে তা নাসারাদের গির্জা ও ইয়াহুদীদের উপাসনালয়ের সদৃশ মনে হয়। কেননা সেখানে তারা গির্জায় চেয়ার ও বেঞ্চে বসে উপাসনা করে। আর দ্বীনি বিষয়ে ইয়াহুদী-নাসারা ও বিজাতিদের সাদৃশ্য অবলম্বন করতে বারণ করা হয়েছে।

৩. চেয়ার ব্যবহারের কারণে কাতার সোজা করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়। অথচ কাতার সোজা করা ও মিলে মিলে দাঁড়ানোর ব্যাপারে হাদীস শরীফে জোর তাকিদ এসেছে।

৪. যে ব্যক্তি শরী'আতের দৃষ্টিতে মা'যূর নয়, অর্থাৎ কিয়াম, রুকু-সিজদা করতে সক্ষম, তার জন্য মাটিতে অথবা চেয়ারে বসে ফরয বা ওয়াজিব নামায আদায় করা কোনোক্রমেই জায়েয নেই। এধরনের সুস্থ ব্যক্তিও সামনে চেয়ার পেয়ে চেয়ারে বসে নামায আদায় করে নেয়। ফলে তার নামাযই হয় না।

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে উক্ত বিধানাবলী বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২০ রবিউস সানী ১৪৩৫হি.

চেয়ারে বসে নামায : কিছু সংশয়ের নিরসন

'দরসুল ফিক্হ' ১ম খন্ডের প্রথম প্রকাশের অনেকদিন পর এক মসজিদের ইমাম সাহেব 'চেয়ারে বসে নামায' শীর্ষক প্রবন্ধটির উপর কিছু আপত্তি উল্লেখ করে দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ বরাবর একটি চিঠি পাঠান। উক্ত চিঠিতে তিনি দাবি করেন, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা বৈধ নয়। দলীল হিসেবে ভারতের কিছু আলেম কর্তৃক প্রচারিত একটি ইশতেহারও সেই চিঠির সাথে যুক্ত করেন।
চিঠিটি দারুল ইফতায় আসার পর আসাতিযায়ে কেরাম বান্দাকে জবাব লিখতে নির্দেশ দেন। আসাতিযায়ে কেরামের নির্দেশে ইমাম সাহেবের আপত্তিগুলোকে মৌলিক শিরোনামের আকারে উল্লেখ করে দলীলভিত্তিক জবাব প্রস্তুত করা হয়। আসাতিযায়ে কেরাম তা সত্যায়ন করেন এবং ইমাম সাহেবের বরাবর সেটি প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।
প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ কিছুটা বিলম্ব হওয়ায় দরসুল ফিকহ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে জবাবমূলক প্রবন্ধটি ছাপানো হয়েছিল। এখন ১ম খণ্ডেও 'চেয়ারে বসে নামায' সংক্রান্ত মূলপ্রবন্ধের সাথে তা সংযুক্ত করা হলো।

- সম্পাদক

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه، ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত 'দরসুল ফিকহ' কিতাবটি সংগ্রহ করে অধ্যয়ন করার জন্য আপনার প্রতি শুকরিয়া জানাচ্ছি। 'চেয়ারে বসে নামায' বিষয়ক প্রবন্ধের উপর কিছু প্রশ্ন সম্বলিত আপনার চিঠি আমরা দেখেছি। চিঠির সাথে সংযুক্ত ইশতেহার, যা আমাদের সংগ্রহে পূর্ব থেকেই ছিলো, তাও পুনরায় ভালোভাবে অধ্যয়ন করেছি। সতর্কতাবশত সমষ্টিগতভাবে আলোচনার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। প্রবন্ধের বক্তব্য ও প্রমাণাদি পুনঃবিবেচনায় আনার পর আমাদের সিদ্ধান্ত দাঁড়ায় যে, চেয়ারে বসে নামায সম্পর্কে প্রবন্ধে উল্লিখিত মাসআলাগুলো ফিকহী দৃষ্টিতে সঠিক এবং যথাযথই ছিলো।

দারুল উলূম হাটহাজারীর ফাতওয়া বিভাগ থেকে কিছু দিন পূর্বে 'চেয়ারে বসে নামায : মূলনীতি ও কিছু বিধান' শিরোনামে আরো একটি নাতিদীর্ঘ ফাতওয়া প্রকাশ করা হয়। এ ফাতওয়াতেও ওজরবিশিষ্ট ব্যক্তির জন্য চেয়ারে বসে নামায আদায়ের বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। মসজিদে যাওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে নতুন করে আর লেখার প্রয়োজন নেই। তাই এখানে শুধু আপনার চিঠিতে উল্লিখিত সংশয়গুলোকে মৌলিক শিরোনাম দিয়ে তার বিস্তারিত 'নিরসন' তুলে ধরা হলো।

এক.

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান কি খায়রুল কুরুনে ছিলো?

চেয়ার খায়রুল কুরুনে ছিলো, অসুস্থতাও ছিলো; কিন্তু চেয়ারে বসে নামায পড়ার বিধান খায়রুল কুরুন থেকে অনুসৃত হয়নি। সুতরাং চেয়ারে বসে নামায পড়া জায়েয হবে না॥

আমাদের মনে রাখতে হবে যে, চেয়ারে বসে নামায পড়া বৈধ-অবৈধ হওয়া সম্পর্কে খায়রুল কুরুনের পরিষ্কার ও অকাট্য কোনো বক্তব্য না থাকলেও এর পক্ষে আমল বিদ্যমান রয়েছে। বিশিষ্ট সাহাবী আবু বারযাহ রাযি. সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে,

كان لأبي برزة دكان يجلس عليه ويدلي رجليه ويصلي.

"হযরত আবু বারযাহ রাযি.-এর একটি উঁচু বসার স্থান ছিলো। তিনি সেখানে বসে পা ঝুলিয়ে নামায আদায় করতেন।"[৯৯]

এছাড়াও চেয়ারে বসে নামায পড়ার অন্যতম নযীর হলো বাহনের উপর বসে নামায আদায় করা, যা রাসূল ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল দ্বারা প্রমাণিত। বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসছে।

প্রকৃতপক্ষে এখানে প্রয়োজনীয়তার দিকটাই অধিক বিবেচ্য। আমরা জানি, প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই মুফতিয়ানে কেরাম চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন একটি আপেক্ষিক বিষয়। বর্তমানে চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক উন্নত। প্রযুক্তির নিরীক্ষণে আবিষ্কৃত হচ্ছে নানা রোগ ও তার নিরাময়ক। উন্মোচিত হচ্ছে বিভিন্ন পীড়ার রহস্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে

---

[৯৯] মুখতাসারু কিয়ামিল লাইল: ২০৬, ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে নাসর মারওয়াযী রাহ. এ বর্ণনাটি من يصلي على دكان مدليا رجليه শিরোনামে উল্লেখ করেছেন।

ডাক্তারগণ অনেক রোগ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে চেয়ারে বসতে হবে। নিচে বসলে তার ক্ষতি হবে। বলাবাহুল্য, রোগের কোনো বয়স নেই। যে কোনো বয়সেই রোগ হতে পারে। তাই অনেক সময় কমবয়সী হয়েও চেয়ারে বসতে হয়। এ ছাড়াও দুর্ঘটনায় বা অস্বাভাবিক পরিস্থিতির শিকার হয়েও চেয়ারে বসতে বাধ্য হচ্ছে অনেকেই।

প্রথম যুগে প্রয়োজন এভাবে সুনির্দিষ্ট হয়ে দেখা দেয়নি। প্রয়োজনের মাত্রাও হয়তো এমন প্রকট ছিলো না। আপনি কি এমন প্রমাণ দেখাতে পারবেন যে, অভিজ্ঞ ডাক্তার চেয়ারেই বসার তাগিদ করেছেন ? কিন্তু রাসূল ﷺ বা কোনো সাহাবী তাকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সে যামানায় আমল না থাকা, বর্তমানে প্রয়োজনে আমল করার ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না।

ফকীহগণের নিকট স্বীকৃত যে, প্রথম যুগ থেকে অনুসৃত কিছু পদ্ধতির ক্ষেত্রে পরবর্তী যামানায় প্রয়োজনের তাগিদে তারতম্য হতে পারে। যেমন, রাসূল ﷺ-এর যুগে মদীনায় ঈদের নামায হতো শুধু একস্থানে। তখনো অসুস্থরা ছিলো। তা সত্ত্বেও ঈদের নামায একস্থানেই আদায়ের নিয়ম ছিলো। হযরত আলী রাযি. প্রথমে অসুস্থদের অবস্থা বিবেচনা করে শরী'আতস্বীকৃত প্রয়োজনে দু'স্থানে নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। পরবর্তী সময়ে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. সহ অন্যরা প্রয়োজনে এক শহরের ততোধিক স্থানেও নামাযের অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

قال الإمام الطحاوي: ولا بأس بأن يجمع الناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روى محمد. (قال الجصاص:) لا يحفظ عن أبي حنيفة في ذلك شيء، والأول هو قول محمد، شبهه بصلاة العيدين في المسجد، والجبانة. وقد روي أن عليًا ﷺ كان يخلف رجلاً يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد، ويخرج هو، فيصلي بهم في الجبانة.

"ইমাম তহাবী রাহ. বলেন, এক শহরে দুই মসজিদে নামায আদায় করতে কোনো সমস্যা নেই। হ্যাঁ, এর চেয়ে বেশি মসজিদে বিভক্ত হয়ে জুমা পড়বে না। এভাবেই ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বর্ণনা করেছেন।

ইমাম জাস্‌সাস রাহ. বলেন, এক শহরে একাধিক মসজিদে জুম'আর নামায আদায়ের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর কোনো অভিমত বর্ণিত নেই। প্রথমটি ইমাম মুহাম্মদ রাহ.-এর অভিমত। তিনি এক শহরে একাধিক স্থানে জুম'আর নামাযের বৈধতাকে হযরত আলী রাযি.-এর যামানায় মসজিদ এবং শহরের বাইরে অর্থ্যাৎ ময়দানের দু'জায়গায় ঈদের নামায আদায়ের সাথে তুলনা করেছেন। হযরত আলী রাযি.-এর ব্যাপারে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের দিন একজন ব্যক্তিকে দুর্বল মানুষদের নিয়ে মসজিদে ঈদের নামায আদায় করার জন্য প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ করতেন। আর তিনি নিজে সবাইকে নিয়ে ময়দানে ঈদের নামায আদায় করতেন।"[১০০]

এর কাছাকাছি আরো একটি উদাহরণ হলো, 'তাছওয়ীব' অর্থাৎ আযানের পর একামতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকা। রাসূল ﷺ-এর যুগে এর কোনো প্রচলন ছিলো না; কিন্তু প্রয়োজনে

[১০০] শারহু মুখতাসারাতিত তাহাবী: ২/১৩৩-১৩৪

ফুকাহায়ে কেরাম অনুমতি দিয়েছেন। ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেন-

وهذا التثويب أحدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة ﷺ لتغير أحوال الناس، وخصوا الفجر به لما ذكرنا، أی: لأنه وقت نوم وغفلة، والمتأخرون استحسنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الأمور الدينية.

"কুফার উলামায়ে কেরাম মানুষের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে সাহাবা যুগের পর তাছওয়ীব (আযানের পর ইকামাতের পূর্বে নামাযের জন্য ডাকার) প্রথাটি চালু করেছেন। তবে তাঁরা ফজরের নামায ঘুম ও অলসতার সময়ে হওয়ার কারণে শুধু ফজরের সময় তাছওয়ীব করার কথা বলেছেন। তবে পরবর্তী উলামায়ে কেরাম দ্বীনি কাজে মানুষের শিথিল মনোভাব প্রকাশ পাওয়ার কারণে সকল নামাযের ওয়াক্তেই তাছওয়ীব করাকে পছন্দ করেছেন।"[১০১]

উল্লেখ্য, ফিকহে ইসলামী প্রয়োজনীয়তাকে কখনোই উপেক্ষা করে না; বরং সুন্দর ও সাবলীল ও যৌক্তিক সমাধান দেয়। এজন্য ফুকাহায়ে কেরামের নিকট নিম্নের মূলনীতিগুলো স্বীকৃত। যা চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতার প্রমাণ হিসেবে কার্যকর। যেমন,

الضرورات تبيح المحظورات، المشقة تجلب التيسير، يسروا ولا تعسروا، الطاعة بحسب الطاقة، حق الله تعالى مبنى على المسامحة.

"প্রয়োজনের খাতিরে নিষিদ্ধ কাজসমূহ বৈধ হয়ে যায়; জটিলতা সহজিকরণের দাবি রাখে, মানুষের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করো, কঠোরতা করো না; আনুগত্য সাধ্যানুযায়ী; বান্দার উপর আল্লাহর হক উদার প্রকৃতির।"[১০২]

এ ছাড়াও ইমাম আলী মারগীনানী রাহ. বলেছেন- الحكم يدار على دليل الحاجة "শর'য়ী বিধান প্রয়োজনের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়।"[১০৩]

আশা করি এতটুকু পরিষ্কার হয়েছে যে, চেয়ারের মতো অবস্থানে বসে নামায রাসূল ﷺ ও সাহাবাদের যুগে ছিলো। এছাড়া প্রয়োজনীয়তার মূলনীতি অনুযায়ীও চেয়ারে বসে নামায আদায় বৈধ প্রমাণিত হয়। সুতরাং চেয়ারে বসে নামাযকে অবৈধ বলা অগ্রহণযোগ্য এবং একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

এসকল শর'য়ী দলীলের আলোকে এবং বাস্তবার্থেই প্রয়োজন অনুভব করে দারুল উলূম দেওবন্দ, দারুল উলূম করাচী ও দারুল উলূম হাটহাজারীসহ অনেক দারুল ইফতার বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম শর্তসাপেক্ষে এর অনুমতি দিয়েছেন।[১০৪] বিগত কিছু দিন পূর্বে ইসলামিক

---

[১০১] ফাতহুল কাদীর: ১/২৪৯, মাকতাবাতুর রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১০২] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫০, ২৫১, ২২৬, সহীহ বুখারী (৬৯), রদ্দুল মুহতার ১/৫৪৫ এইচ, এম, সাঈদ, আল হিদায়া, ১/৮৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১০৩] আল হিদায়া, কিতাবুত তালাক ২/৩৫৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া

[১০৪] উল্লেখ্য যে, কিছু বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আত বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে; মূল পদ্ধতি গ্রহণ করা সম্ভব না হলে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করার সুবিধার্থে। এ সকল বিধানের ক্ষেত্রে শরী'আতের মেযাজ হলো, পীড়াক্রান্ত ব্যক্তির শতকষ্ট স্বীকার করে মূল পদ্ধতি অনুযায়ী আমল না করে বিকল্প পদ্ধতি গ্রহণ করাই উত্তম। বিষয়টি নিম্নের হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট।

عن أبي طعمة قال: كنت عند ابن عمر إذ جاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إني أقوى على الصيام في السفر ، فقال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من لم يقبل رخصة الله ، كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة. قال العلامة الهيشمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير، واسناد أحمد حسن.

ফাউন্ডেশন থেকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয না হওয়ার ফাতওয়া দিলে আমাদের দেশের বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম তার বিরোধিতা করে জায়েয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। অথচ আপনি সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই উক্ত ফাতওয়াকে ভুল ইজতিহাদ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এ উক্তি কতটুকু ইনসাফপূর্ণ হয়েছে তা আশা করি ভেবে দেখবেন।

দুই.

চেয়ারে বসা কি নামাযের স্বীকৃত পদ্ধতি 'কু'উদ-এর অন্তর্ভুক্ত?

আপনি (قعود) কু'উদ বিষয়ে অপ্রয়োজনীয় লম্বা আলোচনা করেছেন। সূরা আল ইমরানের **১৯১** নং আয়াত ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ উল্লেখ করে তাফসীরে কাবীর ও আদ-দুররুল মানছুর থেকে আমাদের মাযহাবের ইমামদের তুলনায় অন্য মাযহাবের বক্তব্যই বেশি উল্লেখ করেছেন। এতে যে সকল বক্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তাতেও চেয়ারে বসে নামায আদায় নাজায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ নেই। এ থেকে আলোচ্যবিষয়কে প্রমাণ করা উসূলে ফিকহের দৃষ্টিতেও গ্রহণযোগ্য নয়। তাই প্রত্যেকটির ভিন্ন ভিন্ন জবাব না দিয়ে মৌলিক আলোচনার মাধ্যমে সংশয় নিরসন করা হলো।

হাদীসে কোনো ব্যক্তি কিয়াম করতে অক্ষম হলে তাকে বসার সুযোগ দেয়া হয়েছে। বসার পদ্ধতি অনেকটাই কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। এজন্যই ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর উস্তায বিশিষ্ট তাবেঈ ইমাম আতা রাহ. কোনো নির্দিষ্ট পদ্ধতি উল্লেখ করেননি। অসুস্থ ব্যক্তির সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। হযরত ইবনে আবী লায়লা রাহ.[১০৫] বর্ণনা করেন-

عن عطاء قال في صلاة القاعد يقعد كيف شاء.

"হযরত আতা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বসে নামায আদায়কারী ব্যক্তির ব্যাপারে বলেন, যেভাবে বসলে তার সুবিধা হয়, সেভাবেই বসতে পারবে।"[১০৬]

কোনো কোনো ইমাম প্রচলিত কিছু পদ্ধতির আলোচনা করলেও প্রয়োজনে অন্য পদ্ধতি অবলম্বনের সুযোগ রেখে দিয়েছেন। যেমন ইমাম শামসুদ্দীন সারাখসী রাহ. বসার পদ্ধতির

وعن ابن عمر أن النبى ﷺ قال: إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح، والبزار والطبراني في الأوسط، وإسناده حسن.

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ إن الله تبارك وتعالى يجب أن تؤتى رخصه كما يجب أن تؤتى عزائمه. قال العلامة الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد والطبراني في الكبير والبزار، ورجال البزار ثقات، وكذلك رجال الطبراني. (أورد الأحاديث الثلاثة العلامة الهيثمى في "مجمع الزوائد" في باب الصوم في السفر)

عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسر هما، ما لم يكن إنما. (رواه الإمام البخارى في صحيحه، في باب صفة النبى ﷺ)

[১০৫] আবু আব্দুর রহমান মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আবী লায়লা আলফকীহ, আলকাযী, আলহানাফী, আলকূফী। তিনি ৭৬ হিজরীতে কূফায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৮ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আবু আমর আশশা'বী (১০০ হি.), নাফে' মাওলা ইবনে উমর (১১৭ হি.), আতা ইবনে আবী রাবাহ রাহ. (১১৪ হি.) থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম যাহাবী রাহ. বলেন, তিনি ফিকহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা রাহ.-এর সমপর্যায়ের ছিলেন। সুফিয়ান সাওরী (১৬১ হি.), সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা (১৯৮ হি.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। (তাহযীবুল কামাল: ১৭/৩৭২)

[১০৬] মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা: ৬/৬৬ হাদীস নং ৮৮৭৩ মুয়াস্‌সাসাতু উলূমিল কুরআন

ক্ষেত্রে কিয়ামে অক্ষম ব্যক্তি সাধ্যের উপর ছেড়ে দিয়ে ব্যাপক কারণ উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন-

والمصلي قاعدا تطوعا أو فريضة بعذر يتربع ويقعد كيف شاء من غير كراهة، إن شاء محتبيا، وإن شاء متربعا؛ لأنه لما جاز له ترك أصل القيام فترك صفة القعود أولى.

"ওজরের কারণে যে ব্যক্তি বসে নামায আদায় করবে, ফরয নামায হোক বা নফল নামায, সে চারজানু হয়ে বা তার ইচ্ছামতো অন্যভাবে বসতে পারবে। এতে (তার নামায) মাকরূহ হবে না। সে উভয় হাঁটু উঠিয়েও বসতে পারবে। চারজানু হয়েও বসতে পারবে। কেননা দাঁড়ানোর বিধান পরিপূর্ণভাবে ছেড়ে দেয়া তার জন্য বৈধ। সুতরাং বসার নিয়ম ছেড়ে দেওয়া তার জন্য অধিকতর বৈধ হবে।"[১০৭]

এ নসে মা'যূর ব্যক্তিকে বসার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা দেয়ার পর তিনি যে কারণ উল্লেখ করেছেন, তা অনেক ব্যাপক। ওজরের কারণে যখন তার থেকে কিয়ামের ফরয মাফ হয়েছে তখন বসার পদ্ধতির মাঝে সীমাবদ্ধ করা প্রদান না করাই উত্তম; আর স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায়, কোনো কোনো কিতাবে যে দু'একটি পদ্ধতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়।

যে ব্যক্তি বসে নামায পড়তে সক্ষম, যে পদ্ধতিতেই হোক না কেন, তার জন্য শুয়ে নামায পড়ার অনুমতি নেই। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. উল্লেখ করেন-

ولو قدر على بعض القيام ولو قدر آية أو تكبيرة يقوم ذلك القدر وإن عجز عن ذلك قعد، وإن لم يفعل ذلك خفت أن تفسد صلاته، هذا هو المذهب، ولا يروى عن أصحابنا خلافه، وكذا إذا عجز عن القعود وقدر على الاتكاء أو الاستناد إلى إنسان أو حائط أو وسادة لا يجزئه.

"ইমাম আবু জাফর তহাবী রাহ. থেকে বর্ণিত আছে- যদি মা'যূর ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য কিয়াম করতে সক্ষম হয়, যদিও তা এক আয়াত বা এক তাকবীর পরিমাণ হোক না কেন, তার জন্য সে পরিমাণ সময় কিয়াম করতে হবে। আর যদি এতেও অক্ষম হয়, তাহলে বসে নামায আদায় করবে। যদি সামান্য সময় কিয়াম করতে সক্ষম থাকার পরও তা ছেড়ে দেয়, তাহলে তার নামায ভঙ্গ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। এটাই (হানাফী) মাযহাবের সিদ্ধান্ত। মাযহাবের কোনো ইমামের এই মতের বিপরীত অভিমত পাওয়া যায় না। এমনিভাবে কেউ যদি বসতে অক্ষম হয় তবে হেলান দিয়ে বা কোনো মানুষ, দেয়াল অথবা বালিশের সাথে টেক লাগিয়ে বসতে সক্ষম হয়, তাহলে সেভাবেই বসে নামায আদায় করতে হবে। এমঅবস্থায় যদি সে চিত হয়ে শুয়ে নামায আদায় করে, তাহলে তার নামায হবে না।"[১০৮]

ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে এটাও বোঝা যায় যে, কোনো ব্যক্তি বসে নামায পড়তে না পারলে যদ্দুর সম্ভব বসার কাছাকাছি কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করবে। যেমন ইমাম আকমালুদ্দীন আল বাবীরতী রাহ. শুয়ে নামায পড়ার ক্ষেত্রেও যথাসম্ভব বসার কাছাকাছি অবস্থা অবলম্বন করার কথা বলেছেন-

---

[১০৭] আল মাবসূত: ১/২১০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ

[১০৮] আল বিনায়া: ২/৬৩৫, মাকতাবায়ে নাঈমিয়া

(فإن لم يستطع القعود استلقى على ظهره وجعل وسادة تحت رأسه) حتى يكون شبه القاعد ليتمكن من الإيماء والركوع والسجود، إذ حقيقة الاستلقاء يمنع الأصحاء عن الإيماء.

"যদি মা'যূর ব্যক্তি বসতে অক্ষম হয়, তাহলে চিত হয়ে পিঠের উপর শুয়ে পড়বে এবং বসার সাদৃশ্য অবলম্বন করার জন্য মাথার নিচে বালিশ দিবে, যেন মাথা দ্বারা রুকু, সিজদার জন্য ইশারা করতে পারে।..."[১০৯]

কোনো ব্যক্তি যদি ওজরের কারণে পা নিচে রাখতে না পারে, ঝুলিয়ে রাখতে হয়, নিচে বসে নামায পড়ারও সাধ্য নেই, তার জন্য এভাবেই নামায পড়ার সুযোগ আছে। যেমন পূর্বে হযরত আবু বারযা রাযি.-এর আমল উল্লেখ করা হয়েছে; বরং তার বসার ক্ষেত্রেও জুলুস শব্দই ব্যবহৃ হয়েছে। খায়রুল কুরুনে প্রয়োজনে অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় নামায আদায় করার নযির বিদ্যমান আছে। হযরত ই'য়ালা ইবনে মুর্‌রা রাযি. বলেন-

أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فانتهوا إلى مضيق، فحضرت الصلاة، فمطروا، السماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، "فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته، وأقام، فتقدم على راحلته، فصلى بهم يومئ إيماء: يجعل السجود أخفض من الركوع".

"তারা (সাহাবায়ে কেরাম) একবার নবীজী ﷺ-এর সাথে এক সফরে ছিলেন। তাঁরা একটি সংকীর্ণ ভূমিতে উপনীত হলেন এবং নামাযের সময় সমাগত হলো। এমতাবস্থায় তারা পানিতে বেষ্টিত হয়ে পড়লেন। আকাশ মাথার উপর থেকে বর্ষণ করছে। আর আর্দ্রতা নিচ থেকে জমে উঠছে। রাসূল ﷺ আযান-ইকামাত দিলেন এবং স্বীয় বাহন নিয়ে সবার সামনে এগিয়ে গিয়ে বাহনের উপর বসেই ইশারায় নামায পড়ালেন। সেজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝুঁকালেন।"[১১০]

এ হাদীস থেকে রাসূল ﷺ-এর বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করার প্রমাণ মেলে। এ হাদীসের সমর্থনে হযরত আনাছ রাযি.-এর আমলও এখানে উল্লেখযোগ্য। ইমাম ইবনে সীরীন রাহ.[১১১] বলেন-

أقبلنا مع أنس بن مالك من الكوفة حتى إذا كنا بأطيط (جبل بين البصرة والكوفة) أصبحنا والأرض طين وماء، فصلى المكتوبة على دابة ثم قال: ما صليت المكتوبة قط على دابتي قبل اليوم.

"আমরা আনাস ইবনে মালিকের সাথে কুফা থেকে ফিরছিলাম। আতীত (কুফা ও বসরার

---

[১০৯] আল ইনায়া: ২/৪, ফাতহুল কাদীরের টীকা

[১১০] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ৪১১

وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير ٥٢٢/١: قال عبد الحق: إسناده صحيح، والنووي إسناده حسن، وضعفه البيهقي وابن العربى وابن القطان لحال عمرو بن عثمان.

[১১১] আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে সীরীন আলবসরী, আলআনছারী। ৩৩ হিজরীতে বসরায় জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৭ বছর বয়সে বসরাতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁর পিতা সীরীন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি.-এর আযাদকৃত গোলাম এবং তাঁর মাতা ছফিয়্যাহ হযরত আবু বকর রাযি.-এর আযাদকৃত বাঁদী ছিলেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবু হুরায়রাহ রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত কাতাদাহ, হযরত আবু আইয়ুব সাখতিয়ানী, হযরত কুররাহ ইবনে খালিদ প্রমুখ তাঁর বিখ্যাত শাগরিদ। তিনি তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও স্বপ্নের তাবীর ইত্যাদি শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। (তাহযীবুল কামাল: ৯/২৭, তাকরীবুত তাহযীব: ২/৮৫)

মধ্যবর্তী পাহাড়ি অঞ্চল) নামক স্থানে উপনীত হয়ে আমরা কাদা পানিতে আটকে পড়লাম। তিনি ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করলেন এবং বললেন, আমি আজকের আগে কখনো ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করিনি।"[১১২]

ওজরের মৌলিক উসূল ও উল্লিখিত বর্ণনার ভিত্তিতে পরবর্তী ফুকাহায়ে কেরামও বলেছেন, প্রয়োজনে কোনো অশ্বারোহী ঘোড়ায় আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায আদায় করতে পারবে। নিম্নে দু'একটি নস উল্লেখ করা হলো। ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনে মাহমুদ আল মাওসিলী রাহ. বলেন-

مريض راكب لا يقدر على من ينزله يصلي المكتوبة راكبا بإيماء، وكذلك إذا لم يقدر على النزول لمرض أو مطر أو طين أو عدو.

"অসুস্থ ব্যক্তি যদি আরোহীত অবস্থায় থাকে এবং তাকে বাহন থেকে নামানোর জন্য কেউ না থাকে, তাহলে সে বাহনের উপরই ফরয নামায ইশারায় আদায় করবে। অনুরূপ বিধান যদি আরোহী কোনো অসুস্থতা, বৃষ্টি, কাদা অথবা শত্রুর ভয়ের কারণে বাহন থেকে নামতে না পারে।"[১১৩]

বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে মুখতাসারুল কুদূরীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা হাদ্দাদী রাহ. বলেন-

المكتوبة لا تجوز على الدابة إلا من عذر وهو أن يخاف من النزول على نفسه أو دابته من سبع أو لص أو كان في طين أو ردغة لا يجد على الأرض مكانا جافا أو كانت الدابة جموحا لو نزل لا يمكنه الركوب إلا بمعين أو كان شيخا كبيرا لو نزل لا يمكنه ولا يجد من يعينه فتجوز صلاة الفرض في هذه الأحوال كلها على الدابة ولا يلزمه الإعادة.

"ফরয নামায সওয়ারির উপর আদায় করা জায়েয হবে না। হ্যাঁ, তবে যদি কোনো অপরাগতা থাকে যেমন, বাহন থেকে নামলে তার নিজের বা বাহনের কোনো হিংস্র জন্তু বা চোর ডাকাতের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অথবা কাদা মাটির মাঝে, যেখানে নামায আদায় করার মতো কোনো শুকনো জায়গা নেই। অথবা সওয়ারি যদি এমন অবাধ্য হয় যে, তা থেকে অবতরণ করার পর সাহায্যকারী ছাড়া আরোহণের সুযোগ নেই। অথবা সে যদি বৃদ্ধ হয় এবং অবতরণের পর আরোহণে সাহায্য করবে এমন কেউ না থাকে। এসব অবস্থায় ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করা যাবে এবং তার উপর নামায দোহরানো আবশ্যক হবে না।"[১১৪]

ইমাম যাইলাঈ রাহ., আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ., আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ. ও আল্লামা কাশ্মীরী রাহ. একই বক্তব্য উল্লেখ করেছেন।[১১৫]

হাদীস, আছার ও ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হলো যে, সুনির্দিষ্ট ওজরের কারণে সওয়ারিতে বসে নামায আদায় করা যাবে। সওয়ারিতে বসা আর চেয়ারে বসার মাঝে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য নেই; বরং সওয়ারিতে বসা চেয়ারে বসার তুলনায় আরো অস্বাভাবিক।

---

[১১২] قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات. رواه ابن أبي شيبه وزاد: مستقبل القبلة وأو مأ أيماء وجعل السجود أخفض من الركوع.

[১১৩] আল ইখতিয়ার লিতা'লিলিল মুখতার: ১/১৩৪, দারুল হাদীস, কায়রো

[১১৪] আল জাওহারাতুন নায়্যিরা: ১/৯০, মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যা, মুলতান, পাকিস্তান

[১১৫] রদ্দুল মুহতার: ২/৯৬, আল আরফুশ শাযী, দ্র. ফাতহুল মুলহিম: ৪/৪১৩

তাই বাস্তবসম্মত ওজরের কারণে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার অনুমোদন এখান থেকেও প্রমাণিত হয়।

তিন.

ইহুদী-খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য

ইসলামী শরী'আতের গুরুত্বপূর্ণ একটি উসূল হলো, বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে বেঁচে থাকা। এ বিষয়ে একাধিক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। কুরআনেও বিভিন্নভাবে এবিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, **ইসলাম বহু শাখা প্রশাখার সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। ইসলামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো (আমাদের কল্যাণ সাধন ও সুফল প্রদানের ক্ষেত্রে) পরস্পরের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। অতএব ইসলামের যে কোনো শাখায় সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য ইসলামকে সামগ্রিকভাবে অবলোকন করা আবশ্যক। বিশেষ করে তাহকীক ও গবেষণার ক্ষেত্রে এটা অপরিহার্য। কেননা খণ্ডদৃষ্টি দ্বারা কোনো বিষয় নির্ভুল ধারণা লাভ করে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়।**

বিধর্মীদের সাদৃশ্য অবলম্বনের নিষেধাজ্ঞা এত ব্যাপক নয় যে, যেকোনো সাদৃশ্য বা একরূপতা এর আওতায় এসে যাবে। অন্যথায় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অনেক কাজ বাদ দিতে হবে। বলতে গেলে পুরো জীবনযাত্রার স্বাভাবিকতা ব্যাহত হয়ে পড়বে। এ জন্য ফুকাহায়ে কেরাম সাদৃশ্য নিষেধের দলীল এবং শরী'আতের অন্যান্য দলীল বিবেচনা করে বিধানটিকে নির্দিষ্ট সীমায় এনে ব্যাখ্যা করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

فإن التشبه بهم لا يكره في كل شيء، بل في المذموم وفيما يقصد به التشبه، كما في البحر.

"সর্বক্ষেত্রে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন নিন্দনীয় নয়। এটা তখনই নিন্দনীয় হবে যখন তা হবে মন্দ কাজে এবং এমন ক্ষেত্রে যেখানে সাদৃশ্য গ্রহন উদ্দেশ্য হয়।"[১১৬]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

فإنا نأكل ونشرب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان، ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصوفين بمسامير، فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال لا، قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان؛ فقال «كان رسول الله ﷺ يلبس النعال التي لها شعر» وإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. اهـ

"আল বাহরুর রায়িকে কাযিখানের আল জামিউস সগীরের ব্যাখ্যাগ্রন্থ থেকে নকল করা হয়েছে: (কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যতা সব ক্ষেত্রেই যে মন্দ নয় এ প্রসঙ্গে) আমরাও তাদের মতোই পানাহার করি...।

এই বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় আয যখীরা গ্রন্থে- হিশাম রাহ. বলেন, আমি আবু ইউসুফ রাহ.-এর পায়ে লোহার খুঁটিযুক্ত এক পাটি জুতা দেখলাম। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, এখানে লোহার ব্যবহারে আপনি কোনো সমস্যা আছে বলে মনে করেন? তিনি বললেন, না। আমি বললাম, সুফিয়ান এবং সাওর ইবনে যায়দ এতে রুহবান বা বৈরাগীদের সাথে সাদৃশ্য হয়

[১১৬] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার

বিধায় এটাকে অপছন্দ করতেন। এর প্রতিউত্তরে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ পশমযুক্ত জুতা ব্যবহার করতেন। এটাও তো বৈরাগীদের পরিধেয়।" তিনি এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, উপকার ও সুবিধা রয়েছে এমন কাজে সাদৃশ্য হলে কোনো সমস্যা নেই... ।"[১১৭]

এখানে আল্লামা শামী রাহ. নিত্যপ্রয়োজন এবং ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.-এর বক্তব্য থেকে এ মূলনীতি বের করেছেন যে, মানুষের প্রয়োজন মিটাতে বা কল্যাণসাধন করতে বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য হলেও আপত্তির কিছু নেই। প্রয়োজনে বা কৌশলগত কারণে সাদৃশ্য অনুমোদিত। যেমন আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

و (يكفر) بوضع قلنسوة المجوسي على رأسه على الصحيح إلا لضرورة دفع الحر أو البرد وبشد الزنار في وسطه إلا إذا فعل ذلك خديعة في الحرب وطليعة للمسلمين.

"বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী গরম ঠান্ডা থেকে রক্ষা পাওয়ার একান্ত প্রয়োজন ছাড়া অগ্নিপূজারীদের টুপি পরিধান করলে তাকফীর করা হবে। অনুরূপভাবে খ্রিস্টানদের (বিশেষ) কোমরবন্ধনীর ক্ষেত্রেও একই কথা। হ্যাঁ, তবে যদি তা হয়ে থাকে শত্রুকে ধোঁকা দিতে এবং মুসলমানদের কল্যাণে, তাহলে সমস্যা নাই।"[১১৮]

হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ. এক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন-

کفار کی وضع **بلاضرورت قویہ** حسیہ کدفع الحر والبرد **یا** شرعیہ کخدع اھل الحرب والتنجیس للمسلمین **افعال** کفر سے ہے۔[১১৯]

চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা নিয়ে যারা আপত্তি করেছেন তারা জোরেশোরে এ বিষয়টি সামনে আনতে চান। সাদৃশ্যের প্রশ্ন তুলেই মনে করেন যারা অনুমতি দিয়েছেন তাদের কথা দলীলনির্ভর নয়। অথচ যারা অনুমতি দিয়েছেন তারা প্রয়োজনের দিক বিবেচনা করেই অনুমতি দিয়েছেন। প্রয়োজন ব্যতিরেকে চেয়ারে নামায না হওয়ার কথাও স্পষ্টভাবেই বলেছেন। এ প্রসঙ্গে আমাদের ফাতওয়া বিভাগ থেকে প্রকাশিত দ্বিতীয় ফাতওয়ার অংশবিশেষ তুলে ধরছি-

"অপারগতা ও প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য অবৈধতার কারণ নয়। অর্থাৎ, যা করতে মানুষ বাধ্য, যা না হলে মানুষের জন্য কষ্টের কারণ হবে, এমন বিষয়ে সাদৃশ্যের বিধান প্রযোজ্য নয়। কারণ এ সকল বিষয় কারো সাদৃশ্য গ্রহণের জন্য করা হয় না; বরং প্রয়োজনে করা হয়। তাই কারণ বা রহস্য না বুঝে শুধু সাদৃশ্য দেখেই যদি ঢালাওভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলোকে হারাম বলে দেয়া হয়, তাহলে খাওয়া-দাওয়াসহ জীবন ধারণের অনেক মৌলিক বিষয়ও তার আওতায় চলে আসবে। কারণ, এসব বিষয় মৌলিকভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ। আর এ সব হারাম হয়ে গেলে মানব জীবনই বিপন্ন হয়ে পড়বে। তাই যে সকল বিষয় আবশ্যক, প্রয়োজনীয় ও উপকারী নয় বা যে সকল মৌলিক প্রয়োজনগুলো মেটানোর পথ ও পন্থা একাধিক হতে পারে সে সকল ক্ষেত্রে সাদৃশ্যপূর্ণ রূপরেখা বর্জন করে সাদৃশ্যহীন পন্থা অবলম্বনের নির্দেশ করা হয়।

এটি তখন শরী'আতের দৃষ্টিতে ওজরের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব চেয়ারের এই বৈধ ও

---

[১১৭] রদ্দুল মুহতার: ২/৪৬৪, মাকতাবায়ে আযহার
[১১৮] আল বাহরুর রায়িক: ৫/২০৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১১৯] বাওয়াদিরুন নাওয়াদের: ৪৫৪, মাকতাবায়ে জায়েদ, দেওবন্দ

প্রয়োজনীয় ব্যবহারকে সাদৃশ্যের অজুহাতে অবৈধ বলা যাবে না।"

উল্লেখ্য, আমাদের মূল আলোচ্য বিষয় প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি প্রদান করা। অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার আমরাও নিষেধ বলি। অপব্যবহার বন্ধ করা এবং প্রয়োজনীয় ব্যবহারের মাঝে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য সতর্কতা হিসেবে বিভিন্ন ফাতওয়ায় সাদৃশ্যের কথা উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

চার.

চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দিলে অপব্যবহারের দরজা খুলে যাবে

আপনি বলেছেন , চেয়ারে বসে নামায পড়ার অনুমতি দিলে সুযোগ সন্ধানীদের দরজা খুলে দেয়া হবে। অথচ শরী'আতে এক্ষেত্রে দরজা বন্ধ করে দেয়ার কথা বলা হয়েছে॥

এ সংক্রান্ত বিধানাবলী ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত سد الذرائع শিরোনামে উল্লেখ করে থাকেন। এর সরল ব্যাখ্যা হলো, নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা যাতে ছিদ্রপথ না থাকে। নিষিদ্ধ কাজের পরিধি অনেক বড়। অন্য দিকে যে কাজকে নিষিদ্ধ কাজের মাধ্যম ধারণা করা হচ্ছে সেটিও বিভিন্ন পর্যায়ের। কোনো সময় ফরয পর্যায়ের বিধানকে কেউ হারাম কাজের মাধ্যম বানিয়ে থাকে। আবার কিছু ব্যবহৃত মাধ্যম আছে মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। এছাড়াও প্রয়োজনের তাগিদে অবলম্বনকৃত মাধ্যমও আছে।

উল্লিখিত নীতি থেকে ব্যাপক অর্থ উদ্দেশ্য নিলে অনেক বিধানই ব্যাহত হয়ে পড়বে। যেমন, মহিলাদের হিজাব ব্যবহার করা একটি শরী'আতস্বীকৃত বিষয়। কিন্তু বর্তমানে অনেকেই এর অপব্যবহার করে থাকে। অন্যায় কাজ করে নিরাপদে সরে আসার জন্য হিজাব অবলম্বন করে থাকে। হিজাব পরিধান করে রাষ্ট্রীয় আসামী পলায়ন করার বিষয় অজানা থাকার কথা নয়। এ ধরনের আরো উদাহরণ পেশ করা যাবে; তবে বোঝার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। মূল কথা হলো, কোনো বিধানকে কেউ হারামের মাধ্যম বানালেই তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এর বিভিন্ন স্তর ও প্রকার রয়েছে। ইমাম আবুল আব্বাস আল কারাফী রাহ.[১২০] বলেন-

الذرائع ثلاثة أقسام

١. قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين فإنه وسيلة إلى إهلاكهم وكذلك إلقاء السم في أطعمتهم وسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله تعالى عند سبها.

٢. وقسم أجمعت الأمة على عدم منعه وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمر فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من المجاورة في البيوت خشية الزنى.

٣. وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال عندنا.

"যারী'আসমূহ (কোনো জিনিসের কারণ বা মাধ্যম হয়) তিন প্রকার:

---

[১২০] শিহাবুদ্দীন আবুল আব্বাস আহমাদ ইবনে ইদরীস ইবনে আব্দুর রহমান আলমিশরী, আলকারাফী, আলমালেকী। ৬২৬ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬৮৪ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইযযুদ্দীন ইবনে আব্দুস সালাম (৬৬০ হি.), আবু আমর ইবনে হাজিব (৬৪৬ হি.) যকীউদ্দীন ইবনুল মুনযিরী (৬৫৬ হি.) তাঁর অন্যতম উস্তাদ। ফিকহ, উসূলে ফিকহ, লুগাহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে তাঁর আনেক মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। আনওয়ারুল বুরূক ফী আনওয়া'ইল ফুরূক তাঁরই অমর কীর্তি। (তাবাকাতুস সুবকী: ৮/১৬১, হুসনুল মুহাযারাহ লিসসুয়ুতী: ১/৯০, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

১. ঐ সমস্ত যারী'আ বা মাধ্যম যেগুলো নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। যেমন, মুসলমানদের পথের উপর কূপ বা গর্ত খনন করা। এটা কখনো জায়েয হবে না। কারণ এটা যে কারো প্রাণহানির কারণ বা মাধ্যম হতে পারে। অনুরূপভাবে খাবারে বিষ মিশ্রিত করা। এমনিভাবে ঐ মূর্তিপূজারীর সামনে মূর্তিকে গালমন্দ করা, যার ব্যাপারে জানা আছে যে, মূর্তিকে গালমন্দ করলে সেও আল্লাহকে গালমন্দ করবে।

২. আরেক প্রকার হলো, যেটা নিষিদ্ধ না হওয়ার ব্যাপারে সমস্ত উলামায়ে কেরাম একমত। এ ধরনের মাধ্যম থেকে নিষেধ করা হবে না। যেমন, মদ তৈরী করা হবে এই সম্ভাবনার কারণে আঙ্গুর উৎপাদন থেকে নিষেধ করা হবে না...।

৩. আর কিছু যারী'আ বা মাধ্যম আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে- এসব মাধ্যমকে নিষিদ্ধ করা হবে কি হবে না। যেমন, বাকিতে বেচাকেনা।"[১২১]

ফুকাহায়ে কেরামের উল্লিখিত এ মূলনীতি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এমন মাধ্যম যা মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের। যা পালন বা অবলম্বন করার ব্যাপারে শরী'আতের পক্ষ থেকে স্বতন্ত্র কোনো তলব নেই। এ ধরণের মাধ্যমগুলোই উক্ত মূলনীতি থেকে উদ্দেশ্য। আল্লামা ইবনে রুশদ রাহ. (৫৯৫ হি.)[১২২] বলেন-

الذرائع هى الأشياء التي ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إلى فعل المحظور.

"যারায়ে হচ্ছে ঐ সমস্ত কাজ যেগুলো বাহ্যত বৈধ; কিন্তু পরিণতিতে এগুলো অবৈধ কাজের দিকে নিয়ে যায়।"[১২৩]

ইমাম কুরতুবী রাহ.[১২৪] বলেন-

الذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع في نفسه، يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع.

"যারী'আ বলা হয় এমন বিষয়কে যেটা সত্তাগতভাবে বৈধ; কিন্তু এটা করার কারণে অবৈধ ও হারামে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে।"[১২৫]

সুতরাং যে বিধানগুলো স্বতন্ত্র দলীল দ্বারা প্রতিপাদ্য ও প্রমাণিত, এমন বিধানকে কেউ গুনাহের মাধ্যম বানালেও তা নিষেধ হয়ে যাবে না। এমনিভাবে কোনো বিধান যদি উপকার ও অপকার

---

[১২১] الفروق للقرافي (الفرق الثامن وخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) (٦٢/٢ مؤسسة الرسالة)

[১২২] আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে আহমাদ ইবনে রুশদ আলকুরতুবী, আলমালেকী। তিনি ইবনে রুশদ আল হাফীদ নামে প্রসিদ্ধ। ৫২০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৫৯৫ হিজরীতে মরক্কোর মারাকেশ শহরে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহ, ইসলামী দর্শন, গণিত, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। এসব শাস্ত্রে তাঁর অনেক গুরুত্বপূর্ণ রচনা রয়েছে। ফিকহশাস্ত্রে 'বিদায়াতুল মুজতাহিদ ওয়া নিহায়াতুল মুকতাছিদ' তাঁরই কালজয়ী রচনা। এছাড়াও 'উসূলে ফিকহ শাস্ত্রে 'মুখতাসারুল মুস্তাস্‌ফা' এবং চিকিৎসা শাস্ত্রে 'আল কুল্লিয়াত' রচনা করেন। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ২১/৩০৭)

[১২৩] আল মুকাদ্দিমাতুল মুমাহহাদাত লি-ইবনে রুশদ: ২/৩৯, (কিতাবুল বুয়ু)

[১২৪] আবু আব্দুল্লাহ শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু বকর ইবনে ফারাহ আল কুরতবী আলমালেকী। ৬০০ হিজরীতে আন্দালুসের কুরতুবা (বর্তমান স্পেনের কর্ডোভা) শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৬৩৩ হিজরীতে আন্দালুসের পতনের পর মিশরে হিজরত করেন। ৬৭১ হিজরীর শাওয়াল মাসে মিশরেই ইন্তেকাল করেন। তিনি তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রের ইমাম ছিলেন। 'আল জামে লিআহকামিল কুরআনিল কারীম' তাঁরই রচিত বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ। (শাযারাতুয যাহাব ৫/৩৩৫, আল আ'লাম লিযযিরিকলী ১/২১০)

[১২৫] আল জামে লি-আহকামিল কুরআন: (সূরা বাকারা: ১০৪)

উভয়ের মাধ্যম হয়; কিন্তু তার উপকারের দিকটা অধিক শক্তিশালী, তখনও তা অবলম্বন করার সুযোগ আছে। ইমাম আবুল আব্বাস কারাফী রাহ. বলেন-

(تنبيه) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة...

"(সতর্কীকরণ) কখনো কখনো হারামের দিকে ধাবিত করে এমন জিনিস হারাম হয় না যদি তাতে উপকার বা কল্যাণের পাল্লা ভারী থাকে।"[১২৬]

মোটকথা, ওজর বা প্রয়োজনে যে কাজগুলো করতে হয় তা কেউ গুনাহের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগালেও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে না। কারণ, এই কাজটি নিছক মুবাহ বা জায়েয পর্যায়ের নয়। এর পিছনে স্বতন্ত্র দলীল আছে।

ওজরের কারণে ঘরে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেকে অলসতা করেই বাসায় একাকী নামায আদায় করে। মসজিদে আসে না। এদের কারণে কি প্রকৃত মা'যূরদের ঘরে নামায না হওয়ার ঘোষণা দেয়া যাবে?

আমাদের আলোচ্যবিষয়ে ওযর ও প্রয়োজনকে বিবেচনা করেই চেয়ারে বসে নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে। এখন কিছু ব্যক্তির অপব্যবহারের কারণে প্রকৃত মা'যূরদের জন্য চেয়ারে বসে নামায পড়া নিষেধ করলে তাদের উপর অসাধ্য জিনিস চাপানো হবে যা শরী'আতে নিষিদ্ধ। হ্যাঁ, অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য অন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পাঁচ.

মা'যূর ব্যক্তিরা কি মসজিদে যাবে না?

আপনি প্রশ্ন তুলেছেন যে, ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তি কি মসজিদে যেতে পারে? এরপর আশ্চর্যবোধ করে বলেছেন, যে ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম নয় এমন ব্যক্তি মসজিদে আসবে কীভাবে?

হতে পারে আপনার ধারণা হলো, প্যারালাইসিসে যার পা বিকল হয়ে গেছে, শুধু সেই ব্যক্তিই ওযরবিশিষ্ট বলে বিবেচিত হবে। কিন্তু বাস্তবতা মোটেও এরূপ নয়। অনেকেই আছেন যাদেরকে ডাক্তার নিচে বসতে নিষেধ করে দিয়েছেন। তারা যাবতীয় কাজ চেয়ারে বসেই সম্পাদন করে। চলাফেরাও করে হুইল চেয়ারে বসে। জমিনে বসা তাদের জন্য ক্ষতিকর, কারো জন্য আশঙ্কাজনকও। এ ধরনের ব্যক্তিরা কি মসজিদে যেতে পারবে না?

রাসূল ﷺ-এর জীবনের শেষ দিনগুলোতে মসজিদে উপস্থিত হওয়া এবং মসজিদে যেতে অপরের সহযোগিতা গ্রহণ করা, এছাড়া মসজিদে আসার প্রতি জোর তাগিদ আমাদেরকে কী শিক্ষা দেয়? হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له، فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى، دعاه، فقال: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم، قال: «فأجب»

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এক অন্ধ ব্যক্তি এসে আরজ করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ, (আমি অন্ধ) আমার এমন কেউ নেই যে আমাকে ধরে মসজিদে নিয়ে আসবে। অতএব আমাকে ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে অনুমতি দিলেন। লোকটি যখন চলে যাচ্ছিলো,

---

[১২৬] الفروق للقرافي (الفرق الثامن وخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) (٢/٦٤ مؤسسة الرسالة)

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে ডাক দিয়ে বললেন, তুমি নামাযের আহবান (আযান) শুনতে পাও? সে বললো, জ্বী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তাহলে সাড়া দিও (অর্থাৎ মসজিদে যাবে)।"[১২৭]

এ হাদীসে রাসূল ﷺ অন্ধ ব্যক্তিকেও ঘরে নামায পড়ার অনুমতি দেননি। আপনার যুক্তির দৃষ্টিতে দেখলে তো এখানেও প্রশ্ন হয়, অন্ধ ব্যক্তি কি মসজিদে আসতে পারে? কিন্তু কার হিম্মত আছে যে, রাসূল ﷺ-এর ফয়সালার উপর প্রশ্ন করবে?

মোটকথা, কুরআন হাদীসে পুরুষকে মসজিদে জামাতের সাথে নামায আদায় করার জোর তাগিদ করা হয়েছে। একাগ্রচিত্তে নামায আদায়ের উত্তম স্থান মসজিদই। সুতরাং কোনো ব্যক্তি মা'যূর হলেও যদ্দুর সম্ভব মসজিদে এসে নামায পড়ার চেষ্টা করা কাম্য।

ছয়.

ইমামের পিছনে চেয়ারে বসে নামায পড়া কি 'মুনকার'?

ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তিও ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়তে পারবেন। তবে তাদের জন্য কাতারের কিনারায় গিয়ে সুস্থ ও আলেমদের জন্য ইমামের পিছনে নামায পড়ার সুযোগ করে দেয়াই উত্তম। ইমামের পিছনে দাঁড়ানো একটি উত্তম কাজ। ইমাম আবু দাউদ রাহ.[১২৮] উলূল আহলামি ওয়ান-নুহা' বিষয়ক হাদীস এই শিরোনামে উল্লেখ করেছেন-

باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف، وكراهية التأخير.

"ইমামের পিছনে সামনের কাতারে কে দাঁড়াবে এবং সেখানে দাঁড়ানো থেকে পিছিয়ে থাকা অপছন্দনীয় এ বিষয়ক অধ্যায়।"[১২৯]

ইমাম আব্দুর রায্যাক রাহ. ও এ ধরনের হাদীসের জন্য কাছাকাছি শিরোনাম দিয়েছেন-

باب من ينبغي أن يكون في الصف الأول.

"কার জন্য প্রথম সারিতে দাঁড়ানো উচিত এ বিষয়ক অধ্যায়।"[১৩০]

সুতরাং ওযরবিশিষ্ট ব্যক্তির ইমাম সাহেবের পিছনে নামায পড়া 'মুনকার'-এর আওতায় আসে না। তাই সর্বসাধারণের জন্য 'নাহী আনিল মুনকার'-এর বিধান হিসেবে তাকে পিছনে যাওয়ার হুকুম জারি করার সুযোগ নেই। উপরন্তু এতে ফেতনা হওয়ার আশংকা রয়েছে।

রাসূল ﷺ-এর শেষ বয়সে অসুস্থ অবস্থায় মসজিদে গমন করার হাদীস সুপ্রসিদ্ধ। রাসূল ﷺ কাতারের কিনারায় না গিয়ে ইমামের পাশেই অবস্থান নিয়ে ছিলেন।[১৩১] মাযূর ব্যক্তির জন্য কিনারায় দাঁড়ানো আবশ্যক হলে তিনি মাঝে আসতেন না।

এছাড়াও রাসূল ﷺ 'উলূল আহলামি ওয়ান-নুহা' কে প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন এর

---

[১২৭] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৬৫৩, বাইতুল আফকারিদ দাউলিয়্যা

[১২৮] আবু দাউদ সুলাইমান ইবনে আশআছ ইবনে ইসহাক ইবনে বশীর ইবনে শাদ্দাদ ইবনে আমর আলআযদী আসসিজিস্তানী। তিনি ২০২ হিজরীতে ইরানের সিজিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৭৫ হিজরীতে বসরায় ইন্তেকাল করেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন, ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম আবু ঈসা তিরমিযী এবং ইমাম নাসাঈ তাঁর ছাত্র ছিলেন। তিনি হাদীস শাস্ত্রের বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। কুতুবে ছিত্তা'র অন্যতম হাদীস গ্রন্থ 'সুনানে আবী দাউদ' তাঁরই রচনা। এছাড়াও 'মারাসিলে আবী দাউদ' রচনা করেছেন। (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ১৩/২০৫-২২১, তাহযীবুল কামাল: ৪/৩৪৩)

[১২৯] বাজলুল মাজহুদ: ৩/৬২৩, দারুল বাশায়ের

[১৩০] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫২

[১৩১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৮৭, ফাতহুল বারী: ২/২১৪-২১৫

বিভিন্ন উদ্দেশ্য ছিলো। আপনার উদ্ধৃতির কিতাব 'দরসে তিরমিযী'তেও একাধিক উদ্দেশ্যের আলোচনা আছে।

আপনি বলেছেন ইমামের পিছনে কেবল যোগ্য ব্যক্তিরাই দাঁড়াবে। আপনি যোগ্য ব্যক্তির ব্যাখ্যা করেননি। যদি আপনার উদ্দেশ্য হয় রাসূল ﷺ-এর নামায সঠিকভাবে বোঝা ও তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার যোগ্য অর্জন করা; যা উল্লিখিত হাদীসের অন্যতম ব্যাখ্যা। তাহলে চেয়ারে বসে নামায আদায়কারী অযোগ্য নয়। আর যদি উদ্দেশ্য হয় যে, প্রয়োজনে নায়েব বা খলীফা হওয়ার যোগ্যতা থাকা, তাহলে আমরা বলবো এটাই হাদীসের একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তাই এ কথা সুনির্দিষ্টভাবে বলা যাবে না যে, রাসূল ﷺ শুধু নায়েব হওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকেই পিছনে দাঁড়াতে বলেছেন। সুতরাং এ হাদীসের ভিত্তিতে মা'যূও ব্যক্তির জন্য মসজিদের পিছনের কাতার বা একপাশে নামায পড়া, অথবা ইমামের পিছনে বসে গেলে তাকে পিছনে যেতে বাধ্য করা অপরিহার্যতা প্রমাণিত হয় না।

রাসূল ﷺ শুধু নিজের পিছনেই দাঁড়াতে বলেননি; বরং নিজের কাছাকাছি প্রথম কাতারে দাঁড়াতে বলেছেন। একজনকে নয় একাধিক ব্যক্তিকেই দাঁড়াতে বলেছেন। কোনো কোনো রেওয়ায়াতে মুহাজির ও আনছার শব্দও এসেছে।[১৩২] একজন নায়েব হতে অপারগ হলে অন্যজন নায়েব হবে। সুতরাং কোনো মা'যূর ব্যক্তির ইমামের পিছনে নামায পড়া উল্লিখিত হাদীস পরিপন্থী হবে না। সর্বসাধারণের জন্য তাকে পিছনের কাতারে বা একপাশে যাওয়ার হুকুম জারি করারও সুযোগ নেই। সর্বোপরি একটি উত্তম কাজ নিয়ে বাড়াবাড়ি কাম্য নয়। হাদীসের মৌলিক উদ্দেশ্য অনুধাবনের জন্য নিম্নে প্রসিদ্ধ হাদীস ব্যাখ্যাকার ইমাম আবু সুলাইমান আল খাত্তাবী রাহ. (৩৮৮ হি.)-এর বক্তব্য তুলে ধরা হলো। তিনি বলেন-

إنما أمر صلى الله عليه وسلم أن يليه ذوو الأحلام والنهى ليعقلوا عنه صلاته، ولكي يخلفوه في الإمامة إن حدث به حدث في صلاته وليرجع إلى قولهم إن أصابه سهو أو عرض في صلاته عارض في نحو ذلك من الأمور.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ গুরুত্বের সাথে আদেশ করেছেন যাতে নামাযের সময় জ্ঞানী ও বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ তার পেছনে দাঁড়ায়। যাতে তারা তার থেকে নামায পরিপূর্ণরূপে বুঝে নিতে পারে। এছাড়াও নামাযে ইমামের কোনো সমস্যা হলে তারা যেন ইমামের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে, অথবা ইমামের কোনো ভুল হয়ে গেলে তাদের থেকে যেন শুধরে নিতে পারে।"[১৩৩]

পূর্বের আলোচনার দ্বারা আশা করি আপনার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়েছেন। পুরো আলোচনার ভিত্তি প্রয়োজনীয় অবস্থার উপর। আর প্রয়োজনে গৃহীত বিধান প্রয়োজনের সাথেই সীমাবদ্ধ থাকে। প্রয়োজন ছাড়া মসজিদে চেয়ার ব্যবহার করার অনুমতি নেই। মসজিদের ইমাম সাহেবগণ মাঝে মাঝে মসজিদে আলোচনা করলে চেয়ারের অপব্যবহার কমে যাবে। একপর্যায়ে বন্ধও হয়ে যাবে, ইনশাআল্লাহ।

চেয়ারে বসে নামায আদায় সম্পর্কে একটি ইশতেহার : কিছু পর্যালোচনা

আপনি ভারতের উলামায়ে তামিলনাড়ুর পক্ষ থেকে প্রকাশিত একটি ইশতেহার পাঠিয়েছেন।

---

[১৩২] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫৩, হাদীস নং ২৪৫৭

[১৩৩] মা'আলিমুস সুনান: ১/১৫৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

আমরা ইশতেহারের দাবি ও দলীল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় আলোচনার পূর্বে বলবো, চেয়ারের অপব্যবহার অবশ্যই দোষণীয়। এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। তবে ইশতেহারের ব্যাপক অর্থবোধক শিরোনাম (کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعا جائز نہیں)-এর সাথে আমরা একমত নই। ইশতেহারের প্রকাশক ভারতের হওয়ায় দারুল উলূম দেওবন্দের দারুল ইফতায় এ ইশতেহার সম্পর্কে তাদের সিদ্ধান্ত তলব করলে তাঁরাও এ শিরোনামের সাথে একমত পোষণ করেননি।

১ম.

ইশতেহারের শিরোনাম দেয়া হয়েছে کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا قطعا جائز نہیں। শিরোনাম থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, এতে ফিকহী বিচক্ষণতার তুলনায় মানসিক জযবা প্রাধান্য পেয়েছে। সর্বস্বীকৃত কথা হলো, শরী'আতে কিছু বিষয় এমন আছে যা কাত'য়ী বা অকাট্যভাবে প্রমাণিত। আর কিছু বিধান রয়েছে যন্নী বা ইজতিহাদী। প্রথম শ্রেণীর ক্ষেত্রে قطعا 'অকাট্য' শব্দ ব্যবহার হতে পারে। এসব বিধান সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট; এতে অন্য ব্যাখ্যার কোনো সুযোগ নেই। পক্ষান্তরে ইজতিহাদী বিষয়ে এ ধরনের শব্দ ব্যবহার ফিকহী দৃষ্টিকোণ থেকে যথাযথ নয়। অথচ চেয়ারে বসে নামায আদায়ের পক্ষে-বিপক্ষে না কোনো অকাট্য ও সুস্পষ্ট আয়াত আছে, না কোনো হাদীস। বরং হাদীস ও শরী'আহ-এর এমন মূলনীতি রয়েছে, যা বৈধ হওয়ার প্রবল দাবি রাখে।

২য়.

ইশতেহারে বলা হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় করা কুরআনের খেলাফ। প্রকৃতপক্ষে ইশতেহারে নামাযে খুশু-খুজু'র তারগীব বিষয়ক উল্লিখিত আয়াত দ্বারা চেয়ারে বসে নামায অকাট্যভাবে নাজায়েয হওয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ, খুশু-খুজু সম্পর্কে দু'টি আয়াত উল্লেখ করে এ কথা বুঝানো হয়েছে যে, চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র খেলাফ। লক্ষণীয় বিষয় হলো, চেয়ারে বসে নামায খুশু-খুজু'র খেলাফ বা চেয়ারে বসে নামায আদায় খুশু-খুজু'র আওতায় আসে না- এ সিদ্ধান্তটি কুরআনের ভাষ্য নাকি তাদের নিজেদের বুঝ ও ইজতিহাদ? নিশ্চিত জবাব হলো, এটি তাদের ইজতিহাদ বা বুঝ।

তাদের ভাষ্য অনুযায়ী যদি চেয়ারে বসে নামায আদায় করার দ্বারা খুশু-খুজু না থাকায় তা নাজায়েয হয়, তাহলে রাসূল ﷺ চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে নফল নামায কীভাবে আদায় করার অনুমতি দিলেন? নিজেও আমল করলেন? প্রয়োজনে ফরয নামায পড়ার প্রমাণ কীভাবে হাদীস, আসার এবং ফুকাহায়ে কেরামের কিতাবে পাওয়া যায়? অথচ চেয়ারে বসা আর ঘোড়ায় বসার মাঝে মৌলিক কোনো পার্থক্য নেই। চতুষ্পদ জন্তুর উপর আরোহন করে নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তারা যে জবাব দিবেন আমরাও তাই বলবো।

৩য়.

ইশতেহারে কিছু হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। যাতে অসুস্থ ব্যক্তির নামাযের বিভিন্ন পর্যায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা দ্বিতীয় সংশয় নিরসনে করা হয়েছে। এখানে মুসলিম শরীফের একটি হাদীস দ্বারা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ-এর কাছে চেয়ার ছিলো। এরপরও তিনি চেয়ারে বসে নামায পড়েননি। এ বিষয়েও পিছনে আলোচনা হয়েছে। এখানে একটি দিক তুলে ধরছি। তাদের আলোচনার ধরন থেকে বোঝা যায়, তারা মনে করেন,

কোনো কিছু ব্যবহারের সুযোগ থাকার পরও রাসূল ﷺ তা ব্যবহার না করা সর্বাবস্থায় তা অবৈধ হওয়ার দলীল। অথচ বিষয়টি এমন নয়। ইমাম আবু ইসহাক শাতেবী রাহ. উসূলে শরী'আতের একজন সর্বস্বীকৃত ইমাম, তিনি রাসূল ﷺ যে কাজগুলো করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ছেড়ে দিয়েছেন তা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। সবগুলোকে এক পর্যায়ের অর্ন্তভুক্ত করেননি। শ্রেণীবিন্যাস করে তিনি বলেন-

وقد يقع الترك لوجوه غير ما تقدم:

ومنها: ترك المباح الصرف إلى ما هو الأفضل؛ فإن القسم لم يكن لازما لأزواجه في حقه، وهو معنى قوله تعالى: ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾[১৩৪] عند جماعة المفسرين، ومع ذلك؛ فترك ما أبيح له إلى القسم الذي هو أخلق بمكارم أخلاقه، وترك الانتصار ممن قال له: اعدل؛ فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، ونهى من أراد قتله، وترك قتل المرأة التي سمت له الشاة، ولم يعاقب عروة بن الحارث إذ أراد الفتك به، وقال: من يمنعك مني؟ الحديث.

"পূর্বোল্লিখিত কারণ ছাড়াও আরো বিভিন্ন কারণে কোনো বৈধ কাজ বর্জন করা হতে পারে। যেমন, মুবাহকে ত্যাগ করে তার চেয়ে উত্তমকে গ্রহণ করা। মুফাসসিরীনদের এক জামাতের বক্তব্য অনুযায়ী ﴿تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ﴾ (এই আয়াত)-এর ভিত্তিতে নবী কারীম ﷺ-এর উপর স্ত্রীদের জন্য সমানভাবে সময় বন্টন আবশ্যক ছিলো না। তার পরও তিনি সময় বন্টন করতেন। তাঁর উন্নত চরিত্রের সাথে মানানসই হিসেবে। তাঁর জন্য সময় বন্টন না করা বৈধ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তা করাকে প্রাধান্য দিয়েছেন...(আরো কিছু উদাহরণ)।"[১৩৫]

এখানে কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করে এ কথা প্রমাণ করা হয়েছে যে, রাসূল ﷺ কোনো কাজ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা কাজটি অবৈধ হওয়ারই দাবি করে না; বরং এক্ষেত্রে অন্য কারণও বিদ্যমান থাকতে পারে। যেমন, উত্তম আখলাক অবলম্বন, আবদিয়্যাত প্রকাশ করা ইত্যাদি।

মোটকথা, যে কাজের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে- একটি উত্তম আরেকটি মুবাহ, রাসূলুল্লাহ ﷺ যদি এর মধ্য হতে উত্তম পদ্ধতিটি গ্রহণ করেন, তাহলে এর দ্বারা মুবাহ পদ্ধতিটি নাজায়েয সাব্যস্ত হবে না। এ নীতিটি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত। যেমন, 'দ্বব' (এক ধরনের প্রাণী) খাওয়া সম্পর্কে রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন, لا آكله ولا أحرّمه[১৩৬]। এতে তিনি না খাওয়ার দিক গ্রহণ করলেও অন্যদের বারণও করেননি। এছাড়া মুবাহ পর্যায়ের অনেক বিধান সুনির্দিষ্টভাবে রাসূল ﷺ বলে যাননি; বরং মৌলিক নির্দেশনা দিয়ে উম্মতের উপর ছেড়ে দিয়েছেন। বিষয়টি ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ.-এর বক্তব্য থেকে সহজেই অনুমেয়। তিনি বলেন-

---

[১৩৪] সূরা আহযাব: ৫১
[১৩৫] আল মুওয়াফাকাত ফী উসূলিশ শারইয়্যাহ: ৪/৩৪৩, দারুল হাদীস, কায়রো
[১৩৬] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৯৪৩

ليس على النبي ﷺ بيان كل شيء مباح، ولا توقيف الناس عليه بنص يذكره.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য প্রত্যেক বৈধ বিষয় বর্ণনা করা বা নির্দিষ্টভাবে মানুষকে তা জানিয়ে দেয়া জরুরী নয়।"[১৩৭]

ইশতেহারে জমিনে নামায পড়ার প্রতি প্রবল তাগিদ বোঝানোর জন্য তিনটি হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম হাদীস আহমদ বুসীরী রাহ.-এর কিতাব 'ইতহাফুল-খিয়ারা' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। বুসীরী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করেছেন 'সুনানে বাইহাকী' থেকে। তিনি বলেন-

رواه البيهقي في سننه من طريق سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر، أن النبي ﷺ عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة، فأخذها فرمى بها، وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به، وقال ﷺ: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء.

"ইমাম বাইহাকী রাহ. স্বীয় সুনানে সুফিয়ান সাওরীর সনদে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গিয়ে তাকে দেখতে পান, একটি বালিশের উপর নামায পড়ছে। তিনি বালিশ সরিয়ে ফেললেন। এবার অসুস্থ সাহাবীটি একটি কাষ্ঠখণ্ড নিলেন। এটাও তিনি সরিয়ে ফেললেন এবং বললেন, যদি পারো জমিনে সিজদা করো, অন্যথায় ইশারায় আদায় করো।"

দ্বিতীয় হাদীসটি দু'একটি শব্দ ছাড়া হুবহু প্রথম হাদীস। যা সরাসরি 'সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন-

عن جابر، أن النبي ﷺ قال لمريض: صل على وسادة، فرمى بها، وقال ﷺ: صل على الأرض إن استطعت، وإلا فأومىء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك.

মূল বক্তব্য আগের বর্ণনার অনুরূপ। তবে এখানে শেষে ইশারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, রুকুর তুলনায় সেজদার সময় মাথা একটু বেশি ঝোঁকাবে।

তৃতীয় হাদীস মূলত হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়া; যা 'সুনানে বাইহাকী' থেকে উল্লেখ করা হয়েছে।

عن جبلة قال: سئل بن عمر وأنا أسمع عن الصلاة على المروحة فقال: لا تتخذ مع الله إلها آخر وقال لا تتخذ لله أندادا صل قاعدا واسجد على الأرض فإن لم تستطع فأوم إيماء وإجعل السجود أخفض من الركوع.

"হযরত জাবালা রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নিজ কানে শুনেছি, হযরত উমর রাযি. -কে (সেজদায় অক্ষম ব্যক্তি) পাখা জানালার খাঁজে মাথা রেখে নামায আদায় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহকে গ্রহণ করো না। কোনো কিছুকে আল্লাহর শরীক বানিয়ো না; বরং বসে বসে নামায আদায় করো এবং জমিনে সেজদা করো। যদি সক্ষম না হও, ইশারা করো। সিজদার সময় মাথা রুকুর চেয়ে একটু বেশি ঝোঁকাবে।"

ইশতেহারে প্রত্যেক হাদীসে চিহ্নিত বাক্যগুলোর অর্থ করা হয়েছে এভাবে-

تکیہ پر نماز ادا کر رہا ہے--- پھر اس نے نماز کے لئے ایک لکڑی کا انتخاب کر لیا، تا کہ اس پر نماز پڑھے--- پنکھے پر نماز پڑھنے کے متعلق سوال کیا گیا۔

---

[১৩৭] আল ফুসূল ফিল উসূল: ১০/২

এভাবে অনুবাদ করার পর লেখা হয়েছে مذکورہ احادیث میں زمین پر پڑھنے کا لفظ جو بار بار آیا ہے غور طلب ہے- এ সকল ইবারত থেকে বোঝা যায় যে, তারা হাদীসের মতলব বুঝেছেন যে, "জনৈক ব্যক্তি বালিশ বা পাখার উপর নামায পড়ছিলো। রাসূল ﷺ এবং ইবনে উমর রাযি. তা করতে বারণ করেছেন এবং জমিনেই নামায পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যথায় ইশারা করে নামায পড়তে বলেছেন।" অথচ এ হাদীসগুলোতে নামায পড়া নয়; বরং সিজদা করা উদ্দেশ্য ছিলো। যেমন, প্রথম হাদীসটি ইমাম আবু ইয়া'লা রাহ.[১৩৮]ও বর্ণনা করেছেন। তাঁর বর্ণনার শব্দ হলো-

عن جابر بن عبد الله قال: «عاد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مريضا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: "إن استطعت أن تسجد على الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع»

"হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ এক অসুস্থ ব্যক্তির যিয়ারতে গেলেন। আমি তাঁর সাথে ছিলাম। তাকে বালিশের উপর সিজদা করতে দেখে তা করতে বারণ করলেন এবং বললেন, যদি সক্ষম হও তাহলে জমিনের উপর সেজদা করো। আর না হয় ইশারায় আদায় করো। সিজদার সময় মাথাকে রুকুর চেয়ে বেশি ঝোঁকাবে।"[১৩৯]
এখানে 'সিজদা' শব্দটি উল্লেখ হওয়া এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বাইহাকীর রেওয়ায়াতে 'সিজদা' শব্দটি উহ্য ছিলো অথবা ওখানে 'সালাত' সিজদার অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।
তৃতীয় হাদীসে 'সালাত' সিজদার অর্থে ব্যবহার হওয়ার বিষয়টি আরো পরিষ্কার। প্রশ্ন-উত্তরের আন্দায থেকেও তা বোঝা যায়। সুতরাং বালিশে সিজদা নিষেধ করা এক বিষয়, আর প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়া অন্য বিষয়। উপরন্তু উঁচু স্থানে সিজদা নিষেধ হওয়ার বিশেষ কারণও আছে, যা চেয়ারে বসার মাঝে বিদ্যমান নেই। হযরত ইবনে উমর রাযি.-এর ফাতওয়ার মাঝে কারণ উল্লেখিত রয়েছে। অর্থাৎ, সিজদার সময় কোনো উঁচু স্থান বা জিনিস থাকলে এর উপর সিজদা করলে এক রকম মূর্তিপুজার সাদৃশ্য হয়ে যায়। এ জন্যই ইবনে উমর রাযি. ফাতওয়ায় শিরকের দিকে ইশারা করেছেন।

৪র্থ.

ইশতেহারে ইজমার দাবিও করা হয়েছে; কিন্তু দলীল বা ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। সুতরাং আমরাও লম্বা আলোচনা করছি না। তবে আমরা তাদের এ দাবি যুক্তিযুক্ত মনে করি না। ইজমা প্রমাণিত না হওয়ার পক্ষে অনেক ফিকহী দলীল ও নযির রয়েছে। এ ছাড়া উসূলে ফিকহের 'ইজমা' অধ্যায় বুঝে পাঠ করলে যেকোনো বিজ্ঞ আলেম উক্ত ইজমার অসারতা সহজেই বুঝতে পারবেন।

---

[১৩৮] আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুছান্না ইবনে ইয়াহইয়া আততামীমী, আলমাওসিলী। তিনি ইমাম আবু ইয়ালা নামে প্রসিদ্ধ। ২১০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩০৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীসশাস্ত্রে তিনি বড় ইমাম ছিলেন। ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন (২৩৩ হি.), ইমাম আলী ইবনুল মাদীনি (২৩৪ হি.), ইমাম আহমদ বিল হাম্বল (২৪১ হি.) প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে তিনি হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হাতেম ইবনে হিব্বান (৩৫৪ হি.), ইমাম সুলায়মান ইবনে আহমাদ আততাবরানী (৮২১ হি.) তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তার রচিত 'মুসনাদে আবু ইয়ালা', 'মু'জামে আবু ই'য়ালা' হাদীসশাস্ত্রে ইলমের বিশাল ভান্ডার। (সিয়ারু আলামিন নুবালা: ১৪/১৮০)

[১৩৯] اتحاف الخيرة المهرة بزوائد العشرة (باب الإيماء) ٢٠٦/٢ رقم الحديث: ١٣٤٨، دار الوطن للنشر.

ফিকহী দলীল উল্লেখ করা হয়েছে তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মুফতিয়ানে কেরামের ভাষ্য বুঝতে খুবই তাড়াহুড়া হয়েছে। ভাসাভাসা দৃষ্টিকে এক্ষেত্রে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কারণ, আল্লামা শামী রাহ.-এর বক্তব্য ও উল্লিখিত ফাতওয়াগুলো গভীর দৃষ্টিতে পড়লেই চেয়ারে বসে নামাযের বৈধতার দিক বের হয়ে আসে।

দারুল উলূম দেওবন্দের মুখপত্র 'মাহনামা দারুল উলূম'-এর ১৪৩৩-১৪৩৪ হি.-এর জিলহজ্জ-মুহার্‌রম সংখ্যায় চেয়ারে বসে নামাযের বিধান সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। এ প্রবন্ধে একাধিক প্রমাণ দ্বারা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায পড়ার বৈধতা প্রমাণ করা হয়েছে। প্রবন্ধটি দেখা যেতে পারে।

এছাড়া দারুল উলূমের ফাতওয়া বিভাগ থেকে একটি আধুনিক মাসাইলের সংকলন প্রকাশ করা হয়েছে ১৪৩৩ হি. মুতাবেক ২০১২ খৃ.। এতে ফাতওয়া বিভাগের মুফতিয়ানে কেরামের সত্যায়ন রয়েছে। সংকলনটি মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপুরী দা. বা.-এর সম্পাদনার পর মজলিসে শুরার অনুমতিক্রমে প্রকাশ করা হয়। এ সংকলনে প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায়ের সুস্পষ্টভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছে। যেমন-

البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھ کر نماز ادا کرنا دشوار ہو جائے تو پھر کرسیوں پر ضرورت کی وجہ سے نماز ادا کی جاسکتی ہے؛ لیکن زمین پر بیٹھ کر رکوع و سجدہ کی قدرت ہونے کی صورت میں کرسی پر اشارے سے نماز ادا کرنا جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر زمین پر کسی بھی ہیئت میں بیٹھنا دشوار ہو، تب کرسی پر نماز ادا کی جاسکتی ہے۔

"তবে যদি জমিনে বসে নামায আদায় করা সর্বাবস্থায় কষ্টকর হয়, তাহলে প্রয়োজনের খাতিরে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু জমিনে বসে রুকু এবং সিজদা করতে সক্ষম হওয়ার পরও চেয়ারে বসে নামায আদায় করা জায়েয নয়। তবে যদি জমিনে বসে নামায আদায় করা সর্বাবস্থায় কষ্টকর হয় তখন চেয়ারে বসে নামায আদায় করা যাবে।"[১৪০]

ইশতেহারে দারুল উলূমের যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে এর শব্দগুলো ভালোভাবে পড়লেই বৈধতার দিকে বের হয়ে আসে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ফাতওয়ার নাম্বার অনুযায়ী কিছু ইবারত উল্লেখ করা হলো-

۲-کرسیوں کے بلا ضرورت استعمال سے صفوں میں بہت خلل ہوتا ہے۔

۳-بلا ضرورت کرسیوں کو مساجد میں لانے سے اغیار کی مشابہت ہوتی ہے۔

۴-بلا ضرورت کرسی پر بیٹھ کر ادا کرنے کے مقابلہ میں زمین پہ انکساری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

"(২) বিনা প্রয়োজনে (মসজিদের মধ্যে নামাযের জন্য) চেয়ার ব্যবহার করার ফলে কাতারের মাঝে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

(৩) বিনা প্রয়োজনে মসজিদে চেয়ার আনার কারণে বিধর্মীদের (উপাসনালয়ের) সাথে সাদৃশ্য সৃষ্টি হয়।

(৪) বিনা প্রয়োজনে চেয়ারে বসে নামায আদায় করার তুলনায় জমিনে বসে নামায আদায়

---

[১৪০] چند اہم عصری مسائل پر دار الافتاء دار العلوم دیوبند سے صادر کئے گئے فتاوی: ۱/ ۱۲۹-۱۳۲

করার দ্বারা (আল্লাহর সামনে) সর্বাধিক নম্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।"

ফাতওয়ার শব্দগুলো অনেকটাই পরিষ্কার। এরপরও এ ফাতওয়াকে চেয়ারে বসে নামায আদায় করা একদম নাজায়েয হওয়ার পক্ষে তারা কীভাবে উল্লেখ করলেন- তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিফায়াতুল মুফতী এবং আহসানুল ফাতাওয়া থেকে যে ফাতওয়া উল্লেখ করা হয়েছে তাতেও বৈধতার ইঙ্গিত রয়েছে। কমপক্ষে বলা যায় অবৈধ হওয়ার পক্ষে পরিষ্কার কোনো কথা নেই।

মোটকথা, আমাদের মনে রাখতে হবে, কোনো বাস্তবতাকে শর'য়ী বিধানের সাথে সমন্বয় করে সঠিক ও যথাযথ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে অনেক ইলমী আয়োজন, উপকরণ ও গবেষণা প্রয়োজন। অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। আর শর'য়ী বিধি-বিধানের ক্ষেত্রে 'শায' বা বিচ্ছিন্ন চিন্তা অবলম্বন করে তা জনসাধারণের মাঝে প্রচার করা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। اللهم اهدنا وسدّدنا

বিনীত

বান্দা আব্দুল্লাহ নাজীব
দারুল উলূম হাটহাজারী, চট্টগ্রাম।
৩ সফর ১৪৩৭ হি. ১৬ নভেম্বর ২০১৫ খৃ.

সত্যায়নে

أصاب فيما أجاب وأجاد فيما أفاد -
العبد الضعيف كفاية الله
٢١/٣/١٤٣٧ه

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ রবিউল আওয়াল ১৪৩৭ হি.

نعم ما أجاد فيما أفاد
نور احمد عفي عنه

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ রবিউল আখের ১৪৩৭ হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ রবিউল আখের ১৪৩৭ হি.

এক শহরে একাধিক জুম‘আ

মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান মোমেনশাহী

জুম‘আ শরী‘আতের অকাট্য বিধান, দ্বীন ইসলামের ‘জাতীয় নিদর্শন’। মুসলিম জাতির সাপ্তাহিক ঈদ। এর বিধানাবলী সম্বন্ধে প্রতিটি মুসলমানের স্বচ্ছ ধারণা থাকা প্রয়োজন। ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। এখানে সংশ্লিষ্ট কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

জুম‘আ সহীহ হওয়ার জন্য শর্তসমূহ

জুম‘আর নামায অন্যান্য নামাযের মত নয় যে, যে কোনো বালেগ ব্যক্তির উপর ফরয হবে বা যে কোনো স্থানে থাকলেই জুম‘আ আদায় করতে হবে। বরং এর রয়েছে বিশেষ স্বকীয়তা। আর স্বকীয়তার দাবিতেই জুম‘আ আদায় হওয়ার জন্য অন্যান্য নামাযের তুলনায় আরো কিছু শর্ত যুক্ত করা হয়েছে। যেমন-

১. শহর বা উপশহর হওয়া। ২. জুম‘আর নামায ও খুতবা যোহরের সময়ে হওয়া। ৩. নামাযের পূর্বে খুতবা হওয়া। ৪. জামা‘আত হওয়া। ৫. ইযনে আম অর্থাৎ যে স্থানে জুম‘আর নামায পড়া হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা ইত্যাদি।

আমরা পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পারলাম যে, জুম‘আর নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য একটি শর্ত হলো- শহর হওয়া। একেবারে গ্রাম-গঞ্জে বা পল্লী এলাকায় জুম‘আ সহীহ হবে না। কারণ হযরত আলী রাযি.[১৪১] থেকে বর্ণিত-

لا جمعة ولا تشريق ولاصلاة فطر ولا أضحى إلا في مصر جامع.[১৪২]

“জুম‘আ, তাকবীরে তাশরীক ও ঈদের নামায শহর-বন্দর ছাড়া ওয়াজিব হয় না।”

মুহাক্কিক ইবনুল হুমাম রহ. হযরত আলী রাযি. এর হাদীস সম্পর্কে বলেছেন-

وكفى بقول علي ﵁ قدوة.

“অনুসরণ ও অনুকরণের জন্য হযরত আলী রাযি. এর কথা যথেষ্ট।”[১৪৩]

রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকেও বুঝা যায় যে, জুম‘আর জন্য শহর

---

[১৪১] আমীরুল মুমিনীন আলী ইবনে আবু তালেব রাযি.। তিনি মুসলিম জাহানের চতুর্থ খলীফা ছিলেন। দারুল খিলাফাহ স্থাপন করেছিলেন কুফায়। এর সুবাদে অনেক সাহাবী কুফায় অবস্থান করেন। ১৮ই রমযান শুক্রবার ৪০ হিজরীতে কুফায় ইন্তেকাল করেন।

[১৪২] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» ١٦٨/١ (بحاشية الهداية) : رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن علي موقوفا. (باب القرى الصغار). قال الزيلعي في «نصب الراية» باب صلاة الجمعة : وأخرجه البيهقي في «المعرفة»عن شعبة عن زبيد اليامي به ، قال : وكذلك رواه الثوري عن زبيد به ، وهذا إنما يروى عن علي موقوفا.

[১৪৩] ফাতহুল কাদীর: ২/৪৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

শর্ত। যেমন ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রহ.[১৪৪] বলেছেন-

وكذا النبي ﷺ كان يقيم الجمعة بالمدينة، وما روي الإقامة حولها، وكذا الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فتحوا البلاد، وما نصبوا المنابر إلا في الأمصار، فكان ذلك إجماعا منهم على أن المصر شرط.

"রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় মদীনায় জুম‘আ কায়েম হতো। তার আশপাশে কোথাও জুমআর নামায কায়েম করার বর্ণনা আসেনি। এভাবে সাহাবায়ে কেরাম রাযি. অনেক শহর জয় করেছেন। তারা শহর ছাড়া অন্য কোথাও মিম্বার স্থাপন করেননি। সুতরাং এটি তাদের এ বিষয়ে ইজমা যে, জুম‘আর জন্য শহর শর্ত।"[১৪৫]

এছাড়াও জুম‘আ দ্বীন-ইসলামের সবচেয়ে বড় একটি প্রতীক-চিহ্ন, যা প্রকাশ্যভাবে উপযুক্ত স্থানে আদায় করা উচিত। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. সহ আরো অনেকে বলেছেন-

ولأن الجمعة من أعظم الشعائر فتختص بمكان إظهار الشعائر وهو المصر.

"জুম‘আ দ্বীন ইসলামের সবচেয়ে বড় একটি প্রতীক-চিহ্ন। তাই শি‘আরে ইসলামের অধিকতর প্রকাশ হয় এমন স্থানের সাথে জুম‘আ খাস হবে। আর তা হলো শহর।"[১৪৬]

উপরের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, জুম‘আর নামায ফরয হওয়ার জন্য শহর হওয়া শর্ত।

শহরের পরিচয়

শহরের সংজ্ঞাদানে ওলামাদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। নির্ভরযোগ্য ও প্রসিদ্ধ মত নিম্নে তুলে ধরা হলো। ইমাম আবু ইউসুফ রাহ.[১৪৭] এর একটি রেওয়ায়েতে আছে-

«...إذا اجتمع في قرية من لا يسعهم مسجد واحد».

"শহর বলা হবে এমন গ্রামকে, যেখানে এত সংখ্যক মানুষ আছে এক মসজিদে যাদের সংকুলান হয় না।"[১৪৮]

আবু আব্দুল্লাহ বালখী রাহ. উক্ত মতটিকে সর্বোত্তম বলে আখ্যা দিয়েছেন।

---

[১৪৪] আবু বকর ইবনে মাসউদ ইবনে আহমদ আল কাসানী আল হানাফী রাহ.। তিনি ৫৮৭ হিজরীর ১০ই রজব রবিবার হালাবে ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত 'বাদায়েউস সানায়ে' ফিকহে হানাফীর রেফারেন্স বুক হিসেবে বরিত। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ১/২৩৫

[১৪৫] বাদায়েউস সানায়ে: ১/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৪৬] বাদায়েউস সানায়ে: ১/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৪৭] ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব আবু ইউসূফ রাহ. তিনি হাফিজুল হাদীস ছিলেন। ইমাম আহমদ ইবনে হম্বল রাহ. বলেন, সর্বপ্রথম আমি কাযী আবু ইউসুফ থেকে হাদীস লিখে এরপর অন্যদের থেকে। ইবনে মাঈন রাহ. বলেন, ما رأيت في أصحاب الرأي أثبت في الحديث ولا أحفظ ولا أصح رواية من أبي يوسف. । তিনি বাগদাদের কাযী (বিচারক) ছিলেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর শাগরেদদের মধ্যে তাঁর অবস্থান সবার শীর্ষে। হানাফী মাযহাবের উপর সর্বপ্রথম তিনিই কিতাব লেখেন এবং প্রচার করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ইলমকে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে দেন। ১৮৩ হিজরীতে খলীফা হারুনুর রশীদের খেলাফতকালে ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যা: ২২৫; ফাযায়েলে আবু হানীফা: ৩০২

[১৪৮] বাদায়েউস সানায়ে: ১/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

أحسن ما قيل فيه إذا كانوا بحال لو اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناء مسجد الجمعة فهذا مصر تقام فيه الجمعة.

"শহরের পরিচয়ে সর্বোত্তম মত হলো কোনো এলাকার লোকসংখ্যা এতো হয় যে, যদি তাদের সর্ববৃহৎ মসজিদে সবাই একত্রিত হয়, মসজিদে তাদের সংকুলান হয় না। এমনকি জুম'আর মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন হয়, তাহলে তাকে শহর বলা হবে এবং সেখানে জুম'আ কায়েম করা হবে।"[১৪৯]

আল্লামা তুমারতাসী রাহ.[১৫০] উক্ত মতের উপর ফাত্ওয়া আখ্যা দিয়ে বলেছেন-

المصر وهو ما لا يسع أكبر مساجده أهله المكلفين بها، وعليه فتوى أكثر الفقهاء.

"শহর এমন আবাদীকে বলা হয়, যেখানের প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ লোকগণ সেখানের সর্ববৃহৎ মসজিদে একত্রিত হলে সকলের সংকুলান হয় না। আর এ কথার উপর অধিকাংশ ফকীহের ফাতওয়া।"[১৫১]

শহরের উল্লিখিত সংজ্ঞায় বড় গ্রামও অন্তর্ভুক্ত। যেমন, সাইয়েদ তাহতাবী রাহ. বলেন-

هذا يصدق على كثير من القرى.

"শহরের সংজ্ঞায় ما لا يسع এর ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রাহ. বলেন, এই সংজ্ঞাটি অনেক গ্রামের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।"[১৫২]

মোটকথা শহর, শহরতলী ও বৃহৎ গ্রামে জুম'আ আদায় করা জায়েয হবে। আর শহরের উল্লিখিত পরিচয় কোনো এলাকায় পাওয়া না গেলে তা ছোট গ্রাম বলে বিবেচিত হবে। সেখানে জুম'আর নামায আদায় করা জায়েয হবে না।

এক শহরে একাধিক জুম'আ

রাসূলুল্লাহ ﷺ জুম'আর নামায পড়া শুরু করেন মদীনায় আসার পর থেকে। তখন সারা মদীনা জুড়ে শুধু মসজিদে নববীতেই জুম'আর নামায হতো। মদীনা ও আশপাশের এলাকা থেকে সবাই গুরুত্বের সাথে অংশগ্রহণ করতো। দ্বিতীয় কোনো জায়গায় জুম'আ হতো না। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রাযি. বর্ণনা করেন-

كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي.

"লোকজন তাদের মনজিল ও আওয়ালী থেকে জুম'আর দিন পালাক্রমে আসতো।"[১৫৩]

---

[১৪৯] বাদায়েউস সানায়েঃ ১/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; কিতাবুল মাবসুত, সারাখসীঃ ২/২৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[১৫০] মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ আল খতীব আল গজ্জী আত তুমারতাশী আল হানাফী রাহ.। তিনি ৯৩৯ হিজরীতে গাজ্জ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০০৪ হিজরীর রজব মাসে ইন্তেকাল করেন। তানবীরুল আবসার, শরহু কানযিদ দাকায়েক, শরহুল মানার ও কিতাবুল উসূল ইত্যাদি তাঁর রচনাবলীর অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরিফীনঃ ২/২৬২

[১৫১] আদ্দুররুল মুখতারঃ ৩/৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৫২] হাশিয়াতুত তাহতাবী আলাদ দুররিল মুখতারঃ ১/৩৩৮, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১৫৩] সহীহ বুখারীঃ ১/১২৩, হাদীস নং ৯০২

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেছেন-

أن النبي ﷺ كان يقيم الجمعة بالمدينة، وما روي الإقامة حولها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় জুম'আ কায়েম করতেন। তার আশপাশে অন্য কোথাও জুম'আ কায়েম করা বর্ণিত হয়নি।"[১৫৪]

কারণও ছিলো, যেহেতু ইসলামের শুরু যুগ, মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও একতা দেখানো একটি অপরিহার্য বিষয় ছিলো। অধিকন্তু রাসূল ﷺ ছিলেন সবার শিক্ষক। বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম দেয়ার প্রয়োজন ছিলো অনেক তীব্র। সাহাবাদের দ্বীনি অনেক বিষয় শিক্ষাগ্রহণ ও অনুশীলন করার প্রয়োজন ছিলো। এসবগুলো সহজে সম্ভব ছিলো সকলের সম্মিলনে। তাই তখন অন্য কোথাও জুম'আর নামায হয়নি।

আল্লামা ইবনে কুদামা রাহ.[১৫৫] বলেন-

ولأن أصحابه كانوا يرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى وشارع الأحكام.

"সাহাবায়ে কেরাম রাসূলুল্লাহ ﷺ এর খুতবা শোনা এবং জুম'আর দিন উপস্থিত হয়ে তার পেছনে নামায আদায় করার কামনা করতেন, যদিও তাদের বাড়ী অনেক দূর হয়। কারণ, রাসূলুল্লাহ ﷺ আল্লাহর পক্ষ থেকে মুবাল্লিগ ও হুকুম-আহকামের বর্ণনাকারী।"[১৫৬]

পরবর্তী খলীফাগণও এই ধারা বহাল রেখেছিলেন। জুম'আর অনুরূপ ঈদের নামাযের বিষয়টি। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যামানাতে ও পরবর্তী খলীফাদের যামানাতেও মদীনায় এক স্থানেই ঈদের নামায আদায় করা হতো। তবে ৪র্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. অবস্থা বিচারে দুই জামা'আতে নামায পড়ার অনুমতি দেন। হযরত আলী রাযি. সবলদেরকে নিয়ে অনতিদূরের নির্দিষ্ট স্থানে নিয়ে ঈদের নামায আদায় করতেন আর দুর্বলরা মদীনায় নামায আদায় করত। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ.[১৫৭] বলেন-

أن عليا ﷺ كان يخلّف رجلا يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد ويخرج هو فيصلي بهم في الجبانة.

"হযরত আলী রাযি. ঈদের দিন মদীনায় দুর্বলদের ঈদের নামায পড়ানোর জন্য একজনকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে নিজে মদীনার বাইরে গিয়ে নির্দিষ্ট স্থানে লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন।"[১৫৮]

---

[১৫৪] বাদায়েউস সানায়ে: ১/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[১৫৫] আবু মুহাম্মদ মুওয়াফ্ফাক উদ্দীন আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা আল মাকদেসী আদ দিমাশকী আল হাম্বলী রাহ.। ইবনে কুদামা নামে প্রসিদ্ধ। ৫৪১ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৬২০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ফিকহ শাস্ত্রের অনেক খেদমত করেছেন। তাঁর রচিত 'আল মুগনী' ফিকহে হাম্বলীর রেফারেন্স বুক হিসেবে স্বীকৃত। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/৪৫৯

[১৫৬] আল মুগনী: ২/১৮৩-১৮৪, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

[১৫৭] আহমদ ইবনে আলী আবু বকর আর রাযী আল জাসসাস। ৩০৫ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৭০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি হানাফী মাযহাবের অনেক বড় ইমাম ছিলেন। তার রচিত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হলো আহকামুল কুরআন, শরহু মুখতাসারিত তাহাবী, শরহু জামে মুহাম্মদ। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যাঃ ২৭-২৮

[১৫৮] শরহু মুখতাসারিত তাহাবীঃ ২/১৩৪, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

হযরত আলী রাযি. এর দুই জায়গায় ঈদের নামায পড়ার অনুমতি থেকে বুঝা যায় যে, পূর্বে ঈদের নামায এক জায়গায় হওয়াটা কোনো স্থিরীকৃত হুকুম ছিল না। বরং সাময়িক প্রয়োজনে ছিলো যার কিছু আলোচনা আমরা ইতিপূর্বে করে এসেছি। একই সাথে এটাও অনুমেয় যে, প্রয়োজনে একাধিক স্থানে আদায় করা যাবে।

বর্তমানে শহর বড় হওয়ায় সবাই একত্রে এক স্থানে নামায আদায় করা বা পুরো শহরের মানুষ একত্রিত হওয়া অনেকটা কষ্টসাধ্য এবং অনিরাপদও বটে। মোটকথা, আলী রাযি. প্রয়োজনে এক শহরে ঈদের নামায দুই স্থানে আদায় করার অনুমতি দিয়েছেন। আর বিভিন্ন দিক থেকে ঈদের নামাযের সাথে জুম‘আর নামাযের সামঞ্জস্যতা থাকায় ইমাম মুহাম্মদ রাহ.[১৫৯] বলেছেন, প্রয়োজনে একই শহরে একাধিক স্থানে জুম‘আও আদায় করা যেতে পারে। ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. বলেন-

والأول هو قول محمد شبهه بصلاة العيدين في المسجد والجبانة.

"প্রথমটি (একাধিক স্থানে জুম‘আ বৈধ হওয়া) ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মত। তিনি জুম‘আর নামায একাধিক স্থানে আদায় করার বিষয়টি তুলনা করেছেন আলী রাযি. এর যুগে ঈদের নামায মসজিদে ও খোলা মাঠে আদায় করার সাথে।"[১৬০]

ইমাম তাহাবী রাহ.[১৬১] উক্ত মতটি উল্লেখ করে বলেন, এ মতানুযায়ী আমাদের আমল হবে।

لا بأس بأن يجمع الإمام بالناس في المصر في مسجدين، ولا يجمع فيما هو أكثر من ذلك، هكذا روي عن محمد بن الحسن وبه نأخذ.

"এক শহরে দুই মসজিদে জুম‘আ আদায় করতে বাধা নেই। (প্রয়োজন ছাড়া) দুয়ের বেশি স্থানে আদায় করা যাবে না এমনটি ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত। আর আমাদের আমল এ মতানুসারেই হবে।"[১৬২]

ইমাম বুরহানুদ্দীন ইবনে মাজাহ রাহ. উল্লেখ করেন-

---

[১৫৯] মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ওয়াকিদ আবু আব্দুল্লাহ আশ্ শায়বানী রাহ.। তিনি মিসআর ইবনে কিদাম, ইমাম মালেক, ইমাম আওযায়ী, সুফয়ান সাওরী প্রমুখ মুহাদ্দিস থেকে ইলমে হাদীস শিক্ষা করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে ইলমে ফিকহ অর্জন করেন। তিনি কুরআন সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি ইলম অর্জন করেন। এ ছাড়া আরবী ভাষা, ইলমে নাহু এবং ইলমে হিসাবেও তাঁর অসামান্য দক্ষতা ছিল। ইমাম শাফে‘য়ী রাহ. বলেছেন, ما رأيت أعلم بكتاب الله عز وجل من محمد بن الحسن، كأنه نزل عليه. ولقد كتبت عنه حمل جمل। ইমাম শাফে‘য়ী ও ইবনে মাঈন তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমাম দারাকুতনী রাহ. তাঁকে সিকাহ (নির্ভরযোগ্য) মুহাদ্দিসদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি বহুগ্রন্থ রচনা করে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ইলম প্রচার করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো আল মাবসূত, আল জামেউস সগীর, আল জামেউল কাবীর, আস সিয়ারুল কাবীর, আস সিয়ারুস সগীর, কিতাবুল আছার, মুআত্তা মুহাম্মদ ইত্যাদি। ১৮৭ হিজরীতে তিনি ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়িদুল বাহিয়্যাঃ ১৬৩; আল জাওয়াহিরুল মুযিয়্যাঃ ২/৪৪; ফাযায়েলে আবু হানীফাঃ ৩৫, মানাকিবু আবী হানীফা

[১৬০] শরহু মুখতাসারিত তাহাবীঃ ১/২৩৪, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১৬১] আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আবু জা‘ফর তাহাবী আল আযদী রাহ.। তিনি হানাফী মাযহাবের অনেক বড় ইমাম ও হাফিযুল হাদীস ছিলেন। ২২৯ বা ২৩০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩২১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হলো শরহু মা‘আনিল আছার, মুশকিলুল আছার, আল মুখতাছার ইত্যাদি। -আল ফাওয়াইদুল বাহিয়্যা ৩১-৩২

[১৬২] মুখতাসারুত তাহাবীঃ ৩৫, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান।

ولا بأس بالجمعة في موضعين أو ثلاثة من مصر واحد عند محمد.

“ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর নিকট এক শহরে দুই বা ততোধিক স্থানে জুম‘আ আদায় করা যেতে পারে।”[১৬৩]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

عن محمد يجوز ... ورواه عن أبي حنيفة رحمه الله، ولهذا قال السرخسي رحمه الله الصحيح من مذهب أبي حنيفة جواز إقامتها في مصر واحد في مسجدين فأكثر، وبه نأخذ لإطلاق لا جمعة إلا في مصر.

“ইমাম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণিত, একাধিক জুম‘আ জায়েয আছে। যা ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে রেওয়ায়েত করেছেন। সেজন্যই তো ইমাম সারাখসী রাহ. বলেছেন ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর বিশুদ্ধ মাযহাব হলো একই শহরে একাধিক জুম‘আ জায়েয আছে। আমরা এ মতই গ্রহণ করবো। কেননা হযরত আলী রাযি. এর বাণী لا جمعة إلا في مصر শর্তহীনভাবে (এক বা একাধিক স্থানের বর্ণিত শর্ত নেই) হয়েছে।”[১৬৪]

আল্লামা হাসকাফী রাহ. বলেন-

تودي في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقا على المذهب وعليه الفتوى... دفعا للحرج.

وفي الفتاوى الشامية تحت قوله: (دفعا للحرج) لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجا بينا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين، ولم يوجد دليل عدم جواز التعدد، بل قضية الضرورة عدم اشتراط لا سيما إذا كان مصرا كبيرا كمصرنا كما قاله الكمال.

“মাযহাব ও ফাত্ওয়া অনুসারে মানুষের কষ্ট দূর করণার্থে (শহর ছোট বা বড় হওয়া ইত্যাদির শর্ত ছাড়াই) এক শহরে একাধিক জুম‘আ জায়েয আছে।”

“আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. دفعا للحرج এর ব্যাখ্যায় বলেন, সকলকে এক স্থানে একত্র হওয়ার আবশ্যিক শর্তারোপ করলে মানুষের কষ্ট ও সমস্যা হবে যা কাম্য নয়। কারণ অধিকাংশ লোকদের দূর-দুরান্ত থেকে জুম‘আর নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে একত্র হতে হবে। অথচ একাধিক স্থানে জুম‘আ আদায় অবৈধ হওয়ার কোনো দলীল বিদ্যমান নেই এবং জরুরত ও হাজতের চাহিদা হলো বিনা শর্তেই একাধিক জুম‘আ জায়েয হওয়া। বিশেষতঃ যখন বড় শহর হবে।”[১৬৫]

এক শহরে একাধিক জুম‘আর অনুমতি জরুরতের সাথে সম্পৃক্ত, প্রয়োজন হলে আদায় করা যাবে অন্যথায় অনুমতি নেই। এটাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ফুকাহার মত।

---

[১৬৩] আল মুহীতুল বুরহানী: ২/১৭৫, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন; দ্রষ্টব্য- শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/১৩৫, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১৬৪] ফাতহুল কাদীর: ২/২৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১৬৫] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/১৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
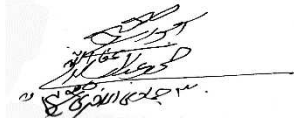
ইমাম ইবনে কুদামা রাহ. বলেন-

فأما مع عدم الحاجة فلا يجوز في أكثر من واحد، وإن حصل الغنى باثنين لم تجز الثالثة، وكذلك ما زاد لا نعلم في هذا مخالفا إلا أن عطاء قيل له إن أهل البصرة لا يسعهم المسجد الأكبر، قال: لكل قوم مسجد يجمعون فيه، ويجزى ذلك من التجميع في المسجد الأكبر، وما عليه الجمهور أولى إذ لم ينقل عن النبي ﷺ وخلفائه أنهم جمعوا أكثر من جمعة إذ لم تدع الحاجة إلى ذلك.
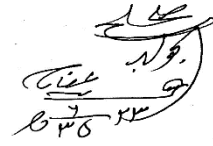
"আর প্রয়োজন না থাকলে একাধিক স্থানে জুম'আর নামায পড়া জায়েয হবে না। দুই স্থানে পড়ার দ্বারা প্রয়োজন পুরা হলে তৃতীয় স্থানে পড়া জায়েয হবে না। এভাবেই বাকিগুলোর হুকুম হবে। আর এক্ষেত্রে আমাদের জানা মতে দ্বিমত পোষণকারী নেই। শুধু আতা রাহ.[১৬৬] ছাড়া। ... আর সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহের মতই অগ্রগণ্য ও উত্তম। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খুলাফায়ে রাশেদীন থেকে একাধিক স্থানে জুম'আ আদায় করার কথা বর্ণিত নেই। কারণ তখন প্রয়োজন ছিলো না।"[১৬৭]

তাই মনে রাখতে হবে যে, একাধিক স্থানে জুম'আ আদায় করার বৈধতার অর্থ এই নয় যে, যেখানে ইচ্ছা সেখানেই জুম'আর নামায আদায় করা যাবে। বরং একাধিক স্থানে জুম'আর নামাযের অনুমতি দেয়া হয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। তাই তা প্রয়োজনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[১৬৬] আবু মুহাম্মদ আতা ইবনে আবী রবাহ রাহ.। তিনি ইবনে আবক্কাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী রাযি. প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর উস্তায। তিনি ১১৫ হিজরীতে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬১১

[১৬৭] আল মুগনী: ২/১৮৫-১৮৬, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

জেলখানা ও সংরক্ষিত এলাকায় জুম'আর নামায

মাওলানা মাহমুদুল হাসান নোয়াখালী

জেলখানা ও সংরক্ষিত এলাকায় জুম'আর নামায জায়েয হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ফকীহগণের কিতাবে সুস্পষ্ট কোনো বর্ণনা উল্লেখ নেই। ফলে এ বিষয়ে সমকালীন ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। কারণ, হানাফী মাযহাবের ফুকাহায়ে কেরাম জুম'আর নামায সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মাঝে 'ইযনে আম' তথা সর্বসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতিকেও শর্ত উল্লেখ করেছেন। যেহেতু জেলখানায় সর্বসাধারণের প্রবেশের অনুমতি থাকে না তাই সাধারণ দৃষ্টিতে মনে হয়, জেলখানায় জুম'আর নামায জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে মনে হয়, এ ধরনের অন্যান্য সংরক্ষিত এলাকার একই হুকুম। যেমন, বিমানবন্দর, সেনানিবাস, বড় কারখানা বা সর্বসাধারণের যাতায়াত নিষিদ্ধ সংরক্ষিত এলাকা ইত্যাদি ।

এখন আমাদের জানা প্রয়োজন, ফকীহগণ সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির যে শর্ত উল্লেখ করেছেন তা কোনো পর্যায়ের এবং তার উদ্দেশ্য কী?

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

قلت: وينبغي أن يكون محل النزاع ما إذا كانت لا تقام إلا في محل واحد أما لو تعددت فلا، لأنه لايتحقق التفويت كما أفاده التعليل تأمل.

"আল্লামা শামী রাহ. এর বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, জুম'আ জায়েয হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি ঐ সময় প্রযোজ্য যখন এক শহরে শুধুমাত্র এক জায়গায় জুম'আ হয়। আর এখন যেহেতু এক শহরে অনেক জায়গায় জুম'আ কায়েম হয়, তাই এখন সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতি থাকার প্রয়োজন নেই। কেননা, সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি রাখা হয়েছে যেন কোনো ব্যক্তি জুম'আ থেকে বঞ্চিত না হয়, আর যেহেতু সম্প্রতি সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতি না থাকলেও কারো জুম'আর নামায থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা নেই, তাই এখন সর্বসাধারণের জন্য ব্যাপক অনুমতি শর্তটিও প্রয়োজন নেই।"[১৬৮]

কিন্তু উপরোক্ত ভাষ্যের উপর এ প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, যদি সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি কাউকে জুম'আ থেকে বঞ্চিত না করার জন্যই হয়, তাহলে যে শহরে একাধিক জুম'আ হয় সেখানে যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে জুম'আর নামাযের জামা'আত করে তাহলে তা বৈধ হওয়ার কথা, অথচ তা বৈধ নয়। এছাড়াও যখন থেকে এক শহরে একাধিক জুম'আর প্রচলন শুরু হয়েছে, তখন থেকে ফকীহগণের জন্য তাদের কিতাবসমূহ থেকে সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি বাদ দিয়ে দেয়া উচিত ছিল। অথবা বাদ না দিলেও পাশাপাশি এ কথাও লিখে দেয়া উচিত ছিল যে, বর্তমানে এ

[১৬৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১৫২, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

শর্তের উপর আমল করা ওয়াজিব নয়। অথচ ফকীহগণ একাধিক জুম‘আ হওয়া সত্ত্বেও তাদের কিতাবে সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি উল্লেখ করেছেন এবং পাশে ভিন্ন কোনো মত প্রকাশ করেননি?

উত্থাপিত প্রশ্ন যুক্তিসংগত, কিন্তু ফিক্হের কিতাবাদি অধ্যয়নে প্রতীয়মান হয় যে,"ইযনে আম" তথা সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি নাদিরুর রেওয়ায়েত (হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবের বর্ণনায়) পাওয়া যায়, কিন্তু যাহিরুর রেওয়ায়েত (হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাবে) পাওয়া যায় না। যেমন ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. উল্লেখ করেছেন-

وذكر في النوادر شرطا آخر لم يذكره في ظاهر الرواية وهو أداء الجمعة بطريق الاشتهار

"নাদেরুর রেওয়ায়েত (হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবের বর্ণনায়) অন্য একটি শর্ত উল্লেখ করা হয়েছে, যা যাহেরুর রেওয়ায়েতে উল্লেখ নেই। তা হলো জুম‘আ আদায় শুদ্ধ হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের যাতায়াতের ব্যাপক অনুমতি থাকা।"[১৬৯]

ফলে দেখা যায় হেদায়া গ্রন্থকার ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ.ও সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি উল্লেখ করেননি।[১৭০]

এছাড়া আল্লামা সুগদী[১৭১] রাহ.ও নিজ কিতাব 'আন-নুতাফ ফিল ফাতাওয়ায়' জুম‘আর জন্য সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি উল্লেখ করেননি । যেমন উল্লেখ হয়েছে-

وأما صلاة الجمعة فإنها لا تجوز إلا خمسة شرائط، أحدها: المصر الجامع، والثاني: أمر السلطان، والثالث: الوقت، والرابع: القوم، والخامس: الخطبة.

"জুম‘আর নামায জায়েযের জন্য পাঁচটি শর্ত। ১. শহর হওয়া। ২. বাদশাহর অনুমতি থাকা। ৩. সময় হওয়া। ৪. জামা‘আত হওয়া। ৫. খুতবা দেয়া।"[১৭২]

আবার দেখা যায়, নাদেরুর রেওয়ায়েত (হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ছয় কিতাব ব্যতীত অন্য কিতাবের) বর্ণনা অনুযায়ী অনেক ফুকাহায়ে কেরাম তাদের কিতাবে জুম‘আ জায়েযের জন্য সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতির শর্তটি উল্লেখ করেছেন, কিন্তু এর মর্মার্থের ক্ষেত্রে ফকীহগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে।

কেউ কেউ 'ইযনে আমের' মর্মার্থ এরূপ বর্ণনা করেছেন যে, প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার উপর জুম‘আ ফরয, জুম‘আ আদায়ের স্থানে তাদের আসার অনুমতি অবশ্যই থাকতে হবে।

এ সম্পর্কে আল্লামা শামী রাহ. একটি রেওয়ায়াত নকল করেছেন। তা হলো-

---

[১৬৯] বাদায়েউস সানায়ে: ২/২১৭, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

[১৭০] হেদায়া: ১/১৭০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[১৭১] রুকনুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইবনে হুসাইন আস সুগদী রাহ.। শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. তাঁর অন্যতম উস্তায ছিলেন। আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া ও শরহুল জামি‘য়ল কাবীর তাঁর অন্যতম রচনা। তিনি ৪৬১ হিজরী সনে বুখারায় ইন্তেকাল করেন। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা: ১২১

[১৭২] আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া: ৬১, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

الإذن العام: أي أن يأذن للناس إذنا عاما بأن لا يمنع أحدا ممن تصح منه الجمعة عن دخول الموضع الذي تصلي، وهذا مراد من فسر الإذن العام بالاشتهار.

অপর দিকে কোনো কোনো ফকীহ 'ইযনে আমের' মর্মার্থ বর্ণনা করেছেন, যে এলাকায় জুম'আর নামায আদায় করা হচ্ছে ঐ এলাকার লোকদের সেখানে আসার পুরোপুরি অনুমতি থাকতে হবে। বাহিরের লোকদের আসার অনুমতি না থাকলেও কোনো সমস্যা নেই।[১৭৩]

যেমন আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة، لأن الإذن العام مقرر لإهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي. نعم لو لم يغلق لكان أحسن.

"দুর্গ বা সংরক্ষিত এলাকায় অবস্থানরত লোকেরা যদি তথায় নামায আদায়ের অনুমতিপ্রাপ্ত হয়, আর প্রাচীন রীতির ভিত্তিতে কিংবা দুশমনের আশঙ্কায় দুর্গের গেইট বন্ধ রাখা হয় তা ব্যাপক অনুমতি শর্তটির পরিপন্থী হবে না। কারণ এটি কেবল নিরাপত্তাজনিত কারণে, মুসল্লীদেরকে বাধাগ্রস্ত করার জন্য নয়। তবুও যদি বন্ধ না করা হতো, তা উত্তম হতো"[১৭৪]

এছাড়াও আল্লামা শুরুমবুলালী রহ.[১৭৫] উল্লেখ করেছেন-

قلت اطلعت على رسالة للعلامة ابن الشحنة، وقد قال فيها بعدم صحة الجمعة في قلعة القاهرة، لأنها تقفل وقت صلاة الجمعة وليست مصرا على حدتها. وأقول: في المنع نظر ظاهر، لأن وجه القول بعدم صحة صلاة الإمام بقفله قصره اختصاصه بها دون العامة والعلة مفقودة في هذه القضية فإن القلعة وإن قفلت لم يختص الحاكم فيها بالجمعة، لأن عند باب القلعة عدة جوامع في كل منها خطبة، لا يفوت من منع من دخول القلعة الجمعة، بل لو بقيت القلعة مفتوحة لا يرغب في طلوعها للجمعة لوجودها فيما هو أسهل من التكلف بالصعود لها، وفي كل محلة من المصر عدة من الخطب، فلا وجه لمنع صحة الجمعة بالقلعة عند قفلها.

"একাধিক জুম'আর ক্ষেত্রে "ইযনে আমের" ব্যাপক অর্থ নেয়ার প্রয়োজন নেই। যার ফলে প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যার উপর জুম'আর নামায ফরয তার সেখানে আসার অনুমতি থাকতে হবে। বরং কোনো জনবসতি যদি এমন হয় যেখানে বসবাসকারীদের একটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যা রয়েছে এবং ঐ জনবসতির সব লোকের সেখানে জুম'আর নামায আদায়ের অনুমতি থাকে। তাহলে এতটুকু অনুমতি 'ইযনে আমের' মর্মার্থের জন্য যথেষ্ট বলে বিবেচিত হবে। অবশ্যই উক্ত জনবসতির বাইরের লোকদেরকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি না দেয়াটা নামায

[১৭৩] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১৫১, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

[১৭৪] আদ্দুররুল মুখতার: ২/১৫২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; দ্রষ্টব্য, মাজমা'উল আনহুর: ১/২৪৬

[১৭৫] আবু ইখলাস হাসান ইবনে আম্মার ইবনে ইউসুফ আল মিসরী আশ শুরুম্বুলালী রাহ.। তিনি ৯৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৬৯ হিজরীতে মিসরে ইন্তেকাল করেন। হানাফী ফিকহের উপর তাঁর অনেক রচনা রয়েছে। তার মধ্যে মারাকিল ফালাহ ও আত তাহকীকাতুল কুদসিয়া ওয়ান নাফাহাতুর রহমানিয়া (যা সাতটি রিসালার সমষ্টি) অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ১/২৯২

থেকে বাঁধা দেয়ার উদ্দেশ্যে না হতে হবে। বরং ঐ নিষেধাজ্ঞা হবে নিরাপত্তার কারণে কিংবা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ইত্যাদি রক্ষার্থে।"[১৭৬]

উপরোক্ত ভাষ্য থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ইযনে আমের শর্তটি হানাফী ফকীহদের থেকে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, বরং তার মর্মার্থ এই দাঁড়ায় যে, যদি সংরক্ষিত এলাকায় জুম'আর নামায হয় আর সে সংরক্ষিত এলাকার মানুষদেরকে সেখানে আসার অনুমতি দেয়া হয় এবং বাইরের লোকদেরকে নিরাপত্তার কারণে কিংবা প্রশাসনিক শৃঙ্খলা ঠিক রাখার জন্য বাধা দেয়া হয় তাহলে তা 'ইযনে আমের' পরিপন্থী হবে না। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে যে, সংরক্ষিত এলাকার নিয়ম-শৃঙ্খলা বহাল রাখতে গিয়ে সে এলাকার বাইরের লোকেরা যেন নামায থেকে বঞ্চিত না হয়।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

ফুকাহায়ে কেরাম জেলখানার কয়েদীদের ব্যাপারে একটি মাসআলা উল্লেখ করেছেন, জুম'আর দিন জেলখানার লোকদের জন্য যোহরের জামা'আত করা মাকরূহ। যেমন ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াতে উল্লেখ রয়েছে-

ومن لا تجب عليهم الجمعة من أهل القرى والبوادي، لهم أن يصلوا الظهر بجماعة يوم الجمعة بأذان وإقامة، والمسافرون إذا حضروا يوم الجمعة في مصر يصلون فرادى، وكذلك أهل المصر إذا فاتتهم الجمعة وأهل السجن والمرض، ويكره لهم الجماعة.

"যে গ্রামের অধিবাসী ও বেদুঈনদের উপর জুম'আ আবশ্যক নয় তারা জুম'আর দিন আযান ও ইকামত দিয়ে জামা'আতের সাথে যোহরের নামায আদায় করতে পারবে। পক্ষান্তরে মুসাফির ব্যক্তিরা জুম'আর দিন শহরে উপস্থিত হলে ভিন্ন ভিন্নভাবে যোহরের নামায আদায় করবে। (যোহরের নামাযের জামা'আত করতে পারবে না।) অনুরূপ শহরবাসী জুম'আর নামায না পেলে এবং জেলখানার আসামী ও অসুস্থ ব্যক্তি একাকী যোহরের নামায আদায় করবে। তাদের জন্য যোহরের জামা'আত করা মাকরূহ।"[১৭৭]

অনুরূপ হেদায়া, নাওয়াযেল- এ উল্লেখ রয়েছে।

এ মাসআলা থেকে একটি প্রশ্ন সৃষ্টি হয়। তা হলো, জেলখানার বন্দীদের জন্য জুম'আ পড়া জায়েয নেই।

উত্তর: ১. এর জবাবে আল্লামা শুরুমবুলালী রাহ. এর উপরোল্লিখিত 'ইযনে আমের' ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যায়, এটা ঐ সময়ের কথা যখন জুম'আ বাদশাহর অনুমতিক্রমে শুধু এক জায়গায় অনুষ্ঠিত হতো আর কোনো জায়গায় জুম'আ হতো না।

২. জেলখানা কয়েক ধরনের হতে পারে। তন্মধ্যে এটাও হওয়া সম্ভব যে, জেলখানা তৎকালীন একটি ঘর বা একটা সংকীর্ণ জায়গা ছিলো, যাকে একটি এলাকা বলা যায় না। কিন্তু বর্তমানে জেলখানা বিরাট এলাকা জুড়ে হয়ে থাকে।

---
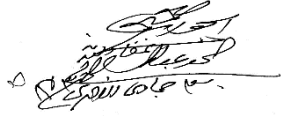
[১৭৬] মারাকীল ফালাহ: ৫১০, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[১৭৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/২০৫, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
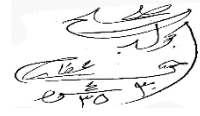
সারকথা

যদি কোনো শহরে বাদশাহর অনুমতিক্রমে শুধু এক জায়গায় জুম‘আ হয়, তখন জুম‘আ বৈধ হওয়ার জন্য সর্বসাধারণের ব্যাপক অনুমতি থাকতে হবে। অর্থাৎ যার উপর জুম‘আ ওয়াজিব তার জন্য যে জায়গায় প্রবেশের কোনোরূপ বাধা না থাকতে হবে, অন্যথায় সেখানে জুম‘আ জায়েয হবে না। এমনিভাবে যদি কোনো ব্যক্তি নিজ ঘরে বা দোকানে জুম‘আ আদায় করতে চায়, তাহলে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকতে হবে। অন্যথায় এই জুম‘আও জায়েয হবে না। কোন সংরক্ষিত এলাকায় যদি অনেক মানুষ বসবাস করে আর সেটা শহরের ভেতরে হয় এবং অন্যান্য জায়গায়ও জুম‘আ হয়, তবে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে বা নিরাপত্তার কারণে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি না থাকে, কিন্তু সেখানে বসবাসকারী মানুষের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি থাকে, তাহলে সে সমস্ত জায়গায় জুম‘আ জায়েয হবে। যেমন বড় জেলখানা, বিমানবন্দর, সেনানিবাস ও বড় ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।
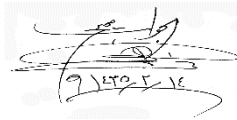
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ রবিউস সানী ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৪ সফর ১৪৩৫হি.

গায়েবানা জানাযার শর'য়ী বিধান

আবুল বাশার সোহেল সিরাজী

গায়েবানা জানাযা হলো, দাফনের আগে বা পরে এমন মাইয়িতের জানাযার নামায আদায় করা, যে মাইয়িত সামনে উপস্থিত নেই। সম্প্রতি এ জাতীয় জানাযার প্রবণতা দিন দিন বেড়ে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির রূপ নিয়ে দেশ-বিদেশের অনেক স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অনেককেই অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। তাই এ বিষয়ে শর'য়ী সমাধান সবিস্তারে আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। অতএব, শরী'আতের দলীলসমূহের আলোকে গায়েবানা জানাযার বিধান এখানে তুলে ধরা হলো-

মূল আলোচনার পূর্বে জানাযার গুরুত্ব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযার নামায আদায়ের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। জানাযার নামাযের গুরুত্ব একটি স্বতঃসিদ্ধ বা সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

سمعت رسول الله ﷺ يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.

"প্রত্যেক মুসলমানের উপরে অপর মুসলমানের পাঁচটি হক বা অধিকার রয়েছে। ১. সালামের উত্তর দেয়া। ২. অসুস্থ ব্যক্তির সেবা করা। ৩. জানাযা আদায় করা। ৪. দাওয়াত গ্রহণ করা। ৫. হাঁচির জবাব দেয়া।"[১৭৮]

এছাড়া আরো অনেক হাদীস রয়েছে যা থেকে জানাযার গুরুত্বের বিষয়টি স্পষ্ট বুঝে আসে। শুধু তাই নয় বরং রাসূল ﷺ নিজেও জানাযার নামায পড়ার প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব দিতেন। সাহাবাদের জানাযার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ অধিক আগ্রহী হওয়ার বিষয়টি হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর একটি বর্ণনা থেকে ফুটে উঠে-

أن رجلا أسود أو امرأة سوداء كان يقم المسجد، فمات فسأل النبي ﷺ عنه، فقالوا: مات، قال: أفلا كنتم أذنتموني به دلوني على قبره أو قال: قبرها، فأتى قبرها فصلى عليها.

"একজন কালো ব্যক্তি বা মহিলা মসজিদ পরিষ্কার করত, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ (তাকে দেখতে না পেয়ে) সাহাবায়ে কেরামকে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তাঁরা বললেন, সে মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বললেন, তোমরা কি তার ব্যাপারে আমাকে অবগত করবে না? আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও অথবা তিনি বললেন, আমাকে সে মহিলার কবর দেখিয়ে দাও। এরপর কবরের নিকট এসে জানাযার নামায পড়েন।"[১৭৯]

এছাড়াও ইবনে উবাই মুনাফেক হওয়া সত্ত্বেও তার জানাযার নামায পড়ার প্রতি আগ্রহী হওয়া থেকেও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর অন্তরে জানাযার নামায ও মাইয়িতের জন্য দু'আর

[১৭৮] সহীহ বুখারী: ১/১৬৬
[১৭৯] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৪৫৮

গুরুত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জানাযার সার্বক্ষণিক পদ্ধতি কী ছিল? রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পুরা জীবনী তালাশ করলে দেখা যায় যে, যতগুলো জানাযার নামায তিনি পড়িয়েছেন সবগুলোতে মাইয়িতকে সামনে রেখেই পড়িয়েছেন (হ্যাঁ, বাদশাহ নাজাশীর জানাযা গায়েবানা ছিলো বলে যে দাবি করা হয়ে থাকে তার বিস্তারিত বিশ্লেষণ সামনে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ)। এমনকি মাইয়িতের কোনো অংশ বরাবর রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়াতেন এবং একাধিক মাইয়িত হলে কোনো তারতীবে রাখা হতো তাও সাহাবায়ে কেরাম সযত্নে বর্ণনা করেছেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবাদের এ সকল পদ্ধতি থেকে সহজেই প্রমাণিত হয় যে, মাইয়িতের উপস্থিতিতে জানাযা পড়াই সুন্নাহ বা রাসূলের তরীকা।

তাই তো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যুগে অনেক সাহাবা দূর-দূরান্তে ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু জানাযার অত্যাধিক গুরুত্ব এবং একান্ত হক হওয়া সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ ﷺ কোনো সাহাবীর গায়েবানা জানাযা পড়েননি। ইমাম কামাল উদ্দীন ইবনুল হুমাম হানাফী রাহ. বলেন-

أنه قد توفي خلق منهم ﷺ غيبا فى الأسفار كأرض الحبشة والغزوات، ومن أعزالناس عليه كان القراء ، ولم يؤثر قط عنه بأنه ﷺ صلى عليهم. وكان على الصلاة على كل من توفي من أصحابه حريصا حتى قال: لا يموتن أحد منكم إلا آذنتمونى به. فإن صلاتي عليه رحمة له.

"সাহাবাদের অনেকে যাঁরা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে দূরবর্তী কোনো সফরে যেমন হাবশা এবং বিভিন্ন জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করেছেন। বিশেষ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কুরআন শিক্ষাদানকারী প্রাণপ্রিয় সাহাবা যাঁরা (বীরে মা'উনার সফরে) শাহাদাত বরণ করেছেন (যাঁদের জন্য মাসব্যাপী কুনূতে নাযেলা পড়েছেন,) তাঁদের জন্য নবীজীর জানাযা পড়ার প্রমাণ নেই। অথচ তিনি স্বীয় সাহাবাদের জানাযা পড়ার প্রতি অতি আগ্রহী ছিলেন। এমনকি তিনি এ নির্দেশও দিয়েছিলেন যে, তোমাদের কেউ যদি মৃত্যুবরণ করে তাহলে অবশ্যই আমাকে অবহিত করবে (যেন আমি তার জানাযা পড়িয়ে দিই)। কেননা, আমার নামায তার জন্য রহমত স্বরূপ।"[১৮০]

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর পরলোক গমনের সময় তাঁর নিবেদিতপ্রাণ অনেক সাহাবা যাঁরা মদীনায় উপস্থিত হয়ে জানাযায় শরীক হতে পারেননি। তাদের কোনো একজনও দূরে থেকে নবীজীর গায়েবানা জানাযা পড়েননি। যদি বিষয়টি শরী'আতসম্মত হত, তাহলে একজন সাহাবীও প্রাণাধিক প্রিয় এই মহামানব ও মহান রাসূলের জানাযা থেকে বঞ্চিত থাকতেন না। যেমনটি আল্লামা ইল্লীশ রাহ. 'মুখতাসারুল খলীল' এর ব্যাখ্যাগ্রন্থে উল্লেখ করেছেন-

صلاته ﷺ بالمدينة على النجاشي يوم موته بأرض الحبشة من خصوصياته ﷺ، بدليل عدم صلاة أمته عليه ﷺ وفيها أعظم الرغبة.

"মদীনায় নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বৈশিষ্ট্য ছিল।

---

[১৮০] ফাতহুল কাদীর: ২/১২১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

কেননা, উম্মত রাসূলের জানাযা আদায় করার প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেনি।"[১৮১]

শুধু তাই নয় বরং অনুসরণীয় সোনালী তিন যুগ, বিশেষভাবে খেলাফতে রাশেদার সময়কালে কোনো সাহাবী ও তাবে'য়ীকে গায়েবানা জানাযা পড়তে দেখা যায়নি। অথচ মাইয়িতকে সামনে রেখে জানাযা পড়ার নজীর অসংখ্য-অগণিত। সুতরাং মাইয়িতের উপস্থিতিতে জানাযার নামায পড়ার নিয়মই সুন্নাহ।

আর এ সবকিছুর ভিত্তিতেই ইমামগণ জানাযা সহীহ হওয়ার জন্য মাইয়িত সামনে উপস্থিত থাকার শর্তারোপ করে থাকেন।

উপরোক্ত আলোচনার মূল কথা হলো- সকল ইমাম উপস্থিত মাইয়িতের জানাযা ফরযে কিফায়া হওয়ার ব্যাপারে যেমন ঐক্যমত তেমনিভাবে অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা ফরয না হওয়ার ব্যাপারেও সবাই ঐকমত্য। অর্থাৎ গায়েবানা জানাযা পড়ানের কোনো ইমামতে ফরয বা ওয়াজিব নয়। তবে হ্যাঁ যদি কেউ গায়েবানা জানাযা পড়তে চায় তাহলে তা জায়েয হবে কিনা? এ বিষয় নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে ইমামদের মতামত

ইমাম আ'যম আবু হানীফা রাহ. ও তার অনুগামী সকল ইমাম এবং ইমাম মালেক রাহ. এর মতে- গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই, দাফনের আগে হোক বা পরে। মাইয়িত শহরের ভেতরে থাকুক বা বাইরে।

আল্লামা শামসুল আইম্মা আস্ সারাখসী আল-হানাফী রাহ.[১৮২] বলেন-

قال علمائنا : لا يصلى على ميت غائب.

"আমাদের ওলামায়ে কেরাম বলেন, অনুপস্থিত মাইয়িতের জানাযা পড়া যাবে না।"[১৮৩]

'মুখতাছারুল খলীল' এর ব্যাখ্যা গ্রন্থে আল্লামা ইল্লীশ মালেকী রাহ. বলেন-

ولا يصلى على غائب.

"অনুপস্থিত মাইয়িতের জানাযা পড়া যাবে না।"[১৮৪]

উল্লিখিত রেওয়ায়েতসমূহের আলোকে এবং ফকীহগণের মতামতের ভিত্তিতে সুস্পষ্ট যে, হানাফী ও মালেকী মাযহাবে গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই। এ ব্যাপারে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. থেকে জায়েয হওয়ার একটি উক্তি থাকলেও স্বীয় শাগরিদ ইবনে আবী

---

[১৮১] শরহু মুখতাসারিল খলীল: ১/৩১৬-৩১৭, দারু সাদের, বৈরুত, লেবানন

[১৮২] মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে আবু সাহাল আবু বকর শামসুল আইম্মা আস সারাখসী আল হানাফী রাহ.। তিনি ৪৮৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। ইমাম মুহাম্মাদ রাহ. এর প্রায় সব কিতাবের তিনি ব্যাখ্যা লিখেছেন। মাবসূত ও মুহীত তাঁর জগত বিখ্যাত রচনা। বুরহানুল আইম্মা আব্দুল আযীয ইবনে ওমর ইবনে মাজাহ ও মাহমুদ ইবনে আব্দুল আযীয উযাযান্দী রাহ. তাঁরই সুযোগ্য শাগরেদ। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ২/৭৬

[১৮৩] মাবসূতে সারাখসী: ২/৬৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১৮৪] মানহুল জালীল: ১/৩৭৬, দারু সাদের, বৈরুত, লেবানন

মুসা তাঁর থেকে নাজায়েয হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমনটি লিখেছেন হাম্বলী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফিকাহ্‌বিদ ইমাম ইবনে কুদামা রাহ.-

وقال مالك وأبوحنيفة : لا تجوز، وحكى ابن أبي موسى عن أحمد رحـ رواية أخرى كقولهما : لأن من شرط الصلاة على الجنازة حضورها بدليل ما لو كان في البلد لم تجز الصلاة عليها مع غيبتها عنه.

“ইমাম মালেক রাহ. ও ইমাম আবু হানীফা রাহ. উভয়ে বলেন, গায়েবানা জানাযা জায়েয নেই। ইমাম আহমদ রাহ. থেকে ইবনে আবী মুসা উক্ত ইমামদ্বয়ের অনুরূপ (নাজায়েয হওয়ার) একটি উক্তি বর্ণনা করেছেন ...।”[১৮৫]

আর আমরা পূর্বে প্রমাণাদিসহ আলোচনা করেছি যে, এ মতটি সুন্নাহ সম্মত।

ইমাম শাফে‘য়ী রাহ. ও ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রাহ. এর মতে মাইয়িত ভিন্ন শহরে থাকলে গায়েবানা জানাযা জায়েয।

যেমনটি বলেছেন ড. ওয়াহাব যুহাইলী রাহ.-

للفقهاء رأيان في الصلاة على الغائب عن البلد، رأي الحنفية والمالكية عدم جواز الصلاة على الغائب، ورأي الشافعية والحنابلة جواز الصلاة على الميت الغائب عن البلد.

“গায়েবানা জানাযার ব্যাপারে ফিকাহ্‌বিদদের দু’ধরনের মতামত পাওয়া যায়। হানাফী ও মালেকী ফকীহগণ নাজায়েয হওয়ার অভিমত পোষণ করেন, আর শাফে‘য়ী ও হাম্বলী ফকীহগণ তা জায়েয বলে উল্লেখ করেন।”[১৮৬]

এছাড়া ইমাম শাফে‘য়ী রাহ. শহরের বাইরে অবস্থিত মাইয়িতের ক্ষেত্রে তা জায়েয বললেও শহরের ভেতরে উপস্থিত মাইয়িতের ক্ষেত্রে তা নাজায়েয বলেছেন। যেমন ইমাম নববী রাহ. বলেন-

أما إذا كان الميت في البلد فطريقان: المذهب وبه قطع المصنف والجمهور، لا يجوز أن يصلي عليه حتى يحضره عنده، لأن النبي ﷺ لم يصل على حاضر في البلد إلا بحضرته ولأنه لا مشقة فيه، بخلاف الغائب عن البلد.

“অবশ্য মাইয়িত যদি শহরের বাইরে থাকে তাহলে দু’টি পদ্ধতি রয়েছে। তবে মাযহাবের বর্ণনা যেটাকে স্বয়ং মুসান্নিফ রাহ. এবং জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম (সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিকাহবিদগণ) সমর্থন করেছেন, তা হলো মাইয়িতকে মুসল্লির সামনে উপস্থিত করা ছাড়া অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা জায়েয নেই।”[১৮৭]

মোটকথা, হানাফী ও মালেকী মাযহাবে গায়েবানা জানাযা নাজায়েয। পক্ষান্তরে শাফে‘য়ী মাযহাবে ভিন্ন শহরে অবস্থিত মাইয়িতের ক্ষেত্রে জায়েয থাকলেও নিজ শহরে উপস্থিত

---

[১৮৫] আল মুগনী: ২/৩৮৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[১৮৬] আল ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু: ১/৫০৪, মাকতাবাতুল হক্কানিয়্যাহ, পাকিস্তান

[১৮৭] আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব: ৫/২৫৩, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

মাইয়িতের ক্ষেত্রে নাজায়েয। হাম্বলী মাযহাবে ভিন্ন শহরে অবস্থিত মাইয়িতের ক্ষেত্রে জায়েয ও নাজায়েয উভয় উক্তি পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনু আবদিল বার রাহ.[১৮৮] নাজায়েয হওয়ার উক্তিকে জমহুর ফুকাহা তথা সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামায়ে কেরামের মতামত বলে অভিহিত করেছেন। যেমনটি উল্লেখ করেছেন বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রাহ.[১৮৯] -

قالت الحنفية والمالكية: لا تشرع، ونسبه ابن عبد البر إلى أكثر العلماء.

"হানাফী ও মালেকী ওলামাগণ বলেন, গায়েবানা জানাযা শরী'আত সম্মত নয়। ইবনু আব্দিল বার রাহ. এ উক্তিকে অধিকাংশ ওলামাদের মত হিসেবে উল্লেখ করেছেন।"[১৯০]

গায়েবানা জানাযা জায়েয প্রবক্তাদের দলীল ও তার খন্ডন

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. বর্ণনা করেন-

نعى النبي ﷺ إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعا .

"মহানবী ﷺ সাহাবায়ে কেরামকে বাদশাহ নাজাশীর মৃত্যুসংবাদ দিলেন। অতঃপর জানাযার জন্য অগ্রসর হলেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর পেছনে কাতারবন্দী হয়ে দাঁড়ালে নবীজী ﷺ চারটি তাকবীর বলে নামায পড়ালেন।"[১৯১]

একই বর্ণনা সহীহ ইবনে হিব্বানে[১৯২] হযরত ইমরান ইবনে হাছীন রাযি. সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হাদীসটির বিশ্লেষণ

প্রথমত: আলোচিত হাদীসটি এ ব্যাপারে দলীল হতে পারে না; কারণ সহীহ বুখারীসহ কুতুবে সিত্তায়[১৯৩] উক্ত হাদীসের যত বর্ণনা এসেছে সব সংক্ষিপ্ত। জানাযার সময় নাজাশীর লাশ কোথায় ছিলো? এ বিষয়ে পরিষ্কার কোনো নস নেই। তবে অপরাপর হাদীস গ্রন্থসমূহ অনুসন্ধানে নাজাশীর জানাযার বিস্তারিত বিবরণ সম্বন্ধীয় নির্ভরযোগ্য কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এগুলির প্রত্যেকটিতে উল্লেখ আছে যে, বাদশাহ নাজাশীর লাশ মু'জেযা স্বরূপ সামনে উপস্থিত করে দেয়া হয়েছিলো। ফলে তা আর গায়েবানাই থাকে না। যেমনটি সহীহ ইবনে হিব্বানে আওযায়ী রাহ. সূত্রে হযরত ইমরান ইবনে হাছীন রাযি. থেকে বর্ণিত হয়েছে-

---

[১৮৮] হাফেয জামালুদ্দীন আবু ওমর ইউসুফ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনু আব্দিল বার আল কুরতুবী আল মালেকী রাহ.। তিনি ৩৬৮ হিজরীর ৫ই রবিউল আওয়াল শুক্রবারে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৪৬৩ হিজরীর রবিউস সানীর শুক্রবার রাতে শাতিবা অঞ্চলে ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহে মালেকীর অনেক খেদমত করেছেন। ইসতিযকার, তামহীদ, জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহি, আদাবুল ইলম ইত্যাদি অনেক জগত বিখ্যাত কিতাব তাঁর হাতেই রচিত। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ২/৫৫০

[১৮৯] শাইখুল হাদীস যাকারিয়া ইবনে ইয়াহয়া রাহ.। ভারতের মুজাফ্ফরনগর জেলার অন্তর্গত কান্দালায় জন্মগ্রহণ করেন। খলীল আহমদ সাহিরানপুরী, ইয়াহইয়া কান্ধলভী ও রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. তাঁর বিশিষ্ট উস্তায। তিনি নানা বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। আওজাযুল মাসালিক, খাসাইলে নববী ও ফাযায়েলে আ'মাল তাঁর শ্রেষ্ট রচনাবলীর অন্যতম। তিনি ১৪০৩ হিজরীর শাবান মাসে মদীনা মুনাওয়ারায় ইন্তেকাল করেন। -কারওয়ানে রফতা: ১০৪

[১৯০] লামিউদ দারারী: ৪/৪৩২

[১৯১] সহীহ বুখারী: ১/১৬৭

[১৯২] সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৭২, হাদীস নং ৩১০২, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, লেবানন

[১৯৩] সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবু দাউদ, জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজাহ

وهم لا يظنون إلا أن الجنازة بين يديه

"সাহাবায়ে কেরামের প্রবল বিশ্বাস এটাই ছিল যে, জানাযা হুজুর ﷺ এর সামনে উপস্থিত।"[১৯৪]

এছাড়া উক্ত বর্ণনাটি আবান রাহ. সূত্রে হযরত ইমরান ইবনে হাছীন থেকে এভাবে এসেছে-

نحن لا نرى إلا أن الجنازة قدّامنا.

"আমরা যখন নবীজী ﷺ এর পিছনে জানাযা পড়েছি, তখন নাজাশীর লাশকে আমাদের সামনে উপস্থিত দেখতে পেয়েছি।"[১৯৫]

সুতরাং উক্ত জানাযা যেহেতু গায়েবানাই ছিল না, তাই নাজাশীর হাদীসটি গায়েবানা জানাযা বৈধতার ব্যাপারে দলীল হতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ সাময়িকের জন্য যদি মেনেও নেয়া হয়, নাজাশীর জানাযা গায়েবানা ছিল, তবুও আমাদের জন্য তা জায়েয হবে না। কারণ তা একমাত্র রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জন্যে খাস বা বিশেষত্ব ছিলো। যার অন্যতম দুটি কারণ হলো-নবীজীর উক্ত কর্মপন্থা অনুসরণ করে তার জীবদ্দশায় বা পরবর্তীতে কোনো সাহাবীর গায়েবানা জানাযা পড়েননি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ ও অন্য কোনো সাহাবীর গায়েবানা নামায পড়ানো গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়নি এর স্বপক্ষে ইবনুল হুমাম রাহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করেছি। এছাড়া মালেকী মাযহাবের ইমাম মুহাম্মাদ ইল্লীশ রাহ. উল্লেখ করেছেন-

صلاته ﷺ بالمدينة على النجاشي يوم موته بأرض الحبشة من خصوصياته ﷺ، بدليل عدم صلاة أمته عليه ﷺ، وفيها أعظم الرغبة، وأيضا الأرض رفعته له فصلى عليه وهو مشاهد له قبل دفنه، فهي كصلاة إمام على ميت رآه ولم يره المأمومون، ولا خلاف في جوازها.

"মদীনায় নাজাশীর গায়েবানা জানাযা পড়ার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বৈশিষ্ট্য ছিলো। কেননা, উম্মত রাসূলের জানাযা আদায় করার প্রতি অধিক আগ্রহী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেনি। উপরন্তু নাজাশীর লাশকে অলৌকিকভাবে রাসূলের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ ﷺ নাজাশীর লাশ সামনে দেখেই তার জানাযা পড়েছেন। যেমন, মাইয়িত ইমামের সামনে থাকা অবস্থায় ইমাম মাইয়িতকে দেখতে পায় কিন্তু অনেক মুক্তাদী দেখতে পায় না আর এ ক্ষেত্রে নামায সহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই।"[১৯৬]

তৃতীয়তঃ সহীহ বুখারীর উক্ত হাদীসের শিরোনাম (الصفوف على الجنازة) থেকেও গায়েবানা জানাযা নাজায়েযের প্রতি ইমাম বুখারী রাহ.[১৯৭] এর সমর্থন বোঝা যায়। শায়খুল হাদীস

---

[১৯৪] সহীহ ইবনে হিব্বান: ৮৭২, দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, লেবানন

[১৯৫] ফাতহুল বারী: ৩/২৪৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[১৯৬] মানহুল জালীল: ১/৩১৬-৩১৭, দারু সাদের, বৈরুত, লেবানন

[১৯৭] আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা আল জু'ফী আল বুখারী রাহ.। ১৯৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ২৫৬ হিজরী সনে ইন্তেকাল করে। তাঁর জগত বিখ্যাত রচনা আল জামেউস সহীহ ছাড়াও হাদীস ও

মাওলানা যাকারিয়া রাহ. বলেন-

قال: فالأوجه عند هذا العبد الضعيف أن الإمام البخاري رحمه الله مال في هذه المسألة إلى قول الحنفية والمالكية، وأشار بباب «الصفوف على الجنازة» إلى قولهم المشهور أن الجنازة كانت مشاهدة، ولذا لم يبوب بباب «الصفوف على الغائب» مع وجود الحديث عنده، وقد تقدم في الأصل الخامس والستين من أصول التراجم، أن الإمام البخاري رحمه الله قد لا يترجم على مسألة فى الحديث لعدم رؤيته بذلك.

"আমার নিকট সঠিক এটাই মনে হয় যে, ইমাম বুখারী রাহ. এ মাসআলায় হানাফী ও মালেকী মাযহাবের মতকে সমর্থন করেছেন এবং الصفوف على الجنازة তথা 'জানাযায়ে কাতারবন্দী হওয়া' শিরোনাম স্থাপন করে ইঙ্গিত করেছেন যে, নাজাশীর জানাযা দৃশ্যমান ছিলো; গায়েব ছিলো না। আর এটাই উক্ত মাযহাবদ্বয়ের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা। (যা আলোচ্য বিষয়কে সমর্থন করে) তাই তো হাদীস থাকা সত্ত্বেও তিনি الصفوف على الغائب 'অনুপস্থিত ব্যক্তির জানাযা' শিরোনামে অধ্যায় তৈরী করেননি। তা ছাড়া সহীহ বুখারীতে শিরোনাম তৈরির নীতিমালার ৬৫ নম্বরে উল্লেখ রয়েছে, কোনো মাসআলা ইমাম বুখারী রাহ. এর মতের পরিপন্থী হলে তিনি তা শিরোনাম হিসেবে উল্লেখ করেন না।"[১৯৮]

উক্ত ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেলো, স্বয়ং ইমাম বুখারী রাহ. এ হাদীসকে গায়েবানা জানাযার বৈধতার ক্ষেত্রে দলীল মনে করতেন না।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

এখানে একটি সংশয় সৃষ্টি হতে পারে যে, যদি গায়েবানা জানাযা জায়েযই না হতো, তাহলে হারাম শরীফে কিভাবে বিশ্ববরেণ্য ইমামগণকে তা পড়তে দেখা যায়?

নিরসন: পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে, গায়েবানা জানাযা যেহেতু শাফে'য়ী ও হাম্বলী মাযহাবে জায়েয আছে। আর সেখানকার ইমামসহ স্থানীয় মুসল্লিগণ এবং প্রশাসনও উক্ত মাযহাবদ্বয়ের কোনো একটির অনুসারী। তাই তারা নিজেদের মাযহাব অনুসারে গায়েবানা জানাযা পড়ে থাকেন। এজন্য হানাফী মাযহাবের অনুসারীদের জন্য তা জায়েয হয়ে যাবে না। আর ইতিপূর্বে প্রমাণিত হয়েছে যে, গায়েবানা জানাযা না পড়াই ছিল রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সার্বক্ষণিক কর্মপন্থা।

রাজনৈতিক সূত্রে গায়েবানা জানাযার হুকুম

বর্তমানে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়েও অনেককে গায়েবানা জানাযা পড়তে দেখা যায়। শুধু তাই নয় বরং রাজনৈতিক স্বার্থ অর্জনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন নেতা-নেত্রীর গায়েবানা জানাযাও পড়া হয়। শরী'আতে তা কখনই জায়েয হবে না বরং ইবাদতকে রাজনীতি বানানো বা ইবাদত থেকে রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টাই হবে মাত্র।
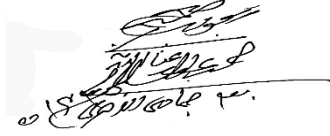
ইতিহাস শাস্ত্রে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল আদাবুল মুফরাদ, আত তারীখুল কাবীর, আত তারীখুস সগীর, আসমাউস সাহাবা ইত্যাদি তাঁর রচনাবলীর অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/১৬

[১৯৮] হাশীয়া লামিউদ দারারী শরহুল বুখারী: ২/১২২, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া দিল্লী
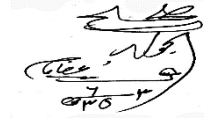
যার ফলে সওয়াবের পরিবর্তে গুনাহ ও আযাবের প্রবল আশঙ্কা রয়েছে।[১৯৯]

আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে বিষয়টি সঠিকভাবে বুঝে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥
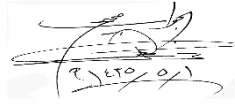
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
০১ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[১৯৯] জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া: ১/৪১২, ইসলামী কুতুবখানা, পাকিস্তান

ঈদগাহের আহকাম

মাওলানা মাহমুদুল হাসান শ্যামনগরী

ইসলামে আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য বিশেষ কিছু দিন রয়েছে। তন্মধ্যে দুই ঈদের দিন। তবে তা উদ্‌যাপন করতে হবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শ অনুকরণ করে, লাগামহীনভাবে নয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদ পালন করতেন এবং ঈদগাহে যেতেন। তাই মসজিদের মত ঈদগাই হয়ে ওঠে ইবাদতগাহ। তাই মসজিদের সাথে সঙ্গতি রেখে ঈদগাহের রয়েছে নিজস্ব কিছু বিধিবিধান। এ বিষয়ে নিম্নে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

ঈদগাহের গুরুত্ব

ইসলামের শুরু যুগে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সবার প্রতি নির্দেশ ছিলো। এমনকি যে সকল মহিলা হায়েয, নেফাসগ্রস্তা তাদেরকেও এক পর্যায়ে ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার আদেশ দেয়া হয়েছিলো। এ ব্যাপারে হযরত উম্মে আতিয়া রাযি.[২০০] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أمرنا رسول الله ﷺ أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله! إحدانا لا يكون لها جلباب قال: لتلبسها أختها من جلبابها.

"আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহাতে বের হতে আদেশ দিয়েছেন। সেখানে যুবতি, হায়েযগ্রস্তা ও পর্দানশীন মহিলারা বের হতো। হায়েযগ্রস্তা মহিলারা নামায থেকে দূরে থাকত। তবে তারা ভাল কাজে তথা জিকির ও নসীহতের মজলিসে ও মুসলমানদের দু'আয় উপস্থিত হতো। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কারো বোরকা নেই। উত্তরে তিনি বলেন, তার বোন যেন তাকে বোরকা পরিয়ে নিয়ে আসে।"[২০১]

হাদীসের ব্যাখ্যাকারগণ লিখেন যে, তখন মুসলমানদের একতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রদর্শন করা অপরিহার্য বিষয় ছিলো। তাই সকলকেই উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যাতে আনন্দ হয় এবং ইসলামের শান-শওকতও প্রকাশ পায়। কিন্তু পরবর্তী যুগে ফেতনা-ফাসাদ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যাওয়ায় ইমামগণ মহিলাদের ঈদগাহে উপস্থিত হতে বারণ করেছেন। ঈদগাহে যাওয়ার মাধ্যমে শান-শওকত প্রকাশ পায়- এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী রাহ.[২০২] বলেন-

---

[২০০] হযরত উম্মে আতিয়া নুসাইবা ইবনে কা'ব বিনতে হারেস আল আনসারী রাযি.। রাসূল সা. এর নিকট বাইআত গ্রহণ করেছিলেন। রাসূল সা. এর সাথে অনেক যুদ্ধে অংশ করে আহতদের শুশ্রূষা করতেন। -আল ইকমাল: ৬১২

[২০১] সহীহ মুসলিম: ১/২৯১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২০২] শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলবী: শাহ ওয়ালিউল্লাহ ইবনে আব্দুর রহীম আল ফারুকী দেহলবী রাহ.। তিনি ১১১৪ হিজরীর ১৪ই শাওয়াল বুধবার ভারতের মুজাফ্‌ফরনগরে জন্মগ্রহণ করেন। আবু তাহের কুরদী আল মাদানী, ওফদল্লাহ মালেকী ও তাজুদ্দীন

إن كل ملة لا بد لها من عرضة يجتمع فيها أهلها لتظهر شوكتهم و تعلم كثرتهم، ولذلك استحب خروج الجميع.

"প্রত্যেক জাতির প্রশস্ত ময়দান বা মাঠ থাকা আবশ্যক। সেখানে তারা একত্রিত হবে। যাতে তাদের শান-শওকত প্রকাশ পায় এবং তাদের আধিক্য বোঝা যায়। এ কারণে সকলের সেখানে যাওয়া মুস্তাহাব।"[২০৩]

এ দিকে লক্ষ্য রেখেই রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনার ভেতরে ঈদের নামায আদায় করতেন না। বরং মদীনার অদূরে নির্দিষ্ট স্থানে ঈদের নামায আদায়ের জন্য গমন করতেন। সাহাবায়ে কেরামও সেখানে উপস্থিত হতেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি.[২০৪] বর্ণনা করেন-

كان النبي ﷺ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন ঈদগাহে যেতেন।"[২০৫]

রাসূল ﷺ এর ওফাতের পর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খলীফাও ঈদের নামাযের জন্য 'জাব্বানায়' গমন করতেন। মদীনার ভেতরে ঈদের নামায পড়তেন না।

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী রাযি. অবস্থা, পরিস্থিতি অনুসারে সবলদের নিয়ে নিজে জাব্বানায় চলে যেতেন। আর দুর্বলদের মদীনায় নামায আদায় করার নির্দেশ দিতেন। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. বলেন-

أن عليا ﷺ كان يخلّف رجلا يصلي العيد بضعفة الناس في المسجد، ويخرج هو فيصلي بهم في الجبانة.

"হযরত আলী রাযি. ঈদের দিন মদীনায় দুর্বলদের ঈদের নামায পড়ানোর জন্য একজনকে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করতেন। আর নিজে মদীনার বাইরে জাব্বানায় লোকদেরকে নিয়ে নামায পড়তেন।"[২০৬]

হযরত আলী রাযি. এর আমল থেকে বোঝা যায় যে, ঈদের নামায সর্বাবস্থায় শহরের বাইরে আদায় করা কোনো অপরিবর্তনশীল বিধান নয়। বরং অবস্থার পরিবর্তনে শহরের মাঝেও ঈদের নামায আদায় করার সুযোগ আছে। তবে খলীফার জন্য বা সাধারণ অবস্থায় ঈদের নামায শহরের বাইরে একত্রে আদায় করাই উত্তম। কারণ এতে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আদর্শের অনুকরণের সাথে সাথে ইসলামের একতা ও শান-শওকত প্রকাশ পায়।

ঈদগাহ নামাযের স্থান হওয়ায় কিছু দিক থেকে মসজিদের সাথে সাদৃশ্য রাখে। তাই কিছু বিধানের ক্ষেত্রে স্থানদ্বয় এক। নিম্নে এমন কিছু বিধান তুলে ধরা হলো।

হানাফী রাহ. তাঁর বিশিষ্ট উস্তায। ১১৭৬ হিজরীর ২৯শে মুহাররম ইন্তেকাল করেন। আল ফাওযুল কাবীর, মুসাফ্ফা শরহে মুআত্তা, হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা ও ইযালাতুল খাফা তাঁর অমর কীর্তি। -রহমাতুল্লাহিল ওয়াসিয়া: ১/৩৫

[২০৩] হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগাহ: ২/৩১, দারুল মা'রিফা

[২০৪] আবু সাঈদ খুদরী: সা'দ ইবনে মালেক আল আনসারী আল খুদরী রাযি.। ৭৪ হিজরীতে ৮৪ বছর বয়সে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। মাকবারা বাকীতে তাঁকে দাফন করা হয়। -আল ইকমাল: ৫৯৮

[২০৫] সহীহ বুখারী: ১/১৩১, হাদীস নং ৯৪৬,

[২০৬] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/১৩৪, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

১. ঈদগাহ নামাযের জন্য স্থির হওয়ায় পুরো ঈদগাহের জায়গাটি ইমামের পিছনে ইকতেদা করার ক্ষেত্রে এক স্থান ধরা হবে।

২. ইকতেদার বিষয় ছাড়া অন্যান্য দিক থেকে ঈদগাহের বিধিবিধান মসজিদের আঙ্গিনার ন্যায়। তাই মসজিদের আঙ্গিনায় যা বৈধ, ঈদগাহেও তা বৈধ হবে। এবং ওখানে যা নিষেধ এখানেও তা নিষেধ। তবে ঈদগাহকে গরু-ছাগল বিচরণের মাঠ বা খেলাধুলার মাঠে পরিণত করা সম্পূর্ণ নিষেধ। কোনো অবস্থাতেই ঈদগাহকে অবমূল্যায়ন করার সুযোগ নেই। বরং সকলকেই এর যথাযথ সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করতে হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ.[২০৭] বলেন-

(و) أما (المتخذ لصلاة جنازة أو عيد) فهو (مسجد في حق جواز الاقتداء) وإن انفصل الصفوف رفقا بالناس (لا في حق غيره) به يفتى، نهاية. (فحل دخوله لجنب وحائض) كفناء مسجد ورباط ومدرسة ومساجد حياض وأسواق.

“জানাযা বা ঈদের নামায আদায়ের জন্য যে জায়গা নির্ধারণ করা হয়েছে, তা নামাযের ইকতেদা সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে। যদিও কাতারগুলোর মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি হয় (লোকসমাগম বেশি হওয়ায় সহজ করণার্থে কাতারের মাঝে দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ইকতেদাকে সহীহ বলা হয়েছে)। তবে ইকতেদা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে মসজিদ হিসেবে গণ্য হবে না। আর ফাতওয়া এর উপরই। অতএব অপবিত্র ও হায়েযগ্রস্তা মহিলার জন্য সেখানে প্রবেশ করা বৈধ হবে। যেমন, মসজিদের আঙ্গিনা, চত্বর, মাদরাসা বা বাজার ইত্যাদির নামাযের জায়গা।”[২০৮]

৩. ঈদগাহের জন্য ওয়াক্‌ফকৃত জমি ঈদগাহের কাজেই ব্যবহার করতে হবে। অন্য খাতে (শরী‘আতের সম্মতি ছাড়া) ব্যয় করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

شرط الواقف كنص الشارع.

“ওয়াকফকারীর শর্ত শরী‘আত প্রবর্তকের ভাষ্যের ন্যায়।”[২০৯]

অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকারীর বক্তব্য শারে‘য়ের বক্তব্যের মতই অপরিহার্য গণ্য করা হবে। তাই ওয়াক্‌ফকারী যে খাতে ব্যয় করার জন্য ওয়াক্‌ফ করেছে তা অটুট রাখতে হবে।

মসজিদে ঈদের নামায

স্বাভাবিক অবস্থায় সুন্নাহ হলো, শহরের বাইরে কোনো নির্দিষ্ট স্থানে ঈদের নামায আদায় করা। কিন্তু ওজরবশত মসজিদেও ঈদের নামায আদায় করা যায়। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

---

[২০৭] মুহাম্মাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুর রায্যাক আদ দিমাশকী রাহ.। তিনি হাসকাফী নামে প্রসিদ্ধ। তিনি ১০২১ হিজরীতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১০৮৮ হিজরীতে সেখানেই ইন্তেকাল করেন। খাযাইনুল আসরার ও ইফাদাতুল আনওয়ার তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। -হাদিয়্যাতুল আরেফীন: ২/২৯৫

[২০৮] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪৩০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২০৯] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৬৪৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي ﷺ صلاة العيد في المسجد.[২১০]

"একবার ঈদের দিন বৃষ্টি হয়। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মসজিদে ঈদের নামায আদায় করেন।"[২১১]

অন্যত্র উসমান ইবনে আব্দুর রহমান আত তাইমী থেকে বর্ণিত-

قال مطرنا في إمارة أبان بن عثمان على المدينة مطرا شديدا ليلة الفطر، فجمع الناس في المسجد، فلم يخرج إلى المصلى الذي يصلى فيه الفطر والأضحى، ثم قال لعبد الله بن عامر بن ربيعة: قم، فأخبر الناس ما أخبرتني، فقال عبد الله بن عامر: إن الناس مطروا على عهد عمر بن الخطاب ﷺ فامتنع الناس من المصلى، فجمع عمر الناس في المسجد، فصلى بهم، ثم قام على المنبر فقال: يا أيها الناس! إن رسول الله ﷺ كان يخرج بالناس إلى المصلى يصلي بهم، لأنه أرفق بهم وأوسع عليهم وإن المسجد كان لا يسعهم، قال: فإذا كان هذا المطر فالمسجد أرفق.[২১২]

"তিনি বলেন, আবান ইবনে উসমানের শাসনকালে মদীনায় একবার ঈদুল ফিতরের রাতে প্রচুর বৃষ্টি হয়। ফলে লোকজনকে মসজিদে একত্রিত করেন তিনি ঈদগাহে নামায আদায় করার জন্য বের হতে পারেননি। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবী'আকে বললেন, তুমি আমাকে যে সংবাদ দিয়েছ উপস্থিত সকলকে তা শুনাও। তখন আব্দুল্লাহ ইবনে আমের বললেন, ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. এর যুগে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিলো। ফলে লোকজন ঈদগাহে যেতে পারেনি। তখন ওমর রাযি. লোকজনকে মসজিদে একত্রিত করে নামায পড়ান। এরপর মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবায় বলেন, হে লোকসকল! নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ লোকদেরকে নিয়ে ঈদগাহে গিয়েই নামায পড়তেন। কেননা তাদের জন্য তাই ছিলো উপযুক্ত ও সহজতর। আর তখন মসজিদে তাদের সংকুলান হতো না। কিন্তু এখন যেহেতু বৃষ্টি, তাই মসজিদই বেশি উপযুক্ত।"[২১৩]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

السنة أن يخرج الإمام إلى الجبانة.

"সুন্নাহ হলো ইমাম 'জাব্বানায়' বের হওয়া।"[২১৪]

সুতরাং উল্লিখিত হাদীসদ্বয় ও ফিক্‌হের ভাষ্য দ্বারা বুঝা যায় যে, কোনো ধরনের প্রতিকূল অবস্থা বা দুর্যোগের সম্মুখীন না হলে ঈদগাহে নামায পড়া উত্তম। এমনিভাবে শহরের বাইরে না গিয়ে শহরের ভেতরে ঈদের নামায আদায় করারও সুযোগ আছে। এক জায়গায়

[২১০] رواه أبو داود في «سننه» وسكت عنه، وأخرجه الحاكم في «مستدركه» كتاب الصلاة باب أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي ﷺ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ، ولم يخرجاه.

[২১১] সুনানে আবু দাউদ: ১/১৬৪, হাদীস নং ৯৮০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২১২] أخرجه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» (٦٣٥٠) بإسناد صالح.

[২১৩] সুনানে বাইহাকী: হাদীস নং ৬৩৫০, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[২১৪] ফাতহুল কাদীর: ২/৬৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

সংকুলান না হলে দুই জায়গায় নামায আদায় করার সুযোগ আছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وتجوز إقامة صلاة العيد في موضعين.

"দুই জায়গায় ঈদের নামায পড়া জায়েয।"[২১৫]

বাচ্চাদের ঈদগাহে যাওয়া

ইসলামের শুরু যুগে বড়রা যেভাবে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করতো, বাচ্চারাও তাদের ন্যায় ঈদগাহে যেতো। আব্দুর রহমান ইবনে আবেস রাহ.[২১৬] বর্ণনা করেন-

قال سمعت ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي ﷺ؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العَلَم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى، ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال، فوعظهن وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن، يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.

"আমি ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে শুনেছি তাকে বলা হলো, আপনি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে ঈদের নামাযে উপস্থিত হতেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যদি আমার এমন সম্পর্ক না থাকতো, তাহলে আমি ছোট হওয়ায় তাঁর সাথে উপস্থিত হতে পারতাম না। অবশেষে কাছীর ইবনুস সাল্‌তের বাড়ির কাছের নির্দিষ্ট জায়গায় এসে নামায পড়ে খুতবা পাঠ করেন। এরপর মহিলাদের কাছে এসে নসিহত ও উপদেশ দেন এবং তাদেরকে সদকার ব্যাপারে আদেশ করেন। তখন মহিলারা নিজ হাতে বেলালের কাপড়ে সদকা প্রদানে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এরপর তিনি এবং বেলাল বাড়িতে ফিরে যান।"[২১৭]

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ.[২১৮] বলেন-

لأن مشروعية إخراج الصبيان إلى المصلى إنما هو للتبرك وإظهار شعار الإسلام بكثرة من يحضر منهم، ولذلك شرع للحيض...

"শরী'আত শিশুদেরকে ঈদগাহে নেয়ার অনুমতি দিয়েছে ঈদগাহের বরকত গ্রহণ এবং লোক সমাগম বেশি ঘটিয়ে ইসলামের এই শি'আরকে পূর্ণরূপে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে। তাই হায়েয-নেফাযগ্রস্তা নারীদেরও উপস্থিতির অনুমতি ছিলো।"[২১৯]

উপরোক্ত হাদীস থেকে আরেকটি বিষয় বোঝা যায়, ঈদগাহে নিদর্শন স্বরূপ মিনার, মিম্বর

---

[২১৫] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৫০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২১৬] আব্দুর রহমান ইবনে আবেস ইবনে রাবি'আ আন নাখায়ী আল কূফী রাহ.। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও আব্দুর রহমান ইবনে আবী লাইলা তাঁর বিশিষ্ট উস্তায। শু'বা ও সাওরী রাহ. তাঁর ছাত্রদের অন্যতম। ১১৯ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। -তাহযীবুত তাহযীব: ৬/২০১

[২১৭] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৯৭৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২১৮] হাফেয আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে মুহাম্মাদ আলী ইবনে হাজার আল আসকালানী রাহ.। ইবনে হাজার আসকালানী নামে প্রসিদ্ধ। ৭৭২ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। হাদীস শাস্ত্রে অনেক খেদমত করেছেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। ফাতহুল বারী তাঁর জগত বিখ্যাত অমর রচনা। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/১২৮

[২১৯] ফাতহুল বারী: ২/৫৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

ইত্যাদি নির্মাণ করা যেতে পারে। হাদীসের علم (আলাম) শব্দের ব্যাখ্যায় হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-

وظهر من هذا الحديث أنهم جعلوا لمصلاه شيئا عرف به، وهو المراد بالعلم.

"এই হাদীস থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা ঈদগাহে বিশেষ কোনো প্রতীক স্থাপন করত, যা দ্বারা ঈদগাহকে চেনা যায়। হাদীসে আলাম শব্দ দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য।"[২২০]

সামনে 'সুতরা' দেয়া

ঈদের নামায খোলা মাঠে আদায় হতো, আর খোলা মাঠে নামায আদায় করার ক্ষেত্রে সুন্নত হলো সামনে সুতরা স্থাপন করা। যেমন হযরত ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

قال كان النبي ﷺ يغدو إلى المصلى، والعنزة بين يديه تحمل وتنصب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সকাল সকাল ঈদগাহে যেতেন। আর তাঁর সামনে সুতরা রাখা হতো, এবং তিনি সেটার বরাবর দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন।"[২২১]

সুতরাং উল্লিখিত হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, পুরো ঈদগাহে ইমামের সামনের সুতরাই সকল মুসল্লির জন্য যথেষ্ট হবে।

ঈদের নামাযের পূর্বাপর নফল নামায

একজন মুসলমানের সকল কাজই শরী'আত সমর্থিত হবে। শরী'আত যখন নামায পড়ার কথা বলবে, তখন নামায পড়বে। আর যখন নিষেধ করবে, তখন বিরত থাকবে। তাই ঈদের দিন সকালে ঈদের নামাযের পূর্বে ঈদগাহ ও বাড়িতে এবং পরে শুধু ঈদগাহে নফল নামায পড়া থেকে বিরত থাকা উচিত।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن النبي ﷺ خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের দুই রাকা'আত নামায আদায় করেন। এর (ঈদের নামাযের) আগে বা পরে কোনো নামায পড়েননি। আর তখন তাঁর সাথে ছিলেন বেলাল[২২২] রাযি. ।"[২২৩]

এমনিভাবে আবু মাসউদ রাযি. বলেন-

ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد.[২২৪]

"ঈদের দিন ইমাম সাহেব ঈদগাহে উপস্থিত হওয়ার পূর্বে নফল নামায পড়া সুন্নাহ সম্মত

---

[২২০] ফাতহুল বারী: ২/৫৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[২২১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৯৭৩

[২২২] বেলাল ইবনে রবাহ রাযি.। তিনি সর্বপ্রথম মক্কায় ইসলাম প্রকাশ করেছেন। ২০ হিজরীতে দামেস্কে ইন্তেকাল করেন। - আল ইকমাল
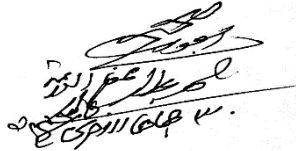
[২২৩] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৯৮৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২২৪] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله ثقات.

নয়।”[২২৫]
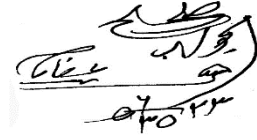
ঈদগাহে কুরবানীর বিধান

ঈদগাহ যেহেতু নামাযের স্থান, তাই ঈদগাহে কুরবানী না করে অন্য কোনো জায়গায় করা উচিত এবং সর্বাবস্থায় ঈদগাহ পবিত্র রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদগাহে নামায আদায় করে মদীনায় ফিরে কুরবানী করতেন। যেমন বারা ইবনে আযেব রাযি.[২২৬] থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

خطبنا النبي ﷺ يوم النحر فقال: إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن يصلي، فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈদুল আযহার দিন আমাদের উদ্দেশ্যে খুতবা দেন। তখন তিনি বলেন, আমাদের আজকের এই দিনের সর্বপ্রথম ইবাদত হলো নামায আদায় করা। এরপর আমরা বাড়ি ফিরে কুরবানী করবো। আর যে এই (কুরবানীর কাজ) সম্পাদন করলো, সে আমাদের সুন্নাহর সাথে একাত্মতা পোষণ করলো। আর যে ব্যক্তি নামাযের মত গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত পূর্ণ করার আগে কুরবানী করলো, সে তার পরিবারের জন্য কিছু গোশত তাড়াহুড়া করে পেশ করলো। ফলে তা আর ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে না।”[২২৭]

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[২২৫] মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ: হাদীস নং ৩২৩২, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[২২৬] বারা ইবনে আযেব আবু আম্মার আল আনসারী আল হারেসী রাযি.। তিনি কুফায় মুসআব ইবনে যুবায়েরের শাসনকালে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৫৮৭

[২২৭] সহীহ বুখারী: হাদীস নং- ৯৬৮

অধ্যায়ঃ সফর

মুসাফিরের নামায: কিছু মাসাইল

মাওলানা শহীদুল ইসলাম টাঙ্গাইলী

মানব জীবনে সফর অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা দ্বীন-দুনিয়ার তাগিদে প্রত্যেকেরই কম-বেশি সফর করতে হয়। স্বগৃহে বসবাস করে চিরমুকীম হয়ে যিন্দেগী পার করে দেয়ার দৃষ্টান্ত বিরল। অনেকের জন্য সফর করা অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায় এবং সফরের কষ্ট-ক্লেশ বরণ করে নিতে হয়। তাই শরী'আত মুসাফিরের কষ্ট-ক্লেশ লাঘবের নিমিত্তে কিছু আহকামের ক্ষেত্রে ছাড় দিয়েছে যা আমাদের জানা আবশ্যক। তাই মুসাফিরের নামায সংক্রান্ত কিছু মাসআলা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

মুসাফির কোত্থেকে কসর করবে

কোনো ব্যক্তি সফর শুরু করার স্থান থেকে ৪৮ মাইল বা ৭৮ কিলোমিটার অতিক্রম করার নিয়তে বের হলে তাকে মুসাফির বলা হবে। তবে নামায কসর করার ক্ষেত্রে যদি নিজ এলাকা থেকেই মূল সফর শুরু করে তাহলে নিজ এলাকা অতিক্রম করতে হবে। তবে প্রথমে নিজ এলাকা থেকে শহরে বা অন্য কোথাও (যা সফরের দূরত্বে নয়) গেলে এবং ওখান থেকে মূল সফর শুরু করলে ঐ শহর বা এলাকার সীমা অতিক্রম করতে হবে। যেমন ইমাম আব্দুর রাজ্জাক রাহ. ইবনে ওমর রাযি. এর আমল এভাবে বর্ণনা করেন-

أنه كان يقصر الصلاة حين يخرج من بيوت المدينة ، ويقصر إذا رجع حتى يدخل بيوتها.[২২৮]

"তিনি মদীনার আবাদী থেকে বের হওয়ার পর থেকে নিয়ে পুনরায় মদীনার আবাদীতে প্রবেশ করা পর্যন্ত নামায কসর করতেন।"[২২৯]

স্মরণযোগ্য যে, শহর কিংবা গ্রামের যে দিক দিয়ে রওনা হবে ঐ দিকের আবাদী ঘর-বাড়ি অতিক্রম করার পরই কসর করতে পারবে। যদিও অপর দিক থেকে তার গ্রামের আবাদী বাকি থাকে। যেমন ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ثم المعتبر مجاوزة بيوت الجانب الذي خرج منه، فلو جاوزها وتحاذيه بيوت من جانب آخر، جاز القصر.

"ঐ দিকের আবাদী অতিক্রম করা ধর্তব্য হবে, যে দিক থেকে সে বের হয়েছে। সুতরাং যদি সে এক দিক থেকে আবাদী অতিক্রম করে আর অপর দিকে আবাদী বাকি থাকে,

---

[২২৮] أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» ٢/٥٣٠ بإسناد رجاله ثقات غير عبد الله بن عمر العمري، قال عنه الترمذي في «سننه» باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل : ليس هو بالقوي عند أهل الحديث... وهو صدوق.قال الحافظ ابن عدي : ولعبد الله بن عمر حديث صالح وأروى من رأيت عنه ابن وهب ووكيع وغيرهما من ثقات المسلمين، وهو لا بأس به في رواياته، وإنما قالوا به لا يلحق أخاه عبيد الله، وإلا فهو في نفسه صدوق لا بأس به.

[২২৯] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ২/৫৩০, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান

তাহলে তার জন্য কসর করা জায়েয হবে।"[২৩০]

নিজ এলাকার সীমা

কতটুকু পথ অতিক্রম করলে নিজ এলাকা অতিক্রম করেছে বলে ধরা হবে এ বিষয়ে রাসূল ﷺ ও সাহাবা রাযি. এর আমল উল্লেখ করার পর ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্য উল্লেখ করবো, ইন্‌শাআল্লাহ। হযরত আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

أن النبي ﷺ صلى الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনায় চার রাকা'আত যোহর আদায় করেছেন আর (মদীনার অনতিদূরে) যুল হুলায়ফাতে দুই রাকা'আত আসর আদায় করেছেন।"[২৩১]

হযরত আবু হারব আদ্‌দাইলী রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أن عليا ﷺ لما خرج إلى البصرة رأى خصا، فقال: لولا هذا الخص لصليت ركعتين. فقلت: وما الخص؟ قال: بيت من قصب.

"হযরত আলী রাযি. যখন বসরা অভিমুখে রওয়ানা করেন, তখন পথে একটি বাড়ি দেখে বলে উঠলেন, যদি এই 'খুছ'টি (বাড়ি) না থাকত (যদি এই বাড়িটি অতিক্রম করতাম), তাহলে (কসর হিসেবে) দুই রাকা'আত নামায আদায় করতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'খুছ' কী জিনিস? উত্তরে তিনি বললেন, এক জাতীয় বাঁশের ঘর।"[২৩২]

হযরত আলী রাযি. বসরার দিকে সফর করতে গিয়ে নিজ এলাকার সীমা ধরেছেন এলাকার সর্বশেষ বাড়ি-ঘর। এমনিভাবে ইবনে ওমর রাযি. এর আমল থেকে তাই প্রতীয়মান হয়। কেননা, তিনিও মদীনার ঘর-বাড়ি অতিক্রম করলেই কসর শুরু করতেন।

হযরত আনাস রাযি. সূত্রে বর্ণিত উপরোল্লিখিত হাদীস ও ইবনে ওমর রাযি. এবং আলী রাযি. এর আমল থেকে বোঝা যায় যে, কোনো মুসাফির নিজ শহর বা গ্রাম অতিক্রম করলেই সফরের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে।

ইমাম ইবনে মুনযির রাহ. এ বিষয়ে ইজমা উল্লেখ করে বলেন-

أجمع كل من نحفظ عن أهل العلم أن للذي يريد السفر أن يقصر الصلاة إذا خرج من بيوت القرية التي يخرج منها.

"ফুকাহায়ে কেরাম এ বিষয়ে একমত যে, কোনো ব্যক্তি যখন শর'য়ী সফরের ইচ্ছা পোষণ করে নিজ গ্রাম বা শহরের সমস্ত ঘর-বাড়ি অতিক্রম করবে তখন সে নামায কসর করবে।"[২৩৩]

এমনিভাবে ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

---

[২৩০] ফাতহুল কাদীর: ২/৩৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৩১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৫৪৭
[২৩২] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: হাদীস নং ৪৩১৯, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান
[২৩৩] আল মুগনী: ২/৯৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

وإذا فارق المسافر بيوت المصر صلى ركعتين.

"মুসাফির ব্যক্তি যখন শহরের ঘর-বাড়ি অতিক্রম করবে তখন (চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামায) দুই রাকা'আত আদায় করবে।"[২৩৪]

মোটকথা, কসর শুরু করার জন্য কমপক্ষে নিজ গ্রাম বা শহর অতিক্রম করতে হবে। এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, ফিক্‌হের কিতাবাদিতে গ্রাম ও শহর উভয়টাই উল্লেখ করা হয়েছে। তা থেকে বোঝা যায়, অতিক্রম করার দিক থেকে শহর ও গ্রাম এক বরাবর। গ্রাম চাই যত ছোট হোক না কেন তা অতিক্রম করলেই কসর করতে পারবে।

অতিক্রম দু'ধরনের

এক. কোনো শহর বা গ্রাম থেকে এমনভাবে বের হওয়া যা দ্বারা শহর বা গ্রামের ঘর বাড়ি ও সংশ্লিষ্ট জায়গা অতিক্রম করা হয়। এটা তখন সম্ভব যখন এক শহর বা গ্রাম অন্য শহর বা গ্রাম থেকে পৃথক হবে এবং উভয় শহর বা গ্রামের মাঝে বিস্তর তফাত থাকবে। এধরনের অতিক্রম পূর্বযুগে সহজ ছিল। কারণ, তখন দুই শহরের মাঝে বেশ দূরত্ব থাকত, আর সে হিসেবেই ফকীহগণ বাস্তব অর্থে অতিক্রম হওয়াকে কিতাবাদিতে শর্ত করেছেন।

দুই. বর্তমানে অনেক গ্রাম আছে যা অন্য গ্রাম থেকে পৃথক নয়; বরং ঘর-বাড়িগুলো পরস্পর মিলিত। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় এমন হয় যে, গ্রামের পর গ্রাম অতিক্রম করা হচ্ছে কিন্তু এক গালওয়াহ (দুইশত গজ) পরিমাণ ফাঁকা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না, যা অতিক্রম করলে সে কসর করতে পারবে। তাই বর্তমান ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, যেহেতু মূল উদ্দেশ্য নিজ গ্রাম অতিক্রম করা। আর প্রত্যেক গ্রামের আলাদা স্বকীয়তা আছে। পরিচয় পরিধির দিক থেকে প্রত্যেক গ্রাম অন্য গ্রাম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাই ফাঁকা জায়গা না থাকলেও গ্রামের প্রসিদ্ধ সীমা অতিক্রম করলেই সে কসর করতে পারবে।

শহরের বিষয়টিও গ্রামের মতই। তাই বর্তমানে শহর বা পৌরসভার সীমা অতিক্রম করলেই কসর করতে পারবে।

মোটকথা যদি প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী আমল করা সম্ভব হয়, তাহলে সেভাবে আমল করবে, অন্যথায় দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী কসরের নামায আদায় করবে।[২৩৫]

কসর নামায সম্পর্কে কিছু মাসআলা

মাসআলা: মুসাফির ব্যক্তির উপর চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকা'আত পড়া ওয়াজিব। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النبي ﷺ ، ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى.

"নামায প্রথমত দুই রাকা'আত ফরয করা হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ হিজরত করার পর নামায চার রাকা'আত ফরয করা হয়েছে এবং সফরের নামায (বৃদ্ধি না করে) দুই

---

[২৩৪] হেদায়া: ১/১৬৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[২৩৫] দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ: ৫/১৮১, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ; জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া: ৪/৩০৯, কুতুবখানা ইসলামিয়া, পাকিস্তান

রাকা'আতই রাখা হয়েছে।"[২৩৬]

হযরত ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

صلاة السفر ركعتان ... وصلاة الجمعة ركعتان، تمام، غير قصر على لسان محمد ﷺ.[২৩৭]

"সফরের নামায দুই রাকা'আত... জুম'আর নামায দুই রাকা'আত। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ভাষ্যানুযায়ী (সফরের জন্য) এটাই পূর্ণ নামায; অপূর্ণ নয়।"[২৩৮]

শর'য়ী সফরের কারণে কসর ওয়াজিব হওয়া সত্ত্বেও যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে চার রাকা'আত আদায় করে এবং প্রথম বৈঠকও করে, তাহলে তার ফরয তো আদায় হয়ে যাবে কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়াজিব তরক করার কারণে নামায মাকরূহে তাহরীমী হবে। এ জন্য পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব হবে। আর যদি প্রথম বৈঠক না করে তাহলে তার নামাযই হবে না। যেমন আল্লামা শুরুমবুলালী রাহ. বলেন-

فإذا أتم الرباعية، والحال أنه قعد القعود الأول قدر التشهد صحت صلاته، لوجود الفرض في محله، وهو الجلوس على الركعتين، وتصير الأخريان نافلة له مع الكراهة، لتأخير الواجب وهو السلام عن محله إن كان عامدا، فإن كان ساهيا، يسجد للسهو، وإلا فلا تصح صلاته.

"যদি কোনো মুসাফির ব্যক্তি চার রাকা'আত আদায় করে এবং প্রথম বৈঠকে তাশাহুদ পরিমাণ সময় বসে, তাহলে ফরয আদায় হওয়ায় (অর্থাৎ প্রথম বৈঠক করার কারণে) তার নামায সহীহ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয় দুই রাকা'আত তার জন্য নফল হয়ে যাবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে সালাম আদায় করার কারণে তার নামায মাকরূহ হবে। আর যদি সে ভুলে চার রাকা'আত আদায় করে, তাহলে সিজদায়ে সাহু করবে। অন্যথায় নামায সহীহ হবে না।"[২৩৯]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وتعاد وجوبا في العمد والسهو إن لم يسجد له، وإن لم يعدها يكون فاسقا آثما، وكذا كل صلاة أديت مع كراهة التحريم تجب إعادتها.

"যদি কোনো ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ওয়াজিব তরক করে, বা ভুল করে ওয়াজিব তরক করে এবং সেজদায়ে সাহু না দেয়, তাহলে ঐ নামায পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব। যদি সে পুনরায় নামায আদায় না করে, তাহলে সে গুনাহগার হবে। অনুরূপভাবে যে নামায মাকরূহে তাহরীমীর সাথে আদায় হয় ঐ নামাযও পুনরায় আদায় করা ওয়াজিব।"[২৪০]

মাসআলা: যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াক্তের শুরুতে মুকীম থাকে কিন্তু নামায আদায় করার পূর্বেই

---

[২৩৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩৯৩৫

[২৩৭] أخرجه ابن خزيمة في « صحيحه» (١٤٢٥) و ابن حبان في « صحيحه» (٢٧٨٣)

[২৩৮] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৫৭

[২৩৯] মারাকিল ফালাহ: ৪২৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[২৪০] আদ্দুররুল মুখতার: ২/১৪৭-১৪৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মুসাফির হয়ে যায়, তাহলে সে নামাযে কসর করবে। অনুরূপভাবে যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াক্তের শুরুতে মুসাফির থাকে, কিন্তু নামায আদায় করার পূর্বেই মুকীম হয়ে যায়, তাহলে সে নামাযে কসর করবে না; বরং পুরা নামায আদায় করবে। আল্লামা তাহের ইবনে আব্দুর রশীদ রাহ. বলেন-

إذا كان الرجل مقيما في أول الوقت، فلم يصل حتى سافر في آخر الوقت، كان عليه صلاة السفر... ولو كان مسافرا في أول الوقت... وإن لم يصل حتى أقام في آخر الوقت، ينقلب فرضه أربعا.

"যখন কোনো ব্যক্তি ওয়াক্তের শুরুতে মুকীম থাকে আর সে নামায আদায় করার পূর্বেই শেষ ওয়াক্তে মুসাফির হয়ে যায়, তাহলে সে নামায কসর করবে... আর যদি ওয়াক্তের শুরুতে মুসাফির থাকে আর নামায আদায় করার পূর্বেই ঐ ওয়াক্তে মুকীম হয়ে যায়, তাহলে সে পুরা নামায আদায় করবে।"[২৪১]

তবে যদি কোনো মুকীম ব্যক্তি ওয়াক্তের শুরুতে নামায আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তেই মুসাফির হয়ে যায় অথবা কোনো মুসাফির ব্যক্তি নামায আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তেই মুকীম হয়ে যায়, তাহলে তার আদায়কৃত নামায পরিবর্তন হবে না। এ বিষয়ে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

ولو كان مسافرا في أول الوقت، إن صلى صلاة السفر، ثم أقام في الوقت، لا يتغير فرضه.

"যদি কোনো ব্যক্তি ওয়াক্তের শুরুতে মুসাফির থাকে এবং সে মুসাফিরের নামায আদায় করার পর ঐ ওয়াক্তে মুকীম হয়ে যায়, তাহলে তার আদায়কৃত ফরয চার রাকাতে পরিবর্তন হবে না।"[২৪২]

মুসাফিরের জুম'আর নামায

জুম'আর নামায যেহেতু অন্যান্য নামাযের মত নয়; বরং তা ওয়াজিব হওয়ার জন্য বেশ কিছু শর্তের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। তাই সময় হলেই জুম'আর নামায সবার উপর সর্বত্র ওয়াজিব হবে না। আর জুম'আর শর্তসমূহের মাঝে একটি হলো মুকীম হওয়া। তাই মুসাফিরের উপর জুম'আ ওয়াজিব হবে না। তবে তারা যদি জুম'আ পড়ে নেয়, তাহলে আদায় হয়ে যাবে। যেমন ইমাম আবু হানীফা[২৪৩] রাহ. বর্ণনা করেন-

---

[২৪১] খোলাসাতুল ফাতাওয়া: ১/২০২, মাকতাবায়ে হক্কানিয়্যাহ, পেশোয়ার, পাকিস্তান

[২৪২] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৪১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৪৩] আবু হানীফা নো'মান ইবনে সাবেত। ৮০ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তিনি তাবেঈ ছিলেন। ইমামে আ'যম উপাধিতে পরিচিত। তিনি অত্যন্ত পরহেযগার খোদাভীরু ও ধৈর্যশীল ছিলেন। তিনি সমকালীন যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ। ইমাম শাফে'য়ী রাহ. বলেন- الناس عيال على أبي حنيفة
ইয়াহইয়া ইবনে মাঈন রাহ. কে ইমাম আবু হানীফা রাহ. সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন-
ثقة ما سمعت أحدا ضعفه، هذا شعبة بن الحجاج يكتب إليه أن يحدث، ويأمره، وشعبة شعبة
আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রাহ. বলেন- قول أبي حنيفة عندنا أثر إذا لم يكن فيه أثر তিনি আরো বলেন- لا تقول رأي أبي حنيفة، ولكن قولوا تفسير الحديث
ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. বলেন- ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحديث من أبي حنيفة
তাঁর হাজার হাজার উস্তায ও শাগরেদ ছিলেন। তাঁর উস্তাযগণের মধ্যে অন্যতম হলেন, যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ, মুফতী ও মুহাদ্দিস

عن محمد بن كعب القرظي ﷺ عن النبي ﷺ قال: أربعة لا جمعة عليهم، المرأة، والمملوك، والمسافر والمريض. قال أبو حنيفة رحمه الله: فإن فعلوا أجزأهم، قال محمد: وبه نأخذ.

"মুহাম্মদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন, চার শ্রেণীর মানুষের উপর জুম'আর নামায ওয়াজিব নয়। মহিলা, কৃতদাস, মুসাফির এবং অসুস্থ ব্যক্তি। ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, যদি তারা জুম'আ আদায় করে নেয়, তাহলে অবশ্য আদায় হয়ে যাবে।"[২৪৪]

দুই নামায একসাথে আদায় করা

আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক নামাযকে ওয়াক্তের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ এর তা'লীম ও ধারাবাহিক আমল ছিলো প্রতিটি নামায নিজ ওয়াক্তে আদায় করা। তাই নামাযের একটি মূলনীতি হলো, নামায তার নিজ ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে। এক নামাযকে অন্য ওয়াক্তে আদায় করা যাবে না। তবে হজ্বের সময় আরাফার দিন আরাফায়ে যোহর ও আসর যোহরের ওয়াক্তে, আর মুযদালিফায় মাগরিব ও এশা উভয় নামায এশার ওয়াক্তে একসাথে পড়তে হবে। এই নামাযগুলো ব্যতীত আর কোথাও কোনো অবস্থাতেই দুই নামায এক সময়ে আদায় করা জায়েয নয়। কারণ, প্রতিটি নামায তার নির্ধারিত সময়ে পড়ার ব্যাপারে কুরআন, হাদীসে তাকীদ এসেছে। যেমন, কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَٰبًا مَّوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

"নিশ্চয় মুমিনদের উপর নির্দিষ্ট সময়ে নামায ফরয করা হয়েছে।"[২৪৫]

অনুরূপভাবে হাদীস শরীফে এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

ما رأيت رسول الله ﷺ صلى صلاة إلا لميقاتها، إلا صلاتين، صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها.

"আমি দুইটি নামায ব্যতীত রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সময়ের বাইরে (আগে-পরে) নামায পড়তে দেখিনি। মাগরিব এবং ইশার নামায ইশার সময়ে মুযদালিফায় একত্রে একবার পড়তে দেখেছি। আর ঐ দিন স্বাভাবিক সময়ের পূর্বে ফজরের নামায পড়তে দেখেছি।"[২৪৬]

হযরত আতা ইবনে আবী রবাহ রাহ. ও হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমান রাহ.। ইমামুল হাদীস আমের ইবনে শুরাহবিল এবং আদী ইবনে সাবেত রাহ. প্রমূখ। ইমাম আবু হানীফা রাহ. হাম্মাদ ইবনে আবী সুলাইমানের সান্নিধ্যে আঠার বছর থেকে ফিক্হ অর্জন করেন। আর শাগরেদদের মধ্যে অন্যতম হলেন, হযরত ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ, ইমাম যুফার ইবনে হুযাইল, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান রাহ. প্রমুখ। তিনি সর্ব প্রথম সুবিন্যাস্তভাবে শরী'আত সংকলন করেন। তাঁর সংকলিত কিতাবুল আছার সর্বাধিক সহীহ কিতাব বলে বিবেচিত। -ফাযায়িলু আবী হানীফা; আল ইনতিকা ফী ফাযায়িলিল আইম্মাতিছ ছালাছাতিল ফুকাহা; মানাকিবু আবী হানীফা লিয-যাহাবী

[২৪৪] কিতাবুল আছার: হাদীস নং ১৯৯

[২৪৫] সূরা নিসা: ১০৩

[২৪৬] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১২৮৯

অবশ্য সফরজনিত সমস্যার কারণে দুই নামাযকে এভাবে আদায় করা জায়েয আছে যে, প্রথম নামাযকে তার একেবারে শেষ ওয়াক্তে আদায় করে পরবর্তী নামাযকে তার শুরু ওয়াক্তে আদায় করবে। এতে প্রতিটি নামায তার নিজ নিজ নির্ধারিত সময়েই আদায় হবে। এক্ষেত্রে দুই ওয়াক্তের নামায বাহ্যত একত্রে আদায় করা হয়েছে বলে মনে হলেও বাস্তবে একত্রিত হয়নি। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এভাবে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن النبي ﷺ كان يؤخر الظهر ويعجل العصر، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء في السفر.[২৪৭]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ সফরে যোহরের নামায শেষ ওয়াক্তে ও আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে এবং মাগরিব শেষ ওয়াক্তে ও ইশা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করতেন।"[২৪৮]

যেহেতু কুরআন হাদীস ও ইজমা দ্বারা দুই ওয়াক্ত নামায বাস্তবিকভাবে একত্রে পড়া প্রমাণিত নেই অতএব, কোনো সম্ভাবনাপূর্ণ (একাধিক অর্থবোধক) হাদীস দ্বারা এর বিপরীত বিধান প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। এব্যাপারে ইমাম আবু বকর আল-জাসসাস রাহ. বলেন-

ونقل الناس هذه المواقيت نقلا عاما، قولا وفعلا، بحيث يوجب العلم والعمل، فلا يجوز لأحد تركها إلا بمثل ما ورد به نقل الأصل، ولا يجوز إسقاطها بأخبار الآحاد، وبما يحتمل التأويل، ولا بالنظر والمقاييس.

"পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ওয়াক্তসমূহ পুরো উম্মতে মুসলিমার মৌখিক ও কর্মধারার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে বর্ণিত হয়েছে। যা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, তার উপর আমল করা ও অকাট্য বিশ্বাস করা আবশ্যক। সুতরাং উক্ত হাদীসের ন্যায় সর্বগুণে মানে উন্নীত কোনো হাদীস ব্যতীত উক্ত হাদীসকে বাদ দেয়া (তথা দুই ওয়াক্তের নামাযকে এক ওয়াক্তে পড়া) জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে শুধু একজন রাবীর বর্ণনার দ্বারা বা সম্ভাবনাপূর্ণ (একাধিক অর্থবোধক) হাদীস দ্বারা অথবা শুধু যুক্তি দ্বারা উক্ত হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা জায়েয হবে না।"[২৪৯]

নামাযের দু'আ-কেরাত সংক্ষেপ করা প্রসঙ্গ

সফরে তাড়াহুড়ার মুহূর্তে নামযের মাসনূন তাসবীহ তিনবারের স্থলে একবার পড়া যাবে এবং সূরা কিরাত সংক্ষেপ করা যাবে। যেমন ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

وفي السفر يقرأ بفاتحة الكتاب، وأي سورة شاء، لما روي أن النبي ﷺ قرأ في صلاة الفجر في سفره بالمعوذتين ... وهذا إذا كان على عجلة من السير، وإن كان في أمنة وقرار، يقرأ في الفجر نحو سورة

[২৪৭] أخرجه ابن أبي شيبة في « المصنف» ٢١٠/٢ (٨٢٣٨) والطحاوي في « شرح معاني الآثار» ١٦٤/١ وانظر تخريجه وشواهده بما يقويه في تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة لـ« المصنف» ٣٧٦ (١٢٧١)

[২৪৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ৮২৩৮

[২৪৯] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/১০২. মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

البروج وانشقت، لأنه يمكنه مراعاة السنة مع التخفيف.

“সফরে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য যে কোনো সূরা ইচ্ছা পড়া যাবে। কেননা বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ (লম্বা সূরা পড়ার অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও) সফরে ফজরের নামাযে সূরায়ে ফালাক ও সূরায় নাস পাঠ করেছেন... এভাবে তখন আদায় করবে যখন তাড়াহুড়া থাকবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তি শান্ত ও স্থির অবস্থায় থাকে, তাহলে ফজরের নামাযে সূরায় ‘বুরূজ’ ও ‘ইনশাক্কাত’ এর মত দীর্ঘ সূরা পাঠ করবে। কেননা তখন তাখফীফ সহকারে সুন্নাতের উপর আমল করা সম্ভব।”[২৫০]

সফরে সুন্নত নামাযের হুকুম

মুসাফিরের জন্য ফজরের সুন্নত ব্যতীত অন্যান্য সুন্নত নামাযের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা নেই। ইসলাম এক্ষেত্রে এক ধরনের শিথিলতা প্রদান করেছে। তাই মুসাফিরের জন্য সুন্নত পড়া আবশ্যক নয়। কোনো তাড়াহুড়া কিংবা সময়ের স্বল্পতা থাকলে তখন সুন্নত না পড়াই উত্তম। হযরত হাফস ইবনে আসেম রাহ. বলেন-

صحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله، وجلس وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى، فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي، يا ابن أخي! إني صحبت رسول الله ﷺ في السفر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان، فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وقد قال الله (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة).

“হযরত হাফস ইবনে আছেম রাযি. বলেন, আমি মক্কার সফরে একবার ইবনে ওমর রাযি. এর সাথে ছিলাম। তিনি আমাদেরকে দুই রাকা‘আত যোহর পড়ালেন। এরপর সামনে চললেন। আমরাও তার সঙ্গে চলতে শুরু করলাম। ইতোমধ্যে সাওয়ারীর কাছে এসে গেলেন। তিনি বসলেন, আমরাও তার সাথে বসলাম। অতঃপর তিনি যেখানে নামায পড়েছেন সেদিকে লক্ষ্য করলেন এবং কিছু লোককে দন্ডায়মান দেখে বললেন, তারা কী করছে? বললাম, তারা তাসবীহ (নামায) পড়ছে। তিনি বললেন, হে ভাতিজা! যদি আমি নামায পড়তাম (অর্থাৎ ফরযের পর সুন্নত পড়তাম) তাহলে তো ফরযই পুরা পড়তাম। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সফর করেছি, তিনি দু’রাকাতের বেশি পড়েননি। এ আমলের উপরই তিনি পরলোক গমন করেছেন। আমি হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর সঙ্গে সফর করেছি, তিনিও অন্তিমকাল পর্যন্ত দু’রাকা‘আত আদায় করেছেন, এর বেশি নয়। অনুরূপভাবে হযরত ওমর রাযি. এর সঙ্গে সফর করেছি, তিনিও আমৃত্যু দুই রাকাতের বেশি পড়েননি। হযরত উসমান রাযি. এর সঙ্গে সফর করেছি, তিনিও আমৃত্যু দুই রাকা‘আত

---

[২৫০] হেদায়া: ১/১৯৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

নামায পড়েছেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ ﷺ এর জীবনে রয়েছে তোমাদের জন্য অনুপম আদর্শ।”[২৫১]

ইমাম আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. উল্লেখ করেন-

(ويأتي) المسافر (بالسنن) إن كان (في حال أمن وقرار وإلا) بأن كان في خوف وفرار (لا) يأتي بها هو المختار، لأنه ترك لعذر «تجنيس» ، قيل إلا سنة الفجر.

“মুসাফির ব্যক্তি যদি স্থির এবং নিরাপদ অবস্থায় থাকে, তাহলে সে সুন্নত আদায় করবে। আর যদি সে ভীত এবং পলায়নরত হয়, তাহলে সুন্নত আদায় করবে না। আর এটাই গ্রহণযোগ্য মত। কিন্তু কেউ কেউ বলেছেন যে, এ অবস্থায়ও ফজরের সুন্নত আদায় করবে।”[২৫২]

অবশ্য যদি কোথাও দুই চার দিনের জন্য অবস্থান করতে হয়, তাহলে সুন্নতগুলো আদায় করে নেয়াই উত্তম। রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে এরূপ আমল প্রমাণিত আছে। হযরত উম্মে হানী রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ صلى في بيتها عام الفتح ثماني ركعات في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় আমার ঘরে এমন একটি কাপড়ে আট রাকা‘আত নামায আদায় করেছেনম যার এক পার্শ্ব অন্য পার্শ্বের বিপরীত ছিল।”[২৫৩]

বলাবাহুল্য যে, রাসূল ﷺ মক্কা বিজয়ের সময় মক্কায় মুসাফির ছিলেন। তিনি মুসাফির হওয়া সত্ত্বেও আট রাকা‘আত নফল নামায আদায় করেন।

হযরত ইবনে ওমর রাযি. বলেন-

صليت مع النبي ﷺ في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعا وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، لا تنقص في الحضر ولا في السفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين.

“আমি সফরে এবং ইকামাতে রাসূল ﷺ এর সাথে নামায আদায় করেছি। তবে মুকীম অবস্থায় রাসূল ﷺ এর সাথে যোহরের নামায চার রাকা‘আত আদায় করেছি এবং যোহরের পর দুই রাকা‘আত পড়েছি। আর মুসাফির অবস্থায় যোহরের নামায দুই রাকা‘আত আদায় করেছি এবং তার পরে দুই রাকা‘আত পড়েছি। আর আসরের নামায দুই রাকা‘আত পড়েছি, তিনি আসরের পর কোনো নামায আদায় করেননি। আর মাগরিবের নামায সফরে

---

[২৫১] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৬৮৯
[২৫২] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৬১৩
[২৫৩] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৭১৯-৭২০

এবং ইকামাতে তিন রাকা'আত আদায় করেছি এবং তারপর দুই রাকা'আত পড়েছি।"[২৫৪]

কিন্তু বর্তমান সমাজে কিছু সংখ্যক লোক এমন আছে দ্বীনের এই সঠিক জ্ঞান না থাকার কারণে যারা উভয় ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে। অর্থাৎ কিছু লোক সফর অবস্থায় সুন্নত একেবারেই আদায় করে না; বরং তারা বলে, 'সফরে সুন্নত আদায় করতে হয় না।' আর কিছু লোক সুন্নতের খুব পাবন্দী করে, যার কারণে তার সাথী-সঙ্গীদেরকে এমনকি অনেক সময় স্বয়ং তাকেও পেরেশান বা কষ্টের শিকার হতে হয়। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে সফরের সকল আহকামের সমূহের সঠিক জ্ঞান দান করে সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

---

[২৫৪] জামে তিরমিযী: ১/১২৩; ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

তাবলীগী সফর, শ্বশুরালয় ও পিত্রালয়ে নামায

মাওলানা আব্দুল করীম ঢাকা

সফর মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, ধনী-গরীব সকলেই কম-বেশি সফর করে থাকে। আর সফর বলতেই কষ্ট। সেই কষ্টকে সামনে রেখে শরী'আত মুসাফিরের জন্য বিভিন্ন আহকামে সহজ-সরলতার দিক অবলম্বন করেছে। যার অন্যতম হচ্ছে নামায। তাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাবলীগী জামাত সফরে এবং (সফরের দূরত্বে) জামাই শ্বশুরালয়ে ও মেয়ে পিত্রালয়ে কখন কীভাবে নামায আদায় করবে, তার শর'য়ী বিধান আলোচনা করা হলো।

মুসাফিরের পরিচয়

মুসাফির বলা হয়, যার মধ্যে তিনটি শর্ত পাওয়া যায়। যদি এর কোনো একটি শর্তও না পাওয়া যায়, তাহলে সে মুসাফির হবে না।

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. শর্তগুলো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন-

فالذي يصير المقيم به مسافرا نية مدة السفر، والخروج من عمران المصر، فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء. أحدها: مدة السفر... والثاني: نية مدة السفر، لأن السير قد يكون سفرا وقد لا يكون... فلا بد من النية للتمييز... والثالث: الخروج من عمران المصر، فلا يصير مسافرا بمجرد نية السفر ما لم يخرج من عمران المصر.

"যে সকল শর্ত পাওয়া গেলে শরী'আতের দৃষ্টিতে মুকীম মুসাফির হয়, তা হলো, সফরের দূরত্ব অতিক্রমের নিয়ত করা ও শহরের আবাদী থেকে বের হওয়া। সুতরাং এক্ষেত্রে তিনটি বিষয়ের উপস্থিতি আবশ্যক। **এক.** সফরটা শরী'আত কর্তৃক সফরের নির্ধারিত দূরত্বে হওয়া। (শর'য়ী সফরের দূরত্ব: তিন দিন তিন রাতের পথ। অর্থাৎ ৪৮ মাইল, যা বর্তমানে ৭৭ কি.মি. ২৪৮ মি.।[২৫৫] তবে সতর্কতামূলক ৭৮ কিলোমিটার ধরা উত্তম।) **দুই.** একই সাথে শর'য়ী সফরের দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়ত করা। কারণ মানুষ কখনো পথ চলে সফরের উদ্দেশ্যে, আবার কখনো সফরের নিয়ত থাকে না। তাই উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করার জন্য নিয়ত আবশ্যক। **তিন.** শহর, গ্রাম বা জনপদের লোকালয় থেকে বের হওয়া। শহরের বসতি থেকে বের না হয়ে শুধু সফরের নিয়ত করলে মুসাফির হবে না।"[২৫৬]

মুসাফির মুকীম হওয়ার উপায়সমূহ

মুসাফিরের মাঝে চারটি শর্তের যে কোনো একটি পাওয়া গেলে মুকীম হয়ে যাবে।

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বিস্তারিতভাবে এই চারটি শর্তের আলোচনা করেছেন-

---

[২৫৫] জাওয়াহিরুল ফিকহ, আওযানে শরইয়্যাহ অধ্যায়: ১/৪৩৬-৪৩৮, মাকতাবা তাফসীরুল কুরআন, সাইয়িদ মঞ্জিল, দেওবন্দ
[২৫৬] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৬১-২৬৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

فالمسافر يصير مقيما بوجود الإقامة ، والإقامة تثبت بأربعة أشياء:

أحدها: صريح نية الإقامة وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوما في مكان واحد صالح للإقامة فلا بد من أربعة أشياء... **أما نية الإقامة** : فأمر لا بد منه عندنا، حتى لو دخل مصرا، أو مكث فيه شهرا أو أكثر لانتظار القافلة أو لحاجة أخرى، يقول : أخرج اليوم أو غدا، ولم ينو الإقامة لا يصير مقيما... **وأما مدة الإقامة** : فأقلها خمسة عشر يوما عندنا... **وأما اتحاد المكان** : فالشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد ؛ لأن الإقامة قرار، والانتقال يضاده، ولا بد من الانتقال في مكانين، وإذا عرف هذا فنقول : إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كانا مصرا واحدا أو قرية واحدة صار مقيما ؛ لأنهما متحدان حكما... **وأما المكان الصالح للإقامة** : فهو موضع اللبث والقرار في العادة نحو الأمصار والقرى ، وأما المفازة والجزيرة والسفينة فليست موضع الإقامة ، حتى لو نوى الإقامة في هذه المواضع خمسة عشر يوما لا يصير مقيما كذا روي عن أبي حنيفة.

والثاني: وجود الإقامة بطريق التبعية، وهو أن يصير الأصل مقيما، فيصير التبع أيضا مقيما بإقامة الأصل ، كالعبد يصير مقيما بإقامة مولاه ، والمرأة بإقامة زوجها ، والجيش بإقامة الأمير ونحو ذلك.

وأما الثالث: فهو الدخول في الوطن، فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيما ، سواء دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة، والخروج بعد ذلك.

وأما الرابع: فهو العزم على العود للوطن، وهو أن الرجل إذا خرج من مصره بنية السفر، ثم عزم على الرجوع إلى وطنه ، وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة سفر، يصير مقيما حين عزم عليه.

"মুসাফির মুকীম হয় ইকামতের কারণে। আর ইকামত প্রমাণিত হয় চারভাবে। **এক.** ইকামাতের যোগ্য কোনো স্থানে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করা। এক্ষেত্রে চারটি বিষয়ের সমন্বয় ঘটা আবশ্যক।

১. ইকামাতের নিয়ত করা। কেউ যদি কোনো শহরে প্রবেশ করে এবং সেখানে এক মাস বা আরো বেশি সময় অবস্থান করে কোনো কাফেলার অপেক্ষায় অথবা অন্য কোনো প্রয়োজনে, এবং আজ যাবো কাল যাবো করে অনেক দিন পার করে দেয়, অথচ (পনের দিন বা তার বেশি সময়) অবস্থানের নিয়ত না করে, তাহলে সে মুকীম হবে না।

২. ইকামাতের সময় নির্ধারণ করা। হানাফী মাযহাবে ইকামাতের সর্বনিম্ন সময় হলো পনের দিন। (সুতরাং পনের দিনের কম সময় ইকামতের নিয়ত করলে মুকীম হবে না।)

৩. নিয়তে ইকামাতের স্থান এক হওয়া। অর্থাৎ একস্থানেই পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করা। তাই কোনো মুসাফির যদি দুই জায়গায় পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে, আর এই দু'টি জায়গা একই শহর বা একই গ্রামে হয়, তাহলে সে মুকীম হবে। কেননা এই দু'টি স্থান ভিন্ন দেখা গেলেও এক্ষেত্রে এক স্থানই ধরা হবে।

৪. স্থানটা ইকামাতের জন্য উপযুক্ত হওয়া। অর্থাৎ স্বাভাবিক অবস্থান ও স্থিতির জায়গা, যেমন শহর বা গ্রাম। পক্ষান্তরে যদি তা হয় বিশাল শূন্য ময়দান, মরুভূমি বা জাহাজ, তাহলে সেটা ইকামাতের জায়গা নয়। এমন স্থানে যদি কেউ পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সে মুকীম হবে না। এমনটিই বর্ণিত আছে ইমাম আবু হানীফা রাহ. থেকে।

দুই. কারো অনুগত হিসেবে ইকামাত করা। আর তা এভাবে যে, আসলের (অনুসৃতের) ইকামাতের দ্বারা অনুসারীর ইকামাতের নিয়ত হয়ে যাবে। যেমন স্ত্রী তার স্বামীর, চাকর বা গোলাম তার মনিবের এবং সেনাবাহিনী সেনাপতির নিয়ত দ্বারা মুকীম বা মুসাফির হবে। অর্থাৎ অনুসৃত ব্যক্তি মুকীম হলে অনুসারীও মুকীম হয়ে যাবে কোনো নিয়ত ছাড়াই।

তিন. 'ওয়াতনে আসলী' অর্থাৎ নিজ শহর বা গ্রামে প্রবেশ করা। চাই সে অবস্থানের জন্য কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনে বা পথ অতিক্রমের জন্য প্রবেশ করুক না কেন। সর্বাবস্থায়ই সে মুকীম হয়ে যাবে।

চার. 'ওয়াতনে আসলী'তে ফিরে আসার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি সফরের নিয়তে তার শহর থেকে বের হওয়ার পর যদি আবার নিজ শহরে ফিরে আসার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে, আর তার অবস্থানস্থল ও তার নিজ শহরের মাঝে সফরের দূরত্ব না থাকে, তাহলে তার প্রতিজ্ঞার সময় থেকে সে মুকীম হিসেবে গণ্য হবে।"[২৫৭]

তাবলীগী জামা'আতের সফর প্রসঙ্গ

মুসাফির ও মুকীম সংক্রান্ত আলোচনাকে ভিত্তি করে তাবলীগী জামা'আতের সফরে নামায কসর করা না করা সম্পর্কে কিছু মাসআলার আলোচনা তুলে ধরা হলো।

মারকাযে অবস্থানকালীন সময়ের হুকুম

যদি মারকায মসজিদ আর তার নিজ শহর বা গ্রামের মাঝে সফরের দূরত্ব না থাকে, এমতাবস্থায় মারকাযে অবস্থানকালে সে মুসাফির হবে না। কারণ মুসাফির হওয়ার জন্য সফরের শুরু থেকেই নিশ্চিতভাবে ৭৮ কি.মি. দূরত্ব অতিক্রম করার নিয়ত করা শর্ত।

আর যদি শহর বা গ্রাম থেকে মারকায মসজিদ ৭৮ কি.মি. দূরত্বে হয়, তাহলে শহরবাসীরা নিজ শহর বা পৌরসভার নির্ধারিত সীমারেখা আর গ্রামবাসীরা নিজ গ্রামের সীমানা অতিক্রম করলেই মুসাফির হয়ে যাবে।

এরপর মারকাযে আসার পর যদি সেখানে পনের দিন বা আরো বেশি সময় থাকার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে না পারে, তাহলে তারা মুসাফিরই থাকবে। আর যদি পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের ব্যাপারে নিশ্চিত হয় এবং নিয়তও করে, তাহলে মুকীম হয়ে যাবে। কেননা মুকীম হওয়ার জন্য কোনো স্থানে পনের দিন বা আরো বেশি সময় ইকামাতের নিয়ত করাই যথেষ্ট।

যে সকল সাথী মারকাযে ইন্তেজামের দায়িত্ব পালন করার জন্য বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসে

---

[২৫৭] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৬৮-২৮২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

বিভিন্ন মেয়াদে মারকাযে অবস্থান করেন, তাদের মধ্য থেকে যাদের শহর বা গ্রাম মারকায থেকে সফরের দূরত্বে অবস্থিত, তারা শহর বা গ্রামের সীমানা পার হলেই মুসাফির হয়ে যাবে। এরপর যদি মারকাযে পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে সেখানে মুকীম হিসেবে থাকবে। আর যাদের গ্রাম বা শহর মারকায থেকে সফরের দূরত্বে নয় তারা সর্বাবস্থায় মুকীম থাকবে।

তিন চিল্লা বা সালের সাথীরা চিল্লার অন্তর অন্তর মারকাযে অবস্থানকালে যদি পনের দিনের কম সময় থাকার নিয়ত করে, তাহলে তারা মুসাফির হিসেবে কসর করবে। আর যদি পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করে, তাহলে তারা মুকীম হিসেবে থাকবে।

সফরকালীন সময়ের বিধান

মারকায মসজিদে মুকীম হিসেবে অবস্থানকারী জামা'আতের রোখ (গন্তব্য) যদি মারকায থেকে ৭৮ কি.মি. দূরত্বে না হয়, তাহলে মুসাফির হবে না। কিন্তু বাড়ি ফেরার সময় রোখ থেকে নিজ শহর বা গ্রামের দূরত্ব ৭৮ কি.মি. হলে সে ফেরার পথে মুসাফির থাকবে নিজ শহর বা গ্রামে প্রবেশের পূর্ব পর্যন্ত। আর যদি রোখ ৭৮ কি.মি. দূরত্বে হয়, তাহলে মারকাযস্থ শহর অতিক্রম করলেই মুসাফির হবে।

মারকায কর্তৃক নির্ধারিত গন্তব্যে পৌঁছতে যদি জামা'আতের কোনো সাথীর গ্রাম বা শহরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়, তাহলে ঐ সাথী তার শহরে বা গ্রামের এরিয়ার ভেতর প্রবেশ করার সাথে সাথে মুকীম হয়ে যাবে। তবে তার এলাকা থেকে যদি জামা'আতের রোখ (গন্তব্য) সফরের দূরত্বে হয়, তাহলে সে তার এলাকা থেকে বের হলে পুনরায় মুসাফির হবে। অন্যথায় মুকীম থাকবে। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. উল্লেখ করেন-

وأما الثالث: فهو الدخول في الوطن، فالمسافر إذا دخل مصره صار مقيما، سواء دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء حاجة، والخروج بعد ذلك.

"ওয়াতনে আসলী অথাৎ নিজ শহর বা গ্রামে প্রবেশ করলে মুকীম হয়ে যাবে। সে অবস্থানের জন্য কিংবা কোনো প্রয়োজনে অথবা পথ অতিক্রমের জন্য প্রবেশ করুক না কেন।"[২৫৮]

নির্ধারিত রোখে অবস্থানকালীন সময়ের বিধান

যদি কোনো জামাতকে পনের দিন বা আরো বেশি সময়ের জন্য সফরের দূরত্বে কোনো শহরে পাঠানো হয়, তাহলে তারা ঐ শহরে গিয়ে পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত না করা পর্যন্ত মুসাফির থাকবে। আর নিয়ত করার পর মুকীম হয়ে যাবে। কারণ পুরো শহরটা তাদের জন্য এক স্থানের মত।

এমনিভাবে যদি তাদেরকে কোনো ইউনিয়নে পাঠানো হয়, তখন ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রাম তাদের জন্য আলাদা আলাদা জায়গা হিসেবে গণ্য হবে। হ্যাঁ, যদি এমন কোনো বড় গ্রাম থাকে যেখানে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করা যায়, তাহলে সেখানে পনের দিনের নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যাবে।

---

[২৫৮] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৭৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

وأما اتحاد المكان : فالشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد ؛ لأن الإقامة قرار والانتقال يضاده ولا بد من الانتقال في مكانين، وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوما في موضعين فإن كانا مصرا واحدا أو قرية واحدة صار مقيما ؛ لأنهما متحدان حكما.

"নিয়তে ইকামাতের স্থান এক হওয়া। অর্থাৎ একস্থানেই পনের দিন বা আরো বেশি সময় অবস্থানের নিয়ত করা। সুতরাং আমরা বলবো, কোনো মুসাফির যদি দুই জায়গায় পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে, আর এই দু'টি জায়গা একই শহর বা একই গ্রামে হয়, তাহলে সে মুকীম হবে। কেননা এই দু'টি স্থান ভিন্ন দেখা গেলেও এক্ষেত্রে এক স্থানই ধরা হবে।"[২৫৯]

যদি মারকায কর্তৃক এমন শহর বা গ্রামে জামা'আতের রোখ দেয়া হয় যেখানে কোনো সাথীর ওয়াতনে আসলী (মূল বাসস্থান) বা ওয়াতনে ইকামাত (অস্থায়ী বাসস্থান) আছে, তাহলে এই সাথী তার শহর বা গ্রামে প্রবেশ করামাত্র মুকীম হয়ে যাবে। এব্যাপারে ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. বলেন-

وإذا دخل المسافر في مصره أتم الصلاة وإن لم ينو المقام فيه، لأنه ﷺ وأصحابه ﷺ كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم مقيمين من غير عزم جديد.

"মুসাফির যখন তার শহরে প্রবেশ করবে তখন নামায পূর্ণ করবে (কারণ সে মুকীম হয়ে গেছে) যদিও সে তার শহরে অবস্থানের নিয়ত না করে। কেননা রাসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ সফর করতেন আবার ঘরে ফিরে আসতেন, নতুন করে কোনো ধরনের ইকামাতের নিয়ত ছাড়াই মুকীম হয়ে যেতেন।"[২৬০]

মহিলাদের সফর

মহিলাদের সফর কিংবা ইকামাতের নিয়ত পুরুষদের উপর নির্ভর করবে। অতএব, তারা সফরের নিয়ত করলে মহিলারা মুসাফির হবে আর ইকামাতের নিয়ত করলে তারাও মুকীম হবে। কেননা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সফর অবস্থায় অনুসারী তার অনুসৃতের হুকুমে গণ্য হবে।

الأصل: أن من يمكنه الإقامة باختياره يصير مقيما بنية نفسه، ومن لا يمكنه الإقامة باختياره لا يصير مقيما بنية نفسه، حتى أن المرأة إذا كانت مع زوجها في السفر، والرقيق مع مولاه، والتلميذ مع أستاذه، والأجير مع مستأجره، والجندي مع أميره، فهؤلاء لا يصيرون مقيمين بنية أنفسهم في ظاهر الرواية، كذا في المحيط.

"মূলনীতি: যে নিজের ইচ্ছায় ইকামাতের ক্ষমতা রাখে, সে নিজের নিয়তেই মুকীম হবে। আর যে নিজের ইচ্ছায় ইকামাতের ক্ষমতা রাখে না, সে নিজের নিয়তে মুকীম হবে না।

---

[২৫৯] বাদায়েউস সানায়ে: ১/২৭০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৬০] হেদায়া: ১/১৬৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

সুতরাং মহিলা যখন তার স্বামীর সাথে সফর করবে, গোলাম তার মুনিবের সঙ্গে, ছাত্র তার উস্তাদের সঙ্গে, কর্মচারী তার মালিকের সঙ্গে এবং সৈন্য সেনাপতির সঙ্গে সফর করবে, তখন তারা নিজেদের নিয়তে মুকীম হবে না। এটিই জাহেরুর রেওয়ায়া।"[২৬১]

শ্বশুর বাড়িতে জামাতার ও পিত্রালয়ে মেয়ের নামায

ফিকহের কিতাবাদিতে সফরের অধ্যায়ে তিন প্রকার 'ওয়াতন' বা বাসস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। **১.** ওয়াতনে আসলী (স্থায়ী বাসস্থান)। **২.** ওয়াতনে ইকামাত (অস্থায়ী বাসস্থান)। **৩.** ওয়াতনে সুকনা (সাময়িক অবস্থানের বাসস্থান)।

এ বিষয়ের পূর্ণ আলোচনা দেখলে বোঝা যায় যে, এই নামগুলো (এজাফী) অর্থাৎ আপেক্ষিক ও তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করা হয়েছে। যথা, সফর অবস্থায় একদিন দুই দিন এভাবে **১৫** দিনের কম কোথাও অবস্থান করলে তাকে 'ওয়াতনে সুকনা' বলা হয়। অর্থাৎ যেখানে নিতান্তই প্রয়োজনে অবস্থান করা হয়ে থাকে। দীর্ঘ সময় অবস্থানের নিয়ত নেই। এমনিভাবে যদি **১৫** দিন অবস্থানের নিয়ত না করে একদিন দুইদিন করতে করতে এক বছরও থাকা হয় তবুও মুসাফির থাকবে। কারণ সে **১৫** দিন এক সাথে থাকার নিয়ত করেনি।

'ওয়াতনে একামত' এর বিষয়টিও তেমনি। কেউ কোথাও **১৫** দিন থাকার নিয়ত করলে ঐ স্থান তার জন্য 'ওয়াতনে ইকামাত' হয়ে যাবে। ইকামাত বলা হয়েছে যেহেতু নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ পর্যন্ত সেখানে ইকামাত বা অবস্থান করা হবে। আবার 'আসলী' বা স্থায়ী বলা হয়নি। যেহেতু সে স্থায়ীভাবে সেখানে থাকার সংকল্প করেনি। বরং তার নিয়ত হলো নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে চলে যাওয়ার, থাকার নয়।

আর 'ওয়াতনে আসলী' হলো যেখানে একজন স্থায়ীভাবে থাকার নিয়ত করে এবং স্থায়ীভাবে থাকার জন্য ব্যবস্থাপনাও গ্রহণ করে।

মোটকথা যে কোনো ব্যক্তির 'ওয়াতন' স্থির হওয়ার ক্ষেত্রে তার অবস্থানের ধরন ও প্রকৃতির দখল রয়েছে। এ জন্য অনেকেই ওয়াতনে আসলীর পরিচয়ে 'অবস্থান করা ও সেখান থেকে স্থানান্তর না হওয়া'র কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

الوطن الأصلي: هو وطن الإنسان في بلدته، أو بلدة أخرى اتخذها دارا، وتوطن بها مع أهله وولده، وليس من قصده الارتحال عنها بل التعيش بها.

"ওয়াতনে আসলী হলো, কোনো ব্যক্তির নিজ শহরের আবাসস্থল, কিংবা অন্য শহরের আবাসস্থল যেটা সে তার সন্তান-সন্ততি ও পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য গ্রহণ করেছে। আর তার এখান থেকে চলে যাওয়ারও ইচ্ছা নেই। বরং স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা।"[২৬২]

তাহলে বুঝা গেলো, ওয়াতনে আসলীর অন্যতম শর্ত হলো স্থায়ীভাবে অবস্থান করার সংকল্প থাকা। তবে মনে রাখতে হবে যে, স্থায়ীভাবে সংকল্প করার অর্থ এই নয় যে, সেখানে

---

[২৬১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/২০১ দারুল ফিকর, বৈরুত

[২৬২] আল বাহরুর রায়েক: ২/২৩৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

স্বশরীরে থাকতে হবে। বরং কেউ যদি দুই শহরে বিবাহ করে এবং দুই শহরে দুই স্ত্রী থাকে তাহলে যেহেতু সে দুই শহরকেই নিজের স্থায়ী ঠিকানা মনে করে এবং কোনো এক শহর থেকে স্থানান্তর হওয়ার সংকল্প আপাতত নেই তাই উভয় শহর তার জন্য ওয়াতনে আসলী হবে। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ولو كان له أهل ببلدتين فأيتهما دخلها صار مقيما، فإن ماتت زوجته في إحداهما وبقي له فيها دور وعقار قيل لا يبقى وطنا له إذ المعتبر الأهل دون الدار.

"যে ব্যক্তির দুই শহরে দুইজন স্ত্রী আছে, সে যে শহরেই প্রবেশ করবে মুকীম হয়ে যাবে। যদি কোনো এক স্ত্রী মারা যায় আর সেই শহরে তার ঘর-বাড়ি ও জমি থাকে, তাহলে কারো কারো মতে তা তার ওয়াতন (বাসস্থান) হিসেবে বাকি থাকবে না। কারণ ওয়াতন (বাসস্থান) হওয়ার জন্য শর্ত হলো স্ত্রী থাকা, ঘর বাড়ি থাক বা না থাক।"[২৬৩]

স্থায়ীভাবে অবস্থানের কিছু আলামত

ফুকাহায়ে কেরাম স্থায়ীভাবে অবস্থানের সাধারণত তিনটি আলামত উল্লেখ করে থাকেন।

১. تولد জন্মস্থান। মানুষ যেখানে জন্মগ্রহণ করে সাধারণত সেখানে স্থায়ীভাবে পিতা-মাতার সাথে থাকা হয়। তাই জন্মস্থানে পিতা-মাতা থাকলে সে পরবর্তীতে অন্য বাড়ি ঘর করলেও নিজের জন্মস্থান (যেখানে পিতা-মাতা থাকেন) তা তার জন্য ওয়াতনে আসলী হিসেবে বাকি থাকবে। কারণ নিজের পিতা-মাতার বাড়িকে মানুষ নিজের ঠিকানা মনে করে। সুতরাং কোনো মেয়ের দূরে কোথাও বিবাহ হলে তার জন্মস্থান 'ওয়াতনে আসলী' হিসেবে থাকবে। যেহেতু অন্যত্র বিবাহ হলেও নিজ পিতা-মাতার বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করার নিয়ত থাকে না। বরং আপদে-বিপদে নিজ পিতা-মাতার বাড়ি আশ্রয়স্থল মনে করে থাকে। তাই স্বামীর বাড়ি থেকে পিতার বাড়িতে এলে মুকীম থাকবে। তবে কোনো ছেলে নিজ জন্মস্থান সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করে অন্যত্র নিজের আবাসস্থল স্থির করলে তার জন্মস্থান ওয়াতনে আসলী হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না।

২. تأهل স্বস্ত্রীক অবস্থান। কেউ কোথাও বিবাহ করে সেখানে স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে রাখলে নিজের ঠিকানা মনে করে। এবং স্থায়ী আবাসস্থলের ন্যায় সব ধরনের ব্যবস্থাপনা করে থাকে। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. হেদায়ার ইবারতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে সমকালীন 'উরফ' সম্পর্কে বলেন-

أما العرف فلأن الزوج يقيم في البلد الذي يتزوج فيه عادة.

"আর সমাজে এ প্রচলন রয়েছে যে, স্বামী যে শহরে বিয়ে করে সাধারণত সেই শহরই তার বসবাসস্থল হয়ে থাকে।"[২৬৪]

এক্ষেত্রে স্বামীর শ্বশুর বাড়িতে সব সময় উপস্থিত থাকা জরুরী নয়। স্ত্রীকে স্থায়ীভাবে

[২৬৩] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/১৩১, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

[২৬৪] আল বিনায়া: ৫/৬৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; মাকতাবায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ

রাখলেই শ্বশুর বাড়ি ওয়াতনে আসলী গণ্য হবে।[২৬৫] তাই যখন শ্বশুর বাড়িতে যাবে, তখন মুকীম হবে। এছাড়াও স্ত্রীকে নিয়ে অন্য কোথাও স্থায়ীভাবে থাকার ইচ্ছা করলে সেই স্থান তার জন্য ওয়াতনে আসলী হবে।

৩. توطن বাড়ি করা। কোথাও স্থায়ীভাবে থাকার জন্য বাড়ি ঘর করলে ঐ জায়গা তার জন্য ওয়াতনে আসলী হবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

الوطن الأصلي: هو موطن ولادته، أو تأهله، أو توطنه.

“ওয়াতনে আসলী হলো, তার জন্মভূমি অথবা যে ভূমিতে সে বিয়ে করেছে তা সে স্থায়ী স্থান আবাসরূপে গ্রহণ করেছে।”[২৬৬]

উপরের আলোচনা থেকে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়েছে যে, স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে অবস্থান করলে স্বামীর বাড়ি তার জন্য ওয়াতনে আসলী হয়ে যাবে। যেহেতু সে সাধারণত সেখানেই অবস্থানের সংকল্প করে থাকে। আর ইকামাত ও সফরের ক্ষেত্রে স্বামীর অনুগামী হওয়ার বিষয় তো আছেই। এর বিপরীত যদি স্বামী শ্বশুরালয়ে যায় আর স্ত্রী সেখানে স্থায়ীভাবে অবস্থান না করে, তাহলে শ্বশুর বাড়িতে স্বামীর (সফরের দূরত্ব হলে এবং পনের দিনের কম থাকার নিয়ত করলে) কসর করতে হবে।[২৬৭]
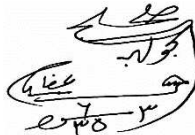
<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
১৩ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[২৬৫] أخرج الإمام أحمد في «مسنده» (٤٤٣) والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٣٥١) في معناه حديثا بطريق عكرمة بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن أبيه أن عثمان بن عفان ﷺ صلى بمنى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول من تأهل في بلد فليصل صلاة المقيم.

[২৬৬] আদ্দুররুল মুখতার: ২/১৩১, এইচ. এম. সাঈদ করাচী, পাকিস্তান

[২৬৭] ফাতাওয়ায়ে দারুল উলূম দেওবন্দ: ৪/৪৬৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মহিলাদের সফরে মাহরাম

মাওলানা মাসূম বিল্লাহ মোমেনশাহী

পুরুষের পাশাপাশি মহিলারও সফরের প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে হজ্বের সফর। আর মহিলাদের স্বভাব-প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য রেখেই শরী'আত তাদের সফরের ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু নিয়মনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। যার অনুসরণ যেভাবে মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, তেমনি সব ধরনের ফেতনা-ফাসাদ থেকেও হেফাজতে রাখে। তাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মহিলাদের সফর নিয়ে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

তবে মূল আলোচনা শুরু করার আগে সফরের দূরত্ব এবং মাহরামের পরিচয় ও প্রকার আলোচনা করা হচ্ছে।

সফরের দূরত্ব

প্রাচীনকাল থেকে সফরের প্রধান দু'টি পথ হলো স্থলপথ ও নৌপথ। এই দুই পথে তিনদিনের দূরত্ব হলো শর'য়ী সফরের দূরত্ব। অর্থাৎ কেউ যদি এই পরিমাণ দূরত্বে সফর করার ইচ্ছায় নিজ জনবসতি অতিক্রম করে, তাহলে সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। তবে তিন দিন, তিন রাত পুরো সময় পথ চলা শর্ত নয়; বরং একজন মানুষ স্বাভাবিক গতিতে নিজ প্রয়োজন পুরা করে তিন দিন তিন রাতে যতটুকু পথ চলতে পারে ততটুকুই সফরের দূরত্ব হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো। ইমাম আবুল বারাকাত আন নাসাফী রাহ. বলেন-

من جاوز بيوت مصره مريدا سيرا وسطا ثلاثة أيام في بر أو بحر أو جبل، قصر الفرض الرباعي.

"যে ব্যক্তি মধ্যম গতিতে তিন দিনের দূরত্বে সফরের নিয়ত করে নিজ শহরের জনবসতি অতিক্রম করে সে চার রাকা'আতবিশিষ্ট ফরয নামায দুই রাকা'আত পড়বে। সে সফর স্থলপথে হোক বা সমুদ্রপথে কিংবা পাহাড়িপথে।"[২৬৮]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

ولا يعتبر السير في البر بالسير في البحر، ولا السير في البحر بالسير في البر، وإنما يعتبر في كل موضع منهما ما يليق بحاله، كذا في الجوهرة النيرة.

"সমুদ্রপথে চলার উপর ভিত্তি করে স্থলপথের দূরত্ব সাব্যস্ত করা যাবে না। এবং স্থলপথে চলার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রপথের দূরত্ব সাব্যস্ত করা যাবে না। প্রত্যেক স্থানের দূরত্ব স্থির করা হবে তার নিজ অবস্থা বিবেচনা করে।"[২৬৯]

স্থলপথ: স্থলপথে তিন দিনের দূরত্ব হল ৪৮ মাইল।[২৭০] যা বর্তমানে ৭৭ কি.মি. ২৪৮ মি.। তবে সর্তকতামূলক ৭৮ কিলোমিটার ধরা হয়।

পাহাড়িপথ: তিন দিন তিন রাত পায়ে হেঁটে পাহাড়ি রাস্তায় চলার দ্বারা মুসাফির হয়ে যাবে। যদিও তা ৪৮ মাইল থেকে কম হোক না কেন।[২৭১]

---

[২৬৮] কানযুদ দাকায়েক, বাহরুর রায়েকের নুসখা: ২/২২৫-২৩০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৬৯] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৮ দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[২৭০] জাওয়াহিরুল ফিকহ, আওজানে শরইয়্যা অধ্যায়: ৩/৪২৫-৪২৭, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[২৭১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৩৯, যাকারিয়া; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২/৪৯১, যাকারিয়া

নৌপথ: স্বাভাবিক আবহাওয়ায় সাধারণ যানবাহনে (যেমন ইঞ্জিনবিহীন নৌকা ইত্যাদি) নদী পথে তিনদিনে যে পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করা যায় ঐ পরিমাণ দূরত্ব[২৭২] অতিক্রম করার ইচ্ছায় নিজ শহর বা গ্রাম থেকে বের হলে মুসাফির হিসেবে গণ্য হবে। যদিও ঐ পরিমাণ দূরত্ব কোনো দ্রুতগামী লঞ্চ বা স্পীড-বোটের মাধ্যমে অতিক্রম করা যায় আরো অল্প সময়ে।[২৭৩]

আকাশপথ: আকাশপথে বিমানের সফরে স্থলপথের দূরত্বই ধরা হবে। সুতরাং কেউ যদি আকাশপথে ৭৮ কি.মি. দূরে সফর করার ইচ্ছা করে, তাহলে নিজ এলাকার সীমা অতিক্রম করার পর সে মুসাফির বলে গণ্য হবে। এ দূরত্ব যত অল্প সময়ে অতিক্রম করুক না কেন।[২৭৪]

মাহ্‌রামের পরিচয়

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. মাহরামের পরিচয় এভাবে ব্যক্ত করেন-

والمحرم من لا يجوز مناكحتها علي التأبيد بقرابة أو رضاع أو صهرية كما في التحفة.

"মাহরাম বলা হয়, যাদের সঙ্গে বিবাহ চিরকালের জন্য হারাম। তা বংশগত সূত্রে হোক, দুধপান সূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে।"[২৭৫]

বংশগত সূত্রে মহিলাদের মাহরাম

১. বাবা, দাদা, নানা, পরদাদা, পরনানা এভাবে ঊধর্ক্ষতন পিতাগণ।

২. পুত্র, পুত্রের পুত্র ও মেয়ের পুত্র। এভাবে অধস্তন পুত্রগণ।

৩. আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই (বাবা এক, মা ভিন্ন) ও বৈপিত্রেয় ভাই (মা এক, বাবা ভিন্ন)।

৪. পিতার আপন ভাই, তার বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এভাবে ঊর্ধ্বতন মাহরামদের আপন চাচাগণও মহিলার মাহরাম।

৫. মায়ের আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাই এবং পিতা-মাতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এভাবে ঊর্ধ্বতন মাহরামদের আপন মামাগণও মহিলার মাহরাম।

৬. আপন ভাই, বৈমাত্রেয় ভাই ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে (ভাতিজা)। ভাতিজা-ভাতিজির ছেলে ও তার ছেলে। এভাবে তাদের অধস্তন পুত্রসন্তানরা।

৭. আপন বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে (ভাগিনা)। ভাগিনা-ভাগিনীর ছেলে। এভাবে তাদের অধস্তন পুত্রসন্তানরা।

বৈবাহিক সূত্রে মহিলাদের মাহরাম

১. স্বামীর পিতা অর্থাৎ আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর, নানা শ্বশুর, পরদাদা শ্বশুর। এভাবে তাদের ঊর্ধ্বতন পুরুষগণ।

২. স্বামীর ছেলে। অর্থাৎ স্বামীর অন্য স্ত্রীর সন্তান। অনুরূপভাবে স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত মেয়ের পুত্রসন্তানরা। এভাবে তাদের অধক্ষস্তন পুত্রসন্তানরা।

---

272 অভিজ্ঞজনের তথ্য অনুযায়ী জলপথে জাহাজ সাধারণত মধ্যম গতিতে ঘন্টায় ৫ ১/২ সামুদ্রিক মাইল অতিক্রম করে। সুতরাং তিন দিনে অতিক্রম করবে- ৭২ ঘন্টা × ৫ ১/২ = ৩৯৬ সামুদ্রিক মাইল। সুতরাং এটিই নৌপথে শরয়ী সফরের দূরত্ব। বিস্তারিত দেখুন: আহসানুল ফাতাওয়া : ৪/৮৬।

২৭৩ আল বাহরুর রায়েক: ২/২২৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ২/৪৯১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

২৭৪ আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৮২, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

২৭৫ ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৬৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

৩. ঔরষজাত মেয়ের স্বামী। আপন নাতনীর স্বামী, আপন নাতনীর মেয়ের স্বামী। এভাবে তাদের অধস্তন কন্যাসন্তানদের স্বামীগণ।
৪. সৎ পিতা। অর্থাৎ সে যার ঔরষজাত সন্তান নয়।[২৭৬]

দুধ পানের সূত্রে মাহরাম

বংশগত সূত্রে যেসকল পুরুষ মহিলাদের জন্য মাহরাম হয়, দুধ পানের সূত্রেও সেসকল পুরুষ মহিলাদের মাহরাম বলে বিবেচিত হবে। যেমন- ১. দুধ সম্পর্কীয় পিতাগণ। ২. দুধ সম্পর্কীয় ছেলেরা। ৩. দুধ সম্পর্কীয় ভাই। ৪. দুধ সম্পর্কীয় চাচা। ৫. দুধ সম্পর্কীয় মামা। ৬. দুধ সম্পর্কীয় ভাতিজা। ৭. দুধ সম্পর্কীয় ভাগিনা।
হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

قال رسول الله ﷺ : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة.

"রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, জন্ম সম্পর্ক যা হারাম করে দুধ সম্পর্কেও তা হারাম হবে।"[২৭৭]
আল্লামা মাহমুদ আলূসী রাহ. বলেন-

ثم إن المحرمية المبيحة للإبداء كما تكون من جهة النسب تكون من جهة الرضاع، فيجوز أن يبدين زينتهن لآبائهن وأبنائهن مثلاً من الرضاع.

"জন্ম সম্পর্কের কারণে যাদের সাথে চিরস্থায়ীভাবে সাক্ষাৎ করা জায়েয, দুধ সম্পর্কের কারণেও তাদের সাথে সাক্ষাৎ করা জায়েয। সুতরাং দুধ সম্পর্কের পিতা ও দুধ সম্পর্কের সন্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা বৈধ হবে।"[২৭৮]

মহিলাদের সফরে মাহরামের গুরুত্ব

আল্লাহ তা'আলা মহিলাদের সার্বিক নিরাপত্তার জন্য সহযোগী হিসেবে স্বামী বা মাহরামকে নিযুক্ত করে দিয়েছেন, যারা সর্বাবস্থায় তার নিরাপত্তা ও সুরক্ষার কাজ আঞ্জাম দিবে। তাই নিরাপত্তার খাতিরে মহিলাদের সফরে স্বামী বা মাহরামের উপস্থিতিকে আবশ্যক করা হয়েছে। মহিলাদের সফরের নিয়ম-নীতি বিষয়ে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যা থেকে বোঝা যায় কোনো মহিলার সফরের দূরত্ব (৭৮ কি.মি.) অতিক্রম করতে হলে তার সাথে স্বামী বা মাহরাম থাকা আবশ্যক।
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন-

قال رسول الله ﷺ : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে নারী আল্লাহ তা'আলা এবং আখেরাতের উপর ঈমান এনেছে তার জন্য তিন দিন বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে স্বীয় পিতা, ছেলে, স্বামী, ভাই বা অন্য কোনো মাহরাম ব্যতীত সফর করা বৈধ হবে না।"[২৭৯]
হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন-

---

[২৭৬] সূরা নূর: ৩১
[২৭৭] সহীহ মুসলিম: ১/৪৬৬, হাদীস নং ১৪৪৪; সহীহ বুখারী: ২/৭৬৪, হাদীস নং ৫২৩৯
[২৭৮] তাফসীরে রুহুল মা'আনী: ১০/১৪৩, মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান
[২৭৯] সহীহ মুসলিম: ১/৪৩৪, হাদীস নং ১৩৪০

أن نبي الله ﷺ قال: لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন তিন রাতের বেশি দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর না করে।"[২৮০]

আল্লামা ফরিদুদ্দীন রাহ. বলেন-

ولا تسافر المرأة بغير محرم ثلاثة أيام فما فوقها.

"মহিলা তিন দিন (৭৮ কি.মি.) বা তার চেয়ে বেশি দূরত্বে মাহরাম ব্যতীত সফর করবে না।"[২৮১]

শর'য়ী সফরের কম দূরত্বে মহিলাদের সফর

তিন দিন (৭৮ কি.মি.) এর কম দূরত্বে মহিলাদের মাহরাম ছাড়া সফরের ব্যাপারেও হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال: لا تسافر المرأة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন তার স্বামী কিংবা কোনো মাহরাম পুরুষ ছাড়া দুই দিনের দূরত্বে সফর না করে।"[২৮২]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى محرم عليها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে মহিলা বিশ্বাস রাখে আল্লাহর উপর এবং বিচার দিবসের উপর তার জন্য মাহরাম ছাড়া এক দিন এক রাতের দূরত্ব পরিমাণও সফর করা জায়েয নেই।"[২৮৩]

এই বর্ণনা দু'টি এবং আরো একটি বর্ণনা উল্লেখ করার পর ইমাম বাইহাকী রাহ. বলেন-

وهذه الرواية في الثلاثة واليومين واليوم صحيحة، وكان النبي ﷺ سئل عن المرأة تسافر ثلاثا من غير محرم فقال: لا، وسئل عنها تسافر يومين من غير محرم فقال: لا، ويوما فقال: لا، فأدى كل واحد منهم ما حفظ.

"মহিলাদের মাহরাম ছাড়া তিন দিনের দূরত্বে, দুই দিনের দূরত্বে ও এক দিনের দূরত্বে সফর করার নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে যে রেওয়ায়েত এসেছে এগুলো সবই সহীহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞাসা করা হলো মহিলাদের তিন দিনের দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর করা প্রসঙ্গে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তার জন্য তা জায়েয নেই। এরপর জিজ্ঞেস করা হলো, মহিলাদের মাহরাম ছাড়া দুই দিনের দূরত্বে সফর করা সম্পর্কে। তখনও রাসূল ﷺ বললেন, জায়েয নেই। সর্বশেষ একদিনের দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে বললেন, তাও জায়েয নেই। রাবীদের যে যতটুকু মনে রেখেছে তা রেওয়ায়েত করেছে।"[২৮৪]

তবে কোনো কোনো ইমাম বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের জন্য তিন দিন অর্থাৎ ৭৮ কি.মি. এর চেয়ে কম দূরত্বে মাহরাম ব্যতীত সফর করা জায়েয বলেছেন।

قوله: في سفر هو ثلاثة أيام ولياليها فيباح لها الخروج إلى ما دونه لحاجة بغير محرم.

---

[২৮০] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৮২৭

[২৮১] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ১৮/২৪৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[২৮২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৯৯৫; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৮২৭

[২৮৩] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৩৩৯

[২৮৪] আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী: ৩/১৩৯

"সফরের দূরত্ব হলো তিন দিন তিন রাতের পথ অর্থাৎ ৭৮ কি.মি.। তবে মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রয়োজনে তিন দিন (৭৮ কি.মি.) এর কম দূরত্বে মাহরাম ছাড়া সফর করা বৈধ আছে।"[২৮৫]

কিন্তু বর্তমান বিশ্বের সার্বিক পরিস্থিতির চরম অবনতির কারণে যেখানে মানুষের জান-মাল ও ইজ্জত-আবরুর ন্যূনতম কোনো নিশ্চয়তা নেই, যেখানে একজন পুরুষের একাকি কোথাও বের হতে বুক কেঁপে উঠে, সেখানে একজন নারী একাকি সফরে বের হলে কীভাবে তার ইজ্জত-আবরু ও সতীত্বের নিশ্চয়তা পাবে? তাই ওলামায়ে কেরাম কম দূরত্বেও মাহরাম ছাড়া মহিলাদের সফর করতে নিষেধ করেছেন এবং তা মাকরূহে তাহরীমী। যদিও ৪৮ মাইল থেকে কম দূরত্বে হোক না কেন। এর উপরই ফাতওয়া সে মহিলা যুবতী হোক বা বৃদ্ধা। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى كراهة خروجها وحدها مسيرة يوم واحد وينبغي أن يكون الفتوى عليه لفساد الزمان.

"ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ রাহ. থেকে বর্ণিত আছে, একদিন এক রাত পরিমাণ দূরত্বেও মহিলাদের জন্য একাকি সফর করা মাকরূহ। এবং যামানা খারাপ হওয়ার কারণে এর উপরই ফাতওয়া হওয়া উচিত।"[২৮৬]

সফরে কোন ধরনের মাহরাম থাকতে হবে

মাহরাম সাথে থাকার উদ্দেশ্য হলো মহিলার সহযোগিতা ও নিরাপত্তা। নাবালেগ বা পাগলের দ্বারা তা সম্ভব নয়। কাজেই নাবালেগ বা পাগলকে সাথে নিয়ে তিন দিনের বেশি দূরত্বের সফর করা বৈধ হবে না। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ولها أن تخرج مع كل محرم سواء كان بنسب أو رضاع أو صهرية مسلما أو كافرا أو عبدا إلا أن يعتقد حل مناكحتها كالمجوسي أو يكون فاسقا إذ لا تؤمن معه الفتنة أو صبيا.

"মহিলাদের জন্য যে কোনো ধরনের মাহরামের সাথে সফর করা জায়েয আছে। সে বংশগত, দুগ্ধপান বা বৈবাহিক সূত্রে হোক। কিংবা মুসলমান, কাফের বা গোলাম হোক। তবে যে মাহরাম ঐ মহিলাকে বিবাহ করা হালাল মনে করে; যেমন মূর্তিপূজারী কিংবা মাহরাম যদি ফাসেক হয়, যার সাথে সফর করলে মহিলা ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমন মাহরামের সাথে সফর করা বৈধ হবে না। তদ্রূপ যদি মাহরাম নাবালেগ হয়।"[২৮৭]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

وقالوا في الصبي الذي لم يحتلم والمجنون الذي لم يفق أنهما ليسا بمحرمين في السفر لأنه لا يتأتى منهما حفظها.

"নাবালেগ এবং পাগল সফরের মধ্যে মহিলার জন্য মাহরাম হবে না। কেননা তাদের দ্বারা মহিলার হেফাজত সম্ভব নয়।"[২৮৮]

---

[২৮৫] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৮৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৮৭] ফাতহুল কাদীর: ২/৪২৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৮৮] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৩০০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

তাই মাহরাম সাথে রাখতে হবে ঠিক, তবে দেখতে হবে মাহরাম রাখার যে মূল উদ্দেশ্য তা পূরণ হচ্ছে কি না। যেহেতু ফুকাহায়ে কেরাম বিশেষ বিবেচনা করে স্থির করেছেন যে, মাহরামের উদ্দেশ্য বালেগ ও বুঝমান পুরুষ দ্বারাই পূরণ হওয়া সম্ভব। তাই নাবালেগ ও নির্বোধ বা পাগলকে নিয়ে কোনো মহিলা সফর করতে পারবে না। কেউ কেউ অবশ্য বালেগের নিকটবর্তীকেও বালেগের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তবে এর ব্যতিক্রম হলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় এবং প্রতিনিয়ত তা হচ্ছে।

নারীদের হজ্বের সফর

হজ্বের সফর যদি তিন দিন (অর্থাৎ ৭৮ কি.মি.) এর দূরত্বে হয়, তাহলে মহিলাদের হজ্ব ফরয হওয়ার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতার সাথে সাথে মাহরাম থাকাও আবশ্যক।
হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ قال لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم.

" রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মহিলা যেন মাহরাম ছাড়া হজ্ব না করে।"[২৮৯]

এ জাতীয় আরো হাদীস আমরা পূর্বে উল্লেখ করে এসেছি। এটি একটি শর'য়ী মূলনীতির মান রাখে কোনো মহিলা যেন স্বামী বা মাহরাম ছাড়া সফর না করে। এটি একটি ব্যাপক মূলনীতি। তাই সর্বক্ষেত্রে এর উপর আমল হওয়া উচিত। কারণ রাসূলুল্লাহ ﷺ এর যে কথাগুলো মূলনীতির পর্যায়ে তা শর'য়ী হুকুমের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো, মূলনীতি সম্বলিত হাদীসগুলোর বিপরীত বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা অন্য হাদীসে বর্ণিত হলে মূলনীতি সম্বলিত হাদীসটি প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আর এক্ষেত্রে ফুকাহায়ে কেরাম সাধারণত সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্বলিত হাদীসকে মূলনীতি সম্বলিত হাদীসের অনুকূলে ব্যাখ্যা করে থাকেন। আমাদের আলোচ্য বিষয়েও উল্লিখিত হাদীসটি মূলনীতি পর্যায়ের। তাই এর বিপরীত কোনো সুনির্দিষ্ট ঘটনা সম্বলিত হাদীস থাকলে (যা আদী ইবনে হাতেম রাযি. সূত্রে সামনে উল্লেখ করা হবে) তা মূলনীতির অনুকূলে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত।

এছাড়া রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে একাকি হজ্বের সফরে যাওয়ার নির্দেশ দেননি। বরং কিছু হাদীস থেকে তার ব্যতিক্রম বুঝা যায়। যেমন ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসে জনৈক ব্যক্তিকে রাসূল ﷺ স্ত্রীর সাথে হজ্বে যাওয়ার নির্দেশ দিয়ে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে, মহিলাদের একাকী হজ্বের সফরে যাওয়ার অনুমতি নেই। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

أنه سمع النبي ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال: يا رسول الله! اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال: اذهب فحج مع امرأتك.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, মহিলার সঙ্গে যদি মাহরাম না থাকে এমতাবস্থায় কোনো পুরুষ যেন সেই মহিলার সঙ্গে নির্জনবাস না করে এবং এ অবস্থায় সে যেন সফরও না করে। তখন এক সাহাবী দাঁড়িয়ে আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো অমুক যুদ্ধে নাম লিখিয়েছি, অথচ আমার স্ত্রী হজ্বের সফরে বেরিয়ে গেছে। তখন রাসূল ﷺ তাকে বললেন, তুমি দ্রুত যাও এবং তোমার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্ব আদায় কর।"[২৯০]

---

[২৮৯] সহীহ বুখারী: ২/১৪৭
[২৯০] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩০০৬

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন-

فأمره بترك الغزو، وهو فرض، ليحج مع امرأته، فيُسقط عنها فرضَ الحج.

"এখানে রাসূল ﷺ সাহাবীকে যুদ্ধ ছেড়ে তার স্ত্রীর সঙ্গে হজ্ব পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, অথচ যুদ্ধটাও ফরয ছিলো। যেন তার স্ত্রীর ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যায়।"[২৯১]

হযরত ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله! إن ابنتي تريد أن تحج فقال: لها محرم؟ قالت: لا، قال: فزوِّجيها، ثم لتحج.

"একজন মহিলা রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মেয়ে হজ্ব করতে চাচ্ছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তার কি কোনো মাহরাম পুরুষ আছে? সে উত্তর করল, না। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তাকে বিয়ে দিয়ে দাও। এরপর যেন সে (তার স্বামীর সঙ্গে) হজ্ব আদায় করে।"[২৯২]

এছাড়াও রাসূল ﷺ বিদায় হজ্ব শেষ করে স্ত্রীদেরকে সফর না করে ঘরে অবস্থান করার কথা বলেছেন। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ لأزواجه فى حجة الوداع : إنما هى هذه ثم ظهور الحصر.

"রাসূল ﷺ বিদায় হজ্বে তাঁর স্ত্রীদেরকে বললেন, এটাই শেষ হজ্ব। এরপর ঘরে অবস্থান করবে।"[২৯৩]

এ হাদীসগুলো থেকে বোঝা গেলো যে, রাসূল ﷺ মহিলাদেরকে মাহরাম ছাড়া হজ্বের সফর করতে অনুমতি প্রদান করতেন না। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ثم المحرم أو الزوج إنما يشترط إذا كان بين المرأة وبين مكة ثلاثة أيام فصاعدا ، فإن كان أقل من ذلك حجت بغير محرم ؛ لأن المحرم يشترط للسفر، وما دون ثلاثة أيام ليس بسفر فلا يشترط فيه المحرم.

"মহিলার সঙ্গে হজ্বের সফরে কোনো মাহরাম বা তার স্বামী থাকা তখনই শর্ত করা হয়েছে যখন হজ্বের সফর তিন দিন (৭৮ কি.মি.) কিংবা তার বেশি দূরত্বে হবে। সুতরাং দূরত্ব যদি তিন দিনের কম হয়, তাহলে মাহরাম ছাড়াই সে হজ্ব করতে পারবে। কেননা মাহরাম তো শর্ত করা হয়েছে সফরের জন্য। আর দূরত্ব যদি তিন দিনের কম হয়, তাহলে সেটাকে শর'য়ী সফর ধরা হয় না। সুতরাং এক্ষেত্রে মাহরাম থাকাও শর্ত নয়।"[২৯৪]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ثم إذا كان المذهب إباحة خروجها ما دون الثلاثة بغير محرم فليس للزوج منعها إذا كان بينها وبين مكة أقل من ثلاثة أيام إذا لم تجد محرما.

"তিন দিনের (৭৮ কি.মি.) কম দূরত্বে যেহেতু মাহরাম ছাড়া সফর করা জায়েয সুতরাং হজ্বের সফরে যদি কোনো মাহরাম না পায়, তাহলে স্বামীর জন্য তার স্ত্রীকে হজ্বের সফরে যেতে বাধা

---

[২৯১] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/৪৮৪, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[২৯২] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/৪৮৫, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[২৯৩] আস সুনানুল কুবরা, বাইহাকী: হাদীস নং ১০১৪৩ (باب المرأة تنهى عن كل سفر لا يلزمها بغير محرم)

[২৯৪] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৩০০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দেয়া জায়েয নেই।"[২৯৫]
স্বামী বা মাহরাম ব্যতীত মহিলাদের হজ্বে গমন করা নাজায়েয। এরপর যদি কোনো মহিলা মাহরাম ব্যতীত হজ্ব আদায় করে, তাহলে ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে বটে। তবে মাকরূহে তাহরীমী হবে। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ولوحجت بلا محرم جاز مع الكراهة أي: التحريمة.

"মহিলা যদি মাহরাম ব্যতীত হজ্ব করে তাহলে মাকরূহে তাহরীমীর সাথে আদায় হয়ে যাবে।"[২৯৬]

মাহরাম ব্যতীত মহিলা জামা'আতের সাথে হজ্ব

সফরে মাহরামের ভূমিকা ও দায়িত্ব সম্পর্কে পূর্বে যা আলোচনা হয়েছে তা থেকে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে যে, সফর যদি তিন দিনের দূরত্বে (৭৮ কি.মি.) হয়, তাহলে কোনো পুরুষ মাহরাম ছাড়া মহিলার জন্য হজ্বের সফরে গমন করা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ও গুনাহের কাজ, যা একটি শর'য়ী মূলনীতি। উপরন্তু এ অবস্থায় তার উপর হজ্ব ওয়াজিবই হয় না। এমনকি যদি কোনো দ্বীনদার বিশ্বস্ত মহিলা জামা'আতের সঙ্গে সফর করে তবুও মাহরাম ছাড়া জায়েয হবে না। কেননা এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। তা ছাড়া মহিলার সঙ্গে পুরুষ মাহরাম থাকার যে উদ্দেশ্য তা মহিলাদের দ্বারা হাসিল হয় না।
কোনো কোনো ইমাম এ মত ব্যক্ত করেছেন যে, যদি এমন একটি মহিলা জামা'আতের সাথে হজ্ব করে যারা ফছকা অর্থাৎ গ্রহণযোগ্য দ্বীনদার পরহেজগার বিশ্বস্ত। যাদের থেকে ফিতনা হওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই। তাহলে মাহরাম ছাড়াই তার উপর হজ্ব ওয়াজিব হবে। তারা নিম্নোক্ত হাদীস দিয়ে দলীল পেশ করে থাকেন।
আদী ইবনে হাতেম রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال بينا أنا عند النبي ﷺ... فقال يا عدي هل رأيت الحيرة قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله... قال عدي فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله.

"আমি একদা রাসূল ﷺ এর কাছে ছিলাম। তিনি বললেন, তুমি কি হিরা নামক জায়গা দেখেছ? আমি বললাম, দেখিনি তবে উক্ত জায়গা সম্পর্কে জানা আছে। তখন রাসূল ﷺ বললেন, তুমি যদি দীর্ঘায়ু হও, তাহলে অবশ্যই দেখবে হিরা নামক জায়গা থেকে পালকিতে ভ্রমণকারী নারী বাইতুল্লাহর তাওয়াফ বা যিয়ারত করার উদ্দেশ্যে সফর করবে। কিন্তু সে আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত কাউকে ভয় করবে না। হযরত আদী রাযি. বলেন, আমি পালকিতে ভ্রমণকারী নারীকে দেখেছি যে হিরা নামক জায়গা থেকে ভ্রমন করে কাবা শরীফ তাওয়াফ করে গেছে। কিন্তু তার মধ্যে আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কারো ভয়ের ছাপ ছিল না।"[২৯৭]
বস্তুত এ হাদীস দ্বারা এমন এক যামানার সুসংবাদ দেয়া উদ্দেশ্য যে যামানায় মানুষ সর্বোচ্চ নিরাপদে বসবাস করতে পারবে। এমনকি মহিলারা একাকী সফর করবে সম্পূর্ণ নিরাপদে ও

---

[২৯৫] ফাতহুল কাদীর: ২/৪২৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৯৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৪৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[২৯৭] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩৫৯৫

নির্ভাবনায়। ইজ্জত-আবরুর ব্যাপারে তাদের কোনো শঙ্কাও থাকবে না।
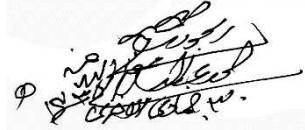
আর যদি হাদীসের ব্যাপকতার উপর আমল করা হয়, তাহলে যে কোনো মহিলা একাকী হজ্ব করার অধিকার রাখে। কারণ এখানে বলা হয়েছে একজন নারী সফর করে হজ্ব করবে। নির্ভরযোগ্য জামা'আতের কথা নেই। অথচ যারা জায়েয মনে করেন তারা নির্ভরযোগ্য জামা'আতের সাথে করার শর্তযুক্ত করেন, তাহলে এ হাদীস তাদের পক্ষের দলীল হয় কীভাবে? ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

واما حديث عدي بن حاتم فليس فيه بيان حكم الخروج فيه ما هو ولا يستلزمه، بل بيان انتشار الأمن ولو كان مفيدا للإباحة كا ن نقيض قولهم فإنه يبيح الخروج بلا رفقة ونساء ثقات.
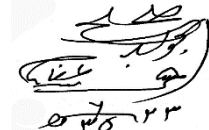
"আদী ইবনে হাতেম রাযি. এর হাদীসের জবাব হলো, উল্লিখিত হাদীসে মহিলাদের মাহরাম ব্যতীত সফরে বের হওয়ার হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয় এবং তা প্রমাণিতও হয় না; বরং মানুষের ব্যাপক নিরাপত্তার কথা উল্লেখ করা উদ্দেশ্য। যদি মহিলাদের মাহরাম ব্যতীত সফরে বের হওয়া জায়েয মেনে নেয়া হয়, তাহলে তাদের কথা বাতিল হয়ে যায়। কারণ তখন তো মহিলারা মাহরাম এবং মহিলাদের বিশ্বস্ত জামাত ব্যতীত একাকি বের হওয়া জায়েয প্রমাণিত হয়।"[২৯৮]

মোটকথা, এক্ষেত্রে উল্লিখিত মূলনীতিই বলবৎ থাকবে। যা একাধিক হাদীস ও সাহাবা রাহ. এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। এর ব্যতিক্রম ঘটনাকে মূলনীতির অনুকূলে ব্যাখ্যা করা হবে।
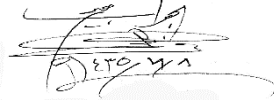
<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[২৯৮] ফাতহুল কদীর: ২/৪২৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

অধ্যায়: যাকাত

যাকাত, ফিত্‌রা, হজ্ব ও কুরবানীর নেসাব

মাওলানা আবু সালেহ মুহাম্মদুল্লাহ কুমিল্লা

হজ্ব, যাকাত, ফিতরা ও কুরবানী ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বিধান, আর্থিক ইবাদত। তাই যাদের সম্পদ আছে তাদের জন্য অপরিহার্য। তবে প্রত্যেক সম্পদশালীর উপর সমানভাবে অপরিহার্য নয়। এর জন্য রয়েছে সম্পদের নির্দিষ্ট সীমারেখা ও নির্ধারিত পরিমাণ, যার উপর নির্ভর করে উপরোক্ত প্রতিটি ইবাদতের অপরিহার্যতা। নিম্নে তার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হলো।

নেসাবের পরিচয়

নেসাব (نصاب) **শব্দটি** আরবী। অর্থ- আসল অবস্থা বা প্রত্যাবর্তন স্থল।

প্রবাদ আছে- رجع الأمر إلى نصابه বিষয়টি তার আসল অবস্থায় ফিরে গেছে। যাকাত, ফিত্‌রা, হজ্ব ও কুরবানী এজাতীয় عبادة مالية বা আর্থিক ইবাদতের ক্ষেত্রে নেসাব বলতে এ পরিমাণ অর্থ-সম্পদ বোঝানো হয়, যে পরিমাণ অর্থ থাকলে উক্ত ইবাদতগুলো আদায় করা ওয়াজিব হয়।

جاء في «معجم لغة الفقهاء»: النصاب بكسر النون: الأصل والمرجع ويقال: رجع الأمر إلى نصابه. وشرعا: المقدار الذي يتعلق به الواجب ومنه نصاب الزكاة نصاب القطع. (معجم لغة الفقهاء: ٤٨)

নেসাবের প্রকারভেদ

আল্লামা আহ্‌মদ আত্‌ তাহতাবী রাহ. নেসাবের প্রকারভেদ প্রসঙ্গে বলেন-

اعلم أن النصب ثلاثة : نصاب يشترط فيه النماء وتتعلق به الزكاة وسائر الأحكام المتعلقة بالمال النامي. ونصاب تجب به أحكام أربعة : حرمة الصدقة، ووجوب الأضحية، وصدقة الفطر، ونفقة الأقارب. ولا يشترط فيه النمو بالتجارة ولا حولان الحول. ونصاب تثبت به حرمة السؤال وهو ما إذا كان عنده قوت يومه عند بعض. وقال بعضهم هو أن يملك خمسين درهما.

"নেসাব তিন প্রকার। **এক.** এমন নেসাব যাতে বর্ধনশীলতা (نماء) শর্ত। বস্তুত উক্ত নেসাবের সাথেই যাকাত ও বর্ধনশীল সম্পদ সম্পর্কীয় যাবতীয় বিধিবিধান সম্পৃক্ত। **দুই.** এমন নেসাব যাতে চার ধরনের বিধান ওয়াজিব হয়। (ক) ছদকা গ্রহণ হারাম হওয়া। (খ) কুরবানী ওয়াজিব হওয়া। (গ) ফিত্‌রা ওয়াজিব হওয়া। (ঘ) পরিবারভুক্ত লোকজন ও আত্মীয়-স্বজনদের ভরণ-পোষণ ওয়াজিব হওয়া। এই নেসাবের ক্ষেত্রে সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া এবং বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। **তিন.** এমন নেসাব যা দ্বারা অন্যের কাছে ভিক্ষা করা অবৈধ সাব্যস্ত হয়। আর এই নেসাবের পরিমাণ হলো, একদিনের চলার মত আহার্য থাকা। আবার কেউ বলেন, এর পরিমাণ হলো পঞ্চাশ দিরহাম (যা তোলা হিসেবে

১৩ তোলা এক মাশা চার রতি হয়।)[২৯৯]

যাকাত

যাকাতের পরিচয়

যাকাত শব্দটি বরকত, বর্ধনশীলতা, পবিত্রতা, প্রশংসা প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার হয়ে থাকে।

আর পরিভাষায় যাকাতের সংজ্ঞা এভাবে করা হয়েছে-

الزكاة هي تمليك جزء من المال عينه الشارع من مسلم فقير غير هاشمي ولا مولى لهاشمي مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى.

"শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত সম্পদের একটি অংশ হাশেমী কিংবা তদীয় গোলাম ব্যতীত অন্য কোনো দরিদ্র মুসলমানকে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এমনভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া, যাতে যাকাত প্রদানকারীর জন্য উক্ত সম্পদ থেকে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না থাকে।"[৩০০]

যাকাতের নেসাব

চার ধরনের বস্তু যাকাতের নেসাবে হিসাব করা হয়। যথা- **এক.** সোনা বা রূপা। **দুই.** ব্যবসায়িক পণ্য। **তিন.** এমন গবাদি পশু যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় মালিকের দানা-পানি ছাড়াই প্রতিপালিত হয়। **চার.** সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সাড়ে সাত তোলা সোনার মূল্য পরিমাণ টাকা।

যেহেতু যাকাতের নেসাব নির্ধারণের ক্ষেত্রে সোনা-রূপা মানদণ্ডের ভূমিকা রাখে, গবাদি পশু ছাড়া অন্য যে কোনো সম্পদের নেসাব স্থির করা হয় সোনা-রূপার মূল্যের সাথে মিল করে, তাই সোনা-রূপার বিষয়টি নিম্নে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো।

সোনা-রূপার নেসাব

যদি কেউ সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর দ্বারা তৈরী অলংকার, পাত্র বা এ জাতীয় অন্য কোনো জিনিসের মালিক হয় তখন তার উপর শতকরা ২.৫০% হারে তথা চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত ওয়াজিব হয়।

সোনা-রূপার যাকাত প্রসঙ্গে হযরত আলী রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-

قال: ...فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون ذلك عشرون دينارا. فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.[৩০১]

---

[299] হাশিয়াতুত তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ : ৭২৩

[300] আল কামূসুল ফিকহী: ১৫৯, ইদারাতুল কুনআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

[৩০১] أخرجه أبو داود بإسناد رجاله رجال الصحيح.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যখন তোমার দুইশত দিরহাম থাকবে এবং এর উপর এক বছর অতিবাহিত হবে। তখন তাতে পাঁচ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে। আর তোমার স্বর্ণের পরিমাণ যতক্ষণ পর্যন্ত বিশ দীনার না হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। সুতরাং যখন তোমার বিশ দীনার অর্জিত হয়ে যাবে এবং এর উপর এক বছর অতিবাহিত হবে। তখন তাতে আধা দীনার যাকাত আসবে।"[৩০২]

দিরহাম ও মিছকালের হিসাব

একথা সর্বসম্মত যে, রূপার নেসাব দুইশত দিরহাম। আর গবেষণা দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, এক দিরহামের ওজন ৩ মাশা এক রতি ও এক রতির ৫ ভাগের এক ভাগ। এখন হিসাব করলে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, রূপার নেসাব ৫২ তোলা ৬ মাশা, তথা সাড়ে বায়ান্ন তোলা।

অনুরূপভাবে একথাও সর্বসম্মত যে, সোনার নেসাব ২০ মিছকাল। আর গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত যে, এক মিছকালের ওজন সাড়ে চার মাশা। তাই তোলা হিসাবে স্বর্ণের নেসাব হবে সাড়ে ৭ তোলা, যেমনটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর ওলামায়ে কেরাম লিখেছেন। কিন্তু মুলতানের বিখ্যাত ব্যবসায়ী শায়েখ বাহাউদ্দিন এর গবেষণা অনুযায়ী আনুমানিক আরো ৪০ রতি বা পাঁচ মাশা অতিরিক্ত হবে। তাহলে সোনার নেসাব ৭ তোলা ১১ মাশা হয়। অতএব সতর্কতামূলক সাড়ে সাত তোলাকে সোনার নেসাব গণ্য করে সে অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণের মালিক হবে, তাকে যাকাত পাওয়ার হকদার গণ্য করা হবে না। বরং তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৩০৩]

এমনিভাবে কারো কাছে যদি সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমপরিমাণ টাকা থাকে, তাহলে তার উপর শতকরা ২.৫০% হারে যাকাত ওয়াজিব হবে।

ব্যবসার সম্পদের নেসাব

অনুরূপভাবে কারো কাছে যদি রূপার নেসাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার সমমূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য থাকে তখন তার উপরও বছরান্তে যাকাত ওয়াজিব হবে, তা যে কোনো ধরনের ব্যবসায়িক পণ্য হোক না কেনো। সুতরাং কেউ যদি গাড়ি-বাড়ি, জায়গা-জমি ইত্যাদি গুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে আর এর উপর বছর অতিবাহিত হয় তখন তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আল্লামা আলী আল-মারগীনানী রাহ. বলেন-

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب.

"ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য যদি সোনা কিংবা রূপার নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। পণ্য যে প্রকারেরই হোক না কেন।"[৩০৪]

---

302 সুনানে আবু দাউদ: ২/৬৮০, হাদীস নং ১৫৭৩, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

303 আওয়ানে শরইয়্যাহ: ২১

304 হেদায়া : ১/১৯৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

ব্যবসায়িক পণ্যের যাকাত সম্পর্কে হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রাযি. বর্ণনা করেন-

قال : أما بعد: فإن رسول الله ﷺ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع.[৩০৫]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে ঐ সব সম্পদ থেকে যাকাত প্রদানের হুকুম করতেন যেগুলো আমরা ব্যবসার জন্য প্রস্তুত করে রাখতাম।"[৩০৬]

বি: দ্র: গবাদি পশুর প্রচলন যেহেতু বর্তমানে নেই তাই এর আলোচনা এখানে করা হলো না।

উপার্জনের উপকরণের উপর যাকাতের হুকুম

যেসব গাড়ি ব্যবসার জন্য কেনা হয়নি, বরং ভাড়া দিয়ে ইনকামের উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে সেসব গাড়ির উপর যাকাত আসবে না । কেননা, ভাড়ায় চালিত গাড়ি (تجارتی مال) ব্যবসায়িক পণ্য নয়, বরং তা হচ্ছে (مال اجارہ) ভাড়ার মাল। আর ভাড়ার মালের উপর যাকাত আসে না, যাকাত আসে কেবল ব্যবসায়িক পণ্যের উপর এবং ভাড়া থেকে অর্জিত ইনকাম বা মুনাফার উপর।

তদ্রূপ ব্যবসার অন্যান্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ যেমন, কম্পিউটার, ফটোস্ট্যাট মেশিন, কাপড় বানানোর মেশিন ইত্যাদি এ সবেরও একই হুকুম। অর্থাৎ সেটা নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। বরং ইনকাম বা আয়ের মাঝে নেসাব হিসাব করা হবে।

এ প্রসঙ্গে 'জাদীদ ফিক্‌হী মাসায়েল' কিতাবে 'খিযানাতুর রেওয়ায়াত' গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হয়েছে যা নিম্নরূপ-

رجل اشترى أعيانا منقولة يواجرها مياومة ومشاهرة ومسانهة ويحصل له من المنقولات مال عظيم لا يجب فيها الزكاة لأنها ليست بمال التجارة.

"এক ব্যক্তি দৈনিক, মাসিক কিংবা বাৎসরিক ভাড়া দেয়ার জন্য কিছু স্থানান্তরযোগ্য দ্রব্য ক্রয় করলো এবং উক্ত দ্রব্যের মাধ্যমে তার অনেক সম্পদ উপার্জিত হলো। তাহলে উক্ত ভাড়ার বস্তুর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এগুলো ব্যবসায়িক পণ্য নয়।"[৩০৭]

এ প্রসঙ্গে আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

---

[৩০৫] أورده الحافظ الزيلعي في «نصب الراية» (فصل في العروض) وقال: «سكت عنه أبو داود ثم المنذري بعده... وقال أبو عمر ابن عبد البر وقد ذكر هذا الحديث: رواه أبو داود وغيره بإسناد حسن». انتهى وقال ابن الملقن في « البدر المنير» (تحقيق: مصطفى أبو الفيط، ط. دار الهجرة للنشر والتوزيع، رياض، الطبعة الأولى ١٤٢٥هـ) باب زكاة التجارة، الحديث الثاني: فقد قال ابن عبد البر: ذكره أبو داود وغيره بإسناد حسن عن سمرة. وقال الحافظ عبد الغني في « عمدته الكبرى» : «إسناده مقارب»، وقال النووي في «شرح المهذب»:فيه رجال لا أعرف حالهم، ولكن لم يضعفه أبو داود، فهو حسن أو صحيح على قاعدته. وقال شيخنا فتح الدين اليعمري: وهذا إسناد لا بأس به وأقل مراتبه أن يكون حسنا فإن جعفر بن سعد مستور الحال وخبيب وأبوه وثقهما ابن حبان، قلت: وكذا جعفر أيضا كما أسلفناه عنه. انتهى كلام ابن الملقن.

[306] সুনানে আবু দাউদ : ২/৬৭৩, হাদীস নং ১৫৬২, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

[307] জাদীদ ফিকহী মাসায়েল: ১/২০৬, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ

وكذلك آلات المحترفين إلا ما يبقى أثر عينه كالعصفر لدبغ الجلد ففيه الزكاة بخلاف ما لا يبقى كصابون يساوي نصبا وإن حال الحول.

"অনুরূপ পেশাদারদের কাজের হাতিয়ারের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না। তবে যে সব উপকরণাদির প্রভাব বহাল থাকে (যেমন, চামড়া ড্রেসিং করার জন্য (عصفر) এক প্রকার মেডিসিন।) তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। পক্ষান্তরে যেসব উপকরণের প্রভাব বাকি থাকে না (যেমন, লন্ড্রির দোকানে ব্যবহৃত সাবান) সেগুলো নেসাব পরিমাণ হলে এবং এর উপর বছর অতিবাহিত হলেও যাকাত ওয়জিব হবে না।"[৩০৮]

সুতরাং উল্লিখিত ভাষ্য থেকে বোঝা গেল যে, ভাড়ায় চালিত গাড়ি ও ব্যবসার অন্যান্য উপকরণের উপর যাকাত ওয়াজিব হয় না, তবে এর ইনকাম যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং এর উপর বছর অতিবাহিত হয়, তাহলে এর উপর যাকাত আসবে।

এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, অনেক ব্যবসায়ী-বিশেষভাবে পরিবহন ও ট্রান্সপোর্ট ব্যবসায়ীগণ-নগদ অর্থ পূর্ণ বছর জমা রাখেন না। বরং টাকা আসা মাত্রই তা দিয়ে ব্যবসার সম্প্রসারণ করে থাকেন। তাদের কাছে যদি বছরের শুরুতে নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি সম্পদ থাকে এবং বছর শেষেও যদি থাকে, তাহলে তাদেরকে যাকাত আদায় করতে হবে। যদিও বছরের মাঝামাঝি সময়ে নেসাব পরিমাণ সম্পদ জমা না থাকে। কারণ, বছরের শুরু-শেষে নেসাব থাকলেই যাকাত ওয়াজিব হয়।

বিভিন্ন শ্রেণীর সম্পদের নেসাব নির্ণয়

অনুরূপভাবে কারো কাছে যদি কিছু টাকা, কিছু সোনা বা রূপা আর কিছু ব্যবসায়িক পণ্য থাকে; যেগুলোর কোনোটাই পৃথক পৃথকভাবে যাকাতের নেসাব পরিমাণ না হয়। কিন্তু সবগুলোর মূল্য একত্রিত করলে নেসাব (সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপার মূল্য) পরিমাণ হয়। তখন এর উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। হযরত বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ রাহ.[৩০৯] বলেন-

مضت السنة من أصحاب رسول الله ﷺ بضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب في إخراج الزكاة.

"যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরাম স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে এবং রৌপ্যকে স্বর্ণের সাথে মিলিয়ে নেসাব হিসাব করতেন।"[৩১০]

ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. বলেন-

وتضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة حتى يتم النصاب... ويضم الذهب إلى الفضة.

"যাকাতের নেসাব হিসাব করার ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক পণ্যের মূল্য সোনা-রূপার সাথে এবং

---

308 আদ্দুররুল মুখতার : ৩/১৮৩ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

৩০৯ বুকাইর ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনুল আশাজ্জ আল কুরাশী আল মিসরী রাহ.। তিনি ১২৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন (ওয়াকিদীর মতানুসারে)। قال ابن سعد : كان ثقة كثير الحديث ذكره ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين من صلحاء الناس.

310 বাদায়েউস সানায়ে : ২/৪২৩ দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

সোনাকে রূপার সাথে মিলিয়ে নেসাব পূর্ণ করা হবে।"[৩১১]

পণ্যের খুচরা মূল্য না পাইকারী মূল্য কোনটির হিসাব ধরা হবে?

ব্যবসায়িক পণ্যে নেসাব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে খুচরা মালের ব্যবসায়ী হলে খুচরা মূল্য ধরে যাকাত আদায় করবে। আর যদি পাইকারী মালের ব্যবসায়ী হয়, তাহলে পাইকারী মূল্য ধরে যাকাত আদায় করবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি খুচরা এবং পাইকারী উভয় মালের ব্যবসা করে, তাহলে খুচরা মূল্য হিসাবে যাকাত আদায় করতে হবে। কেননা যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো- সর্বদা দরিদ্রদের উপকারের বিষয়টি বিবেচনা করা। এ প্রসঙ্গে ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

فلا بد من اعتبار منفعة الفقراء عند التقويم لأداء الزكاة فيقومها بأنفع النقدين.

"যাকাত আদায়ের জন্য মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দরিদ্রদের উপকারের বিষয়টি বিবেচনা করা জরুরী। কাজেই সোনা-রূপার মধ্যে যেটার মূল্য ধরে যাকাত দিলে দরিদ্রদের বেশি লাভ হবে, সেটা ধরেই মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।"[৩১২]

মোটকথা, পাইকারী মূল্যের তুলনায় খুচরা মূল্য ধরে যাকাত আদায় করলে যেহেতু দরিদ্রদের উপকার বেশি হয়, তাই খুচরা মূল্য ধরে যাকাত আদায় করতে হবে।

যাকাত কোন মাল দ্বারা আদায় করবে?

যাকাতযোগ্য যত সম্পদ আছে, যাকাত আদায়ের ক্ষেত্রে সরাসরি ঐ সম্পদের অংশ দিয়েই আদায় করতে হবে না টাকা বা অন্য যে কোনো বস্তু দিয়ে ঐ পরিমাণ আদায় করলে যথেষ্ট হবে? এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণের মাঝে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। মূলতঃ তাদের এই মতভেদের ভিত্তি হলো যাকাতের হাকীকত সম্পর্কে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। অর্থাৎ যাকাত কি কেবল ইবাদত, না ধনীদের সম্পদে আরোপিত দরিদ্রের হক? বাস্তব কথা হলো যাকাত উভয় দিকেরই সম্ভাবনা রাখে। কিন্তু কোনো কোনো ফিকহবিদ, যেমন ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ রাহ. প্রমুখ যাকাতের মধ্যে ইবাদতের দিকটিকে প্রাধান্য দেন এবং যে মালের উপর যাকাত এসেছে সে মাল থেকে যাকাত আদায় না করে তার পরিবর্তে টাকা বা অন্য কিছু দেয়াকে অবৈধ বলেন। অপর দিকে- ইমাম আবু হানীফা রাহ. এবং তার অনুসারী ইমামগণ দরিদ্রের হকের বিষয়টি অগ্রাধিকার দিয়ে মূল্য প্রদান করাকে বৈধ বলেন।

মূল্য প্রদান করাকে যারা বৈধ বলেন তাঁদের দলীল

যারা পণ্যের পরিবর্তে মূল্য প্রদানকে বৈধ বলেন তাঁদের দলীল হলো এই আয়াত-

خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةً

"হে নবী! আপনি তাদের (ধনীদের) মাল থেকে যাকাত উসূল করুন।"[৩১৩]

---

311 হেদায়া : ১/১৯৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

312 মাবসূতে সারাখসী: ২/১৯১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

313 সূরা তাওবা: ১০৩

এ আয়াতে যাকাত হিসেবে মাল উসূল করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর মাল ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ, قِيمة বা মূল্যও মালের অন্তর্ভুক্ত। তাই মাল না দিয়ে তার পরিবর্তে মূল্য দিলেও নির্দেশ পালন হয়ে যাবে। তাছাড়া মূল বস্তুর পরিবর্তে মূল্য বা তার সমপরিমাণ অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু দেয়ার প্রচলন সাহাবা যুগ থেকেই চলে আসছে, যা বিভিন্ন বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয়। নিম্নে এধরনের কয়েকটি বর্ণনা তুলে ধরা হলো। হযরত তাউস রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال معاذ ﷺ باليمن: ائتوني بخميس أو لبيس آخذ منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة، وفي رواية ائتوني بعرض ثياب آخذ منكم مكان الذرة والشعير.[৩১৪]

"হযরত মুয়ায রাযি. যখন রাসূল ﷺ কর্তৃক ইয়ামানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন, তখন ইয়ামানবাসীকে এ নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা উৎপন্ন দ্রব্যের যাকাত জামা, চাদর ইত্যাদি কাপড় দ্বারা পরিশোধ করো। আমি তা গ্রহণ করবো। কেননা, এটা তোমাদের জন্য সহজসাধ্য এবং যাকাত গ্রহণকারী মদীনাবাসী সাহাবীদের জন্যও অধিক উপকারী। (কারণ মদীনা কৃষিপ্রধান দেশ হওয়ায় যেখানে কাপড়ের অভাব ছিলো।) অপর বর্ণনায় আছে, তোমরা ভুট্টা, যব ইত্যাদির পরিবর্তে কাপড় দাও।"[৩১৫]

হযরত আতা রাহ. বর্ণনা করেন-

أن عمر ﷺ كان يأخذ العروض في الصدقة من الورق وغيرها.

"হযরত ওমর রাযি. রূপা ইত্যাদির যাকাতের ক্ষেত্রে অন্যান্য আসবাবপত্র গ্রহণ করতেন।"[৩১৬]

আল্লামা ইউসুফ কারজাভী হাফিযাহুল্লাহ উভয় পক্ষের প্রমাণাদি উল্লেখ করার পর বলেন-

أعتقد أننا بعد التأمل في أدلة الفريقين يتبين لنا رجحان ما ذهب إليه الحنفية في هذا المقام.

"আমি মনে করি, উভয়পক্ষের প্রমাণাদির মাঝে চিন্তা ভাবনার পর আমাদের কাছে হানাফী মাযহাবের প্রাধান্য স্পষ্ট হয়ে যাবে।"[৩১৭]

---

[৩১৪] أورده البخاري في «صحيحه» (باب العرض في الزكاة) بألفاظ متقاربة تعليقا. وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»: هذا التعليق صحيح الإسناد إلى طاوس، لكن طاوس لم يسمع من معاذ فهو منقطع، فلا يغتر بقول من قال ذكره البخاري بالتعليق الجازم فهو صحيح عنده لأن ذلك لا يفيد إلا الصحة إلى من علق عنه، وأما باقي الإسناد فلا، إلا أن إيراده له في معرض الاحتجاج به يقتضي قوته عنده، وكأنه عضده عنده الأحاديث التي ذكرها في الباب. انتهى.

وقال الحافظ نفسه في «التلخيص الحبير» ١٥٢/١ : وهو متكلم عن طريق مسروق وطاوس عن معاذ: وقد قال الشافعي: طاوس عالم بأمر معاذ —وإن لم يلق– لكثرة من لقيه ممن أدرك معاذا وهذا مما لا أعلم من أحد منه خلافا، انتهى. ثم قال آخر الصفحة وقال البيهقي: طاوس وإن لم يلق معاذا إلا أنه يماني وسيرة معاذ بينهم مشهورة ثم قال الحافظ في «التلخيص» في حديث أن معاذا لم يأخذ زكاة الأصل: فيه انقطاع بين طاوس ومعاذ، لكن قال البيهقي: هو قوي لأن طاوسا كان عارفا بقضايا معاذ. انتهى

[315] সহীহ বুখারী: ১/১৯৪, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ; সুনানে বাইহাকী: ৪/১১৩

[316] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৬/৫২২, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

[317] ফিকহুয যাকাত : ২/৮১৫, মাকতাবায়ে ওহবা, কায়রো, মিসর

তিনি আরো বলেন-

الواقع أن رأي الحنفية أليق بعصرنا وأهون على الناس، وأيسر في الحساب وخاصة إذا كانت هناك إدارة أوموسسة تتولى جمع الزكاة وتفريقها.

"বাস্তব কথা হলো, হানাফীদের মতটি আমাদের যুগের সাথে অধিক উপযোগী, মানুষের জন্য অতি সহজ এবং হিসাব করতেও অনেক সুবিধা। বিশেষত যেখানে যাকাত সংগ্রহ এবং বণ্টনের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা থাকবে।"[৩১৮]

উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, যে মালের উপর যাকাত এসেছে সেটার পরিবর্তে তার মূল্য দ্বারা কিংবা অন্য কোনো প্রয়োজনীয় বস্তু দ্বারাও যাকাত আদায় করা বৈধ।

হারাম মাল নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে কিনা?

হারাম মাল বা অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কম হোক বা বেশি, যদি আলাদা থাকে কিংবা হালাল মালের সাথে মিশ্রিত থাকে কিন্তু তা আলাদা করা সম্ভব হয় তাহলে উক্ত সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলেও এর উপর যাকাত ফরয হবে না। কারণ যে মাল অবৈধ পন্থায় অর্জিত হয়েছে তার মালিক অর্জনকারী নয়, বরং মূল মালিক অন্য কেউ। তাই উক্ত হারাম মাল মূল মালিকের কাছে পৌঁছানো তার দায়িত্ব। আর মূল মালিক না পাওয়া গেলে গরীব-মিসকীনকে দিয়ে দিতে হবে। যেহেতু সে মালিক নয়, তার উপর ঐ মালের যাকাতও ফরয হবে না।

আল্লামা শামী রাহ. কুনিয়া কিতাবের উদ্ধৃতিতে বলেন-

ولو كان الخبيث نصابا لا يلزمه الزكاة، لأن الكل واجب التصدق عليه فلا يفيد إيجاب التصدق ببعضه.

"অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে উপার্জনকারীর উপর সে সম্পদের যাকাত আদায় করা ফরয নয়। কেননা উপার্জিত হারাম মাল পুরোটাই সদকা করে দেয়া তার কর্তব্য। ফলে এর কিয়দাংশে সদকা আবশ্যক করায় কোনো ফায়দা নেই।"[৩১৯]

পক্ষান্তরে বৈধ সম্পদের সাথে যদি অবৈধ সম্পদ এমনভাবে মিশ্রিত হয় যে, পৃথক করা সম্ভব নয় কিন্তু ঐ মিশ্রিত সম্পদের বাইরে যদি তার এ পরিমাণ সম্পদ থাকে যা দ্বারা অবৈধ সম্পদের দেনা শোধ করা সম্ভব, তাহলে ঐ মিশ্রিত সম্পদে যাকাত আসবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه. لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييزه عند أبي حنيفة، وقوله أرفق إذ قلما يخلو مال عن غصب، وهذا إذا كان له مال غير ما استهلكه بالخلط منفصل عنه يوفي دينه.

"যদি কোনো বাদশাহ আত্মসাৎকরা সম্পদ নিজের সম্পদের সাথে মিশিয়ে ফেলে, তাহলে সে ঐ সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং তাতে যাকাত আসে ও মিরাছ জারি হয়। কেননা, মিশ্রণের পরে যদি পৃথক করা না যায়, তাহলে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতে তা استهلاك

318 ফিকহুয যাকাত : ২/৮১৬, মাকতাবায়ে ওহবা, কায়রো, মিসর

319 ফাতাওয়ায়ে শামী : ৩/২১৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

(খরচ করে ফেলা/নিঃশেষ করে ফেলা) এর অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর এ মতটি অধিক সহজ। কেননা, খুব কম সম্পদই অবৈধ সম্পদের মিশ্রণ থেকে মুক্ত থাকে। আর এ হুকুমটি তখনই প্রযোজ্য হবে যখন মিশ্রিত সম্পদের বাইরে তার এই পরিমাণ সম্পদ থাকবে, যা দ্বারা আত্মসাৎ করা সম্পদের দেনা শোধ করা যায়।"[৩২০]

আর যদি তার কাছে মিশ্রিত সম্পদের বাইরে অবৈধ সম্পদের দেনা পরিমাণ সম্পদ না থাকে, অথবা তার সমস্ত মালই হারামমিশ্রিত হয় তাহলে সে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবে যে, মিশ্রিত সম্পদের মাঝে হালাল মালের পরিমাণ কতটুকু হতে পারে? হালাল মালের পরিমাণ যদি নেসাব পরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি হয় তাহলে শুধু অতটুকুর যাকাত আদায় করতে হবে।

ফিত্রা

ফিত্রার সংজ্ঞা

পরিভাষায় ফিত্রা এমন একটি সদকার নাম যা ঈদুল ফিতরের দিন প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলমানের উপর ওয়াজিব হয়।[৩২১]

ফিতরার নেসাব

যে ব্যক্তির মালিকানায় নিত্যপ্রয়োজনীয় খরচাদি, গৃহসামগ্রী ও ঋণবাদে সাড়ে সাত ভরি সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা সে পরিমাণ টাকা আছে তার উপর নিম্নোক্ত দ্রব্যগুলোর যে কোনো একটি দ্বারা নিম্নে বর্ণিত হারে ফিত্রা আদায় করা ওয়াজিব। (তবে একটি বিষয় অবশ্যই লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে সোনার বাজারমূল্য অধিক হওয়ায় গরীবদের উপকারার্থে রূপার বাজারমূল্যে যাকাত আদায় করা অধিক সমীচীন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر على كل حر أو عبد، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، صاعا من تمر أو شعير، أو نصف صاع من بر.

"রাসূল ﷺ স্বাধীন-গোলাম, ছোট-বড়, নারী-পুরুষ প্রত্যেকের উপর সদকায়ে ফিতর ফরয করেছেন এক সা' খেজুর বা জব কিংবা অর্ধ সা' গম।"[৩২২]

হিসাবের সুবিধার্থে উক্ত দ্রব্যাদির শর'য়ী, ব্রিটিশ ও মেট্রিক পরিমাণের একটি ছক পেশ করা হলো-

দ্রব্যের নাম	শর'য়ী পরিমাণ	ব্রিটিশ ওজনে	মেট্রিক নিয়মে
(ক) গম, আটা বা ছাতু	আধা সা'	১৪০ তোলা ৪ আনা	পৌনে দুই সের

320 আদ্দুররুল মুখতার : ৩/২১৭ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

321 আল কামুসুল ফিকহী-২২৮, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

322 মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ৬/৫০০, হাদীস নং ১০৪৩৫, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান; শায়েখ মুহাম্মাদ আওয়ামা বলেছেন, সনদটি 'হাসান'

(খ) খেজুর, কিসমিস ও যব	এক সা’	২৮০ তোলা ৮ আনা	সাড়ে তিন সের

বি.দ্র. আধা সা’ মেট্রিক নিয়মে ৮০ তোলা ওজন হিসেবে পৌনে দুই সেরের চেয়ে কিছু বেশি হয়। তাই সতর্কতামূলক দুই সের দেয়া উত্তম। অনুরূপভাবে এক সা’ এর ওজন সাড়ে তিন সের থেকে একটু বেশি। অতএব সতর্কতামূলক পৌনে চার সের দেয়া উত্তম।[৩২৩]

যাকাত ও ফিতরার মাঝে পার্থক্য

যাকাত ও ফিতরার মাঝে বেশ কয়েকটি পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে তা তুলে ধরা হলো-

(ক) যাকাতের জন্য ‘মালে নামী’ তথা বর্ধনশীল সম্পদ হওয়া শর্ত। কিন্তু ফিতরার জন্য তা শর্ত নয়।[৩২৪]

(খ) যাকাতের জন্য বছর অতিবাহিত হওয়া জরুরী, কিন্তু ফিতরার জন্য তা জরুরী নয়।[৩২৫]

(গ) প্রয়োজনের অতিরিক্ত গৃহসামগ্রী এবং যে জায়গা-জমি ব্যবসার জন্য নয় তা যাকাতের নেসাবে গণ্য হবে না। কিন্তু এগুলোকে ফিতরার নেসাবে গণ্য করা হবে।[৩২৬]

(ঘ) যাকাতের নেসাব হালাক হয়ে গেলে যাকাত মাফ হয়ে যায়, কিন্তু ফিতরার নেসাব হালাক হয়ে গেলেও তা যিম্মা থেকে বাতিল হয় না।[৩২৭]

কুরবানী

কুরবানীর নেসাব

কুরবানীর দিনগুলোতে যার মালিকানায় ফিতরার নেসাব পরিমাণ অর্থাৎ সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা অথবা এর যে কোনো একটির সমমূল্য টাকা থাকবে তার উপর কুরবানী করা ওয়াজিব। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وشرائطها (أي الأضحية) الإسلام...واليسار الذي يتعلق به وجوب صدقة الفطر.

“কুরবানীর শর্তসমূহের অন্যতম হলো এমন স্বচ্ছলতা, যা দ্বারা সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হয়।”[৩২৮]

হজ্ব

হজ্ব কখন ফরয

যার কাছে পরিবারস্থ লোকদের ভরণপোষণসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় যাবতীয় খরচ ব্যতীত হজ্বে আসা-যাওয়া ও হজ্ব পালনকালীন অবস্থার খরচাদি মজুদ আছে তার উপর জীবনে একবার হজ্ব আদায় করা ফরয। হযরত ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেছেন-

---

৩২৩ জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৮/১২৫, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

324 শরহুল বেকায়া: ১/২৪১, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ; আদ্দুররুল মুখতার: ৩/১৭৯, ৩১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

325 শরহুল বেকায়া: ১/২৪১, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ; আদ্দুররুল মুখতার: ৩/১৭৪, ৩১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

326 শরহুল বেকায়া: ১/২৪১, মাকতাবায়ে থানভী, দেওবন্দ

327 আদ্দুররুল মুখতার: ৩/৩১৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

328 আদ্দুররুল মুখতার: ৯/৪৫২-৪৫৩

جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة.[৩২৯]

"এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এসে আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোনো জিনিস হজ্ব ওয়াজিব করে? উত্তরে তিনি বললেন الزاد و الراحلة পাথেয় এবং বাহন।" ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটি বর্ণনা করে বলেন যে, হাদীসটি 'হাসান'। আর এর উপরই আমল চলে আসছে।"[৩৩০]
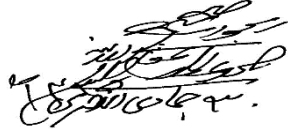
ইমাম কাযীখান রাহ. বলেন-

ومن الشرائط الاستطاعة وهي أن يملك مالا فاضلا عن مسكنه وفرشه وثياب بدنه وفرسه وسلاحه ونفقة عياله وأولاده الصغار مدة ذهابه وإيابه. وإن كفى ذلك الفاضل للزاد والراحلة ...كان عليه الحج.
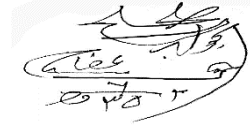
"হজ্ব ওয়াজিব হওয়ার শর্তগুলোর একটি হলো সামর্থ্যবান হওয়া। আর তা হলো বসবাসের বাড়ি, বিছানাপত্র, পরিধেয় বস্ত্র, ঘোড়া ও অস্ত্র এবং তার হজ্বে আসা যাওয়ার সময়ে পরিবারের ভরণপোষণের অতিরিক্ত সম্পদ। অতএব, কারো নিকট যদি এই পরিমাণ সম্পদ থাকে যা হজ্বের সফরের জন্য যথেষ্ট, তাহলে এমন ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয।"[৩৩১]

মোটকথা, বর্ণিত নেসাবের আলোকে কারো কাছে যদি ফিতরা, কুরবানী, যাকাত ও হজ্ব আদায়ের নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে, তাহলে তার জন্য এই ইবাদতগুলো আদায় করা আবশ্যকীয়।
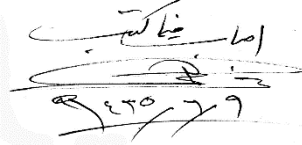
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[৩২৯] أخرجه الترمذي في «جامعه» (٨١٣) وقال: حديث حسن و العمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه.

[330] জামে তিরমিযী: ৩/১১০, হাদীস নং ৮১৩, দারুল হাদীস কায়রো, মিসর

[331] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান : ১/১৭২, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

সমিতি ও কোম্পানির উপর যাকাত

মাওলানা খালিদ হুসাইন টাঙ্গাইলী

যাকাতের গুরুত্ব অপরিসীম। নামাযের পাশাপাশি যাকাতের আলোচনা কুরআনের একাধিক স্থানে করা হয়েছে। হাদীসেও যাকাতের হুকুম-আহকাম স্বযত্নে আলোচিত হয়েছে। কার উপর যাকাত ফরয হবে আর কখন যাকাত দিতে হবে তাও সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কোম্পানি ও সমিতির উপর যাকাত ফরয হবে কি না এ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

যাকাতে নেসাবের গুরুত্ব

বলাবাহুল্য যে, ইসলাম যাকাতের ক্ষেত্রে যথাযথ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। একদিকে গরীব ও অভাবীদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেছে। অন্য দিকে সম্পদের মালিকের সামর্থ্যের বিষয়টিও খেয়াল রেখেছে। মালিককে তার সকল সম্পদ বিলিয়ে দিতে বলা হয়নি। আবার এত কৃপণতাকেও প্রশ্রয় দেয়া হয়নি যে, অভাবীদের অভাব মোচন করার আর কোনো রাস্তাই বাকি না থাকে। তাই ইসলাম একটি সুনির্দিষ্ট পরিমাণ স্থির করে দিয়েছে। এ পরিমাণ সম্পদ কারো কাছে থাকলেই তার উপর যাকাত ফরয হবে। অন্যথায় ফরয হবে না।

ইসলামে এ বিষয়টি পরিষ্কার যে, নেসাব পরিমাণ মালের মালিক না হলে যাকাত ফরয হবে না। একাধিক হাদীসে সবিস্তারে এর আলোচনা এসেছে। নিম্নে আমরা কিছু হাদীস উল্লেখ করছি।

ইমাম আবু দাউদ রাহ. হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.[৩৩২] এর যাকাত উসূল সম্পর্কে রাসূল ﷺ এর সিলসহ লিখিত ফরমান যা তাঁর খেলাফতকালে যথাযথ বাস্তবায়িত ছিলো, তা এভাবে বর্ণনা করেন-

عن حماد قال: أخذت من ثمامة بن عبد الله بن أنس كتابا زعم أن أبا بكر كتبه لأنس، وعليه خاتم رسول الله ﷺ حين بعثه مصدقا، وكتبه له، فإذا فيه: هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله ﷺ على المسلمين التي أمر الله عزّ وجلّ بها نبيه ﷺ فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه، فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم، في كل خمس ذود شاة... فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها وفي الرقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة

---

[৩৩২] আবু বকর সিদ্দীক আব্দুল্লাহ ইবনে উসমান ইবনে আমের ইবনে আমর ইবনে কা'আব ইবনে সা'আদ কুরাশী তামিমী রাযি.। ইসলামের প্রথম খলীফা। তিনি রাসূল সা. এর জন্মের দুই বছর কয়েক মাস আগে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩ হিজরীর জুমাদাস সানীতে ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৫৮৭

فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها.[৩৩৩]

"হাম্মাদ রাহ. বলেন, আমি সুমামা ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আনাস থেকে একটি পত্র সংগ্রহ করেছি, যা আবু বকর রাযি. আনাস রাযি. -কে সদকা উসূল করার জন্য প্রেরণের সময় লিখে দিয়েছিলেন। যাতে রাসূল ﷺ এর সিলমোহর ছিল। উক্ত পত্রে লেখা ছিল, এটি সদকার নেসাব, যা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে রাসূল ﷺ মুসলমানদের জন্য ফরয হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। যার নিকট যথাযথ পরিমাণ সম্পদ চাওয়া হয় সে যেন তা আদায় করে দেয়। আর যদি পরিমাণের অতিরিক্ত চাওয়া হয়, তাহলে সে যেন তা না দেয়। উট পঁচিশটির কম হলে বকরি দিতে হবে। প্রতি পাঁচটি উটে একটি করে বকরি দিবে। চল্লিশটির কম বকরিতে কোনো যাকাত নেই। তবে যদি তার মালিক নফল সদকা করে, সেটা তার ব্যাপার। রূপায়ে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দিতে হবে। এবং দুইশত দিরহামের কমে যাকাত নেই।"[৩৩৪]

হযরত আলী রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ، ببعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء يعني: في الذهب حتى يكون لك عشرون دينارا، فإذا كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন যে, যদি কোনো ব্যক্তির কাছে দুইশত দিরহাম (অর্থাৎ ৫২১/২ সাড়ে বায়ান্ন তোলা পরিমাণ রূপা) থাকে এবং এক বছর পূর্ণ হয়, তাহলে সে উক্ত সম্পদ থেকে পাঁচ দিরহাম যাকাত দিবে। আর যদি কোনো ব্যক্তির কাছে বিশ দীনার (অর্থাৎ ৭১/২ সাড়ে সাত ভরি পরিমাণ স্বর্ণ) থাকে এবং এক বছর পার হয়, সে উক্ত সম্পদ থেকে অর্ধ দীনার যাকাত দিবে। বিশ দিনারের কম স্বর্ণের যাকাত নেই।"[৩৩৫]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقٍ صدقة.

"রাসূল ﷺ বলেছেন, পাঁচ ওয়াসক (নির্দিষ্ট পরিমাপ বিশেষ) এর কম হলে যাকাত ফরয হয় না। পাঁচ উটের কম হলে যাকাত ফরয হয় না এবং পাঁচ উকিয়ার কমেও যাকাত ফরয হয় না।"[৩৩৬]

---

[৩৩৩] أخرجه الحاكم في «المستدرك» في (كتاب الزكاة) وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه هكذا، إنما تفرد بإخراجه البخاري من وجه آخر.

[৩৩৪] সুনানে আবু দাউদ: ১/২১৮-২১৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৩৩৫] সুনানে আবু দাউদ: ১/২২১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ (سكت عنه أبو داود ورجاله رجال الصحيح)

[৩৩৬] সহীহ মুসলিম: ১/৩১৫, আশরাফিয়া, দেওবন্দ;

উল্লিখিত হাদীস ও আরো নুসূস থেকে এ মূলনীতি সাব্যস্ত হয় যে, কারো উপর যাকাত ফরয হতে হলে তাকে স্বতন্ত্রভাবে নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হতে হবে। সুতরাং যদি দু'জনের সম্পদ মিশ্রিত থাকে, কিন্তু এদের কেউ এককভাবে নেসাবের মালিক না হয়, অন্যের সম্পদের সাথে মিশ্রিত থাকার কারণে তার নেসাব পূর্ণ ধরা হবে না এবং যাকাতও ফরয হবে না। ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. উল্লিখিত হাদীসগুলো বর্ণনা করে বলেন-

فنص في هذه الأخبار على حكم الواحد إذا نقص ماله من النصاب، ولم يفرق بين الخليط وغيره، واقتضى عمومه استعمال الحكم في الحالين.

"একজনের সম্পদ নেসাব পরিমাণ না হলে তার উপর যাকাত ফরয না হওয়ার বিধান এ হাদীসগুলোতে পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। তাতে একাধিক ব্যক্তির সম্পদ মিশ্রিত হওয়া না হওয়ার মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। হাদীসের ব্যাপকতার দাবীও এটা যে, একাধিক ব্যক্তির সম্পদ মিশ্রিত থাকুক বা না থাকুক, উভয় অবস্থায় কোনো ব্যক্তির এককভাবে নেসাব পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।"[৩৩৭]

সুতরাং এ কথা পরিষ্কার হলো যে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য স্বতন্ত্রভাবে প্রত্যেকের নেসাব পূর্ণ হতে হবে। নেসাব পূর্ণ না হলে যাকাত ফরয হবে না।

সমিতি ও কোম্পানির উপর যাকাত প্রসঙ্গ

সমিতি ও কোম্পানির উপর বিভিন্ন কারণে যাকাত ফরয হবে না। যার সারসংক্ষেপ নিম্নে তুলে ধরা হলো।

১. আমরা উপরে উল্লেখ করেছি যে, যাকাত ফরয হওয়ার জন্য নেসাবের মালিক হতে হবে। অথচ সমিতি ও কোম্পানিতে বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্য থাকে। কারো অংশ বেশি থাকে কারো কম। তাই অনেক সদস্য এমনও থাকে যে, নেসাব পরিমাণ মালের মালিকই নয়। এমতাবস্থায় সমিতি সবার মালের গড়ে যাকাত আদায় করলে এমন ব্যক্তির মাল থেকেও যাকাত আদায় করা হবে যার উপর যাকাত ফরয হয়নি। এ পর্যায়ে তার সম্পদ থেকে যাকাত আদায় করলে পূর্বোল্লিখিত মূলনীতির পরিপন্থী হবে। এছাড়া নেসাব নির্ধারণ করার মূল হিকমতও অবশিষ্ট থাকে না। যাকাতের নেসাব নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে অন্যের মালের সাথে নিজের মালের সংমিশ্রণ কোনো প্রভাব ফেলবে না। ইমাম তাহাবী রাহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

والخليطان في المواشي كغير الخليطين، يعتبر ملك كل واحد منهما على حياله، ولا يعتد بالشركة.

"গবাদি পশুর দুই অংশীদার ভিন্ন দু'জনের ন্যায়। এখানে প্রত্যেকের সম্পদ আলাদাভাবে হিসাব করা হবে। যাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে অংশীদারির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই।"[৩৩৮]

ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে-

---

[৩৩৭] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/২৫৩, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৩৩৮] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ২/২৫১, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

قال العلامة الحصكفي لا تجب الزكاة عندنا في نصاب مشترك من سائمة ومال تجارة وإن صحت الخلطة فيه باتحاد أسباب الإسامة.

قال ابن عابدين في شرح نصاب مشترك: المراد أن يكون بلوغه النصاب بسبب الاشتراك وضم أحد المالين إلى الآخر بحيث لا يبلغ مال كل منهما بانفراده نصابا.

“আল্লামা হাসকাফী রাহ. বলেন, আমাদের হানাফী মাযহাবে যাকাতযোগ্য পশু ও ব্যবসার মাল যদি সম্মিলিতভাবে নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত আবশ্যক নয়।

আল্লামা শামী রাহ. বলেন, সম্মিলিত নেসাব বলতে বুঝায় যা এক অংশীদারের অংশ অপরের অংশের সাথে মিলানোর কারণে নেসাবের গণ্ডিতে গিয়ে পৌঁছেছে, পক্ষান্তরে যদি এই সম্পদ পৃথক করা হয়, তাহলে কোনোটিই নেসাবের আওতায় আসে না।”[৩৩৯]

মালেকী মাযহাবের ইমাম ইবনে রুশদ রাহ. এ প্রসঙ্গে বলেন-

وأما المسألة الرابعة: فإن عند مالك وأبي حنيفة أن الشريكين ليس يجب على أحدهما زكاة حتى يكون لكل واحد منهما نصاب، وعند الشافعي أن المال المشترك حكمه حكم مال رجل واحد.

وسبب اختلافهم: الإجماع الذي في قوله عليه الصلاة والسلام: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة» فإن هذا القدر يمكن أن يفهم منه أنه إنما يخصه هذا الحكم إذا كان لمالك واحد فقط، ويمكن أن يفهم منه أنه يخصه هذا الحكم كان لمالك واحد أو أكثر من مالك واحد، إلا أنه لما كان مفهوم اشتراط النصاب إنما هو الرفق، فواجب أن يكون النصاب من شرطه أن يكون لمالك واحد، وهو الأظهر، والله أعلم. والشافعي كأنه شبه الشركة بالخلطة ولكن تأثير الخلطة في الزكاة غير متفق عليه على ما سيأتي فيما بعد.

“ইমাম মালেক ও আবু হানীফা রাহ. এর মতে যৌথ সম্পদে প্রত্যেক শরীক ভিন্ন ভিন্নভাবে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক না হলে যাকাত আবশ্যক হবে না। আর শাফে‘য়ী রাহ. এর নিকট যৌথ সম্পদের হুকুম এক ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় (অর্থাৎ যৌথ সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে যাকাত আবশ্যক হবে)। তাদের ইখতিলাফের মূল ভিত্তি হলো রাসূল ﷺ এর এ সর্ববাদী বাণী, ‘স্বর্ণের পরিমাণ পাঁচ উকিয়ার কম হলে সদকা নেই।’ উক্ত বাণী থেকে নির্গত হুকুমটি তথা নেসাবের নির্ধারিত পরিমাণটি যেমন এক মালিকের সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, একাধিক মালিকের সম্পদেও হতে পারে। তবে নেসাব শর্ত করার ভিত্তি যেহেতু দয়া ও অনুগ্রহের উপর, তাই উল্লিখিত হাদীসে যাকাতের নির্ধারিত পরিমাণ এক মালিকের জন্য হওয়াই অধিক স্পষ্ট ও যুক্তিযুক্ত। আর শাফে‘য়ী রাহ. যৌথ সম্পদকে ‘খুলতা’ অর্থাৎ মিশ্রিত সম্পদের সাথে তুলনা করেছেন। অথচ যাকাতের ক্ষেত্রে খুলতার

[৩৩৯] আদ্দুররুল মুখতার: ৩/২৩৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

প্রভাব একটি মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়।"[৩৪০]

২. যাকাত ফরয হওয়া না হওয়া ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত, যৌথ সমিতি বা কোম্পানির সাথে সম্পৃক্ত নয়। কারণ যাকাত একটি ইবাদত যা ফরয হওয়ার জন্য মুকাল্লাফ (অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আদেশ নিষেধ পালনে আদিষ্ট ব্যক্তি) হওয়া শর্ত। যা একজন ব্যক্তির মাঝেই পাওয়া সম্ভব। কোনো সমিতি বা কোম্পানি মুকাল্লাফ নয়। তাই তার উপর যাকাত ফরয হবে না।

৩. যাকাত ফরয হতে হলে মালের মালিক হতে হয় আর সমিতি বা কোম্পানি মালের মালিক নয়। বরং সমিতির সকল সম্পদের প্রকৃত মালিক সদস্যগণ, তাই যাকাত ফরয হলে সদস্যদের উপর হবে, সমিতির উপর নয়।

সমিতির সদস্যদের উপর যাকাত

সমিতি বা কোম্পানির সমষ্টির উপর যাকাত ফরয না হলেও কোনো সদস্যের যদি সমিতি বা কোম্পানিতে নেসাব পরিমাণ সম্পদ থাকে কিংবা সমিতি বা কোম্পানিতে জমাকৃত মালকে তার অন্যান্য সম্পদের সাথে হিসাব করলে নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। তবে যাকাতের ক্ষেত্রে কোম্পানিতে জমাকৃত সম্পদের হিসাব অন্য যে কোনো ব্যবসায়িক সম্পদের মতই হবে। অর্থাৎ সমিতি ও কোম্পানি পরিচালনার জন্য যে সকল আসবাবপত্র প্রয়োজন হয়। যেমন কম্পিউটার, মেশিন, চেয়ার টেবিল ইত্যাদি এগুলো নেসাবের হিসাবে আসবে না। কারণ ব্যবসার মাধ্যম ও যন্ত্রপাতি যাকাতের মালের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. বলেন-

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل... وآلات المحترفين (زكاة).

"বসবাসের বাড়িতে, পরিধেয় বস্ত্রে, গৃহসামগ্রী এবং কর্মজীবীর কাজের মাধ্যম ও যন্ত্রপাতিতে কোনো যাকাত নেই।"[৩৪১]

উক্ত সদস্য অংশীদার হওয়ার তারিখে যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হয় এবং এক বছর পূর্তিতে নেসাব ঠিক থাকে, তাহলে যাকাত আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে নেসাব হিসাব করার সময় বছরের মাঝের লভ্যাংশগুলো মূল সম্পদের সাথে হিসাব হবে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে-

ومن كان له نصاب فاستفاد في أثناء الحول مالا من جنسه ضمه إلى ماله وزكاه سواء كان المستفاد من نمائه أو لا، وبأي وجه استفاد ضمه...

"যার নেসাব পরিমাণ সম্পদ আছে, বছরের মাঝামাঝি সময়ে যদি তার কাছে থাকা সম্পদের অনুরূপ আরো কিছু সম্পদ তার হস্তগত হয়, তাহলে এই সম্পদকে মূল নেসাবের সাথে

---

[৩৪০] বিদায়াতুল মুজতাহিদ: ১/২০৬, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
[৩৪১] হেদায়া: ১/১৮৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

মিলিয়ে যাকাত আদায় করতে হবে। বর্তমানে প্রাপ্ত সম্পদ তার মূল সম্পদলব্ধ হোক বা ভিন্নভাবে অর্জিত হোক এবং এই সম্পদ যে কোনো প্রক্রিয়ায় তার হস্তগত হোক না কেন।”[৩৪২]
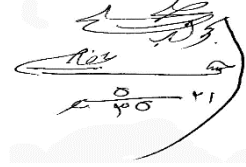
কোম্পানিগুলোতে রিজার্ভ ফান্ড নামে একটা বিশেষ ফান্ড থাকে। কোনো সময় যদি কোম্পানির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে যেন সেখান থেকে পূরণ করা যায়। সেখানে প্রত্যেক সদস্যের একটা অংশ থাকে। কিন্তু কেউ ফান্ড থেকে নিজের অংশ নিতে পারে না এবং কোনো হস্তক্ষেপও করতে পারে না। মূলকথা হলো, এ ফান্ড সম্পূর্ণরূপে কোম্পানির কাছে রক্ষিত থাকে এবং সদস্যের প্রভাবমুক্ত থাকে।

যাকাতের হিসাবের সময় এ ফান্ডের টাকার হিসাব করতে হবে। কারণ তার হস্তক্ষেপ করার অধিকার না থাকলেও সদস্যগণ যেহেতু স্বেচ্ছায় এ শর্ত গ্রহণ করেছেন এবং পরবর্তীতে এ ধরনের শর্তের মাঝে রদবদল করাও সম্ভব। এ ছাড়াও কোম্পানি ভেঙ্গে গেলে ঐ ফান্ডসহ হিসাব করে সদস্যদের মূলধন বুঝিয়ে দেয়া হবে এবং প্রত্যেক সদস্যের অংশের বাজারমূল্য নির্ধারণের সময় ঐ ফান্ডের জমা টাকাও হিসাবে আসে তাই যাকাত আদায় করার সময় ঐ ফান্ডের টাকাও নেসাবের অর্ন্তভুক্ত হবে।
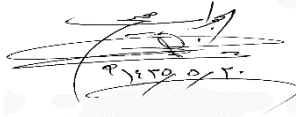
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[৩৪২] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৭৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান

প্রভিডেন্ট ফান্ডের শর'য়ী বিধান ও যাকাত প্রসঙ্গ

মাওলানা আব্দুল্লাহ মোস্তফা, ঢাকা

ভবিষ্যৎ তহ্‌বিল যা সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারীদের মাসিক বেতন থেকে তার ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সরকার বা কোম্পানি কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে বেতনের কর্তিত অংশ ও তার উপর বর্ধিত অংশের সমন্বিত তহ্‌বিলকে প্রভিডেন্ট ফান্ড বলে।

সরকারী ও বেসরকারী দুই ধরনের ফান্ড রয়েছে। তবে সরকারী প্রভিডেন্ট ফান্ডকে সংক্ষেপে এ. চ. ঋও বলে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রকারভেদ

প্রভিডেন্ট ফান্ড দুই প্রকার।

১. বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড।

২. স্বেচ্ছায় প্রণোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ড।

বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড

যে বেতনাংশ কেটে রাখার ব্যাপারে কর্মচারীর কোনো ইখতিয়ার নেই। সরকার বা কোম্পানি বাধ্যতামূলকভাবে নিজস্ব রুল বা নিয়মনীতি অনুযায়ী কর্মচারীর নামে তহবিলে জমা রাখে। এ ফান্ডের অর্থের তিনটি অংশ রয়েছে।

১. মূল বেতনাংশ।

২. সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে প্রতিমাসে বর্ধিত অংশ।

৩. উপরোক্ত অংশ দুটির উপর বছরান্তে শতকরা হারে বর্ধিত অংশ।

শরী'আতে এ তিন প্রকারের টাকার হুকুম একই। অর্থাৎ এ সকল টাকা মূলত বেতনের অংশ। যদিও সুদ বা অন্য কোন নামে দেয়া হয়, মূলত এগুলো সুদ নয়। তাই কর্মচারীর জন্য তা গ্রহণ করা ও স্বীয় কাজে ব্যবহার করা জায়েয।

স্বেচ্ছা প্রণোদিত প্রভিডেন্ট ফান্ড

সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতা নেই। বরং কর্মচারীর স্বীয় ইখতিয়ারে নির্ধারিত একটি অংশ বেতন থেকে কেটে রাখা হয়। এ ফান্ডের উপর ভিত্তি করে সুদের নামে যা কিছু দেয়া হয়, তা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কেননা এর সাথে সুদের সাদৃশ্যতা রয়েছে। আর যদি কর্মচারী গ্রহণ করে ফেলে, তাহলে সওয়াবের নিয়ত ছাড়া সদকা করে দিবে। এমনটি মুফ্‌তী শফী রাহ.[৩৪৩] স্বীয় কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

---

[৩৪৩] মুফতী মুহাম্মদ শফী ইবনে মাওলানা ইয়াসিন উসমানী দেওবন্দী রাহ.। তিনি ১৩১৪ হিজরী সনের ২০/২১শে শাবান ভারতের উত্তর প্রদেশের সাহারানপুর জেলার দেওবন্দ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। সাইয়েদ আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ.

একটি সন্দেহের অবসান

প্রভিডেন্ট ফান্ড মূলত কর্মচারীর পরিশ্রমের বিনিময়ের একটি অংশ যা কর্মচারী এখনও পর্যন্ত উসূল করেনি। অতএব সরকারের যিম্মায় তা কর্মচারীর ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত কর্মচারী নিজে বা তার উকিলের মাধ্যমে তা হস্তগত না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার মালিকানাধীন নয়। কেননা শ্রমিক যতক্ষণ পর্যন্ত তার পরিশ্রমের বিনিময় হস্তগত না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তা তার মালিকানাধীন হয় না। বরং তা শুধুমাত্র তার একটি হক। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে নুজাইম আল-মিস্‌রী রাহ. স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন-

قوله بل بالتعجيل أو بشرطه أو بالاستيفاء أو بالتمكن يعني لا يملك الأجرة إلا بواحد من هذه الأربعة، والمراد أنه لا يستحقها المؤجر إلا بذلك كما أشار إليه القدوري في مختصره، لأنها لو كانت دينا لا يقال إنه ملكه المؤجر قبل قبضه، وإذا استحقها المؤجر قبل قبضها فله المطالبة بها وحبس المستأجر عليها وحبس العين عنه وله حق الفسخ إن لم يعجل له المستأجر.

"ইজারা চুক্তি হলেই (শ্রমিকের জন্য) পারিশ্রমিক আবশ্যক নয়। বরং চারটি উপায়ের কোনো একটি উপায়ে পারিশ্রমিকের অধিকার সাব্যস্ত হয়।

১. কোনো ধরনের পূর্বশর্ত ছাড়াই মালিক কর্তৃক শুরুতেই পারিশ্রমিক আদায় করা।

২. চুক্তির সময় অগ্রিম প্রদানের শর্ত করে থাকলে।

৩. চুক্তিকৃত কাজ সমাধা হলে।

৪. চুক্তিকৃত বস্তুকে শ্রমিক কর্তৃক এমন স্থানে হস্তান্তর করা, যেখান থেকে মালিক পণ্যকে কাজে লাগাতে পারে। ইমাম কুদূরী রাহ.ও স্বীয় কিতাব মুখতাসারুল কুদূরীতে এমনটি উল্লেখ করেছেন। কেননা যদি ঋণ হতো, তাহলে এ কথা বলা যেত না যে, শ্রমিক মজুরী হস্তগত করার পূর্বেই সে তার মালিক হয়ে গেছে এবং শ্রমিকের মজুরী হস্তগত করার পূর্বে তাতে তার হক সাব্যস্ত হয়েছে। তাই এখন সে মালিকের নিকট মজুরী চাইতে পারবে এবং তার জন্য মালিক ও মালিকের পণ্য আটকে রাখার অধিকার থাকবে। আর যদি মালিক তাকে অগ্রিম আদায় করে না দেয়, তবে সে চুক্তি বাতিলও করতে পারবে।"[৩৪৪]

সুতরাং উপরোক্ত ভাষ্যের মাধ্যমে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে, প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা কর্মচারীর মালিকানা নয় এবং এতে তার কোনো হস্তক্ষেপ নেই। অতএব সরকার এ টাকায় যে ধরনের মুআমালা করুক না কেন, তা সরকারের মালিকানা অংশের মধ্যে করেছে। কর্মচারীর এর মধ্যে কোন অংশ নেই। ফলে সরকার যখন নিজে এ টাকা কর্মচারীকে প্রদান করে, তখন তার মধ্যে নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করে প্রদান করলে সেটা সুদ হবে না।

মুফতী আযীযুর রহমান উসমানী রাহ. ও শাইখুল হিন্দ মাহমুদ হাসান দেওবন্দী রাহ. তাঁর বিশিষ্ট উস্তায ছিলেন। মা'আরিফুল কুরআন, আহকামুল কুরআন, ইমদাদুল মুফতীন ও জাওয়াহিরুল ফিকহ তাঁর রচনাবলীর অন্যতম। তিনি ১৩৯৬ হিজরীর ১১ই শাওয়াল ইন্তেকাল করেন। -উসূলুল ইফতা ওয়া আদাবুহু: ৬৭-৬৯

[৩৪৪] আল বাহরুর রায়েক: ৭/৫১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিগত দিনের যাকাত

প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা সরকার বা কোম্পানির নিকট অপরিশোধিত ঋণ যার পাওনাদার উক্ত কর্মচারী। ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহ. এর মতে যে কোনো ধরনের ঋণের উপর যাকাত ওয়াজিব। তাই এ ফান্ডের টাকার উপরও যাকাত ওয়াজিব। অতএব, যখন এ ফান্ডের কর্তিত বেতনাংশ আদায় হবে, তখন বিগত বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। তবে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতে ঋণ তিন প্রকার। যথা:

১. দাইনে কবী (শক্তিশালী ঋণ) অর্থাৎ এমন ঋণ, যা ব্যবসার মালের বিনিময়ে কারো যিম্মায় আবশ্যক হয়। যেমন: রাশেদ খালেদের নিকট ব্যবসার কিছু মাল বিক্রি করেছে। অতএব, খালেদের জন্য এর মূল্য আদায় করা ওয়াজিব। তাই যখন চল্লিশ দিরহাম (এক দিরহাম=৩৪ রতি, অতএব ৩৪ী৪০=১৩৬০ রতি) পরিমাণ প্রাপকের হস্তগত হবে, তখন এ ধরনের ঋণের উপর যাকাত আদায় করা ওয়াজিব।

২. দাইনে যায়ীফ (দুর্বল ঋণ) অর্থাৎ যা কোনো ব্যক্তি কোনো কিছুর বিনিময় ছাড়া পাওনাদার হয়। যেমন: উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি। কিংবা কোন কিছুর বিনিময়ে অর্জিত হলেও কোনো মালের বিনিময়ে নয়। যেমন দেনমোহরের পাওনা টাকা, এ ধরনের ঋণে যাকাত ওয়াজিব হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হস্তগত হওয়ার পর এক বছর অতিবাহিত না হয়।

৩. দাইনে মুতাওয়াস্‌সিত (মধ্যম ঋণ) অর্থাৎ যা ব্যবসায়িক মাল ছাড়া অন্য মালের বিনিময়ে আবশ্যক হয়। যেমন তারেক স্বীয় পরিধেয় কাপড় ওমরের নিকট বিক্রি করেছে। অতএব, উক্ত কাপড়ের বিনিময়ে প্রাপ্য মূল্য হলো মধ্যম ঋণ। এধরনের পাওনা টাকায় বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে ইমাম আবু হানিফা রাহ. এর নিকট বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না। বরং হস্তগত হওয়ার পর এর উপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা যেহেতু উপরোক্ত তিন প্রকারের মধ্যে দাইনে যায়ীফের অন্তর্ভুক্ত হওয়াটাই রাজেহ ও অধিক যুক্তিযুক্ত, তাই এ ফান্ডের টাকার উপর বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না। ফাত্ওয়া এর উপরই। তবে সাহেবাইনের (আবু ইউসূফ ও মুহাম্মদ রাহ.) মতের উপর আমল করা উত্তম। উল্লিখিত তিন প্রকার ঋণের আলোচনাটি আল্লামা কাসানী রাহ. বিস্তারিতভাবে এভাবে উল্লেখ করেছেন-

وجملة الكلام في الديون أنها على ثلاث مراتب في قول أبي حنيفة : دين قوي ، ودين ضعيف ، ودين وسط كذا قال عامة مشايخنا أما القوي فهو الذي وجب بدلا عن مال التجارة كثمن عرض التجارة من ثياب التجارة ، وعبيد التجارة، أو غلة مال التجارة ولا خلاف في وجوب الزكاة فيه إلا أنه لا يخاطب بأداء شيء من زكاة ما مضى ما لم يقبض أربعين درهما ، فكلما قبض أربعين درهما أدى درهما واحدا. وعند أبي يوسف ومحمد كلما قبض شيئا يؤدي زكاته قل المقبوض أو كثر .

وأما الدين الضعيف: فهو الذي وجب له بدلا عن شيء سواء وجب له بغير صنعه كالميراث ، أو بصنعه كالوصية، أو وجب بدلا عما ليس بمال كالمهر ، وبدل الخلع ، والصلح عن القصاص ، وبدل الكتابة

ولا زكاة فيه ما لم يقبض كله ويحول عليه الحول بعد القبض .

وأما الدين الوسط فما وجب له بدلا عن مال ليس للتجارة كثمن عبد الخدمة ، وثمن ثياب البذلة والمهنة وفيه روايتان عنه ، ذكر في (الأصل) أنه تجب فيه الزكاة قبل القبض لكن لا يخاطب بالأداء ما لم يقبض مائتي درهم فإذا قبض مائتي درهم زكى لما مضى ، وروى ابن سماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا زكاة فيه حتى يقبض المائتين ويحول عليه الحول من وقت القبض وهو أصح الروايتين عنه. (بدائع الصنائع : كتاب الزكاة ٢/ ٩٠ زكريا)

বাধ্যতামূলক ফান্ডে স্বেচ্ছায় অতিরিক্ত টাকা রাখা

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে দুই প্রকারের পরিচয় সম্পর্কে কিছুক্ষণ পূর্বে আলোকপাত করা হয়েছে, সে দুই প্রকার ফান্ডের প্রথম প্রকার (বাধ্যতামূলক ফান্ডের) ক্ষেত্রে বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না। তবে দ্বিতীয় প্রকার (স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ফান্ডের) ক্ষেত্রে বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে এবং সরকার বা কোম্পানির পক্ষ থেকে মাসিক বর্ধিত অংশ ও বাৎসরিক সুদের নামে যা প্রদান করা হয়, তা বাধ্যতামূলক ফান্ডের কর্মচারী গ্রহণ করতে পারবে। ইখতিয়ারী ফান্ডের কর্মচারী সুদের সাথে সাদৃশ্য থাকার কারণে গ্রহণ না করা উচিত। কিন্তু বর্তমানে বাধ্যতামূলক ফান্ডের কর্মচারীদের মধ্যে কেউ কেউ স্বেচ্ছায় আরো কিছু টাকা বাড়িয়ে রাখার ব্যাপারে কোম্পানিকে আবেদন করে থাকে। যেমন ধরুন, কোম্পানি ৯% কেটে রাখে, কিন্তু সে আরো ৪১% কেটে রাখার ব্যাপারে আবেদন করে। সে হিসেবে প্রতিমাসে ৫০% কাটা হয়। ফলে অতিরিক্ত ৪১% ও নির্ধারিত ৯% এর সাথে যোগ হয়ে একসাথে সম্পূর্ণ টাকা পাবে।

এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে হুকুম ভিন্ন হবে। অর্থাৎ অতিরিক্ত ৪১% এর মধ্যে যাকাতের বিধান চালু হবে, যদিও হস্তগত না হয়। যেমন কেউ স্বেচ্ছায় কাউকে ঋণ দেয়ার পর তা হস্তগত না হলেও তার উপর যাকাত ওয়াজিব হয়। এমনিভাবে স্বেচ্ছায় কারো নিকট আমানত রাখার পর হস্তগত না হলেও তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেহেতু তা তারই মালিকানা এবং সে স্বেচ্ছায় আমানত রেখেছে। ঠিক তদ্রূপভাবে এখানেও ৪১%এর উপর যাকাত আসবে এবং এর উপর সুদের নামে যে টাকা দেয়া হবে তা সুদ হিসেবেই বিবেচিত হবে। সুতরাং তা গ্রহণ করা যাবে না।[৩৪৫]

প্রভিডেন্ট ফান্ডের যাকাত সংক্রান্ত আরো কিছু মাসআলা

পূর্বে প্রভিডেন্ট ফান্ডের শুধুমাত্র বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হওয়া বা না হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে। তবে যদি এ ফান্ডের টাকা কর্মচারীর হস্তগত হওয়ার পর বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বে চুরি বা খরচ হয়, কিংবা কর্মচারী এ টাকাগুলোকে কোনো বীমা কোম্পানি, ট্রাস্টের কাছে হস্তান্তর করে ইত্যাদি, সেগুলোর ব্যাপারে বিস্তারিত হুকুম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

[৩৪৫] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া: ৭/১৫২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

১. যদি কোনো কর্মচারী নিজের পক্ষ থেকে কোনো ব্যাংক, বীমা কোম্পানি, বোর্ড বা ব্যবসায়িক কোম্পানিকে উক্ত ফান্ডের টাকা হস্তান্তর করে, তখন ব্যাংক বা কোম্পানি কর্মচারীর উকিল হবে। আর শরী'আতে উকিলের কব্জা মুআক্কিলের কব্জার হুকুমে, তাই হস্তান্তর করার পর বছর পূর্ণ হলে যাকাত দিতে হবে।

২. যদি কর্মচারী ফান্ডের টাকা কোনো ব্যবসায়িক কোম্পানিকে এ শর্তে দেয় যে, তারা তা ব্যবসার কাজে লাগাবে এবং সে লাভ ক্ষতির মধ্যে অংশীদার হবে। তাহলে হস্তান্তর করার পর থেকেই এর উপর যাকাতের বিধান চালু হবে এবং প্রত্যেক বছরের যাকাত কর্মচারীর উপর নিয়মানুসারে ওয়াজিব হবে।

৩. যদি পূর্ব থেকে নেসাবের মালিক না হয়ে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা পেয়ে নেসাবের মালিক হয়, সেক্ষেত্রে টাকা গ্রহণ করার দিন থেকে নিয়ে চন্দ্র মাস অনুসারে পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, যদিও বছরের মাঝে নেসাবে কিছু ঘাটতি দেখা দেয় এবং বছর শেষ হওয়ার পূর্বেই নেসাব পুনরায় পূর্ণ হয়ে যায়। আর যদি বছর শেষ হওয়ার পূর্বে পুনরায় নেসাব পূর্ণ না হয়, তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না।

৪. কর্মচারী পূর্ব থেকে নেসাবের মালিক হয়ে থাকলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা নেসাবের চেয়ে কম বা বেশী হাসিল হওয়ার পর তার উপর এক বছর অতিবাহিত হওয়া শর্ত নয়। বরং পূর্ব থেকে যে মাল তার নিকট রয়েছে এর উপর যদি পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হয় (যদিও বছরের মাঝে নেসাবে ঘাটতি দেখা দেয়, কিন্তু বছর পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই ঘাটতি পূরণ হয়ে যায়) তাহলে প্রভিডেন্ট ফান্ডের উসূলকৃত টাকার উপরও যাকাত ওয়াজিব হবে এই নতুন টাকার উপর এক দিন অতিবাহিত হোক না কেন।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের মিরাছ
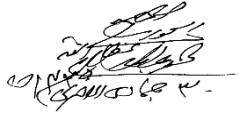
প্রভিডেন্ট ফান্ডের যে অংশ কর্মচারীর বেতন থেকে কর্তন করা হয়েছে, কর্মচারীর মৃত্যুর পর সে অংশে এবং মাসিক বর্ধিত ও বাৎসরিক ইন্টারেস্ট হিসেবে যা জমা করা হয়েছে, সবগুলোর মধ্যে ওয়ারিশদের জন্য মিরাছের হুকুম জারী হবে। কেননা এ অংশের অর্থ তার শ্রমের অপরিশোধিত বিনিময়, যা তার মৃত্যুর পর অর্জিত হবে। সুতরাং তার মৃত্যুর পর প্রভিডেন্ট ফান্ডের সম্পূর্ণ টাকা তার ওয়ারিশদের মাঝে শর'য়ী বণ্টননীতি মোতাবেক বন্টিত হবে।

প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যাপারে আশরাফ আলী থানভী রাহ. এর সর্বশেষ ফাতওয়া
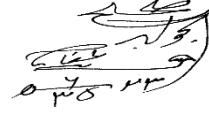
১৩৬২ হিজরীতে যখন আশরাফ আলী থানভী রাহ. এর থানাভবনে মুফতী শফী রাহ. প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিগত দিনের যাকাতের ব্যাপারে আলোচনা করেন। সে সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন, এর ৬ মাস পর তিনি ইন্তেকাল করেন। তখন আশরাফ আলী থানভী রাহ. এ মাসআলাটি গভীরভাবে গবেষণা করার জন্য উপস্থিত ওলামায়ে কেরামকে পরামর্শ দেন। অতঃপর মুফ্তী শফী রাহ. এ ব্যাপারে গবেষণা করে কিছু তথ্য তাঁর সামনে পেশ করেন, যার সারাংশ হলো, বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে না। তার এ তথ্যবহুল লেখা

দেখে আশরাফ আলী থানভী রাহ.[৩৪৬] অত্যন্ত খুশি হন এবং তার গবেষণালব্ধ বিষয়টিকে এমদাদুল ফাতাওয়ার অংশ হিসেবে সাব্যস্ত করেন। পাশাপাশি তিনি স্বীয় মত (বিগত দিনের যাকাত ওয়াজিব হবে) থেকে ফিরে আসেন।[৩৪৭]
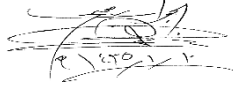
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীম উদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
১০ মুহাররম ১৪৩৫হি.

[৩৪৬] হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ.। ১২৮০ হিজরীর ৫ই রবিউস সানী বৃহস্পতিবার থানাভবনে জন্মগ্রহণ করেন। ১৩০১ হিজরীতে দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে হাদীসের সনদ লাভ করেন। দেওবন্দে তাঁর উস্তাযদের মধ্যে মাওলানা ইয়াকূব নানুতবী রাহ. অন্যতম। তিনি যাহিরী ও বাতিনী ইলমের আধার ছিলেন। হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রাহ. থেকে খেলাফত লাভ করেন। তিনি ইলমী খেদমতের সাথে সাথে তাযকিয়ার ক্ষেত্রে সংস্কারমূলক মেহনত করেন। তাঁর খলীফার সংখ্যা ১৪৯ জন। রচনার জগতেও নিকট অতিতে তাঁর নমুনা বিরল। ছোট বড় মিলে তাঁর রচনার সংখ্যা ৮৭৭। ১৩৬২ হিজরীর ১২ই রজব থানাভবনে ইন্তেকাল করেন। -কারওয়ানে রফতাঁ: ৩৪

[৩৪৭] প্রভিডেন্ট ফান্ড পর যাকাত আওর সুদ কা মাসআলা

ঋণের যাকাতের বিধান

মাওলানা জহীরুল হক খুলনা

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতিকে সামাজিক জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। কাউকে ধনী কাউকে গরীব, কাউকে শক্তিশালী কাউকে দুর্বল করে সৃষ্টি করেছেন। কেউ সব বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি বিষয়ে একে অন্যের মুখাপেক্ষী। সাহায্য নিতে হয় অন্যের জ্ঞানের, শক্তির, কখনো বা অর্থের। এভাবে মানব সৃষ্টির মাঝে রয়েছে মহাজ্ঞানী আল্লাহ তা'আলার পৃথিবী পরিচালনার অপূর্ব হিকমত। যেমন, আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেন-

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ

"আমি তাদের মধ্যে জীবনোপকরণ বণ্টন করে দিয়েছি পার্থিব জীবনে এবং কতিপয়কে কতিপয়ের উপর মর্যাদা দান করেছি, যাতে একে অপরকে কাজে লাগাতে পারে।"[৩৪৮]

যাকাত ইসলামের অন্যতম রোকন

যাকাত ইসলামের অন্যতম রোকন। আর যাকাত সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দাইন বা ঋণের আলোচনা প্রাসঙ্গিকভাবে চলে আসে। কেননা, মানুষ সামাজিক জীব হিসেবে কখনো নিজের প্রয়োজনে ঋণ নেয়, আবার কখনো অন্যের প্রয়োজনে ঋণ দেয়। এভাবে পরস্পর ঋণের আদান প্রদানের ফলে কখনো কখনো অন্যের মাল এ পরিমাণ হস্তগত হয়, যা যাকাতের নেসাবে গিয়ে পৌঁছে। তাই এখন প্রশ্ন জাগে, কেউ যদি কাউকে পাঁচ লাখ টাকা ঋণ দেয়, অথবা মোহর বা পৈত্রিক সূত্রে কারো কাছে পাঁচ লাখ টাকা পায়, তাহলে এ পাঁচ লাখ টাকার যাকাত কি ঋণদাতার উপর ওয়াজিব হবে? তার হাতে তো এখন উক্ত টাকা নেই। নাকি ঋণগ্রহীতার উপর ওয়াজিব হবে? তার হাতে নগদ পাঁচ লাখ টাকা থাকলেও তা অন্যের মালিকানা সম্পদ। এ ধরনের সকল সমস্যার সমাধানের জন্য ফুকাহায়ে কেরাম ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। নিম্নে তা উল্লেখ করা হলো-

ঋণের পরিচয়

ঋণের আভিধানিক অর্থ হলো, পাওনা, ধার, দেনা, কর্জ, ইত্যাদি। ঋণের আরবী প্রতিশব্দ হলো, 'দাইন' (الدين)। আর ইংরেজী প্রতিশব্দ হল, 'ডেট' বা 'লোন' (Debt, Loan)।

ঋণের পারিভাষিক সংজ্ঞা আল্লামা মুহাম্মদ আলী থানভী রাহ.[৩৪৯] এভাবে দিয়েছেন-

مال واجب في الذمة بالعقد أو الاستهلاك أو الاستقراض.

---

[৩৪৮] সূরা যুখরুফ: ৩২

[৩৪৯] মুহাম্মদ থানবী: আলা ইবনে আলী ইবনে কাযী মুহাম্মাদ হামেদ আল ফারুকী আত থানবী রাহ.। তিনি হিজরী ১১ শতাব্দীর লোক ছিলেন। আহকামুল আরাদী ও কাশশাফু ইস্তিলাহাতিল ফুনূন ওয়াল উলূম তাঁর রচনাবলীর অন্যতম। তিনি ১১৫৮ হিজরী পর্যন্ত জীবিত ছিলেন এতটুকু নিশ্চিত জানা যায়।

"এমন অর্থ যা কোনো চুক্তি বা অন্যের কিছু নষ্ট করা অথবা অন্যের কিছু নেয়ার কারণে পরিশোধ করা আবশ্যক হয়।"[৩৫০]

ঋণের প্রকারভেদ

যাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক হওয়া না হওয়া হিসেবে ঋণ তিন প্রকার। যথা:

১. খালেছ বান্দার নিকট দায়বদ্ধ ঋণ। যেমন, কর্জ। ২. আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ ঋণ, তবে তা বান্দার পক্ষ থেকে উসূল করা হয়। যেমন, যাকাত। ৩. খালেছ আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ ঋণ যা বান্দার পক্ষ থেকে উসূল করা হয় না। যেমন, মান্নত, কাফ্ফারা ইত্যাদি। উল্লিখিত তিন প্রকার থেকে প্রথম দুই প্রকার ঋণ যাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে, তৃতীয় প্রকার প্রতিবন্ধক হবে না। যেমন আল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ গ্রন্থে উল্লেখ আছে-

الحنفية قالوا: ينقسم الدين بالنسبة لذلك إلى ثلثة أقسام، الأول أن يكون دينا خالصا للعباد، الثاني أن يكون دينا لله تعالى ولكن له مطالب من جهة العباد، كدين الزكاة. والمطالب هو الإمام في الأموال الظاهرة وهي السوائم وما يخرج من الأرض، أو نائب الإمام (الملاك) في الأموال الباطنة وهي أموال التجارة، كالذهب والفضة...الثالث أن يكون دينا خالصا لله تعالى ليس له مطالب من جهة العباد، كديون الله تعالى الخالصة من نذور وكفارات وصدقة فطر ونفقة حج، فالدين الذي يمنع وجوب الزكاة هو دين القسمين الأولين...أما القسم الثالث فإنه لا يمنع وجوب الزكاة.

"যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া না হওয়ার দিক থেকে ঋণ তিন প্রকার। ১. খালেছ বান্দার ঋণ। ২. আল্লাহ তা'আলার ঋণ, কিন্তু বান্দার পক্ষ থেকে তা উসূল করা হয়। যেমন, যাকাত। চতুষ্পদ জন্তু এবং জমিতে উৎপন্ন শস্য, উসূল করবেন বাদশাহ (রাষ্ট্রপ্রধান)। আর ব্যবসায়িক পণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য ইত্যাদি উসূল করবেন বাদশাহর প্রতিনিধি। ৩. খালেছ আল্লাহ্ তা'আলার ঋণ, যার উসূলকারী বান্দা নয়। যেমন, মান্নত, কাফ্ফারা, সদকায়ে ফিত্র ও হজ্জের খরচ। প্রথম দুই প্রকার ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। তৃতীয় প্রকার ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।"[৩৫১]

উল্লিখিত তিন প্রকারের প্রথম প্রকার, তথা খালেছ বান্দার কাছে দায়বদ্ধ ঋণ আবার তিন ধরনের হতে পারে। যথা: ১. অনির্দিষ্ট মেয়াদী ঋণ, যা যে কোনো সময় ঋণগ্রহীতা আদায় করতে বাধ্য। ২. স্বল্প মেয়াদী ঋণ, যা এক বছরের ভেতরে আদায়ের দায়বদ্ধতা রয়েছে। ৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, যা এক বছরের ভেতরে আদায়ের দায়বদ্ধতা নেই।

মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে ঋণ নেয়। কখনো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য। যেমন, নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্তের লোকেরা যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে তা সাধারণত মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য। কোনো সময় পরিশোধের তারিখ নির্দিষ্ট করে, আবার কখনো নির্দিষ্ট করে না। তবে যে কোনো সময় পাওনাদার দাবী করলে তা আদায় করতে বাধ্য থাকে। আর উচ্চবিত্ত শ্রেণী

---

[৩৫০] কাশ্শাফু ইস্তিলাহাতিল উলূম ওয়াল ফুনূন: ১/৮১৪, মাকতাবাতু লেবানন, বৈরুত, লেবানন

[৩৫১] কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ: ১/৫৯৪, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

সাধারণত ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যাংক ও বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ গ্রহণ করে থাকে, তা মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নয়, বরং ব্যবসা সম্প্রসারণ বা মিল-ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠার জন্যই নিয়ে থাকে। সুতরাং উভয় প্রকার ঋণের বিধানে ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে উভয় প্রকারের বিধান বর্ণনা করা হলো।

মৌলিক চাহিদার জন্যে নেয়া ঋণের যাকাত

যে ব্যক্তি মৌলিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে ঋণ গ্রহণ করে, তা অনির্দিষ্ট মেয়াদী, স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক ঋণের পরিমাণ অর্থ যাকাতের নেসাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না। অর্থাৎ ঋণের অর্থসহ তার সম্পদ যাকাতের নেসাব পরিমাণ হলেও তার উপর যাকাত ফরয হবে না। হ্যাঁ, ঋণ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদ নেসাব পরিমাণ হলে তার উপর যাকাত ফরয হবে। কারণ, মৌলিক প্রয়োজনীয় বিষয়াদি (الحاجة الأصلية) যাকাতের নেসাবে হিসাব করা হয় না। তাই মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নেয়া ঋণও নেসাবে হিসাব করা হবে না। কেননা, মানুষ মৌলিক প্রয়োজনীয় জিনিস তথা খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের মাধ্যমে যেভাবে জীবন রক্ষা করে থাকে, তেমনিভাবে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের জন্য নেয়া ঋণের মাধ্যমেও অপমান অপদস্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করে থাকে, যা জীবন রক্ষার নামান্তর। যেমনটি আল্লামা ইবনে আবিদীন শামী রাহ. বলেছেন-

الحاجة الأصلية هي ما يدفع الهلاك عن الإنسان تحقيقا، كالنفقة ودور السكنى، وآلات الحرب، والثياب المحتاج إليها لدفع الحر أو البرد، أو تقديرا، كالدين فإن المديون محتاج إلى قضائه بما في يده من النصاب دفعا عن نفسه الحبس الذي هو كالهلاك.

"মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তু হলো, যা মানুষকে প্রত্যক্ষ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে। যেমন, খাদ্য, বাসস্থান, যুদ্ধাস্ত্র, শীতকালীন ও গ্রীষ্মকালীন প্রয়োজনীয় পোশাক। অথবা যা মানুষকে পরোক্ষ ধ্বংসের হাত থেকে হেফাযত করে। যেমন, ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তার কাছে থাকা নেসাব পরিমাণ সম্পদ দিয়ে নিজেকে ধ্বংসাত্মক বন্দীদশা থেকে মুক্ত রাখে।"[৩৫২]

এমনিভাবে ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. বলেন-

ولنا أنه مشغول بحاجته الأصلية فاعتبر معدوما، كماء المستحق بالعطش.

"ঋণ পরিশোধ পরিমাণ অর্থ যাকাতের নেসাবে গণ্য হবে না। কারণ তা (ঋণ পরিমাণ অর্থ) মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তা না থাকার মতোই। যেমন, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির নিকট পানি থাকা না থাকার মতোই। (ফলে সে পানি থাকা সত্ত্বেও তায়াম্মুম করতে পারে।)"[৩৫৩]

এমনিভাবে ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

منها: أن لا يكون عليه دين مطالب به من جهة العباد، عندنا، فإن كان فإنه يمنع وجوب الزكاة بقدره حالاً كان أو مؤجلا.

[৩৫২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/১৭৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৩৫৩] হেদায়া: ১/১৮৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

“যে সকল বিষয় যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক তার মধ্য থেকে একটি হলো বান্দার কাছে দায়বদ্ধ ঋণ। সুতরাং কোনো ব্যক্তি ঋণী হলে আমাদের মতে তার ঋণ পরিমাণ অর্থ যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে, ঋণ নগদ হোক বা বাকি হোক।”[৩৫৪]

উল্লিখিত ভাষ্যসমূহ থেকে বাহ্যিকভাবে বোঝা যায় যে, যাকাতের নেসাব থেকে ঋণ বাদ দেয়া হবে, ঋণ মৌলিক প্রয়োজনে নেয়া হোক বা অন্য প্রয়োজনে নেয়া হোক, স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক। কিন্তু এ সকল ভাষ্যে শুধু মৌলিক প্রয়োজনে নেয়া ঋণ ও স্বল্প মেয়াদী ঋণ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ এ দু'প্রকারের ঋণ নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। মৌলিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে নেয়া দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া ঋণের যাকাত প্রসঙ্গ

মৌলিক প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবসা বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে যে ঋণ গ্রহণ করা হয়, তারও তিন প্রকার হয়ে থাকে।

১. অনির্দিষ্ট মেয়াদী ঋণ, যা যে কোনো সময় পাওনাদার দাবি করতে পারে এবং ঋণগ্রহীতাও তা আদায় করতে বাধ্য।

২. স্বল্প মেয়াদী ঋণ, যা এক বছরের ভেতরে আদায় করতে হবে।

৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, যা এক বছরের বেশি সময়ের জন্য নেয়া হয়ে থাকে।

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারের হুকুম

প্রথম প্রকার ঋণ যেহেতু যে কোনো সময় ঋণদাতাকে পরিশোধ করা লাগতে পারে, এমনিভাবে দ্বিতীয় প্রকারও এক বছরের মধ্যে আদায় করতে হবে, তাই এ দু'প্রকার ঋণ যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে।

যে ঋণ পরিশোধ করতে গেলে নেসাব থেকে আদায় করতে হয় তা নেসাব থেকে বাদ দেয়ার বিধান হাদীস থেকেও প্রতীয়মান হয়। হযরত উসমান রাযি.[৩৫৫] রমযান মাসে বলতেন-

هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدون منها الزكاة.

“তোমাদের যাকাত আদায়ের মাস উপস্থিত। সুতরাং তোমাদের মধ্যে কেউ ঋণী থাকলে সে যেন ঋণ পরিশোধ করে দেয়, যাতে তোমাদের মালিকানাধীন সম্পদ পৃথক হয়ে যায়। অতঃপর সেখান থেকে যাকাত আদায় করবে।”[৩৫৬]

উল্লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

وبهذا نأخذ من كان عليه دين وله مال فليدفع دينه من ماله، فإن بقي بعد ذلك ما تجب فيه زكاة، وتلك

---

[৩৫৪] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৩৯০, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

[৩৫৫] আমীরুল মুমিনীন উসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবিল আস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস ইবনে আবদে মানাফ উমাবী রাযি.। আবু বকর রাযি. এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি ৩৫ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন। -আল ইকমাল: ৬০২

[৩৫৬] মুআত্তা মালেক: ১০৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

مأتا درهم أو عشرون مثقالا ذهبا فصاعدا، وإن كان الذى بقي أقل من ذلك بعد ما يدفع من ماله، فليست فيه زكاة، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

"এ হাদীস দ্বারা আমরা দলীল দিয়ে থাকি যে, কোনো ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির যদি সম্পদ থাকে, তাহলে সে তা থেকে তার ঋণ পরিশোধ করবে। ঋণ পরিশোধের পরে যদি যাকাত ওয়াজিব হওয়ার পরিমাণ সম্পদ থাকে, তথা ২০০ দিরহাম (৫২.৫ ভরি রূপা বা তার সমমূল্যের ব্যবসায়িক পণ্য থাকে) বা ২০ মিসকাল বা ততোধিক স্বর্ণ থাকে, তাহলে সে পরিমাণে যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি ঋণ আদায়ের পরে উক্ত পরিমাণ বাকি না থাকে, তাহলে সে ক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবে না। এটাই ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর অভিমত।"[৩৫৭]

হযরত আব্দুল্লাহইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

إذا كان لرجل ألف درهم وعليه ألف درهم، فلا زكاة عليه.

"কোনো ব্যক্তির কাছে যদি নগদ এক হাজার দিরহাম থাকে, আবার সে এক হাজার দিরহামের ঋণী হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।"[৩৫৮]

উপরোল্লিখিত হযরত উসমান রাযি. ও হযরত আব্দুল্লাহইবন ওমর রাযি. এর বাণীদ্বয় এবং ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, ঋণ আদায়ের প্রয়োজনের কারণেই যাকাতের নেসাব থেকে ঋণ পরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হবে। তাহলে আমরা বলতে পারি, যাকাতের নেসাব থেকে ঋণ পরিমাণ বাদ দেয়ার ক্ষেত্রে ঋণের ঐ পরিমাণ ধর্তব্য হবে যা আদায় করা প্রয়োজন এবং আদায় করলে যাকাতের নেসাব কম বা শেষ হয়ে যায়।

তৃতীয় প্রকারের হুকুম

তৃতীয় প্রকার হলো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ, যা এক বছরেরও বেশি মেয়াদী হয়ে থাকে। যেমন অনেক ধনী মানুষ এমন যাদের প্রয়োজন পূরণ করার মত নগদ অর্থ, গাড়ি-বাড়ি, ব্যবসা-বাণিজ্য আছে তারপরও নিজেদের জীবন যাপনের মান আরো উন্নত করার লক্ষ্যে ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প কারখানা প্রতিষ্ঠা করে। যেমন, যায়েদের গাড়ি-বাড়ি ও একটি কারখানা আছে। যার মাধ্যমে তার জীবন যাপন ভালই চলছে। আরো আর্থিক উন্নতি লাভের জন্য আরেকটি কারখানা করতে চাচ্ছে, যার জন্য প্রয়োজন ছয় কোটি টাকা, কিন্তু তার কাছে আছে মাত্র এক কোটি টাকা। এখন সে পাঁচ কোটি টাকা ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে পাঁচ বছরের দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিতে ঋণ নিলো। প্রতি বছর এক কোটি টাকা করে পাঁচ বছরে মোট পাঁচ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। এখন তার সমুদয় সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ঋণকে বাদ দিয়ে যাকাতের নেসাবের হিসেব করা হবে, নাকি বাৎসরিক কিস্তি হিসেবে যা আসে শুধু তা বাদ দেয়া হবে?

এ বিষয়ে পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরাম থেকে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না। ইমাম ইবনুল

---

[৩৫৭] মুআত্তা মুহাম্মদ: ১/১৭২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ; ই'লাউস সুনান: ৯/১১০, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান

[৩৫৮] আওজাযুল মাসালেক: ৫/২৯৩, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

হুমাম রাহ. বলেন-

وهل يمنع الدين المؤجل كما يمنع المعجل في طريقة الشهيد لارواية فيه.

"দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ কি যাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে? যেমনিভাবে স্বল্প মেয়াদী ঋণ প্রতিবন্ধক হয়। পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরাম থেকে এ ব্যাপারে কোনো বর্ণনা পাওয়া যায় না।"[৩৫৯]

পূর্ববর্তী ফুকাহায়ে কেরাম যাকাত অধ্যায়ে ঋণের যে আলোচনা করেছেন তা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষের কাছে দায়বদ্ধ যে কোনো ঋণ যাকাতের নেসাবে অন্তর্ভুক্ত হবে না, ঋণ স্বল্প মেয়াদী হোক বা দীর্ঘ মেয়াদী। যেমন, ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. এর পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি। এমনিভাবে আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله، كزكاة وخراج، أو للعبد ولو كفالة،أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق. إلخ

"(যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সম্পদ) বান্দার প্রাপ্য ঋণ থেকে মুক্ত হতে হবে। উক্ত ঋণ আল্লাহ তা'আলার হোক যেমন, যাকাত, খারাজ ইত্যাদি অথবা বান্দার হোক, তা কাফালাতের (অন্যের ঋণের দায়িত্ব নেয়ার) কারণে হোক বা ঋণটি দীর্ঘ মেয়াদী হোক এবং যদিও তা স্ত্রীর বাকি মোহর হোক না কেন।"[৩৬০]

উল্লিখিত ভাষ্যদ্বয়ে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের মাঝে কোনো পার্থক্য করা হয়নি। তবে মোহরে মু'আজ্জাল (বাকি মোহরের) যাকাতের বিধানের দিকে লক্ষ্য করলে স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের যাকাতে হুকুমগত পার্থক্যের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়।

মোহরে মু'আজ্জাল (المهر المؤجل) অর্থাৎ বাকি মোহর যাকাতের জন্য বাধা হবে কি না? এ বিষয়ে ফিক্‌হের কিতাবে সবিস্তারে আলোচনা পাওয়া যায়। এখানে মাসআলাটি সংক্ষেপে উল্লেখ করতঃ মূল বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ্।

মোহরে মু'আজ্জাল যাকাতের জন্য বাধা হবে কি না? এ বিষয়ে একাধিক মত পাওয়া যায়।

১. মোহরে মু'আজ্জাল যাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক হবে। অর্থাৎ মোহরে মু'আজ্জালসহ যদি সম্পদ নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে তার উপর যাকাত ফরয হবে না। কেননা, মোহরে মু'আজ্জালকে নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে।

২. মোহরে মু'আজ্জাল যাকাতের জন্য বাধা হবে না, বরং তা নেসাবে হিসাব করা হবে।

৩. স্বামী যদি মোহর আদায় করার ইচ্ছা করে, তাহলে তা বাধা হবে, অন্যথায় বাধা হবে না।

যেমন ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. উল্লেখ করেন-

---

[৩৫৯] ফাতহুল কাদীর: ২/১৭৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৬০] আদ্দুররুল মুখতার: ৩/১৭৬-১৭৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

وعلى هذا يخرج مهر المرأة، فإنه يمنع وجوب الزكاة عندنا، معجلا كان أو مؤجلا، لأنها إذا طالبته يؤاخذ به. وقال بعض مشايخنا: إن المؤجل لا يمنع، لأنه غير مطالب به عادة، فأما المعجل فيطالب به عادة فيمنع، وقال بعضهم : إن كان الزوج على عزم من قضائه يمنع، وإن لم يكن على عزم القضاء لا يمنع، لأنه لا يعده دينا، وإنما يؤاخذ المرء بما عنده في الأحكام.اه

"আমাদের নিকট মোহর নগদ হোক বা বাকি হোক যাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, স্ত্রী যখন মোহর চাইবে, তখন স্বামী তা দিতে বাধ্য। তবে আমাদের কোনো কোনো ফকীহের মতে বাকি মোহর যেহেতু চাওয়া হয় না, তাই তা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। পক্ষান্তরে নগদ মোহর যেহেতু চাওয়া হয় তাই তা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। কোনো কোনো আলেমের মতে স্বামী যদি মোহর আদায়ের সংকল্প করে, তাহলে তা যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। আর যদি আদায়ের ব্যাপারে সংকল্পবদ্ধ না হয়, তাহলে তা প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা তখন সেটা ঋণ ধরা হবে না।"[৩৬১]

আল্লামা ফরিদুদ্দীন দেহলভী রাহ. বলেন-

الدين المؤجل: قال بعضهم: يمنع الزكاة، وذكر مجد الأئمة عن مشايخه أنه لا يمنع.اه

"কোনো কোনো মাশায়েখের মতে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। তবে মাজদুল আইম্মা স্বীয় মাশায়েখ থেকে বর্ণনা করেন যে, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নয়।"[৩৬২]

বাকি মোহরের আলোচনার উপর ভিত্তি করে দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতানৈক্যের বিষয়টিও উঠে আসে। তবে আল্লামা কোহেস্তানী রাহ.[৩৬৩] প্রতিবন্ধক না হওয়ার মতটিকে সহীহ বলেছেন এবং অন্যান্য ফুকাহায়ে কেরাম এ মতটি গ্রহণ করেছেন। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) سواء كان لله، كزكاة وخراج أو للعبد ولو كفالة، أو مؤجلا ولو صداق زوجته المؤجل للفراق.اه

উল্লিখিত ভাষ্যের ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

عزاه في المعراج إلى شرح الطحاوي و قال: وعن أبي حنيفة لا يمنع، وقال الصدر الشهيد: لارواية فيه، ولكل من المنع و عدمه وجه، زاد القهستاني عن الجواهر: والصحيح أنه غير مانع.

"(মানুষের কাছে দায়বদ্ধ সকল প্রকার ঋণ থেকে মুক্ত হতে হবে। যদিও ঋণটি দীর্ঘ মেয়াদী হয়, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য এমন শর্তকে) মে'রাজ কিতাবে শরহুত্ তাহাবী এর দিকে

---

[৩৬১] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৬২] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩/২২-২৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৬৩] মুহাম্মদ ইবনে হুসামুদ্দীন আল খোরাসানী আল কোহেস্তানী শামসুদ্দীন আল হানাফী রাহ.। তিনি ৯৬২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। জামেউর রুমুজ ফী শরহিন নুকায়া ও জামেউল মাবানী ফী শরহি ফিকহিল কায়দানী তার অন্যতম রচনা। -হাদিয়াতুল আরিফীন: ২/২৪৪

সম্বন্ধ করে বলেন, দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। আর ছদরুশ শহীদ রাহ. বলেন, 'এ বিষয়ে ফুকাহায়ে কেরাম থেকে কোনো বর্ণনা নেই।' দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ প্রতিবন্ধক হওয়া না হওয়া উভয় দিকের দলীল রয়েছে। তবে আল্লামা কোহেস্তানী রাহ. জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া'র বরাত দিয়ে বলেন, এ বিষয়ে সঠিক মত হলো দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ যাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না।"[৩৬৪]

এ মতটি যুক্তির দিক থেকে শক্তিশালী। কারণ, ঋণ নেসাবে অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার ভিত্তি হলো, বান্দার কাছে দায়বদ্ধ থাকা এবং ঋণ আদায় করলে মূল নেসাব থেকেই আদায় করা। এখানে দ্বিতীয় বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ঋণটি এমন পর্যায়ের, যে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি ঋণ আদায় করতে গেলে যাকাতের নেসাব বাকি থাকবে না। হাদীস ও ফুকাহায়ে কেরামের কিছু ভাষ্য থেকে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে আসে। যেমন হযরত উসমান রাযি. ও ইবনে ওমর রাযি. এর উল্লিখিত হাদীসদ্বয় থেকে বুঝা যায় যে, ঐ ঋণই যাকাতের নেসাবের জন্য বাধা হবে, যা উপস্থিত মাল থেকে আদায় করতে হবে। ঋণ আদায়ের পর নেসাব পরিমাণ অবশিষ্ট থাকলে যাকাত ফরয হবে, অন্যথায় ফরয হবে না। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. এর একটি ভাষ্য থেকেও বিষয়টি পরিষ্কার হয়-

وقالوا فيمن ضمن الدرك فاستحق المبيع: إنه إن كان في الحول يمنع، لأن المانع قارن الموجب، فيمنع الوجوب، فأما إذا استحق بعد الحول لايسقط الزكاة، لأنه دين حادث. اه

"কোনো পণ্য বিক্রয়ের সময় যদি কেউ এ দায়িত্ব নেয় যে, অন্য কোনো ব্যক্তি যদি বিক্রিত পণ্যের মালিক হয়ে যায়, তাহলে ক্রেতার ক্ষতিপূরণ সে দিবে। এ জামানতের ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, যদি চলতি বছরে ওই বিক্রিত পণ্যের মালিকানা কেউ দাবি করে, তাহলে এ ঋণ জামিনদারের যাকাতের নেসাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে। কেননা, প্রতিবন্ধকটি (ঋণটি) যাকাত ওয়াজিব হওয়ার কারণ (তথা চলতি বছরের নেসাবের) সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং তা যাকাত ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হবে। আর যদি এক বছর পর কেউ মালিকানা দাবি করে, তাহলে এ ঋণ যাকাতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হবে না। কেননা, তা বছর পূর্ণ হওয়ার পর ইতয়ায় নতুন ঋণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে।"[৩৬৫]

উল্লিখিত ভাষ্য থেকেও স্বল্প মেয়াদী ও দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের হুকুমের ভিন্নতার বিষয়টি বুঝে আসে। সাথে সাথে এ কথাও স্পষ্ট হয় যে, যে ঋণের মেয়াদ এক বছরের বেশি হবে, তা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। এর চেয়ে কম হলে, তা স্বল্প মেয়াদী ঋণ। কেননা এক বছরের পূর্বে মালিকানা দাবির কারণে যদি ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহলে তা নেসাব থেকে বাদ দেয়া হয়। সুতরাং বুঝা গেলো এটাই স্বল্প মেয়াদী ঋণের সর্বোচ্চ সময়। আর যদি এক বছর পর দাবির কারণে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়, তাহলে তা নেসাব থেকে বাদ দেয়া হয় না। সুতরাং বুঝা গেলো এটা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণের সর্বনিম্ন সময়।

যাকাতের মাসআলার ক্ষেত্রে একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো, শরী'আতের চাহিদা ও যাকাতের

---

[৩৬৪] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/১৭৬-১৭৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৬৫] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মূল উদ্দেশ্যের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। আর যাকাতের ক্ষেত্রে শরী'আতের চাহিদা হলো, গরিবের প্রতি লক্ষ্য রাখা। তাই ফকীহগণ যাকাতের ক্ষেত্রে একটি মূলনীতি নির্ধারণ করেছেন। তা হলো, যেখানে যাকাত ওয়াজিব হওয়া এবং না হওয়া উভয়টির সম্ভাবনা থাকে, সেখানে যাকাত ওয়াজিব সাব্যস্ত করা হবে। যেমন, কারো নিকট যদি সোনা ও রূপা উভয়টি থাকে, কিন্তু পৃথকভাবে কোনোটির নেসাবই পূর্ণ হয় না। তবে উভয়টি মিলালে রূপার মূল্য হিসেবে যাকাতের নেসাব পূর্ণ হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা, এতে গরিবের উপকার হয়।

বর্তমানে মানুষ অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য লাভজনক খাতে ব্যাংক থেকে কিস্তিতে বিরাট অংকের ঋণ নিয়ে বিনিয়োগ করে থাকে। এ সম্পদ তার কাছে উৎপাদনশীল সম্পদ হিসেবে থাকে, যাকে ফুকাহায়ে কেরামের পরিভাষায় 'বিল ফে'ল মালে নামী' (بالفعل مال نامي) বা বর্তমানে উৎপাদনশীল সম্পদ বলে। এ ঋণকে যদি যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হয়, তাহলে যাকাতের পরিমাণ অনেক কমে যাবে। ফলে গরিবরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাই পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম যেভাবে বাকি মোহরকে যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেননি, ঠিক তেমনিভাবে ব্যাংক থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয়া মোটা অংকের সমুদয় ঋণও নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। তবে বাৎসরিক যত টাকা কিস্তি দিতে হয়, শুধু সে পরিমাণ বাদ দিয়ে বাকি সম্পদকে যাকাতের নেসাবের অন্তর্ভুক্ত করে তার উপর যাকাত ওয়াজিবের ফায়সালা করা হবে।

ঋণের উপর আরোপিত সুদ প্রসঙ্গ

উল্লিখিত আলোচনা থেকে একটি প্রশ্ন জাগে। তা হলো, আমরা জানি ব্যাংক থেকে ঋণ নিলে মূল ঋণের সাথে সুদও যুক্ত করা হয় এবং আদায়ের সময় সুদসহ আদায় করতে হয়। এখন প্রশ্ন হলো, মূল ঋণের সাথে সুদও কি যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে? নাকি সুদ বাদ দেয়া হবে না? উদাহরণ স্বরূপ, কোনো ব্যক্তি ১০ লাখ টাকা ১০ বছর মেয়াদে, প্রতি বছর এক লাখ ২০ হাজার টাকা পরিশোধের শর্তে ঋণ নিলো। এখন প্রতি বছর এক লাখ ২০ হাজার টাকা পরিশোধ করতে হয়। মূল ঋণ এক লাখ টাকা আর বিশ হাজার টাকা সুদ। পূর্বের আলোচনায় আমরা জানতে পেরেছি যে, ঋণের উক্ত ১ লাখ টাকা যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। এখন প্রশ্ন হলো, সুদের ২০ হাজার টাকাও কি বাদ দেয়া হবে?

আমরা ইসলামী শরী'আতের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সুদকে অত্যন্ত কঠোরভাবে হারাম করা হয়েছে। সুদের ব্যাপারে এমন কঠিন সতর্কবাণী উল্লেখ করা হয়েছে, যা অন্য কোনো কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়নি। পবিত্র কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا۟ فَأْذَنُوا۟ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ ۖ

"হে মুমিনগনণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা বকেয়া আছে তাও ছেড়ে দাও

যদি তোমরা মু'মিন হও। যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও।"[৩৬৬]

হাদীসেও সুদের ব্যাপারে কঠিন ধমকি এসেছে। হযরত আবু জুহাইফা রাযি. বর্ণনা করেন-

إن النبي ﷺ لعن آكل الربا وموكله .

"হযরত আব্দুল্লাহইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ সুদ দাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।"[৩৬৭]

উল্লিখিত সতর্কবাণীসহ কুরআন ও হাদীসে যে সমস্ত সতর্কবাণী ও অভিশাপ উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে প্রমাণিত হয়, মূল ঋণ যাকাতের নেসাবের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হলেও ঋণের উপর আরোপিত সুদের পরিমাণ অর্থ নেসাবের হিসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। কারণ তা ঋণ নয়; বরং তার সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সম্পদ।

ঋণদাতার যাকাত প্রসঙ্গ

ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে ঋণগ্রহীতার যাকাতের বিধান সম্পর্কে। এখন আলোচনা করা হবে ঋণদাতার (অর্থাৎ পাওনা টাকার) যাকাতের বিধান সম্পর্কে। যাকাতের বিধান হিসেবে ঋণ তিন প্রকার।

১. 'দাইনে কাবী' (الدين القوي) বা শক্তিশালী ঋণ। নগদ অর্থ প্রদান বা কোনো ব্যবসায়িক পণ্যের বিনিময়ে মানুষ যে অর্থের হকদার হয়, তাকে 'দাইনে কাবী' বা শক্তিশালী ঋণ বলে। ঋণের এ প্রকারের হুকুম হলো, যদি এ ঋণ নেসাব পরিমাণ হয় এবং তা ঋণগ্রহীতার কাছে এক বছর থাকে, তাহলে চল্লিশ দিরহাম (১০.৫ ভরি রূপা বা তার সমমূল্য) হস্তগত হলে এক দিরহাম (৩৪ রতি রূপা বা তার সমমূল্য) যাকাত দিতে হবে।

২. 'দাইনে মুতাওয়াস্‌সিত' (الدين المتوسط) বা মধ্যম ঋণ। ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে মানুষ যে অর্থের হকদার হয়, তাকে 'দাইনে মুতাওয়াস্‌সিত' বা মধ্যম ঋণ বলে। যেমন, বসবাসের স্থান, গোলাম, সওয়ারী ইত্যাদির বিনিময়ে যে মূল্য পাওয়া যায়। ঋণের এ প্রকারের হুকুম হলো, যদি পাওনা টাকা নেসাব পরিমাণ হয় এবং তা ঋণগ্রহীতার নিকট এক বছর থাকে, তাহলে নেসাব পরিমাণ হস্তগত হওয়ার পর বিগত বছরসহ যাকাত দিতে হবে।

৩. 'দাইনে যয়ীফ' (الدين الضعيف) বা দুর্বল ঋণ। মাল ব্যতীত অন্য কোনো কারণে মানুষ যে অর্থের হকদার হয়, তাকে 'দাইনে যয়ীফ' বা দুর্বল ঋণ বলে। যেমন, মোহর, ওয়ারিশসূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ ও অসিয়ত ইত্যাদির কারণে প্রাপ্ত অর্থের ঋণ। এ প্রকার ঋণের হুকুম হলো, নেসাব পরিমাণ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, অন্যথায় ওয়াজিব হবে না। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

---

[৩৬৬] সূরা বাকারা: ২৭৮-২৭৯
[৩৬৭] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৯৬২

قسم أبو حنيفة الدين إلى ثلاثة أقسام (١) قوي وهو بدل القرض ومال التجارة (٢) ومتوسط و هو بدل مال ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة وعبد الخدمة ودار السكنى (٣) وضعيف وهو بدل ما ليس بمال، كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح عن دم العمد والدية وبدل الكتابة والسعاية ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى الأداء إلى أن يقبض أربعين درهما، ففيها درهم، وكذا فيما زاد فبحسابه، وفي المتوسط لا تجب ما لم يقبض نصابا، وتعتبر لما مضى من الحول في صحيح الرواية، وفي الضعيف لا تجب ما لم يقبض نصابا ويحول الحول بعد القبض عليه.

"ইমাম আবু হানীফা রাহ. ঋণকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন- ১.'দাইনে কাবী' বা শক্তিশালী ঋণ; যা কর্জ বা ব্যবসায়িক পণ্যের বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়। ২.'দাইনে মুতাওয়াস্‌সিত' বা মধ্যম ঋণ; যা ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত অন্য কিছুর বিনিময়ে প্রাপ্ত হয়। যেমন, ব্যবহৃত কাপড়, খেদমতের গোলাম, বসবাসের ঘর ইত্যাদির বিনিময়ে প্রাপ্ত মূল্য। ৩. 'দাইনে য'য়ীফ' বা দুর্বল ঋণ; যা সম্পদ ব্যতীত অন্য কোনো কারণে প্রাপ্ত হয়। যেমন, মোহর, ওসিয়ত, বদলুল খুলা' (স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে প্রদত্ত অর্থ যার বিনিময়ে সে তালাক গ্রহণ করে।) 'সুলাহ্ আন্ দামিল আ'মদ' (যে অর্থের বিনিময়ে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকগণ স্বেচ্ছায় হত্যাকারীর সাথে সমঝোতা করে।) 'বদলুল্ কিতাবাত' (ওই অর্থ যা কোনো গোলাম স্বীয় মালিককে স্বাধীন হওয়ার জন্য প্রদান করে থাকে।) "সিয়া'য়াহ্" (ওই অর্থ যা কোনো গোলাম তার উপার্জিত সম্পদ থেকে ওই ব্যক্তিকে আদায় করে থাকে যে মালিক থেকে তাকে আযাদ করে দিয়েছে।) (উক্ত তিন প্রকার ঋণের যাকাতের হুকুম হলো) প্রথম প্রকার ঋণের উপর বছর পূর্ণ হওয়ার পর তা হস্তগত হতে দেরি হলে প্রতি চল্লিশ দিরহাম হস্তগত হওয়ার পর তা থেকে এক দিরহাম আদায় করতে হবে। এভাবে পর্যায়ক্রমে আদায় করতে হবে। আর বিশুদ্ধ বর্ণনামতে দ্বিতীয় প্রকার ঋণ থেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদ হস্তগত হওয়ার পর পূর্ববর্তী বছরের যাকাতসহ আদায় করতে হবে এবং তৃতীয় প্রকার ঋণ থেকে নেসাব পরিমাণ সম্পদ হস্তগত হলে তার উপর পূর্ণ এক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে।"[৩৬৮]
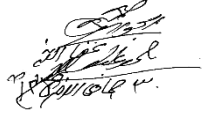
সারকথা ঃ ঋণ যাকাতের জন্য প্রতিবন্ধক হওয়া না হওয়া হিসেবে তিন প্রকার। ১. খালেছ আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ ঋণ। যেমন, মান্নত, কাফ্ফারা ইত্যাদি। এ ঋণ যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। ২. আল্লাহর নিকট দায়বদ্ধ ঋণ, তবে তা বান্দার পক্ষ থেকে উসূল করা হয়। যেমন, যাকাত। ঋণের এ প্রকার যাকাতের নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। ৩. খালেছ বান্দার নিকট দায়বদ্ধ ঋণ। এ প্রকারটি আবার প্রথমত দু'প্রকার। ১. মৌলিক প্রয়োজনে নেয়া ঋণ। এ প্রকার নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। ঋণটি অনির্দিষ্ট মেয়াদী হোক অথবা স্বল্প মেয়াদী বা দীর্ঘ মেয়াদী হোক। ২. মৌলিক প্রয়োজন ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে নেয়া ঋণ। এটি আবার তিন প্রকার। যথা: ক. অনির্দিষ্ট মেয়াদী। ২. স্বল্প মেয়াদী। এ

[৩৬৮] ফাতহুল কাদীর: ২/১৭৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; আল মাবসূত: ২/২০১; ফাতাওয়ায়ে কাযীখান: ১/১৫৬; বাদায়েউস সানায়ে:২/৯০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দু'প্রকার নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে। ৩. দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ। এ ঋণটি নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে না। তবে যদি কিস্তিতে পরিশোধ করা হয়, তাহলে এক বছরের মধ্যে যে পরিমাণ পরিশোধ করতে হবে, শুধু তা নেসাব থেকে বাদ দেয়া হবে।

পাওনা হিসেবে ঋণ আবার তিন প্রকার। ১. শক্তিশালী ঋণ। এ ঋণ গ্রহীতার নিকট থাকলেও যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে কমপক্ষে চল্লিশ দিরহাম (১০½ ভরি রূপা বা তার সমমূল্য) হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত আদায় করতে হবে না। চল্লিশ দিরহাম হস্তগত হলে এক দিরহাম (৩৪ রতি রূপা বা তার সমমূল্য) আদায় করতে হবে। ২. মধ্যম ধরনের ঋণ। এ প্রকারও গ্রহীতার নিকট থাকা অবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে নেসাব পরিমাণ হস্তগত হওয়ার পূর্বে আদায় করতে হবে না। নেসাব পরিমাণ হস্তগত হলে বিগত বছরসহ যাকাত আদায় করতে হবে। ৩. দুর্বল ঋণ। এ প্রকার ঋণ যদি নেসাব পরিমাণ হয়, তাহলে হস্তগত হওয়ার পর এক বছর অতিক্রান্ত হলে তার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। অন্যথায় ওয়াজিব হবে না।

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৭ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৪ রবিউল আউওয়াল ১৪৩৫হি.

শেয়ার ও প্রাইজবন্ডের যাকাতের বিধান

মাওলানা আমীনুল ইসলাম মাদারীপুরী

যাকাত আদায়ের যোগ্য ধন-সম্পদের মধ্যে অন্যতম সম্পদ হলো ব্যবসায়িক পণ্য। কালের আবর্তনে ব্যবসার রূপ ও কাঠামোর মাঝে পরিবর্তন এসেছে। বর্তমানে বহুল আলোচিত একটি ব্যবসার নাম হলো জয়েন্ট স্টক কোম্পানি। স্বাভাবিক কারণেই এর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় চালু হয়। এ সূচনা বিগত সপ্তদশ বা অষ্টাদশ শতাব্দীতে। অন্য দিকে বর্তমানে ঋণ গ্রহণ করা ও ঋণ দেয়ার জন্য সম্পদশালীকে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তার মাঝে একটা প্রাইজবন্ড। আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে শেয়ার ও প্রাইজবন্ডের যাকাত নিয়ে আলোচনা পেশ করার চেষ্টা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

শেয়ারের যাকাত প্রসঙ্গ

যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে শরী'আতসম্মতভাবে হালাল কোম্পানী থেকে শেয়ার ক্রয় করে,[৩৬৯] যেমন, রাশেদ স্টক এক্সচেঞ্জ থেকে ঔষধ কোম্পানির একটি শেয়ার ১,০০০০০/- (এক লক্ষ টাকা) দিয়ে এই নিয়তে ক্রয় করলো যে, মূল্য বৃদ্ধি পেলে তা বিক্রি করে দিবে। তাহলে এক বছর পূর্তিতে উক্ত শেয়ারের বাজারমূল্য ধরে যাকাত আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

الزكاة واجبة في عروض التجارة كائنة ما كانت إذا بلغت قيمتها نصابا من الورق أو الذهب.

"ব্যবসার পণ্য যাই হোক না কেন তার উপর যাকাত ওয়াজিব, যদি তার মূল্য সোনা বা রূপার নেসাব পরিমাণ হয়।"[৩৭০]

যদি শেয়ার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ক্রয় করে, তাহলে শেয়ারের সম্পূর্ণ মূল্যের উপর যাকাত ওয়াজিব হবে।[৩৭১]

আর যদি শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্রয় না করে কোম্পানি থেকে মাসিক বা বাৎসরিক লভ্যাংশ গ্রহণের নিয়তে ক্রয় করে, তাহলে স্থাবর সম্পত্তি যথা কারখানা স্থাপন, ভূমি, মেশিন ও সরঞ্জামাদি ক্রয় এর খরচ বাদ দিয়ে অবশিষ্ট বিনিয়োগকৃত টাকার উপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যেমন, যায়েদ সিমেন্ট কোম্পানি থেকে একটি শেয়ার ১০,০০০০০/- (দশ লক্ষ) টাকা দিয়ে ক্রয় করলো, মাসিক বা বাৎসরিক লাভ গ্রহণের নিয়তে। যায়েদের শেয়ারে স্থাবর সম্পত্তি যথা কারখানা স্থাপনা, ভূমি, মেশিন ও সরঞ্জমাদি ক্রয় বাবদ ব্যয় হয়েছে ১,০০০০০/- (এক লক্ষ) টাকা, তাহলে তার অবশিষ্ট ৯,০০০০০/- (নয় লক্ষ) টাকার যাকাত প্রদান করতে হবে। ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

---

৩২৭ এ সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন "প্রচলিত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান" শীর্ষক প্রবন্ধ।

[৩৭০] হেদায়া: ১/১৯৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৩৭১] যাকাত কে মাসায়েল: ২৮৬

৩২৯ "প্রচলিত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শরয়ী বিধান" শীর্ষক প্রবন্ধ।

وليس في دور السكنى وثياب البدن وأثاث المنازل ودواب الركوب وعبيد الخدمة وسلاح الاستعمال زكاة. لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية، وليست بنامية أيضا، وعلى هذا كتب العلم لأهلها وآلات المحترفين.

"এবং বসতি বাড়ি, ব্যবহৃত কাপড়, ঘরের আসবাবপত্র ও ব্যবহৃত হাতিয়ারের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা এগুলো প্রয়োজনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে পেশাজীবিদের সরঞ্জামাদির উপরও যাকাত ওয়াজিব নয়।"[৩৭২]

আল্লামা ফরিদুদ্দীন রাহ. বলেন-

وآلات الصناع الذين يعملون بها وظروف الأمتعة لا تجب فيها الزكاة.

"কারিগরের কাজ সম্পাদন করার যন্ত্রপাতি এবং সামান রাখার পাত্র ইত্যাদির উপর যাকাত ওয়াজিব নয়।"[৩৭৩]

প্রাইজবন্ড

প্রাইজবন্ড দু'টি ইংরেজী শব্দের সমষ্টি। প্রাইজ অর্থ- উপহার, বন্ড অর্থ- দলীল বা চুক্তিপত্র।

মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, বর্তমান আধুনিক পরিভাষায় বন্ড বলা হয়-

وثيقة يصدرها المديون لمقرضه اعترافا منه بأنه استقرض من حاملها مبلغا معلوما يلتزم بأداءه في وقت معلوم.

"এমন চুক্তিপত্রকে, যা ঋণগ্রহীতা ঋণদাতাকে এই মর্মে প্রদান করে যে, ঋণগ্রহীতা উক্ত পত্রবাহক থেকে নির্দিষ্ট পরিমাণ সম্পদ ঋণ নিয়েছে যা সে নির্দিষ্ট সময়ে পরিশোধ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"[৩৭৪]

সরকার রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে জনগণ থেকে বিভিন্ন পন্থায় ঋণ নিয়ে থাকে।

তন্মধ্যে এক প্রকার হলো প্রাইজবন্ড। যেমন সরকার ২০,০০০/= (বিশ হাজার) প্রাইজবন্ডের সার্কুলার দিলো, প্রতিটি প্রাইজবন্ডের মূল্যে ৫০০ (পাচঁশত) টাকা। ৫ বছর মেয়াদী অর্থাৎ ৫ বছর পর উক্ত টাকা সরকার ফেরত দিতে বাধ্য থাকবে এবং বন্ড বিক্রয়ের সময় সরকার গ্রাহকদের এই প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ৬ মাস বা ১ বছর পরপর লটারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট অর্থ বা পণ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করা হবে। লটারির পদ্ধতিটি হলো, সরকার কর্তৃক নির্বাচিত কমিটি লটারির মাধ্যমে বিজয়ীদেরকে বেছে নিবে এবং বিজয়ীদের বন্ড নম্বর পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করবে। উল্লেখ্য যে, বন্ড গ্রাহকগণ যে কোনো সময় উক্ত বন্ড ব্যাংকে জমা দিয়ে টাকা তুলে নিতে পারবে এবং সরকার যদি চুক্তি অনুযায়ী লটারির ব্যবস্থা না করে, তাহলে গ্রাহকদের আদালতে মামলা করার অধিকার থাকবে। সুতরাং সাধারণ জনগণ ভাগ্য খুলে

---

[৩৭২] হেদায়া: ১/১৮৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত

[৩৭৩] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩/১৬৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৭৪] বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মুআসারাহ: ২/১১১, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

যাওয়ার আশায় প্রতিযোগিতার সাথে প্রাইজবন্ড ক্রয়ে অর্থ নিয়োগ করে।[৩৭৫]

অনেক সময় উক্ত বন্ড ব্যবসায়িক জয়েন্ট স্টক কোম্পানি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও প্রকাশ করা হয়।

শরী'আতের দৃষ্টিতে প্রাইজবন্ড

উক্ত প্রাইজবন্ড ক্রয় করা শরী'আত সিদ্ধ নয়। কারণ প্রাইজবন্ড এমন একটি ঋণী লেনদেন যেখানে ঋণ দেয়ার পর অতিরিক্ত ফায়দা অর্জন করা হয়, যা সুদ। যদিও সরকার লটারির মাধ্যমে প্রত্যেক গ্রাহককে পুরস্কার তথা সুদ দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় না, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। আর এ ধরনের পুরস্কার গ্রহণ করার জন্য সবাই আগ্রহীও হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, সুদকে পুরস্কার বলে প্রচার করার দ্বারা সুদ হালাল হয়ে যায় না। সুতরাং প্রাইজবন্ড সুদী কারবার হওয়ায় শর'য়ী দৃষ্টিতে তা নিষিদ্ধ।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।"[৩৭৬]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, তোমরা তওবা করলে শুধু মূলধন ফেরত পাবে। অতিরিক্ত কিছু পাবে না।

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَٰلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

"যদি তোমরা তওবা করো, তবে তোমরা নিজেদের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারো প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতিও অত্যাচার করবে না।"[৩৭৭]

একাধিক সাহাবী থেকে বর্ণিত-

كل قرض جر نفعا فهو ربا.[৩৭৮]

"লাভের শর্তে ঋণ প্রদান-ই সুদ।"

---

[৩৭৫] ইসলাম ও জাদীদ মা'আশী মাসায়েল: ৪/৭৮, ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লী

[৩৭৬] সূরা বাকারা: ২৭৮

[৩৭৭] সূরা বাকারা: ২৭৯

[৩৭৮] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في «التلخيص الحبير»: قال عمر بن بدر في «المغني» : لم يصح فيه شيء وأما إمام الحرمين فقال : إنه صح ، وتبعه الغزالي ، وقد رواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من حديث علي باللفظ الأول ، وفي إسناده سوار بن مصعب وهو متروك ، ورواه البيهقي في «المعرفة» عن فضالة بن عبيد موقوفا : كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا. ورواه في «السنن الكبرى » عن ابن مسعود ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن سلام ، وابن عباس ، موقوفا عليهم.

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. রিবার সংজ্ঞা এভাবে দিয়েছেন–

وهو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض.

“ঋণের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে ঋণদাতাকে মূলধনের অতিরিক্ত পরিশোধ করার শর্ত করা।”[৩৭৯]

وتحرم كذلك السندات ذات الجوائز.

“এমনিভাবে প্রাইজবন্ডও হারাম।”[৩৮০]

প্রাইজবন্ডের বিকল্প

সরকার বা কোনো কোম্পানির অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে পুরস্কারের শর্ত ছাড়া বন্ড ছাড়তে পারে। আর মানুষ পুরস্কার ছাড়া বন্ড গ্রহণ করতে আগ্রহী না হলে বিকল্প হিসেবে السندات الاستثمارية গ্রহণ করা যেতে পারে। অর্থাৎ এ কথা বলে বন্ড ছাড়বে যে, যারা এ বন্ড ক্রয় করবে তারা সুনির্দিষ্ট ব্যবসা, কোম্পানি বা প্রজেক্টের অংশীদার হবে। লাভ-ক্ষতি নিয়মতান্ত্রিক হারে ভাগ হবে। মোটকথা, মুদারাবা চুক্তি সম্পাদন হবে। এভাবে মুদারাবার চুক্তিতে টাকা নিলে লাভ পাওয়ার আশায় মানুষ আগ্রহী হবে এবং সরকার ও কোম্পানির প্রয়োজনও পুরা হবে।

প্রাইজবন্ডের যাকাতের বিধান

আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পেরেছি যে, প্রাইজবন্ড এক ধরনের ঋণ বা কর্জ। তাই ঋণের যাকাতের বিধান অনুসারে প্রাইজবন্ডের যাকাতের বিষয় তুলে ধরা হলো।

প্রাইজবন্ড গ্রাহকের প্রদানকৃত টাকা নেসাব পরিমাণ হলে তার উপর উক্ত অর্থের যাকাত আদায় করা ফরয। তবে তৎক্ষণাৎ ফরয নয়; বরং ঋণ হস্তগত হলে আদায় করতে হবে। অর্থাৎ পুরা ঋণ হস্তগত হলে পুরোটার যাকাত আদায় করবে। পক্ষান্তরে শুধু ৪০ দিরহাম পরিমাণ ঋণ হস্তগত হলেও এক দিরহাম যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি হস্তগত হতে কয়েক বছর অতিবাহিত হয় তাহলে হস্তগত হওয়ার পর বিগত সব বছরের যাকাত আদায় করতে হবে। তবে যদি শুধু ঋণ দিয়ে নেসাব পূর্ণ না হয়, নিজের মালিকানাধীন অন্য সম্পদ মিলিয়ে যদি নেসাব পূর্ণ হয়, তখনো যাকাত ওয়াজিব হবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

قسم أبو حنيفة الدين على ثلاثة أقسام: قوي وهو بدل القرض ومال التجارة، ومتوسط وهو بدل ما ليس للتجارة كثمن ثياب البذلة، وعبد الخدمة ودار السكنى، وضعيف وهو بدل ما ليس بمال كالمهر والوصية وبدل الخلع والصلح... ففي القوي تجب الزكاة إذا حال الحول ويتراخى القضاء إلى أن يقبض أربعين

---
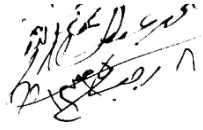
৩৭৯ আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস: ২/১৮৯, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

৩৮০ আল মা'আইরুশ শারইয়্যাহ: ২৯৯

درهما ففيها درهم.

"ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর নিকট ঋণ তিন প্রকার। ১. শক্তিশালী ঋণ। তা হলো, কর্জ। ২. মধ্যম ঋণ। তা হলো, ব্যবসায়িক পণ্য ব্যতীত অন্যান্য জিনিসের বিনিময়। যেমন, ব্যবহৃত কাপড়ের মূল্য। ৩. দুর্বল ঋণ। তা হলো, মাল নয় এমন জিনিসের বিনিময়। যেমন, মোহর। শক্তিশালী ঋণের উপর এক বছর অতিবাহিত হলে যাকাত আবশ্যক। তবে তৎক্ষণাৎ নয় বরং চল্লিশ দিরহাম হস্তগত হলে এক দিরহাম আদায় করতে হবে।"[৩৮১]

মোটকথা, যত প্রকার বন্ড চালু আছে তা থেকে কোনো একটি যে মূল্যে ক্রয় করা হোক তা ঋণের প্রথম প্রকারের অন্তর্ভুক্ত। যদি বন্ডগ্রাহক প্রতি বছরের যাকাত আদায় না করে থাকে, তাহলে যখন বন্ডের টাকা উত্তোলন করবে তখন সম্পূর্ণ বকেয়া যাকাত আদায় করা ফরয।
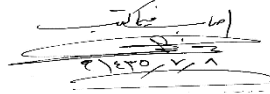
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

[৩৮১] আল বাহরুর রায়েক: ২/৩৬৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া: ৩/৫০৫

ওশর ও খারাজের বিধান

মাওলানা আব্দুল্লাহআল মামুন হবিগঞ্জ

টাকা-পয়সা, ব্যবসায়িক পণ্য ও সোনা-রূপা ইত্যাদিতে যেভাবে যাকাত আদায় করতে হয়, তেমনিভাবে উৎপাদিত শস্যে আদায় করতে হয় ওশর বা খারাজ। ইসলামী অর্থনীতিতে তাই যাকাতের পাশাপাশি ওশর ও খারাজের রয়েছে বলিষ্ঠ ভূমিকা। বিষয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটের দাবি পূরণার্থে নিম্নে এ বিষয়ে শরী'আতের আলোকে আলোচনা পেশ করা হলো।

ওশরের পরিচয়

ওশরের আভিধানিক অর্থ:

والعشر والعشير جزء من عشرة، والجمع أعشار وعشور.

"ওশর এবং আশীর এ দু'টি আরবী শব্দ। অর্থ একদশমাংশ। এর বহুবচন হলো, আ'শার ও উশুর।"[৩৮২]

ওশর শব্দের অর্থ একদশমাংশ হলেও এর ব্যবহার বিশ ভাগের এক ভাগ বোঝাতে হয়ে থাকে। হাদীসের ভাষ্য থেকে বোঝা যায়, কিছু ওশরী জমির উপর একদশমাংশ ধার্য করা হয়েছে। আর কিছু ওশরী জমির উপর বিশ ভাগের এক ভাগ ধার্য করা হয়েছে। তাই ফুকাহায়ে কেরাম উভয় প্রকারকে ওশর নামেই উল্লেখ করে থাকেন।

ওশরের পারিভাষিক অর্থ:

العشر في الاصطلاح اسم للمأخوذ من المسلم في زكاة الأرض العشرية.

"মুসলমানদের থেকে ওশরী জমির শস্যের যাকাত হিসেবে গৃহীত শস্যকে ওশর বলে।"[৩৮৩]

ওশরের হুকুম

ওশরী জমির ক্ষেত্রে ওশর আদায় করা ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦ

"আর তোমরা ফসল কাটার দিন তার হক (ওশর) আদায় কর।"[৩৮৪]

উক্ত আয়াতে 'হক' শব্দের ব্যাখ্যায় ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

---

[৩৮২] লিসানুল আরব: ৪/৩৪১

[৩৮৩] আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ: ১৯/৫৩, কুয়েত

[৩৮৪] সূরা আন'আম: ১৪১

قال عامة أهل التأويل: إن الحق المذكور هو العشر أو نصف العشر.

“সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যাখ্যাকারগণ বলেন, উল্লিখিত আয়াতে ‘হক’ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ‘ওশর’ একদশমাংশ অথবা ‘নিছফে ওশর’ বিশ ভাগের এক ভাগ।”[৩৮৫]

যেহেতু ‘আমর’ তথা আদেশসূচক ক্রিয়ার দাবি হলো। তা ওয়াজিব হওয়া, তাই উল্লিখিত আয়াত দ্বারা ওশর ফরয সাব্যস্ত হয়। যেমন আল্লামা শামী রাহ. লিখেছেন-

(يجب العشر)... أي يفترض لقوله تعالى: وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ. فإن عامة المفسرين على أنه العشر أو نصفه.

“ওশর আদায় করা ওয়াজিব অর্থাৎ ফরয। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন, তোমরা ফসল কাটার সময় তার হক (ওশর) আদায় কর। এখানে অধিকাংশ মুফাস্সিরীনে কেরামের মত হলো, হক দ্বারা উদ্দেশ্য ওশর অথবা নিছফে ওশর।”[৩৮৬]

ওশর ফরয হওয়ার শর্তসমূহ

ওশর যাকাতের মত একটি আর্থিক ইবাদত, যা ফরয হওয়ার জন্য বিশেষ কিছু শর্ত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. ওশর ফরয হওয়ার জন্য জমি ও জমির মালিক উভয়ের সম্পর্কিত শর্তগুলো এভাবে উল্লেখ করেছেন-

أما شرط الأهلية فنوعان. أحدهما: الإسلام... والثاني: العلم بكونه مفروضا.

وأما شرائط المحلية فأنواع. منها: أن تكون الأرض عشرية، فإن كانت خراجية يجب فيها الخراج، ولا يجب في الخارج منها العشر.

ومنها أي من شرائط المحلية: وجود الخارج حتى أن الأرض لو لم تخرج شيئا لم يجب العشر.

ومنها: أن يكون الخارج من الأرض مما يقصد بزراعته نماء الأرض وتستغل الأرض به عادة. فلا عشر في الحطب والحشيش.

জমির মালিক সংক্রান্ত শর্ত দু’টি হলো-

১. মুসলমান হওয়া। (কেননা ওশর এক ধরনের ইবাদত। আর কাফের ইবাদতের যোগ্য নয়।)

২. ওশর ফরয হওয়া সম্পর্কে জানা থাকা। অর্থাৎ ওশর আদায়কারীর এ কথা জানা থাকা

---

[৩৮৫] বাদায়েউস সানায়ে ২/১৬৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৮৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/২৬৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

যে, তার শস্যের উপর ওশর আদায় করা ওয়াজিব।

আর জমি সংক্রান্ত শর্তগুলো হলো-

১. জমি ওশরী হতে হবে। খারাজী জমির উপর ওশর ওয়াজিব হয় না।

২. ফসল উৎপাদন হওয়া। সুতরাং যদি কোনো কারণে ফসল উৎপাদন না হয়, তাহলে ওশর ওয়াজিব হবে না।

৩. উৎপাদিত সম্পদ এমন হতে হবে, যা জমির ফসল হিসেবে চাষ করা হয়। সুতরাং জমিতে যেসব আগাছা, ঘাস, খড় ইত্যাদি জন্মে তাতে ওশর ওয়াজিব হয় না।[৩৮৭]

ওশরী জমির পরিচয়

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. ওশরী জমির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

أما العشرية فمنها: أرض العرب كلها. ومنها: الأرض التي أسلم عليها أهلها طوعا. ومنها: الأرض التي فتحت عنوة وقهرا وقسمت بين الغانمين المسلمين. ومنها: دار المسلم إذا اتخذها بستانا لما قلنا. وهذا إذا كان يسقى بماء العشر.

"ওশরী জমি হলো- ক. আরবের সকল জমি। খ. ঐ সকল জমি যার মালিকরা জমির ব্যাপারে ওশরী বা খারাজীর কোনো হুকুম দেয়ার আগেই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছেন। গ. ঐ সকল জমি যা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় করা হয়েছে এবং গনীমতের হকদারদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। ঘ. মুসলমানদের ঐ সকল বাড়ি যা তারা শস্য উৎপাদনের জন্য নির্ধারণ করে নিয়েছেন। এ সকল জমিতে ওশর ঐ সময় ওয়াজিব হবে, যখন তার সেচ ওশরী পানি দিয়ে করা হয়।"[৩৮৮]

ঙ. কোনো মুসলমান সরকারী কোনো অনাবাদী ভূমি আবাদ করলে যদি তা কোনো ওশরী জমির পাশে হয়, তাহলে ওশরী জমি বলে গণ্য হবে।

من أحيا أرضا مواتا، فإن كانت من حيز أرض الخراج فهي خراجية، وإن كانت من حيز أرض العشر فهي عشرية، وهذا إذا كان المحي لها مسلما، أما إذا كان ذميا فعليه الخراج وإن كانت من حيز أرض العشر.

"কেউ কোনো অনাবাদী সরকারী ভূমি আবাদ করলে সে ভূমি যদি খারাজী জমির পাশে হয় তাহলে তা খারাজী হিসেবেই গণ্য হবে। আর যদি তা ওশরী জমির পাশে হয় তাহলে তা ওশরী জমি ধরা হবে। এ হুকুম তখন, যখন আবাদকারী হবে মুসলিম। আর যদি আবাদকারী জিম্মি হয় তাহলে তার উপর সর্বাবস্থায় খারাজ আরোপ করা হবে। যদিও সেই জমি ওশরী

---

[৩৮৭] বাদায়েউস সানায়েঃ ২/১৭১-১৭৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৮৮] বাদায়েউস সানায়ে ২/১৭৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

জমির পাশে হয়।"[৩৮৯]

ওশরের নেসাব

ওশরের নেসাবের ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মত হলো, ফসল কম হোক বা বেশি তার উপর দশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা ওয়াজিব। কারণ কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولا يشترط فيه النصاب عند أبي حنيفة رحمه الله . لأبي حنيفة رحمه الله عموم قوله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض.

"আবু হানীফা রাহ. এর মতে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাব শর্ত নয়। তার এ কথার দলীল হলো, আল্লাহ তা'আলা ব্যাপকভাবে বলেছেন, আমি তোমাদের জন্য ভূমিতে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে দান কর। (এখানে কোনো নেসাবের উল্লেখ নেই)।"[৩৯০]

ওশরের পরিমাণ

যদি ভূমি সিঞ্চিত হয় বৃষ্টির পানি প্রবাহিত ঝরনা বা নদীর পানি ইত্যাদি দ্বারা এবং সেচ কাজের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম ছাড়া অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করতে না হয়, তাহলে ওশরের পরিমাণ হলো উৎপন্ন শস্যের দশ ভাগের এক ভাগ। আর যদি জমিতে প্রয়োজনীয় পরিশ্রম ও বীজের খরচ ছাড়াও সেচ কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়, যেমন কূপ খনন করতে হয়, নদী বা খালের পানির জন্য কর দিতে হয়, তাহলে বিশ ভাগের এক ভাগ ওশর প্রদান করা ওয়াজিব।

হযরত আব্দুল্লাহইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যে ভূমির সেচ ব্যবস্থা (মালিকের নিজ খরচে করতে হয় না বরং তা) বৃষ্টির পানি, প্রবাহিত ঝরনা বা নদীর পানি থেকে হয়ে থাকে তাতে উৎপন্ন শস্যের এক দশমাংশ আদায় করা ওয়াজিব। আর যে জমির সেচ ব্যবস্থা মালিককে (নিজ খরচে কূপ খনন ইত্যাদি মাধ্যমে) করতে হয় তাতে উৎপন্ন শস্যের বিশ ভাগের এক ভাগ আদায় করা ওয়াজিব।"[৩৯১]

ওশর ব্যয়ের খাত

ওশর একটি ওয়াজিব সদকা। আর সকল ওয়াজিব সদকার ব্যয়ের খাত এক ও অভিন্ন। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. ওয়াজিব সদকার খাত উল্লেখ করে বলেন-

---

[৩৮৯] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/২৩৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৯০] বাদায়েউস সানায়ে ২/১৮০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৩৯১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৪৮৩

باب المصرف: أي مصرف الزكاة والعشر... وهو مصرف أيضا لصدقة الفطر، والكفارة والنذر وغير ذلك من الصدقات الواجبة. كما في القهستاني. أهـ

"ব্যয়খাতের অধ্যায়: অর্থাৎ যাকাত ও ওশরের ব্যয়খাত। ...যাকাত ও ওশরের ব্যয়খাতগুলো সদকায়ে ফিতর, কাফ্‌ফারা, নযর ইত্যাদি যে কোনো ওয়াজিব সদকারও ব্যয়খাত।"[৩৯২]

যেহেতু ওশর যাকাতের মত ইবাদত তাই যেভাবে আমরা যাকাত আদায় করি, সেভাবে ওশরও আদায় করতে হবে। সরকারী ইনকাম ট্যাক্স ইত্যাদি পরিশোধ করার দ্বারা যেভাবে যাকাত রহিত হয় না, সেভাবে সরকারী ট্যাক্স, খাজনা ইত্যাদি আদায় করার দ্বারা ওশর রহিত হবে না।[৩৯৩]

মাসআলা: কোনো শাসক বা তার প্রতিনিধি কোনো ব্যক্তিকে যদি কোনো ওশরী জমির ওশর ক্ষমা করে দেয় তবে তা বৈধ হবে না। জমি ও মালিকের সে শস্য ব্যবহার করা বৈধ হবে না। বরং তার জন্য জরুরী হলো ঐ পরিমাণ সম্পদ সদকা করে দেয়া। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. লিখেন-

(ولو ترك العشر لا) يجوز إجماعا. ويخرجه بنفسه للفقراء.

"(বাদশা অথবা তার প্রতিনিধি যদি জমির মালিককে) ওশর মাফ করে দেয় তাহলে তা সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয। জমির মালিকের দায়িত্ব হচ্ছে, সে তা দরিদ্র মাঝে সদকা করে দেবে।"[৩৯৪]

খারাজের পরিচয়

খারাজের আভিধানিক অর্থ:

ما يخرج من الأرض.

"জমি থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয়।"[৩৯৫]

খারাজের পারিভাষিক অর্থ:

ما تأخذه الدولة من الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة، أو الأرض التي صالح أهلها عليها.

"যুদ্ধ করে বিজিত ভূমির উপর কিংবা যে ভূমির অধিবাসীরা মুসলিম শাসকের সঙ্গে খারাজ দেয়ার সন্ধি করে নিজ ভূমিতে বহাল থেকেছে, সেসব জমির উপর রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত

---

[৩৯২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৩৩৯, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান
[৩৯৩] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৩৭০, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[৩৯৪] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৩৯৫] আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা: ১৯/৫১, কুয়েত

করকে খারাজ বলে।"[৩৯৬]

খারাজী জমির পরিচয়

কোনো মুসলিম শাসক যদি যুদ্ধ ছাড়া কোনো কাফের অঞ্চলের শাসনাধিকার অর্জন করে এ সন্ধিতে যে, সে অঞ্চলের ভূমি তার বাসিন্দাদের হাতে আগের মতই থাকবে এবং তারা ইসলাম গ্রহণ না করে এই সন্ধিতে কর দিয়ে মুসলিম শাসকের অধীনে থাকবে, তাহলে তা খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে। তদ্রূপ মুসলিম শাসক যদি যুদ্ধ করে কোনো অঞ্চল বিজয় করে এবং যুদ্ধের পর সে অঞ্চলের ভূমি তার অধিবাসীদের মাঝে আগের মত রেখে দেয় তাহলেও তা খারাজী জমি হিসেবে গণ্য হবে। ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

وكل أرض فتحت عنوة، فأقر أهلها عليها، فهي أرض خراج وكذا إذا صالحهم، لأن الحاجة إلى ابتداء التوظيف على الكافر، والخراج أليق به.

"যে সকল ভূমি বিজিত হয়েছে যুদ্ধ করে, অতঃপর সেনাপতি সে ভূমিতে তার পূর্বের মালিকদের বহাল রেখেছেন, সেটা খারাজী জমি। তদ্রূপ যদি সেনাপতি কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ ছাড়া তার অধিবাসীদের সঙ্গে সন্ধিতে আবদ্ধ হন তাহলে তাও খারাজী জমি। কেননা এখানে জমির উপর আরোপিত বিধান যেহেতু কাফেরের ক্ষেত্রে তাই এখানে খারাজ আরোপ করাই যুক্তিযুক্ত।"[৩৯৭]

খারাজের বিধান

খারাজের বিধান সম্পর্কে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ হয়েছে-

كل من ملك أرض الخراج، يؤخذ منه الخراج، كافرا كان أو مسلما، صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو مكاتبا أو عبدا مأذونا، رجلا كان أو امرأة كذا في المحيط.

"যে কেউ খারাজী জমির মালিক হবে তার কাছ থেকে খারাজ নেয়া হবে। কাফের হোক বা মুসলমান, ছোট হোক বা বড়, স্বাধীন হোক বা মুকাতাব বা ব্যবসার অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম, পুরুষ হোক বা নারী।"[৩৯৮]

খারাজের প্রকারভেদ

খারাজ দুই প্রকারে বিভক্ত। যথা:

১. খারাজে মুকাসামা। ২. খারাজে মুওয়ায্যফ।

খারাজে মুকাসামার অর্থ হলো, উৎপাদিত ফসলের কোনো একটি অংশকে নির্ধারণ করে

---

[৩৯৬] মু'জামু লুগাতিল ফুকাহা: ১৯৪, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

[৩৯৭] হেদায়া ফাতহুল কাদীরের নুসখা: ৫/২৭৯, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৩৯৮] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ২/২৩৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

দেয়া। যেমন অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ ইত্যাদি।

খারাজে মুওয়ায্যফ এর অর্থ হলো, জমির উপর নির্দিষ্ট পরিমাণের নগদ অর্থ বা অন্য কোনো জিনিস ধার্য করা। উৎপাদন যতটুকুই হোক না কেন তা আদায় করতে হবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী[৩৯৯] রাহ. লিখেন-

الخراج قسمان: خراج مقاسمة وهو ما وضعه الإمام على أرض فتحها ومنّ على أهلها بها من نصف الخارج أو ثلثه أو ربعه. خراج وظيفة.

"জমির খারাজ দুই ভাগে বিভক্ত ১. খারাজে মুকাসামা, এর অর্থ হচ্ছে ইমামুল মুসলিমীন বিজিত ভূমিতে অনুগ্রহপূর্বক তার অধিবাসীদের বহাল রেখে তাতে উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক বা এক তৃতীয়াংশ কিংবা এক চতুর্থাংশ পরিমাণ যে কর নির্ধারণ করে থাকেন। ২. খারাজে মুওয়ায্যফ যা ধার্যকৃত নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ টাকা বা খাদ্যদ্রব্য।"[৪০০]

খারাজের পরিমাণ

খারাজ মুকাসামা হোক বা মুওয়ায্যফ তা উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না এবং এক পঞ্চমাংশের কম হতে পারবে না। এমনকি খারাজে মুওয়ায্যফ ধার্য করা হলে শস্য উঠানোর পর যদি জানা যায় যে, ধার্যকৃত পরিমাণ উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি, তাহলে ধার্যকৃত পরিমাণ কমিয়ে অর্ধেক বা তার কম উসুল করতে হবে।[৪০১] আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وينبغي أن لا يزاد على النصف، ولا ينقص عن الخمس، حدادي.

"ধার্যকৃত খারাজের পরিমাণটা উৎপাদিত শস্যের অর্ধেকের বেশি হতে পারবে না। এবং এক পঞ্চমাংশের কমও হতে পারবে না।"[৪০২]

এ কথার ব্যাখ্যায় আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

هذا في خراج المقاسمة، ولم يقيد به لانفهامه من التعبير بالنصف والخمس، فإن خراج الوظيفة ليس فيه جزء معين تأمل.

"উপরোল্লিখিত পরিমাণটা খারাজে মুকাসামার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু আল্লামা হাসকাফী রাহ. এটি স্পষ্ট করে বলেননি। কারণ তার নিছফ-খুমুস এর প্রকাশভঙ্গি থেকে এটি বুঝা

---

[৩৯৯] মুহাম্মাদ আমীন আবেদীন ইবনে ওমর আবেদীন ইবনে আব্দুল আযীয আদ দিমাশকী রাহ.। তিনি ইবনে আবেদীন নামেই প্রসিদ্ধ। ১১৯৮ হিজরীতে দামেস্কে জন্মগ্রহণ করেন। এবং ১২৫২ হিজরীতে দামেস্কেই ইন্তেকাল করেন। তিনি ফিকহ শাস্ত্রের, বিশেষত ফিকহে হানাফী অনেক খেদমত করেছেন। তাঁর রচিত রদ্দুল মুহতার ফিকহে হানাফীর রেফারেন্স বুক হিসেবে স্বীকৃত। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ২/৩৬৭; -রওজুল বাশীর: ২২০; আল আ'লাম: ৬/৪২

[৪০০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/২৬৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪০১] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/২৭৬, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪০২] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩০৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

যায়। পক্ষান্তরে খারাজে মুওয়ায্যফের ক্ষেত্রে উৎপাদিত শস্যের নির্দিষ্ট কোনো অংশ নির্ধারণ করা হয় না।"[৪০৩]

কিন্তু আল্লামা রাফে'য়ী রাহ.[৪০৪] বলেন-

الظاهر أن الحكم كذلك في الخراج الموظف، والتعبير بالنصف والخمس لا يدل على أنه في المقاسمة خاصة. وذلك أنك إذا وجدت الخراج الموظف زائدا على نصف الخارج نقصته وجوبا إلى النصف ولك تنقيصه إلى الخمس.

"এটা তো স্পষ্ট যে, আল্লামা হাসকাফী রাহ. এখানে খারাজের যে হুকুম বর্ণনা করেছেন হুবহু এই হুকুম খারাজে মুওয়ায্যফের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। শুধু নিসফ-খুমুস বলে প্রকাশ করা এ কথার দাবি করে না যে, এই হুকুম শুধু খারাজে মুকাসামার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। আর তাই খারাজে মুওয়ায্যফ যদি উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি হয়, তাহলে অপরিহার্যভাবে অর্ধেক পর্যন্ত কমাতে হবে। তবে এক পঞ্চমাংশ পর্যন্ত কমানোর সুযোগ আছে।"[৪০৫]

খারাজ ব্যয়ের খাত

খারাজ ব্যয়ের খাত হচ্ছে সাধারণ জনগণের কল্যাণমূলক কাজ। যেমন রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ করা, মুসলিম দেশের সীমান্ত পাহারা, সামরিক কাজকর্ম, রাষ্ট্রের কর্মচারীবৃন্দ ও ওলামায়ে কেরামের ভাতা ইত্যাদি। এদের প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার এ খাত থেকে বহন করা হবে। অমুসলিম থেকে নেয়া জিযিয়াও এ খাতে ব্যয় করা হবে।

ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

وما جباه الإمام من الخراج، ومن أموال بني تغلب، وما أهداه أهل الحرب إلى الإمام، والجزية، يصرف في مصالح المسلمين كسد الثغور، وبناء القناطر، والجسور... ويعطى قضاة المسلمين، وعمالهم، وعلماؤهم منه ما يكفيهم. ويدفع منه أرزاق المقاتلة وذراريهم.

قال ابن الهمام في الفتح : يعطى أيضا للمعلمين، والمتعلمين وبهذا تدخل طلبة العلم.

"শাসক খারাজী জমি থেকে এবং বনু তাগলিব গোত্র থেকে যে খারাজ উসূল করে এবং জিম্মিরা যে সকল হাদিয়া শাসককে দেয় এবং জিযিয়া, এগুলো খরচ করা হবে মুসলমানদের কল্যাণজনক খাতে। যেমন সীমান্ত প্রহরা, ব্রীজ ও কালভাট নির্মাণ ইত্যাদি কাজে এবং মুসলিম বিচারক ও সরকারী অন্যান্য কর্মকর্তা, ওলামায়ে কেরামকে প্রয়োজন পরিমাণ দেয়া

---

[৪০৩] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩০৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৪০৪] আব্দুল কাদের ইবনে মোস্তফা ইবনে আব্দুল কাদের আর-রাফেয়ী আল ফারুকী আল হানাফী রাহ.। তিনি ১২৪৮ হিজরী সনে শামের তারাবুলুসে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৩১২ হিজরীর ৭ই রমযান কায়রোতে ইন্তেকাল করেন। তাহরিরুল মুখতার লি রদ্দিল মুহতার তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

[৪০৫] তাকরীরাতে রাফে'য়ী: ৬/৫৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

হয়ে এবং এখান থেকেই যোদ্ধা ও তাদের সন্তান-সন্ততির ভাতা দেয়া হবে।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন, ইলমে দ্বীনের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের খরচও এখান থেকে দেয়া হবে। সুতরাং মাদরাসার তালিবুল ইলমরাও এর অন্তর্ভুক্ত।"[৪০৬]

বাংলাদেশের জমি ওশরী না খারাজী এ বিষয়ে পর্যালোচনা

খ্রিস্টিয় ১৩তম শতাব্দী থেকে বাংলাদেশে মুসলমানদের সামরিক উপস্থিতি শুরু হয়, কিন্তু এর অনেক আগে হিজরী প্রথম শতাব্দী থেকে এ দেশে মুসলমানদের আগমন শুরু হয়। আগমন করেন অনেক ছুফি, দরবেশ, আলেম ও সাধক। তাঁদের মেহনত ও দাওয়াতে দীর্ঘ পাঁচশ বছরে এ অঞ্চলের অনেক মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেন।

খ্রিস্টিয় ১৩তম শতাব্দীতে (১২০১-১২০৬) ইখতিয়ার উদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীসহ ক্রমান্বয়ে অনেক মুসলিম সেনাপতি এ অঞ্চলে আগমন করেন। তখন মুসলমানদের শাসনক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়।[৪০৭]

মুসলিম সেনাপতিরা এদেশ অধিকারের পর ভূমি ব্যবস্থায় বিশেষ কোনো রদ বদল করেছিলেন বলে স্পষ্ট কিছু জানা যায় না। বরং ইতিহাস থেকে এটা অনুমান করা যায় যে, প্রজাদেরকে যার যার ভূমিতে আগের অবস্থাতেই বহাল রেখেছিলেন।

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের ভূমি তিন ধরনের হতে পারে।

এক. ঐ সকল মুসলমানের ভূমি যারা আগ থেকেই স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে।

দুই. অমুসলিমদের ঐ সকল ভূমি, মুসলিম সেনাপতিরা বিজয়ের পর যাতে পূর্বের মালিকদেরকেই বহাল রেখেছেন।

তিন. ব্যক্তি মালিকানাহীন পতিত ভূমি। যেমন, বন, জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা, খাল-বিল ইত্যাদি।

প্রথম প্রকার ভূমি ওশরী, যার আলোচনা পূর্বে গত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রকার ভূমি খারাজী। তৃতীয় প্রকার ভূমি যদি কোনো মুসলমান আবাদ করে থাকে কিংবা সরকার তাকে দিয়ে থাকে তাহলে তা ওশরী বলে গণ্য হবে। আর যদি তা কোনো অমুসলিম আবাদ করে থাকে কিংবা সরকারের কাছ থেকে মালিকানা স্বত্ত্ব নিয়ে থাকে, তাহলে তা খারাজী বলে গণ্য হবে।

কিন্তু বাংলাদেশের যে সকল জমি খারাজী তাতে কোনো প্রকার খারাজ ওয়াজিব হবে- মুকাসামা না মুওয়ায্যফ, এটা একটা জটিল বিষয়। কারণ এটা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে বিজয়ী মুসলিম শাসকের সিদ্ধান্তের উপর। আর বাংলাদেশে যে সকল মুসলিম শাসক শাসন

---

[৪০৬] হেদায়া ফাতহুল কাদীরের নুসখা: ৫/৩০৬-৩০৭, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান

[৪০৭] দেওবন্দ আন্দোলন ইতিহাস, ঐতিহ্য, অবদান: ২৬

করেছিলেন তারা এখানকার ভূমি কী ব্যবস্থায় রেখেছিলেন তা একটি অস্পষ্ট বিষয়। ইতিহাসে যতটুকু পাওয়া যায় তা হলো, বিজেতারা এখানকার অধিবাসীদেরকে তাদের ভূমিতে পূর্বের রীতিতেই বহাল রেখেছিলেন।

মাসআলা: এখনো পর্যন্ত যে জমি মুসলমানদের মালিকানায় আছে, আর প্রত্যেক প্রজন্মে ও যুগে তা মুসলমানদের মালিকানায়ই ছিলো ওয়ারিশ সূত্রে হোক বা ক্রয় সূত্রে। তাতে যদি মাঝে কোনো অমুসলিমের মালিকানা থাকা সম্পর্কে তাতে স্পষ্টভাবে জানা না যায়, তাহলে বর্তমানে তা ওশরী জমি হিসেবেই গণ্য হবে। আর যদি মাঝে কোনো অমুসলিমের মালিকানা ছিলো। জানা যায় তাহলে তা খারাজী জমি হিসেবে ধরা হবে। আর বর্তমানে মুসলমানদের হাতে থাকা কোনো জমির যদি পূর্বের অবস্থা সম্পর্কে কিছু জানা না যায়, তাহলে তাও ওশরী জমি হিসেবে গণ্য হবে। শুরুতে বা মাঝে কোনো অমুসলিমের মালিকানায় থাকতে পারে এমন ধারণা বা সংশয়ের কোনো স্থান এখানে নেই। এই মাসআলাটি মুফতী শফী রাহ. উল্লেখ করেছেন হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ. ও মুফতী আযীযুর রহমান রাহ. এর বরাত দিয়ে।[৪০৮]

মাসআলা: যদি কোনো মুসলিম রাষ্ট্রের সরকার জমিতে খাজনা বা ট্যাক্স ধার্য করে, কিন্তু তা শর'য়ী খারাজ হিসেবে নয়, তাহলে জমির মালিক সে খাজনা বা ট্যাক্স আদায় করে খারাজের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারে, যদি রাষ্ট্রে খারাজ ব্যয়ের খাত থাকে। তবে সরকারের ধার্যকৃত পরিমাণ যদি এক পঞ্চমাংশ থেকে কম হয় তাহলে অবশিষ্টাংশ নিজ দায়িত্বে খারাজের কোনো খাতে ব্যয় করতে হবে।[৪০৯]

মাসআলা: যদি বাদশাহ কিংবা তার প্রতিনিধি কোনো ভূমির খারাজ মাফ করে দেয়, তাহলে তা জায়েয আছে। এই শস্যগুলো জমির মালিক ভোগ করতে পারে যদি সে খারাজ গ্রহণ করার যোগ্য হয়। যেমন সে দীনি তা'লীম ও তাবলীগের কাজে ব্যস্ত থাকে, তদ্রুপ জিহাদ অথবা ইল্ম অন্বেষণে মশগুল থাকে ইত্যাদি। পক্ষান্তরে যদি সে খারাজের অর্থ গ্রহণের যোগ্য না হয়, তাহলে সে অর্থ তার জন্য হালাল হবে না, বরং সে অর্থ খারাজের খাতে ব্যয় করা তার জন্য ওয়াজিব। আল্লাম আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(ترك السلطان) أو نائبه (الخراج لرب الأرض) أو وهبه له ولو بشفاعة (جاز) عند الثاني، وحل له لو مصرفا، وإلا تصدق به، به يفتى. وما في الحاوي من ترجيح حله لغير المصرف خلاف المشهور.

"শাসক বা তার প্রতিনিধি যদি জমির মালিকের খারাজ মাফ করে দেয় কিংবা তাকে তা হাদিয়া হিসেবে দেয় যদিও কারো সুপারিশে হোক না কেন ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর মতে তা জায়েয হবে। এবং জমির মালিক যদি তার হকদার হয় তাহলে তার জন্য তা হালাল হবে। আর যদি সে তার হকদার না হয় তাহলে তা সদকা করে দিবে। এ মতের উপরই ফাত্ওয়া। আর 'হাবী' নামক কিতাবে খারাজ তার নির্ধারিত খাত ছাড়া ভিন্ন কোনো

---

[৪০৮] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৩৪৯-৩৫৩, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪০৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৩৮০, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

খাতে ব্যবহার হালাল হওয়ার যে কথা রয়েছে তা প্রসিদ্ধ মতের পরিপন্থী।"[৪১০]

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[৪১০] আদ্দুররুল মুখতার: ৬/৩১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

অধ্যায়ঃ রোযা

রমযান ও ঈদের চাঁদ: কিছু সমস্যা ও সমাধান

মাওলানা উবায়দল্লাহ ঝালকাঠী

রোযা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরয। প্রতি বছর রোযার শাশ্বত এ বিধান নিয়ে আগমন করে মাহে রমযান। আর রোযার শেষে আনন্দ ও খুশির বার্তা নিয়ে উপস্থিত হয় ঈদুল ফিত্‌র। কিন্তু রোযা ও ঈদ উভয়টি পালন করতে হয় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অথবা আরবী মাস পূর্ণ হলে। তবে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চাঁদ দৃষ্টিগোচর না হলে রোযা ও ঈদ পালনের ক্ষেত্রে বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে বর্তমান যুগে যখন আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু হয়েছে ধর্মীয় বিষয়াদিতে। যেমন দূরবীন, বিমান ও হেলিকপ্টার চাঁদ দেখার জন্য ব্যবহার করা হয়। আর রেডিও, টেলিভিশন ও মোবাইল ফোন চাঁদ দেখার খবর প্রচারের জন্য। তাই এ সকল নবউদ্ভাবিত সমস্যার শর'য়ী সমাধান জানা আমাদের জন্য সময়ের দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু সমস্যা ও তার শর'য়ী সমাধান আলোচনা করা হলো।

চাঁদ দেখার গুরুত্ব

ইসলামে চাঁদ দেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কেননা শুধু রোযা ও ঈদ নয়; বরং আরো বহু বিধানের সম্পর্ক রয়েছে চাঁদের সাথে। যেমন, হজ্বের মাস ও দিনসমূহ, আশুরা, শবেবরাত ইত্যাদি। আর আল্লাহ তা'আলা জলে-স্থলে, পাহাড়-পর্বতে সর্বত্র বসবাসকারী সব শ্রেণীর মানুষের সুবিধার্থে চাঁদকে সময় নির্ধারণের কাজ আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিযুক্ত করেছেন, যা নিম্নোক্ত আয়াতে উল্লেখ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ

"তোমার নিকট তারা নতুন চাঁদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। বলে দাও, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারক এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম।"[৪১১]

হাদীস শরীফে চাঁদ দেখে রোযা রাখার ও চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

قال النبي ﷺ : صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم الشهر، فعدوا ثلاثين يوما.

"নবী করীম ﷺ বলেন, তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড় (ঈদ কর)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে ত্রিশ দিন পূর্ণ কর।"[৪১২]

হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

إن رسول الله ﷺ ذكر رمضان فقال: لاتصوموا حتي تروا الهلال، ولا تفطروا حتي تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له.

[৪১১] সূরা বাকারা: ১৮৯

[৪১২] সহীহ মুসলিম: ১/৩৪৮

“রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযান সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত (রমযানের) রোযা রাখবে না এবং (শাওয়ালের) নতুন চাঁদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ছাড়বে না (ঈদ করবে না)। আর যদি আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে মাস (ত্রিশ দিন) পূর্ণ করবে।”[৪১৩]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা ইসলামে চাঁদ দেখার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার কারণেই ফকীহগণ বলেছেন, চাঁদ অনুসন্ধান করা ‘ওয়াজিব আলাল কিফায়া’। অর্থাৎ কোনো অঞ্চলের কেউই চাঁদ অনুসন্ধান না করলে সবাই গুনাহগার হবে। আর কিছু মুসলমান অনুসন্ধান করলে সবাই দায়িত্বমুক্ত হবে। যেমন ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে এসেছে-

يجب أن يلتمس الناس الهلال في التاسع وعشرين من شعبان وقت الغروب، فإن رأوه صاموه، وإن غم أكملوه ثلاثين.

“উনত্রিশে শাবান সূর্যাস্তের সময় চাঁদ অনুসন্ধান করা মুসলমানদের উপর ওয়াজিব। সুতরাং যদি চাঁদ দেখা যায়, তাহলে সবাই রোযা রাখবে। অন্যথায় উক্ত মাস ত্রিশ দিন পূর্ণ করবে।”[৪১৪]

রমযান ও ঈদের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার শর্তাবলী

চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিধানের ক্ষেত্রে সব মাস এক নয়। রমযান মাস অন্যান্য মাসের তুলনায় একটু ভিন্ন। কেননা রমযান মাসের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। কোনো একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির সংবাদ দ্বারাও রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হতে পারে। কিন্তু অন্যান্য মাসের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য শাহাদত ও সাক্ষ্যের শর্তারোপ করা হয়েছে। তবে যেহেতু চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয় ইবাদত ও মু‘আমালাত উভয়ের সাথে সম্পর্ক রাখে, তাই অন্যান্য মু‘আমালাতে সাক্ষীর ক্ষেত্রে যে কঠোরতা করা হয় তা এখানে করা হবে না। মোটকথা, রমযান ছাড়া অন্যান্য মাসের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয়টি ভিন্ন। রাসূলুল্লাহ ﷺ রমযানের ক্ষেত্রে একজন মুমিন ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণ করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله! إني رأيت الهلال الليلة، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم، قال: يا بلال! ناد في الناس، فليصوموا غدا.[৪১৫]

“একজন গ্রাম্য ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি রাতে চাঁদ দেখেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, তুমি কি এ কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর রাসূল? লোকটি হ্যাঁ বলে স্বীকৃতি

---

[৪১৩] সহীহ বুখারী: ১/২৫৬

[৪১৪] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৯৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪১৫] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (٩٥٦٠) وأبو داود في «سننه» (٢٣٣٣)، وابن خزيمة في «صحيحه» (١٩٢٤)، والحاكم في«مستدركه» (٤٢٤/١) وصححه بعد ما ساق متابعة الثوري وحماد بن سلمة ووافقه الذهبي.

জানালো। নবীজী ﷺ তখন হযরত বেলাল রাযি.কে ডেকে নির্দেশ দিলেন, সবাইকে এ মর্মে ঘোষণা দাও যে, তারা যেন আগামীকাল রোযা রাখে।”[৪১৬]

উক্ত হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ জনৈক গ্রাম্য ব্যক্তিকে শুধু ঈমানের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। তার আদালত বা ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে অতিরিক্ত খবর নেননি, বাহ্যিক অবস্থার উপর নির্ভর করেছেন। এ থেকে বোঝা যায় যে, রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য শুধু মুসলমান হওয়া যথেষ্ট।

রমযানের চাঁদ শুধু ইবাদতের সাথে সম্পৃক্ত, তাই একজনের খবরই যথেষ্ট। পক্ষান্তরে ঈদ বা অন্যান্য মাসের চাঁদের বিষয় ভিন্ন, সেখানে ইবাদতের পাশাপাশি বান্দার লাভ-ক্ষতি যুক্ত, তাই রমযানের ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকলেও অন্যান্য মাসের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দুইজন সাক্ষী আবশ্যক। হাদীস শরীফে এসেছে, রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসে চাঁদ দেখা না গেলে নবীজী ﷺ দুইজন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত হুসাইন ইবনুল হারেস আল-জাদালী রাহ. বর্ণনা করেন-

أن أمير مكة خطب، ثم قال: عهد إلينا رسول الله ﷺ أن ننسك للرؤية، فإن لم نره ويشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، فسألت الحسين بن الحارث: من أمير مكة؟ فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن حاطب، أخو محمد بن حاطب، وكلاهما من الصحابة.

“মক্কা শরীফের আমীর (হারেস ইবনু হাতিব রাযি.) খুতবায় বলেছেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে চাঁদ দেখে কুরবানী করার অসিয়াত করেছেন। আর কারণবশত চাঁদ না দেখা গেলে এবং দু’জন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিলে, তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে যেন কুরবানী করি।”[৪১৭]

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, রমযান ছাড়া অন্য মাসের চাঁদ স্পষ্টভাবে দেখা না গেলে দু’জন ন্যায়পরায়ণ সাক্ষীর সাক্ষ্য আবশ্যক। শুধু তাই নয়; বরং সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য তাদের মাঝে নিম্ন বর্ণিত গুণগুলো থাকা আবশ্যক।

১. মুসলমান হওয়া। ২. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। ৩. আকেল অর্থাৎ সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন হওয়া। ৪. দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া। ৫. আদেল অর্থাৎ ন্যায়পরায়ণ হওয়া। শেষেরটি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শর্ত যা সব ধরনের সাক্ষীর ক্ষেত্রেই বিশেষ ভূমিকা রাখে। কিন্তু বর্তমান যামানায় বাস্তব অর্থে ন্যায়পরায়ণ সাক্ষী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তাই যদি সব জায়গায় আদেল হওয়ার শর্ত লাগানো হয়, তাহলে মানুষের দৈনন্দিন অনেক সমস্যায় সমাধান দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে। এজন্য প্রয়োজনের তাগিদে বিচারক ফাসেককে নির্ভরযোগ্য মনে করলে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে ফায়সালা দিতে পারেন। তবে এরূপ করা বিচারকের জন্য আবশ্যক নয়। ৬. তার কথার মাঝে সাক্ষ্য দিচ্ছি শব্দ বিদ্যমান থাকা। ৭. স্বচক্ষে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়া। শোনা খবরের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়। ৮. সাক্ষ্যদাতা বিচারকের দরবারে হাজির হওয়া,

[৪১৬] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ২৩৩৩; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ৯৫৬০

[৪১৭] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ২৩৩১

অন্যথায় সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।[৪১৮]

কোনো দেশে শর'য়ী বিচারক না থাকলে বিচারকের বিকল্প হিসেবে একটি হেলাল কমিটি গঠন করা যেতে পারে, যেখানে নির্ভরযোগ্য আলেম ওলামা থাকবেন। সাক্ষীগণ তাদের সামনে সাক্ষ্য দিলে নিজ এলাকার জন্য চাঁদ প্রমাণিত হয়েছে বলে ধরে নেয়া হবে।[৪১৯]

চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রে সাক্ষ্যের কিছু রূপরেখা

যে কোনো মামলার নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে সাক্ষ্য প্রদানের বিভিন্ন পদ্ধতি ও রূপরেখা রয়েছে, যা স্থান ভেদে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাই নিম্নে এ বিষয়টি তুলে ধরা হলো। (আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সাক্ষী বা খবরের মাধ্যমে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার বিষয় তখনই যখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকবে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে বড় এক জামা'আতের চাঁদ দেখা শর্ত। অন্যথায় শুধু একজন বা দু'জনের খবর বা সাক্ষ্য দ্বারা চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে না) এ ব্যাপারে মুফতী শফী রাহ. জাওয়াহিরুল ফিকহে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ-

প্রথম পদ্ধতি: الشهادة على الرؤية তথা স্বচক্ষে চাঁদ দেখার সাক্ষ্যদান। মর্ম হলো নির্দিষ্ট পরিমাণ লোক চাঁদ দেখে বিচারক বা হেলাল কমিটির কাছে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়া। বিচারক বা হেলাল কমিটি সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করলে চাঁদ প্রমাণিত হবে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: الشهادة على الشهادة অর্থাৎ সাক্ষীর সাক্ষ্য প্রদানের সাক্ষ্য। এর উদ্দেশ্য হলো, সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত একাধিক ব্যক্তি চাঁদ দেখার পর শর'য়ী কোনো সমস্যার কারণে বিচারকের কার্যালয়ে উপস্থিত হতে না পারলে তারা প্রত্যেকে দু'জন যোগ্য ব্যক্তির সামনে তাদের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিবে। ঐ দু'জন ব্যক্তি বিচারক বা হেলাল কমিটির সামনে এ কথার সক্ষ্য দিবে যে, প্রথম সাক্ষী তাদের সামনে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করেছে। এভাবে বলবে, 'আমরা এ মর্মে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুকের ছেলে অমুক আমাদের সামনে চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে আমাদেরকে তার পক্ষ থেকে সাক্ষ্য পৌঁছানোর জন্য বলেছে। তাই আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি।' এরপর বিচারক বা হেলাল কমিটি তাদের সাক্ষ্য শ্রবণ করে ফায়সালা দিলে চাঁদ প্রমাণিত হবে। যেহেতু বিশেষ প্রয়োজনের কারণে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়, তাই সমস্ত ফকীহর ঐক্যমতের ভিত্তিতে মূল সাক্ষীর উপস্থিতি অসম্ভব হওয়া ব্যতীত তার পক্ষ থেকে অন্য কারো সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।"[৪২০]

তৃতীয় পদ্ধতি: الشهادة على القضاء 'বিচারকের ফায়সালার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান।' অর্থাৎ সাক্ষ্য দেয়ার উপযুক্ত একাধিক লোক বিচারক বা হেলাল কমিটির নিকট এভাবে সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, অমুক শহরের বিচারক বা হেলাল কমিটি দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করে চাঁদ ওঠার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। তখন এই শহরের বিচারক বা হেলাল কমিটির জন্য তাদের উক্ত 'শাহাদত আলাল কাযা' তথা ফায়সালার ব্যাপারে সাক্ষ্যের

---

[৪১৮] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৭১-৪৭৪, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪১৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৭৫, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪২০] জাওয়াহিরুর ফিকহ: ৩/৪৯৩-৪৯৪, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

ভিত্তিতে এ শহরে চাঁদ ওঠার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা সুযোগ রয়েছে।

আল্লামা বুরহানুদ্দীন মাহমূদ ইবনে মাযা রাহ. বলেন-

وفي مجموع النوازل: شاهدان شهدا عند قاضي مصر لم ير أهله الهلال علي أن قاضي مصر كذا شهد عنده شاهدان برؤية الهلال، وقضي به، ووجد استجماع شرائط صحة الدعوي، قضي القاضي بشهادتهما.

"যে শহরে চাঁদ ওঠেনি সেখানকার বিচারকের নিকট দুই ব্যক্তি এই মর্মে সাক্ষ্য দিবে যে, অমুক শহরের বিচারক দুই ব্যক্তির চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণ করে চাঁদ ওঠার ফায়সালা দিয়েছেন এবং তাদের দাবি শুদ্ধ হওয়ার শর্তসমূহও পাওয়া গেছে। তাহলে এই শহরের বিচারক তাদের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে চাঁদ ওঠার ঘোষণা দিবেন।"[৪২১]

চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার আরো একটি পদ্ধতি

الخبر المستفيض 'ব্যাপক প্রচারিত সংবাদ।' অর্থাৎ কোনো সংবাদ এত ব্যাপকতা বা প্রসিদ্ধি লাভ করা যার সকল বর্ণনাকারী মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব। এক্ষেত্রে সাক্ষ্যের প্রয়োজন নেই। চাঁদের খবরটা রমযানের চাঁদের খবর হোক কিংবা ঈদের। কিন্তু এর জন্য শর্ত হলো বিভিন্ন শহর থেকে বিভিন্ন লোক এ মর্মে সংবাদ দিবে যে আমরা স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি বা অমুক শহরের বিচারক চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক চাঁদ ওঠার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন।[৪২২]

হেলাল কমিটির রূপরেখা

কোনো দেশে শর'য়ী কাযী না থাকলে বিকল্প হিসেবে হেলাল কমিটি গঠন করা উচিত, যার রূপরেখা এভাবে হবে-

১. কমিটির ভেতর এমন বিজ্ঞ আলেমগণ থাকবেন যাঁদের ফাত্ওয়া ও সিদ্ধান্তের উপর মুসলমানদের অধিক আস্থা ও বিশ্বাস রয়েছে, যেন তাদের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে কোনো চিন্তা-ফিকির করতে না হয়। কমিটির সিদ্ধান্ত স্বয়ং কমিটির কোনো আলেম তাদের ভাষায় প্রচার করতে হবে। সাধারণ খবরের মত যে কেউ প্রচার করলে চলবে না।

২. দেশের বড় বড় শহরে হেলাল কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠা করা হবে, যাতে সাক্ষীদের কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন না হয়। এক্ষেত্রে কমিটিতে কোনো সরকারী অফিসার থাকবেন, যিনি সরকারী খরচে সাক্ষ্য গ্রহণ ও খবর পৌঁছানোর ব্যবস্থা আঞ্জাম দিবেন।

৩. রোযা ও ঈদের দু-একদিন পূর্বে সকল মিডিয়াতে এ মর্মে নির্দেশ জারি করা হবে যে, যদি কোথাও কেউ চাঁদ দেখে, তাহলে যেন সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ থানায় সংবাদ পৌঁছায়। যদি গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া সংবাদ পৌঁছাতে বিলম্ব করে, তাহলে সে অপরাধী সাব্যস্ত হবে এবং তার সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪. প্রত্যেক থানায় এ নির্দেশ পৌঁছানো হবে যে, যখনই কোনো সাক্ষ্যদাতা আসে

---

[৪২১] আল মুহীতুল বুরহানী: ২/৫৫০, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

[৪২২] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৭৭, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

তাৎক্ষণিকভাবে থানা প্রধান নিকটস্থ হেলাল কমিটির অফিসারকে টেলিফোনে জানাবেন যে, কয়েকজন লোক স্বচক্ষে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দিচ্ছে, আমরা তাদেরকে আপনাদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছি। অতঃপর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক এই শাখা কমিটি কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট এই অবস্থা জানাবে।

৫. যদি কেন্দ্রীয় কমিটি জানতে পারে, দেশের কোথাও চাঁদ দেখা নিয়ে গবেষণা চলছে, তাহলে ঐ শাখা কমিটির পক্ষ হতে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত প্রচার করবে না। বরং চাঁদ দেখার বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে বলে ঘোষণা দিবে যাতে লোকজন অপেক্ষায় থাকে। সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পরই নিশ্চিত খবর প্রচার করবে।

৬. কেন্দ্রীয় কমিটির প্রধানকে এ বিষয়ে অবশ্যই যত্নশীল হতে হবে যে, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে কেউ বৈঠক ত্যাগ করতে পারবে না।

৭. কেন্দ্রীয় কমিটির আরো একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। তা হলো, দেশের ভেতর সাক্ষীর উপর ভিত্তি করে চাঁদের সিদ্ধান্ত ততক্ষণ পর্যন্ত প্রচার করবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বোক্ত তিন পদ্ধতি অনুসারে পরিপূর্ণভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত না হবে।[৪২৩]

হেলাল কমিটির ঘোষণা অনুযায়ী রোযা ও ঈদ পালন

প্রত্যেক এলাকায় ভিন্ন ভিন্ন হেলাল কমিটির প্রয়োজন নেই। বরং এক 'মাতলা' বা যতটুকু এলাকা জুড়ে এক উদয়স্থল হিসাব করা হয় সেখানে একটি কমিটি থাকা যথেষ্ট। বর্তমানে সরকারের পক্ষ থেকে হেলাল কমিটি গঠন করা হয়, যারা প্রতিমাসে চাঁদ পর্যবেক্ষণ করে। বিশেষ করে রমযান ও ঈদের চাঁদ পর্যবেক্ষণপূর্বক রেডিও, টিভির মাধ্যমে হেলাল কমিটির বরাত দিয়ে চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার করা হয়। উপরোক্ত সংবাদের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালন করতে হলে নিম্নের শর্তসমূহের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. ঘোষণার দিনটি মাসের শুরু থেকে নিয়ে ২৮ বা ৩১তম দিন না হতে হবে।

খ. হেলাল কমিটির সদস্যগণ আলেম ও দ্বীনদার হতে হবে।

গ. পূর্বোক্ত শর'য়ী শর্তানুযায়ী চাঁদের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে।

ঘ. কমিটি বা রাষ্ট্রপ্রধানের পক্ষ থেকে এ মর্মে ঘোষণা প্রদান করতে হবে যে, শর'য়ী শর্তানুযায়ী চাঁদ উদিত হওয়ার প্রমাণিত হয়েছে।[৪২৪]

বিমান, হেলিকপ্টার ও দূরবীনের সাহায্যে চাঁদ দেখা

চাঁদ দেখার ক্ষেত্রে শরী'আতের বিধান হচ্ছে প্রত্যেক মানুষ নিজ নিজ অবস্থানে থেকে চাঁদ দেখার চেষ্টা করবে। তাই বিমান হেলিকপ্টার ইত্যাদির আয়োজন করে চাঁদ দেখার জন্য অনেক উপরে ওঠার প্রয়োজন নেই। আরবী মাস নির্ণয়ে আধুনিক যন্ত্রপাতি কাজে লাগানো অনাবশ্যক হওয়ার বিষয়টি নিম্নের হাদীস থেকে ফুটে ওঠে। হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে

[৪২৩] ফাতাওয়ায়ে বাইয়িনাত: ৩/৩৬-৩৭, মাকতাবায়ে বাইয়িনাত, বিন্নুরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান

[৪২৪] সূত্র, ফাতাওয়ায়ে মাহমূদিয়া: ১৫/১০২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

বর্ণিত-

عن النبي ﷺ أنه قال: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين.

"নবীজী ﷺ বলেছেন, আমরা নিরক্ষর জাতি। আমরা লেখালেখির মাধ্যমে মাস হিসাব করি না। (এরপর হাত দ্বারা ইশারা করে সংখ্যা দেখিয়ে বলেছেন মাস হয়তো এত দিনে হবে অথবা এত দিনে।) বর্ণনাকারী বলেন, তো মাস হয় উনত্রিশ দিনে হবে অথবা ত্রিশ দিনে।"[৪২৫]

তবে এর অর্থ এটা নয় যে, ঘটনাক্রমে কেউ যদি বিমানে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখে তাহলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে মনে রাখতে হবে যে, বিমান ইত্যাদির সাহায্যে চাঁদ দেখার আবশ্যকীয়তা শরী'আতে নেই। এরপরও বিমান বা হেলিকপ্টার যোগে চাঁদ দেখার আয়োজন করলে বা বিমানের সফরে কেউ চাঁদ দেখতে পেলে তা গ্রহণযোগ্য হবে কি না? এ প্রশ্নের জবাব আল্লামা শামী রাহ. এর ভাষ্য থেকে বুঝা যায়, তা গ্রহণযোগ্য হবে। তিনি বলেন-

وقد يري الهلال من أعلي الأماكن ما لا يري من الأسفل، فلا يكون تفرده بالرؤية خلاف الظاهر بل علي موافقة الظاهر.

"কখনো চাঁদ নিচু স্থান থেকে দেখা না গেলেও উপর থেকে দেখা যায়, এমতাবস্থায় উঁচু জায়গা থেকে কারো চাঁদ দেখা বাস্তবতা পরিপন্থী নয়; বরং বাস্তবসম্মত।"[৪২৬]

দূরবীনের সাহায্যে চাঁদ দেখা: দূরবীন সাধারণত দূরের অস্পষ্ট জিনিস বা দৃষ্টি সীমার বাইরের বস্তু দেখতে সাহায্য করে। তবে এমন নয় যে, অস্তিত্বহীন কোনো জিনিসকে দূরবীন অস্তিত্বশীল করে দেয়। সুতরাং এর দৃষ্টান্ত পাওয়ারী চশমার মত। অতএব দূরবীন দ্বারা চাঁদ দেখা সরাসরি চোখে দেখা হিসেবে গণ্য হবে।[৪২৭]

রেডিও টেলিভিশনের সংবাদের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালন

রেডিও টিভিতে প্রচারিত সংবাদ শর'য়ী সাক্ষ্যের সমমানের নয়; বরং তা সাধারণ সংবাদের মতই। কেননা সাক্ষ্যের জন্য সাক্ষীর উপস্থিতি শর্ত, এখানে তা অনুপস্থিত। অথচ রমযান ব্যতীত অন্যান্য মাসের ক্ষেত্রে চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষীর প্রয়োজন হয়।[৪২৮] মূলত উক্ত কারণেই রেডিও টিভিতে চাঁদের সংবাদ প্রচারের হুকুম কিছুটা আলোচনা সাপেক্ষ। তাই বিষয়টি ভালোভাবে বোঝার জন্য আমরা রেডিও টিভির সংবাদকে দু'ভাগে ভাগ করতে পারি।

১. রেডিও টিভির সংবাদের ভিত্তিতে রেডিওস্থ শহর বা দেশে রোযা ও ঈদ পালন। যেমন

[৪২৫] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ১৭৮০
[৪২৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩৫৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪২৭] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/১০৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪২৮] দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩৫২, ৩৬১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ঢাকার টিভির সংবাদে ঢাকাবাসীর ঈদ পালন বা বাংলাদেশের টিভির সংবাদে বাংলাদেশীদের ঈদ পালন।

২. এক দেশের রেডিও টিভির সংবাদে (উদয়স্থল এক হওয়ায়) অন্য শহর বা দেশে রোযা ও ঈদ পালন। যেমন ঢাকার টিভির সংবাদে চট্টগ্রামে রোযা ও ঈদ পালন বা বাংলাদেশের টিভির সংবাদে পাকিস্তানে রোযা ও ঈদ পালন।

প্রথম আলোচনা: যদি বিচারক বা হেলাল কমিটি সাক্ষীদের থেকে শর'য়ী পদ্ধতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করে তা রেডিও টিভিতে প্রচার করে, তাহলে উক্ত শহর বা দেশের বাসিন্দাদের জন্য এর উপর ভিত্তি করে রোযা ও ঈদ পালন করা বৈধ হবে।

মুফ্তী শফী রাহ. বলেন, যদি কোনো শহরের বিচারক বা হেলাল কমিটি সাক্ষীগণের প্রতি আস্থাবান হয়ে রোযা বা ঈদের ঘোষণা দেয় এবং তা রেডিও টিভিতে প্রচার করা হয়, তাহলে ঐ খবর উক্ত শহর এবং তার সংলগ্ন এলাকার জন্য কার্যকর হবে। তবে শর্ত হলো, রেডিও বা টিভিতে চাঁদের বিষয়ে ভিত্তিহীন সংবাদ প্রচার করবে না; বরং বিচারক বা হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে দেয়া সংবাদ হুবহু তাদের বাক্যে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে প্রচার করবে। যে রেডিও বা টিভিতে এ ধরনের সতর্কতা থাকবে না তার সংবাদের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে না।[৪২৯]

মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. 'আহসানুল ফাতাওয়া'য় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন, যদি রেডিও টিভির সংবাদ কোনো গ্রহণযোগ্য আলেম অথবা মুফতী অথবা হেলাল কমিটির পক্ষ থেকে প্রচার করা হয়, তাহলে শুধুমাত্র তা উক্ত শহর ও দেশের জন্যই কার্যকর হবে, অন্যদের জন্য নয়। অন্যান্য ফাত্ওয়াগ্রন্থের অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে।[৪৩০]

দ্বিতীয় আলোচনা: যদি কোনো বিবেকবান ও দৃষ্টিসম্পন্ন সাবালক মুসলমান ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি স্বচক্ষে চাঁদ দেখে রেডিও বা টিভিতে ঘোষণা দেন যে, আমি নিজ চোখে চাঁদ দেখেছি, তাহলে আকাশ পরিষ্কার না থাকলে তার এ সংবাদ পার্শ্ববর্তী এমন দেশের জন্যও গ্রহণযোগ্য হবে যার চাঁদের উদয়স্থল অভিন্ন। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر.

"এক দেশের চাঁদ দেখার খবর বা শাহাদাত অন্য দেশের জন্য ঐ সময় গ্রহণযোগ্য হবে যখন উভয় দেশ এত নিকটবর্তী হয় যে, উভয় দেশের চাঁদের উদয়স্থল অভিন্ন। আর যদি দুই দেশের দূরত্ব এত বেশি হয় যে, উভয়ের উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন, তাহলে উভয় দেশের হুকুম এক হবে না।"[৪৩১]

---

[৪২৯] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৮৩, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪৩০] ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়া: ৪/১৩১-৩২, জামিয়াতুল উলূম হক্কানিয়া, পাকিস্তান; ইবাদুর রহমান: ৩/১৭২, দারুল ইফতা ওয়াত তাহকীক করাচী, পাকিস্তান; আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৩১] বাদায়েউস সানায়ে: ২/২২৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

কতটুকু দূরত্বে চাঁদের উদয়স্থল ভিন্ন হবে আর কতটুকু কাছে অভিন্ন হবে- এ ব্যাপারে আল্লামা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

ينبغي أن يعتبر اختلافها إن لزم التفاوت بين البلدين بأكثر من يوم واحد لأن النصوص مصرحة بكون الشهر تسعة وعشرين أو ثلاثين فلا تقبل الشهادة ولا يعمل بها فيما دون أقل العدد ولا أزيد من أكثره.

"চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে ঐ দুই দেশের মাঝে যেগুলোর চাঁদের উদয়ের ব্যবধান একদিন থেকেও বেশি হয়। কেননা মাস ২৯ বা ৩০ হওয়া সম্পর্কে সুস্পষ্ট শর'য়ী প্রমাণ রয়েছে। অতএব এমন দুই দেশের মাঝে এক দেশের শাহাদাত অন্য দেশের জন্য গ্রহণযোগ্য হবে না, যার ফলে মাস ২৯ দিনের চেয়ে কম বা ত্রিশের চেয়ে বেশি হয়ে যায়।"[৪৩২]

মুফতী শফী রাহ. উল্লিখিত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলেন-

حضرت عثمانی کی اس تحقیق سے اسکا بھی فیصلہ ہوگیا کہ بلاد قریبہ اور بعیدہ میں قرب اور بعد کا معیار کیا اور کتنی مسافت ہوگی وہ یہ کہ جن بلاد میں اتنا فاصلہ ہو کہ ایک جگہ کی رویت دوسری جگہ اعتبار کرنے کے نتیجے میں مہینہ کے دن اٹھائیس رہ جائیں یا اکتیس ہو جائیں وہاں اختلاف مطالع کا اعتبار کیا جائے گا اور جہاں اتنا فاصلہ نہ ہو وہاں نظر انداز کیا جائے گا۔

"হযরত মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. এর তাহকীকের দ্বারা এ সিদ্ধান্তও স্থির হয় যে নিকটবর্তী এবং দূরবর্তী শহরের ক্ষেত্রে নিকট ও দূরের মানদন্ড কী এবং কতটুকু দূরত্ব ধর্তব্য হবে? তার সমাধান হলো, যে দেশে অন্য দেশের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হলে মাস ২৮ বা ৩১ দিনে হয়ে যায় সেখানে উদয়স্থলের ভিন্নতা গ্রহণযোগ্য হবে। পক্ষান্তরে যেখানে অন্য দেশের চাঁদ দেখা গ্রহণযোগ্য হলে মাস ২৮ বা ৩১ দিনে না হয়ে বরং ২৯ বা ৩০ দিনে হয় সেখানে উদয়স্থল এক তথা অভিন্ন ধরা হবে।"[৪৩৩]

মোবাইল ফোন ও চিঠিপত্রের সংবাদে রোযা ও ঈদ পালন

শরী'আতের দৃষ্টিতে চিঠিপত্রের সংবাদ সাধারণ সংবাদের মান রাখে। তাই যদি নিদর্শন দ্বারা জানা যায় যে, এই চিঠি অমুক ন্যায়পরায়ণ বিশ্বস্ত ব্যক্তির লেখা, তাহলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে রমযানের রোযার ক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে।

মুফতী রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. বলেন, চাঁদের সংবাদ চিঠিপত্রের মাধ্যমে জানা যেতে পারে যখন চিঠির ব্যাপারে প্রাপকের প্রবল ধারণা হবে যে, এটা অমুক ব্যক্তির চিঠি। তাতে কোনো রদ-বদল হয়নি, তাহলে তার উপর আমল করা যেতে পারে।[৪৩৪]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানভী রাহ. বলেন, যে সকল বিষয় মুখে বলার দ্বারা গ্রহণ ও প্রমাণযোগ্য হয়, তা চিঠির মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হওয়ার শর্ত হলো চিঠি প্রেরকের পরিচয় ও

---

[৪৩২] ফাতহুল মুলহিম: ৫/১৯৮, মাকতাবায়ে দারুল কলম, দামেস্ক

[৪৩৩] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৮২, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৪৩৪] ফাতাওয়ায়ে রশীদিয়া: ৪৫৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

এটা তার পক্ষ থেকে হওয়ার বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া এবং খবর সত্য হওয়ার ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস থাকা। এক্ষেত্রে বিচারক ও সাধারণ মানুষ সকলে সমান।[৪৩৫]

চিঠির বিধানের উপর ভিত্তি করে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, মোবাইল ফোনের সংবাদদাতা ন্যায়পরায়ণ হলে এবং তার আওয়াজ শনাক্ত করা গেলে উক্ত সংবাদ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকাকালীন রমযানের রোযার জন্য গ্রহণযোগ্য হবে, ঈদের জন্য নয়।
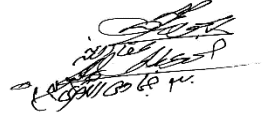
মুফতী রশীদ আহমদ লুধিয়ানভী রাহ. বলেন, রেডিও টেলিফোন ও চিঠিপত্রের সংবাদ এই শর্তে গ্রহণ করা হবে যে, তার লেখা ও আওয়াজ পরিপূর্ণভাবে শনাক্ত করা যাবে ও সংবাদদাতা মুসলমান আদেল হবে এবং নিজের চাঁদ দেখার সংবাদ স্পষ্ট ভাষায় দেবে, অস্পষ্টভাবে দেবে না। যেমন বলবে, আমি স্বচক্ষে চাঁদ দেখেছি।[৪৩৬]

উপসংহার: উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, শরী'আতের দৃষ্টিতে রোযা ও ঈদের চাঁদ দেখা এবং তার সংবাদ প্রচার-প্রসার করার জন্য শরী'আত কর্তৃক নির্দেশিত শর্তাবলী অনুসরণ করা আবশ্যক। তাই কোনো ক্ষেত্রে কোন শর্ত পাওয়া না গেলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে না এবং সে খবর প্রচার-প্রসার করা যাবে না। আর যদি উক্ত শর্তাবলী পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যায়, তাহলে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হবে, সে খবর প্রচার-প্রসার করাও বৈধ হবে এবং এ খবরের ভিত্তিতে রোযা ও ঈদ পালন করা যাবে।
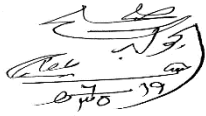
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৪৩৫] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/৯৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪৩৬] আহসানুল ফাতাওয়া: ৪/৪১২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

সারা বিশ্বে একই দিনে ঈদ

মাওলানা মুহাম্মদল্লাহ কুমিল্লা

ঈদ আনন্দ ও ইবাদতের সমষ্টি। মুমিনের আনন্দও ইবাদত হবে, যখন তা সুন্নাহ ও সাহাবার আমল অনুযায়ী হবে। তা হবে সব ধরনের বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়িমুক্ত। অনেক ভাই ঈদকে আনন্দের পরিবর্তে বিবাদে পরিণত করেন। এখন জনমনে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে, সারা বিশ্বে ঈদ একই দিনে হবে না প্রত্যেকের ঈদ তাদের চাঁদ দেখা হিসেবে হবে? বাস্তব সুন্নাহ কোনোটা? এ বিষয়ে পূর্বযুগ থেকেই গবেষণা ও লেখালেখি চলছে। বিজ্ঞজনদের[৪৩৭] আলোচনার সারসংক্ষেপ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে পেশ করা হলো।

এক উদয়স্থলে অবস্থানকারীর ঈদ

হযরত আনাস রাযি. এর পুত্র আবু ওমাইর আনসারী সাহাবীদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা বলেন-

غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صياما، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول الله ﷺ أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر رسول الله ﷺ أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد.[৪৩৮]

“একবার মেঘাচ্ছন্নতার কারণে শাওয়ালের চাঁদ দেখা গেলো না। তাই পরের দিন আমরা রোযা ছিলাম। দিবসের শেষভাগে একটি মুসাফির কাফেলা এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে সাক্ষ্য দিলো, তারা গতরাতে চাঁদ দেখেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ সেদিন সকলকে রোযা ভাঙ্গার এবং পরের দিন ঈদগাহে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন।”[৪৩৯]

এখানে হাদীসের অংশ فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس (রাসূলুল্লাহ ﷺ এর দরবারে সাক্ষ্য দিলো, তারা গতরাতে চাঁদ দেখেছে) থেকে বোঝা যায়, ঐ কাফেলা চাঁদ দেখার সময় মদীনা শরীফ থেকে বেশি দূরে ছিলো না। যদি তারা রাতেও সফররত থাকে, তবুও এক দেড় দিনের দূরত্ব অর্থাৎ ২৫-২৬ মাইলের বেশি দূরে ছিলো না। কেননা ঐ যামানায় যোগাযোগ ব্যবস্থা এত উন্নত ছিলো না যে এর চেয়ে বেশি পথ তারা অতিক্রম করতে পারে। সুতরাং এ হাদীস থেকে বোঝা গেলো, কাছাকাছি এলাকাসমূহে এক জায়াগায় চাঁদ দেখা প্রমাণিত হলে অন্য জায়গায় তা অবশ্য গ্রহণীয়। প্রত্যেক যুগে উম্মতের সম্মিলিত কর্মপন্থা এরূপই ছিলো।

---

৪৩৭ বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধ মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক সাহেব (দা.বা.) এর প্রবন্ধের আলোকে সাজানো হয়েছে।

৪৩৮ أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٢٠٥٨٤) بإسناد جيد رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي عمير بن أنس. رواه أبو داود في «سننه» (١١٥٠) والنسائي في «سننه» (١٧٥٦) والبيهقي في «سننه» ٦٤٩/٤ وحسن إسناده.

৪৩৯ মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২০৫৮৪; মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীস নং ৯৫৫৪; সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ১৬৫৩

ভিন্ন উদয়স্থলে অবস্থানকারীর ঈদ

এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চল দূরবর্তী হলে, এক অঞ্চলে চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে কার্যকর হবে না। এ ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে স্পষ্ট ভাষ্য রয়েছে। কুরাইব রাহ. থেকে বর্ণিত-

أن أم الفضل بنت الحارث بعثته إلى معاوية بالشام، قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ثم ذكر الهلال، فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. فقلت: أوَلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال: لا، هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

"উম্মুল ফযল বিনতে হারেস তার কোনো কাজে আমাকে শামে মু'আবিয়া রাযি. এর কাছে পাঠান। আমি শামে পৌঁছে তার কাজ পুরা করলাম। ইতোমধ্যে শামে রমযানের চাঁদ দেখা গেল। আমি সেখানে চাঁদ দেখেছিলাম শুক্রবার রাতে। তারপর মাসের শেষ দিকে মদীনায় ফিরে এলাম। তখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সাথে সাক্ষাত হলে তিনি চাঁদ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোনো দিন চাঁদ দেখেছিলে? আমি বললাম, শুক্রবার রাতে। তিনি বললেন, তুমি নিজে দেখেছ? আমি বললাম, হ্যাঁ, এবং সকলে দেখেছে। আর মু'আবিয়া রাযি.সহ সকলে রোযা রেখেছে। তখন তিনি বললেন, কিন্তু আমরা মদীনায় শনিবার রাতে চাঁদ দেখেছি। সুতরাং আমরা রোযাকে আমাদের হিসাব অনুযায়ী ত্রিশ দিন পূর্ণ করব অথবা নতুন চাঁদ দেখে রোযা ছাড়ব। আমি বললাম, হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখা ও রোযা রাখাও কি চাঁদ প্রমাণের জন্য আপনার নিকট যথেষ্ট মনে হয় না? তিনি বললেন- না। আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ এরূপই আদেশ করেছেন।"[৪৪০]

এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে, মদীনা শরীফ ও শামের মাঝখানে স্থলপথে দূরত্ব হলো ১৯২৮ কিলোমিটার। সুতরাং শাম মদীনা থেকে অনেক দূরবর্তী দেশ। এখন কথা হলো কুরাইব রাহ. একজন ছিকাহ (নির্ভরযোগ্য) তাবে'য়ী। তিনি যখন হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. কে তার নিজের চাঁদ দেখা ও মু'আবিয়া রাযি. এর চাঁদ দেখার খবর দিলেন, তখন ইবনে আব্বাস রাযি. তার এ সাক্ষ্য কবুল করলেন না। অথচ তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই সহীহ হাদীসও জানতেন, صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (তোমরা চাঁদ দেখে রোযা রাখ এবং চাঁদ দেখে রোযা ছাড়)। কারণ তিনি একথাও জানতেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর এই হাদীস নিকটবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য প্রযোজ্য। দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর জন্য প্রযোজ্য নয়। এই জন্য তিনি বলেছেন-

هكذا أمرنا رسول الله ﷺ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এরূপই হুকুম করেছেন।"

[৪৪০] সহীহ মুসলিম: ১/৩৪৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ; মুসনাদে আহমদ: ৫/১০, হাদীস নং ২৭৮৯, মুআস্‌সাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, লেবানন

উপরের আলোচনা থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে যে, কাছাকাছি এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলে কার্যকর হবে। দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর কোনো অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে তার হুকুম অন্য অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য নয়। অন্তত সাহাবা যুগ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ভিন্ন কোনো মত পাওয়া যায় না।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর সঙ্গে কুরাইব রাহ. এর ঘটনা ঘটেছিল আমীরুল মুমিনীন হযরত মু'আবিয়া রাযি. এর শাসনকালে। তখন ইসলামী সাম্রাজ্য বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু সমগ্র মুসলিম সাম্রাজ্যে এক দিনে রোযা রাখা ও ঈদ পালনের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যবস্থাপনা তো দূরের কথা, এ ব্যাপারে কোনো সাহাবা থেকে একটা বক্তব্যও হাদীস, সীরাতটি ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায় না। অথচ দ্বীন ও শরী'আত পালনে সাহাবায়ে কেরাম সামর্থ্যের সবটুকু বিলিয়ে দিতেন। সারা পৃথিবীতে এক দিনে রোযা রাখা ও এক দিনে ঈদ পালন যদি শরী'আতের কাম্য হত, তাহলে সাহাবায়ে কেরাম অন্তত তাদের সাধ্যের সবটুকু চেষ্টা ব্যয় করে সে ব্যবস্থা করতেন। অন্তত যতটুকু অঞ্চলে সম্ভব। অথচ এক অঞ্চলের চাঁদ দেখার খবর অন্য অঞ্চলে সরবরাহ করার কিংবা এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে চাঁদ দেখার জন্য প্রতিনিধি পাঠানোর মত রাষ্ট্রীয় কোনো ব্যবস্থার নযীর হাদীস, সীরাত বা ইতিহাসের কিতাবে পাওয়া যায় না।

সাহাবা যুগের পর তাবে'য়ী যুগের অবস্থা এমনই ছিলো। তাঁরা ইখতেলাফে মাতালে (اختلاف المطالع : উদয়স্থলের বিভিন্নতা) বিবেচনা করে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অপর অঞ্চলের জন্য কার্যকর মনে করতেন না। অকাট্যভাবে এর বিপরীত কোনো মত পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে তাবে'য়ীদের মাযহাব নকল করে ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহ. বলেন-

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لكل قوم رؤيتهم. وبه قال عكرمة، والقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله، وإليه ذهب ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وطائفة.

"হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য হবে। এটি ইকরিমা, কাসেম ইবনে মুহাম্মদ ও সালেম ইবনে আব্দুল্লাহরাহ. এর বক্তব্য। আর ইবনুল মুবারক, ইসহাক ইবনে রাহুয়াহসহ একটি জামা'আতের মতও এটি।"[৪৪১]

ইমাম তিরমিযী রাহ. তার জামে গ্রন্থে আহকামের হাদীস উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সাহাবা, তাবে'ঈনের মাযহাবের সাথে সাথে চার ইমাম, সুফিয়ান সাওরী ও ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ প্রমুখ ইমামদের মাযহাব বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। তিনি তার জামে গ্রন্থে ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসটি باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। হাদীসটি বর্ণনা শেষে তিনি বলেছেন-

حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن لكل أهل بلد رؤيتهم.

[৪৪১] আল ইসতিযকার: ৩/২৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

"ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীসটি হাসান, সহীহ, গারীব। আর এর উপরই আহলে ইলমের আমল চলে আসছে যে, প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য তাদের নিজেদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য।"[৪৪২] এ থেকে বোঝা যাচ্ছে 'ইখতেলাফে মাতালে' (اختلاف المطالع: উদয়স্থলের বিভিন্নতা) বিবেচনা করা হবে, এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রাহ. এর মতে সাহাবা, তাবেঈন ও চার মাযহাবের ইমামদের মাঝে কোনো ইখতিলাফ নেই।

হানাফী ইমামগণের মন্তব্য

হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ইমামদের মতও এটাই ছিলো যে, দূরবর্তী অঞ্চলের এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য নয়। তবে এক অঞ্চল যদি অন্য অঞ্চলের এত কাছাকাছি হয় যে, উভয়ের উদয়স্থল (مطلع) এক, তাহলে এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অপর অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য হবে।

এ ব্যাপারে হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কয়েকজন ইমামের বক্তব্য নিম্নে পেশ করা হলো।

১. ইমাম আবুল হুসাইন আল কুদূরী রাহ. বলেন-

إذا كان بين البلدتين تفاوت لا يختلف المطالع لزم حكم أهل إحدى البلدتين البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت يختلف المطالع لم يلزم حكم إحدى البلدتين البلدة الأخرى.

"যদি দুই দেশের মাঝে দূরত্ব এতটুকু থাকে যে, উভয়ের উদয়স্থল (مطلع) অভিন্ন, তাহলে এক অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অপর অঞ্চলের চাঁদের হুকুম অপরিহার্যভাবে প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি উভয় দেশের মাঝের দূরত্ব এত বেশি হয় যে, উভয়ের উদয়স্থল ভিন্ন, তাহলে এক অঞ্চলের চাঁদের হুকুম অপর অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য নয়।"[৪৪৩]

২. ফকীহ আব্দুর রশীদ আল ওয়ালওয়ালিযী রাহ. বলেন-

ولو أن أهل بلدة صاموا للرؤية ثلاثين يوما، وأهل بلدة صاموا تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلم من صام تسعا وعشرين لذلك، فعليهم قضاء يوم؛ لأن الذين صاموا ثلاثين يوما رأوا هلال رمضان قبل ليلة، وهذا إذا كان بين البلدتين تفاوت بحيث لا تختلف المطالع، فإن كانت تختلف لا يلزم أحد اللبدين حكم الآخر.

"কোন অঞ্চলের অধিবাসীরা যদি রমযানের চাঁদ দেখে ত্রিশ রোযা রাখে, আর আরেক অঞ্চলের অধিবাসীরা রমযানের চাঁদ দেখে উনত্রিশ রোযা রাখে, এরপর যারা উনত্রিশ রোযা রেখেছে তারা ত্রিশ রোযা পালনকারীদের সম্পর্কে জানতে পারে, তাহলে তাদের উপর একটি রোযা কাযা করা ওয়াজিব। কেননা যারা ত্রিশ রোযা রেখেছে তারা রমযানের চাঁদ এক দিন আগে দেখেছে। এই বিধান তখন প্রযোজ্য, যখন উভয় অঞ্চলের মাঝে দূরত্ব এতটুকু হয় যে, উভয়ের উদয়াচল এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে যদি উভয়ের উদয়াচল ভিন্ন ভিন্ন হয়,

[৪৪২] জামে তিরমিযী: ১/১৪৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৪৪৩] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩/৩৬৫ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; তাহকীক- শাবক্কীর আহমদ কাসেমী

তাহলে এক অঞ্চলের চাঁদের হুকুম অপর অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্য অপরিহার্য নয়।"[৪৪৪]

৩. ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

هذا إذا كانت المسافة بين البلدين قريبة لا تختلف فيها المطالع، فأما إذا كانت بعيدة، فلا يلزم أحد البلدين حكم الآخر، لأن مطالع البلاد عند المسافة الفاحشة تختلف، فيعتبر في أهل كل بلد مطالع بلدهم دون البلد الآخر .

"এই বিধান (এক অঞ্চলের চাঁদ দেখা অন্য অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য হবে) তখনই যখন উভয় অঞ্চল এমন কাছাকাছি হবে যে, উভয়ের উদয়াচল এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে এক অঞ্চল অপর অঞ্চল থেকে যদি দূরে হয়, তাহলে এক অঞ্চলের চাঁদের বিধান অপর অঞ্চলের জন্য অপরিহার্য নয়। কেননা অনেক দূরত্ব হলে এক অঞ্চলের উদয়াচল অপর অঞ্চল থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক অঞ্চলের ক্ষেত্রে সে অঞ্চলের উদয়াচল বিবেচনা করা হবে (অর্থাৎ সে অঞ্চলে চাঁদ দেখা গেলে রোযা বা ঈদের বিধান সাব্যস্ত হবে, অন্যথায় নয়)।"[৪৪৫]

৪. জহিরুদ্দীন আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ আল বুখারী রাহ. এর বক্তব্য-

وسئل الأوزجندي عمن قال لصاحب الدين: إن لم أقض حقك يوم العيد فكذا، فجاء يوم العيد إلا أن قاضي هذه البلدة لم يجعله عيدا ، ولم يصل فيه صلاة العيد لدليل لاح عنده، وقاضي بلدة أخرى جعله عيدا. قال: إذا حكم قاضي بلدة بكونه عيدا يلزم ذلك أهل بلدة أخرى إذا لم تختلف المطالع كما في الحكم بالرمضانية... اه ما في الظهيرية.

"যহীরিয়্যাহর লেখক জহিরুদ্দীন আল বুখারী রাহ. বলেন, উযাজান্দীকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেউ তার ঋণদাতাকে বললো, ঈদের দিন তোমার ঋণ আদায় না করলে এই হবে (কোনো কসম করলো)। এখন এমন হলো যে, ঈদের দিন হলো; কিন্তু সে যে শহরের অধিবাসী সেখানকার কাযী স্পষ্ট কোনো দলীলের ভিত্তিতে সে দিন ঈদ না করার সিদ্ধান্ত দিলো এবং ঈদের নামায পড়লো না। পক্ষান্তরে অন্য কোনো শহরের কাযী সে দিন ঈদের দিন ধার্য করলো। (তাহলে কোনো দিন ঈদের দিন গণ্য হবে এবং এ লোকের কসমের কী হবে?) উযাজান্দী রাহ. উত্তরে বললেন, দুই শহরের উদয়স্থল যদি অভিন্ন হয়, তাহলে এক শহরের কাযীর ঘোষণা অন্য শহরের জন্যও অবশ্য অনুসরণীয় হবে। রমযান শুরুর ঘোষণার ক্ষেত্রেও এ মাসআলা।"[৪৪৬]

৫. ইমাম ফখরুদ্দীন যাইলা'য়ী রাহ. বলেন-

والأشبه أن يعتبر، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم وانفصال الهلال عن شعاع الشمس يختلف باختلاف الأقطار كما أن دخول الوقت وخروجه يختلف باختلاف الأقطار حتى إذا زالت الشمس في المشرق لا

---

[৪৪৪] আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিযিয়্যাহ: ১/২৩৬, মাকতাবা দারুল ঈমান, সাহারানপুর
[৪৪৫] বাদায়েউস সানায়ে: ২/২২৪-২২৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪৪৬] আল বাহরুর রায়েক: ৪/৬১৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

يلزم منه أن تزول في المغرب، وكذا طلوع الفجر وغروب الشمس، بل كلما تحركت الشمس درجة فتلك طلوع فجر لقوم وطلوع شمس لآخرين وغروب لبعض ونصف ليل لغيرهم.

"সবচেয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ মত হলো, চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা শরী'আতে গ্রহণযোগ্য হবে। কেননা প্রত্যেক সম্প্রদায় কোনো হুকুম পালনে ঐ সময় আদিষ্ট হবে যখন ঐ হুকুমের 'সাবাব' বা কারণ তাদের মধ্যে পাওয়া যাবে (অর্থাৎ অন্যের মাঝে পাওয়া গেলে সে হুকুম তাদের জন্য অপরিহার্য নয়)। সূর্যের কিরণ থেকে চাঁদের পৃথক হওয়ার ক্ষেত্রে অঞ্চল ভেদে ব্যবধান হয়। যেমনিভাবে নামাযের ওয়াক্তসমূহ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে হয়। সুতরাং মাশরিকে (পূর্বাঞ্চলে) যখন সূর্য ঢলে পড়ে, তখন মাগরিবে (পশ্চিমাঞ্চলে) সূর্য ঢলে পড়া অপরিহার্য হয়ে যায় না। এমনিভাবে সূর্য উদয় ও সূর্য অস্তের সময়টাও এমনই। বরং সূর্য যখন এক ডিগ্রি নড়ে, তখন হয়তো কোথাও ফজরের ওয়াক্ত, ঠিক ঐ সময়ে অন্য জায়গায় সূর্য উদয়ের ওয়াক্ত, কোথাও সূর্যাস্তের সময়। আবার কোথাও অর্ধরাত্রি।"[৪৪৭]

অনেকেই এ কথা বলে থাকেন যে, 'ইখতেলাফে মাতালে' এর ই'তেবার (বিবেচনা) হানাফী মাযহাবে শুধুমাত্র আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. ও ফখরুদ্দীন যাইলা'য়ী রাহ.-ই করেছেন। আর পরবর্তী কেউ কেউ তাঁদের অনুসরণে এ কথা বলেছেন।

আমাদের পূর্বের আলোচনায় তাদের এ কথার দুর্বলতা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ কাসানী রাহ. ও যাইলা'য়ী রাহ. এর আগেও অনেক ইমাম ও ফকীহ এ কথা বলে গেছেন। তাঁদের মাত্র কয়েকজনের উদ্ধৃতি আমরা পেশ করেছি। এছাড়া এটাই যে ছিলো সাহাবা, তাবেঈন ও পরবর্তীদের আমল, তাও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

উপমহাদেশের হানাফী আলেমদের মন্তব্য

এবার আমরা এ ব্যাপারে উপমহাদেশের হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কয়েকজন ফকীহর বক্তব্য পেশ করবো।

১. শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী রাহ. (১১৭৬হি.) বলেন, 'যদি কোনো শহর থেকে চাঁদ দেখা যায় আর অন্য শহরে অনুসন্ধান করেও চাঁদ দেখা না যায়, আর দুই শহর কাছাকাছি হয়, তাহলে এক শহরের চাঁদ দেখা অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। আর যদি এক শহর অপর শহর থেকে দূরে হয়, তাহলে এক শহরের চাঁদ দেখা অপর শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে না। এই মাসআলা সাব্যস্ত হয় হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর হাদীস দ্বারা। তাছাড়া ঈদুল ফিতর, হজ্ব ইত্যাদি যে সকল মাসআলা হাদীসে স্পষ্ট উল্লেখ আছে সেগুলোর উপর কিয়াসের দাবিও এটাই।'[৪৪৮]

২. আনোয়ার শাহ্ কাশ্মীরী রাহ. (১৩৫২হি.) বলেন-

"এক্ষেত্রে ইমাম যায়লায়ী রাহ. এর মত মেনে নেয়া ব্যতীত কোনো উপায় নেই। অন্যথায় কোনো কোনো অঞ্চলে ঈদ কখনো রমযানের ২৭/২৮ বা ৩১/৩২ তারিখে হয়ে যাবে, যখন

---

[৪৪৭] তাবঈনুল হাকায়েক: ২/১৬৫ এইচ. এম. সাঈদ, পাকিস্তান

[৪৪৮] আল মুসাফফা শরহুল মুআত্তা: ১/২৩৭

দুই দেশের দূরত্ব হবে অনেক বেশি। যেমন হিন্দুস্তান ও ইস্তাম্বুল। কারণ কখনো ইস্তাম্বুলে দুই দিন আগেই চাঁদ দেখা যাবে। অতঃপর হিন্দুস্তানে যখন ইস্তাম্বুলে চাঁদ দেখার দুই দিন পরে চাঁদ দেখা যাবে, এরপর তাদের চাঁদ দেখার খবর আমাদের কাছে পৌঁছবে, এখন যদি তাদের দেশের চাঁদ আমাদের উপর অপরিহার্য করে দেয়া হয়, তাহলে আমাদের ঈদ আগে করতে হবে।

আমি যায়লায়ী রাহ. এর মতকেই অকাট্যভাবে গ্রহণ করেছি।[৪৪৯]

৩. শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৬৯হি.) এর বক্তব্য-

তিনি সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'ফাতহুল মুলহিমে' এ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের দালীলিক আলোচনার পর মজবুত যৌক্তিক আলোচনাও পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কুরআন-হাদীসের অকাট্য ভাষ্য ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মতিতে এ কথা অকাট্যভাবে প্রমানিত যে, হিজরী সনের মাস সর্বনিম্ন ২৯ দিনের ও সর্বোচ্চ ৩০ দিনের হয়। আর 'ইখতেলাফে মাতালে' এর বিবেচনা না করলে এই অকাট্য বিধান লঙ্ঘন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে।'[৪৫০]

৪. মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬হি.) এর বক্তব্য-

তিনি চাঁদ দেখা সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র কিতাব রচনা করেছেন। তাতে তিনি আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রাহ. ও শাব্বীর আহমাদ উসমানী রাহ. এর মত আলোচনার পর বলেন, যদি কয়েকটি দেশের মধ্যে দূরত্ব এত বেশি হয় যে, এক দেশের তারিখ আরেক দেশের থেকে ভিন্ন হয়, তখন 'ইখতেলাফে মাতালে' এর ই'তেবার করাই আবশ্যক। আর এটাই হানাফী মাযহাবের মূল ধারার সাথে সামঞ্জস্যশীল। আমার উস্তাযদের অনুসরণে এটাই আমার মত।[৪৫১]

৫. সাইয়েদ মুহাম্মদ ইউসুফ বানূরী রাহ. (১৩৯৭হি.) এর মত-

তিনি জামে তিরমিযীর ব্যাখ্যাগ্রন্থ মা'আরিফুস সুনানে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এবং 'ইখতেলাফে মাতালে' এর বিবেচনা করার মতটিকে সুদৃঢ়ভাবে সাব্যস্ত করেছেন।[৪৫২]

জাহিরুর রেওয়ায়েত: একটি পর্যালোচনা

যারা একই দিনে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে রোযা ও ঈদ পালনের অপরিহার্যতার কথা বলেন তাদের দলীল হলো অসাড় কিছু যুক্তিমাত্র। আর হানাফী মাযহাবের একটা 'কওল' যা জাহেরী রেওয়ায়েত হিসেবে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে এটাকেই তারা সবচেয়ে শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছেন। তাই এখন আমরা প্রথমে এই 'কওল'টি সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু কথা আরজ করবো। জাহিরুর রেওয়ায়েত হিসেবে প্রসিদ্ধ উক্তিটি হলো-

---

[৪৪৯] মা'আরিফুস সুনান: ৫/৩৩৭, এইচ. এম সাঈদ, পাকিস্তান; আল আরফুশ শাযী: ১৪৯, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ
[৪৫০] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৮১-৪৮২, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[৪৫১] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৩/৪৮৩, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[৪৫২] মা'আরিফুস সুনান: ৫/৩৩৭-৩৪০; ৩৫১-৩৫৪, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

لا عبرة لاختلاف المطالع... لو رأى أهل مغرب هلال رمضان، يجب الصوم على أهل مشرق.

"উদয়স্থলের বিভিন্নতা ধর্তব্য নয়, এবং পশ্চিমের চাঁদ পূর্বের জন্যও অবশ্য গ্রহণীয়।"[৪৫৩] এই উক্তিটি সম্পর্কে মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুল মালেক দা.বা. এর তাহকীকের অংশবিশেষ এখানে তুলে ধরা হলো।

১. অনুসন্ধানে যদ্দূর জানা গেছে, এই মূলনীতিধর্মী বাক্যটা হানাফী মাযহাবের জাহিরুর রেওয়ায়াই ও নাদিরুর রেওয়ায়াই কোথাও নেই এবং তা মাযহাবের প্রথম তিন ইমামের কারো থেকেই বর্ণিত নয়। এ কথা সর্বপ্রথম (আল্লাহই ভাল জানেন) আল্লামা তাহের ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুর রশীদ আলবুখারী রাহ. এর কিতাব 'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' থেকে শুরু হয়েছে। ওখান থেকে আল্লামা হাসান বিন মানসূর কাযীখান রাহ.[৪৫৪] তাঁর 'ফাতাওয়া'য় নিয়েছেন (যা খানিয়া নামে প্রসিদ্ধ)। এরপর এ দু'জনের উপর নির্ভর করে পরের অনেক মুসান্নিফ এ কথা লিখেছেন। কেউ তাদের বরাত দিয়েছেন, কেউ দেননি। এভাবেই কথাটি মশহুর হয়ে গেছে। উপরের কিতাবসমূহ খুলে এবং সরাসরি 'জাহিরুর রেওয়ায়াহ'র ছয় কিতাব দেখে বরাত পরীক্ষা করার সুযোগ হয়নি বা তার প্রয়োজন বোধ করেননি। মোটকথা, এ এক 'তাসামূহ' (ভ্রম)। প্রকৃত অবস্থা জানার পর একে বুনিয়াদ বানানো মুনাসিব নয়।

'খুলাসাতুল ফাতাওয়া'র আরবী পাঠ এই-

ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وعليه فتوى الفقيه أبي الليث، وبه كان يفتي شمس الأئمة الحلواني، قال: لو رأى أهل المغرب هلال رمضان يجب الصوم على أهل المشرق، وفي التجريد: اعتبر اختلاف المطالع.

"কোন শহরের অধিবাসীগণ যদি চাঁদ দেখে ত্রিশদিন রোযা রাখে আর অপর শহরের অধিবাসীগণ চাঁদ দেখে উনত্রিশ দিন রোযা রাখে, তাহলে তাদেরকে একটি রোযা কাযা করতে হবে, আর চাঁদের উদয়স্থলের ভিন্নতা ধর্তব্য নয়, জাহিরুর রেওয়ায়াহ অনুসারে। এর উপরই ফকীহ আবুল লাইছের ফাতওয়া। আর এই ফাতওয়াই দিতেন শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ.। তিনি বলেন, পশ্চিমের অধিবাসীগণ যদি রমযানের চাঁদ দেখে, তাহলে পূর্বের অধিবাসীদের উপর রোযা ওয়াজিব হয়। আর তাজরীদে আছে, উদয়স্থলের বিভিন্নতা

[৪৫৩] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/২৬১, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

[৪৫৪] হাসান ইবনে মানসূর ইবনে মাহমূদ ইবনে আব্দুল আযীয ফখরুদ্দীন কাযীখান রাহ.। জহীরুদ্দীন হাসান ইবনে আলী আল মারগীনানী ও মাহমুদ ইবনে আব্দুল আযীয উযাজান্দী রাহ. প্রমুখ তাঁর উস্তায ছিলেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে জামালুদ্দীন আবুল মাহামিদ মাহমুদ হাসীরী ও শামসুল আইম্মা মুহাম্মদ কারদারী রাহ. অন্যতম। তিনি হেদায়ার লেখক মারগীনানী রাহ. এর সমবয়সী ছিলেন। তার বিখ্যাত রচনাবলীর মধ্যে শরহুয যিয়াদাত, শরহু জামিয়িস সগীর ও শরহু আদাবিল কাযা লিল খস্‌সাফ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৫৯২ হিজরীর ১৫ই রমযান সোমবার রাতে ইন্তেকাল করেন। قال قاسم بن قطلوبغا: ما يصححه قاضيخان مقدم على تصحيح غيره لأنه فقيه النفس। -হাদিয়াতুল আরেফীন: ১/২৮০; আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা: ৬৪-৬৫

ধর্তব্য হবে।"[৪৫৫]

আর খানিয়ায় এভাবে লেখা হয়েছে-

ولو صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وأهل بلدة أخرى تسعة وعشرين يوما للرؤية، فعلم من صام تسعة وعشرين يوما فعليهم قضاء يوم، ولا عبرة لاختلاف المطالع في ظاهر الرواية، وكذا ذكر شمس الأئمة الحلواني رحمه الله تعالى.

২. এখন দেখার বিষয় এই যে, হানাফী ইমামদের থেকে বর্ণিত মাসআলাটি কী, যা থেকে পরবর্তীরা এই মাসআলা বের করেছেন যে, উদয়স্থলের ভিন্নতার কোনো ই'তিবার নেই। তো ঐ মাসআলা সেটিই যা খানিয়া ও খুলাসা উভয় কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

মাসআলাটি হাকিম শহীদ রাহ. এর 'আলমুনতাকা' এর বরাতে 'আলমুহীতুল বুরহানী'তে বর্ণিত হয়েছে। 'আলমুনতাকা'র বিষয়বস্তু হচ্ছে 'জাহিরুর রেওয়ায়াহ'র বাইরের মাসাইল, যা তিনি নাওয়াদির ও আমালী থেকে জমা করেছেন।

আর 'জাহিরুর রেওয়ায়াহ'র মাসাইল তিনি সংকলন করেছেন 'আলমুখতাসারুল কাফী'তে। আলমুহীতুল বুরহানীর ইবারত এই-

أهل بلدة إذا رأوا الهلال هل يلزم ذلك في حق أهل بلدة أخرى؟ اختلف المشايخ فيه، بعضهم قالوا: لا يلزم ذلك به، وإنما المعتبر في حق كل بلدة رؤيتهم، وبنحوه ورد الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وفي المنتقى: بشر عن أبي يوسف، وإبراهيم عن محمد: إذا صام أهل بلدة ثلاثين يوما للرؤية، وصام أهل بلدة تسعة وعشرين للرؤية فعليهم قضاء يوم.

وفي القدوري: إذا كان بين البلدتين تفاوت لا تختلف المطالع، لزم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى، فأما إذا كان تفاوت تختلف المطالع فيه لم يلزم حكم إحدى البلدتين حكم البلدة الأخرى.

وذكر شمس الأئمة الحلواني: أن الصحيح من مذهب أصحابنا رحمهم الله: أن الخبر إذا استفاض وتحقق فيما بين أهل البلدة الأخرى يلزمهم حكم أهل هذه البلدة.

"কোন শহরের অধিবাসীরা চাঁদ দেখলো, এ দেখা কি অন্য শহরের অধিবাসীদের জন্যও অবশ্য অনুসরণীয়? এ বিষয়ে মাশাইখের ইখতিলাফ আছে। কেউ বলেন, অবশ্য অনুসরণীয় নয়। প্রত্যেক শহরের অধিবাসীদের জন্য শুধু তাদের চাঁদ দেখাই ধর্তব্য। এ অর্থে আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. এর সূত্রে 'আছার' বর্ণিত হয়েছে। আলমুনতাকায় আছে, বিশর আবু ইউসুফ রাহ. থেকে এবং ইবরাহীম মুহাম্মদ রাহ. থেকে বর্ণনা করেছেন, যখন কোনো শহরের অধিবাসী চাঁদ দেখে ত্রিশটি রোযা রাখে আর অন্য শহরের লোকেরা চাঁদ দেখে উনত্রিশটি রোযা রাখে তাহলে এদের এক দিনের রোযা কাযা করা জরুরী।

কুদুরীতে আছে: যখন দুই শহরের মাঝে দূরত্ব এ পরিমাণ না হয়, যদ্বারা তাদের উদয়স্থল

---

[৪৫৫] খুলাসাতুল ফাতাওয়া: ১/২৪৯

আলাদা হয়ে যায় তখন এক শহরের বিধান অন্য শহরের জন্য প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে দূরত্ব যদি এমন হয় যে, দুই শহরের উদয়স্থল আলাদা হয়ে যায় তাহলে একের বিধান অন্যের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

শামসুল আইম্মা হালওয়ানী রাহ. উল্লেখ করেছেন, আমাদের আসহাবের (ফকীহগণের) মাযহাবে সঠিক কথা এই যে, (এক শহরের সংবাদ) যদি 'মুস্তাফিজ' (চার দিক থেকে ব্যাপকভাবে আসা খবর) হয়ে যায় এবং অন্য শহরের অধিবাসীদের কাছে তা প্রমাণিত হয়, তখন তাদের জন্য ঐ শহরের বিধান প্রযোজ্য হবে।"[৪৫৬]
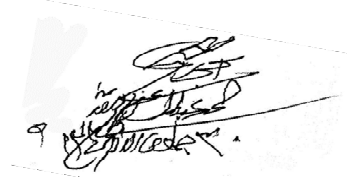
উপরের ইবারতে কিন্তু لا عبرة لاختلاف المطالع এ বাক্যটি জাহিরুর রেওয়ায়াই বা নাদিরুর রেওয়ায়াইর বরাতে উল্লিখিত হয়নি। বরং শুধু 'মুনতাকা' এর বরাতে আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ রাহ. থেকে একটি মাসআলা (উনত্রিশ রোযা আদায়কারীদের এক রোযা কাযা করার বিধান) বর্ণিত হয়েছে মাত্র। আর আমরা আগেই বলেছি, 'মুনতাকা' কিতাবের বিষয়বস্তু হচ্ছে 'জাহিরুর রেওয়ায়াহ'র বাইরের মাসাইল, যা তিনি নাওয়াদির ও আমালী থেকে জমা করেছেন।

৩. আর এ মাসআলাকে হানাফী মাযহাবের অধিকাংশ বড় বড় ফকীহ শুধু কাছাকাছি অঞ্চল সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেন। দূর দূরান্তের শহর-নগরের ক্ষেত্রে তারা এ মাসআলা প্রযোজ্য মনে করেন না। এ বিষয়ের অনেক উদ্ধৃতি পূর্বে বর্ণিত হয়েছে।[৪৫৭]
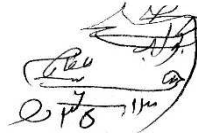
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৪৫৬] আল মুহীতুল বুরহানী: ৩/৩৪১-৩৪২, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান
[৪৫৭] মাসিক আল-কাউসার: সংখ্যা- সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর ২০১৩ ঈ.

রোযা অবস্থায় ইনজেকশন, ইনহেলার, এন্ডোসকপি ও রক্ত দেয়া-নেয়া

মাওলানা মুহিব্বুল্লাহ মোমেনশাহী

সুচিকিৎসার প্রয়োজনে অনেক সময় রোযা অবস্থায়ও এমন চিকিৎসা গ্রহণ করতে হয়, যাতে রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার সন্দেহ হয়। যেমন- রক্ত দেয়া-নেয়া, ইনজেকশন গ্রহণ করা, এন্ডোসকপি করা, হাপানী রোগীদের ইনহেলার ব্যবহার করা ইত্যাদি।

উপরোল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতিগুলোর অনেকটা যেহেতু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুফল তাই পূর্ববর্তী ফকীহগণের কিতাবগুলোতে এ ধরনের মাসআলার সুস্পষ্ট সমাধান পাওয়া না গেলেও পরবর্তী যুগের ফকীহগণ কুরআন-হাদীস ও ফিকহের মৌলিক নীতিমালার আলোকে এ ধরনের মাসআলার শর'য়ী সমাধান পেশ করেছেন। বক্ষমান প্রবন্ধে আমরা রোযাবস্থায় উল্লিখিত চিকিৎসা পদ্ধতির শর'য়ী হুকুম আহকাম তুলে ধরার প্রয়াস চালাবো ইনশাআল্লাহ।

মূল আলোচনার পূর্বে রোযার সংজ্ঞা ও রোযা ভঙ্গের মূলনীতি জেনে নিলে মূল আলোচনা বুঝতে সহজ হবে ইনশাআল্লাহ।

রোযার সংজ্ঞা

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. রোযার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন-

والصوم في الشريعة: عبارة عن إمساك مخصوص، وهو الكف عن قضاء الشهوتين: شهوة البطن وشهوة الفرج من شخص مخصوص. وهو أن يكون مسلما طاهرا من الحيض والنفاس في وقت مخصوص. وهو ما بعد طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس بصفة مخصوصة. وهو أن يكون على قصد التقرب.

"রোযার নিয়তে মুসলিম ব্যক্তি ও হায়েয-নেফাসমুক্ত মহিলার সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত পানাহার ও সহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়।"[৪৫৮]

সংজ্ঞার সারসংক্ষেপ হলো সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডোবা পর্যন্ত তিনটি কাজ থেকে বিরত থাকা। ১. আহার করা। ২. পান করা। ৩. স্ত্রী সহবাস করা।

সংজ্ঞার প্রতিটি বিষয় কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ ... وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ

"রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে ... আর পানাহার কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত।"[৪৫৯]

---

[৪৫৮] মাবসূতে সারাখসী: ৩/৫৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৫৯] সূরা বাকারা: ১৮৭

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآئِكُمْ : আয়াতের এ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, রোযার রজনীতে সুবহে সাদিক পর্যন্ত স্ত্রী সহবাস বৈধ, দিনে বৈধ নয়।

وَكُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ : এ অংশেও সুবহে সাদিক পর্যন্ত পানাহার বৈধ। আর সুবহে সাদিকের পর অবৈধ হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

ثُمَّ أَتِمُّوا۟ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ : এ অংশে রোযার সময়সীমা উল্লেখ করে রাত্র পর্যন্ত রোযা পূর্ণ করার হুকুম দেয়া হয়েছে।

রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার মূলনীতি

রোযার উল্লিখিত পরিচয়ে যে বিষয়গুলোর আলোচনা হয়েছে, তা যথাযথ পালন করলে রোযা সহীহ হবে। আর কোনো একটি লঙ্ঘিত হলে রোযা ভেঙ্গে যাবে, যা একটি মূলনীতির আলোকে আলোচনা করা হলো। মূলনীতিটি হলো, **বাহির থেকে কোনো কিছু শরীরে প্রবেশ করে পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে স্থির হওয়া।**

মূলনীতিটির ব্যাখ্যা সহজবোধ্য হওয়ার জন্য পেট ও মস্তিষ্কের মধ্যকার যোগসূত্র জানা দরকার।

পাকস্থলী ও মস্তিষ্কের সম্পর্ক

উল্লিখিত মূলনীতিতে পেটে খাদ্য পৌঁছার আলোচনায় মস্তিষ্কের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ মানুষের মস্তিষ্ক ও পাকস্থলীর মাঝে যোগসূত্র রয়েছে। যা দ্বারা মস্তিষ্কের কোনো তরল জিনিস সহজেই পাকস্থলীতে পৌঁছে যায়। আর কোনো কিছু পাকস্থলীতে পৌঁছা পানাহারের আওতায় পড়ে, যা রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার অন্যতম কারণ। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

كذا إذا وصل إلى الدماغ، لأن له منفذا إلى الجوف، فكان بمنزلة زاوية من زوايا الجوف.

"এমনিভাবে (রোযা ভেঙ্গে যাবে) যদি মস্তিষ্কে পৌঁছে যায়। কেননা, মস্তিষ্ক থেকে পেট পর্যন্ত একটি রাস্তা রয়েছে। সুতরাং তা পেটের একটি অংশ।"[৪৬০]

যেহেতু মস্তিষ্ক পেটের অংশবিশেষ তাই মস্তিষ্কে কোনো কিছু পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

উপরোল্লিখিত মূলনীতিটির ব্যাখ্যায় কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়। যথা:

১. পেট বা মস্তিষ্কে রাস্তা দিয়ে প্রবেশ করা।

২. পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে স্থির হওয়া।

পেট বা মস্তিষ্কে কোনো কিছু প্রবেশ করার পথ তিনটি। ক. প্রাকৃতিক পথ। খ. কৃত্রিম পথ।

[৪৬০] বাদায়েউস সানায়ে: ২/২৪৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৮৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/২৭৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

গ. লোমকূপ।

ক. প্রাকৃতিক পথ। যেমন নাক, কান, গলা, পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু প্রবেশ করে পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছলে, রোযা ভেঙ্গে যায়। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

وما وصـل إلى الجوف أو إلى الدماغ من المخارق الأصـلية، كالأنف والأذن والدبر ... فوصـل إلى الجوف أو إلى الدماغ فسد صومه.

"পেট বা মস্তিষ্কে প্রাকৃতিক পথ যেমন, নাক, কান বা পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু পৌঁছলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।"[৪৬১]

খ. কৃত্রিম পথ। যেমন, الجائفة (পেটের জখম) এবং الآمة (মস্তিষ্কের জখম)।

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

الجائفة اسم لجراحة وصلت إلى الجوف، والآمة اسم لجراحة وصلت إلى الدماغ.

"جائفة হলো এমন জখম যা পেট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এবং آمة হলো এমন জখম যা মস্তিষ্ক পর্যন্ত পৌঁছে গেছে।"[৪৬২]

কৃত্রিম পথে অর্থাৎ পেট বা মস্তিষ্কের জখম দিয়ে কোনো কিছু পেট বা মস্তিষ্কের ভেতর পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর পেট বা মস্তিষ্কের ভেতর না পৌঁছলে রোযা ভাঙ্গবে না।

ইমাম শামসুদ্দীন আসারাখসী রাহ. বলেন-

وأكثر مشائخنا أن العبرة بالوصول حتى إذا علم أن الدواء اليابس وصل إلى جوفه، فسد صومه. وإن علم أن الرطب لم يصل إلى جوفه، لا يفسد صومه.

"রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যাপারে আমাদের অধিকাংশ মাশায়েখের নিকট মূল ধর্তব্য হলো- পেট বা মস্তিষ্কে কোনো কিছু পৌঁছে যাওয়া। তাই শুকনো ঔষধ ব্যবহারের পর তা পেটের ভেতরে পৌঁছে গেলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। বিপরীতে তরল ঔষধও যদি পেটে না পৌঁছে, তাহলে রোযা ভাঙ্গবে না।"[৪৬৩]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

فالمعتبر حقيقة الوصول حتى لو علم وصول اليابس أفسد، أو عدم وصول الطري لم يفسد.

"মূল কথা হলো বাস্তবে পৌঁছে যাওয়া। তাই যদি জানা যায়, শুকনো বস্তু (পেট বা মস্তিস্কে) পৌঁছে গেছে, রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি জানা যায় তরল ঔষধও পৌঁছেনি, তাহলে রোযা

---

[৪৬১] বাদায়েউস সানায়েঃ ২/২৪৩ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; পূর্ববর্তী ইমামগণ সমকালীন গবেষণা অনুযায়ী এভাবেই সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। বর্তমানে কিছু ডাক্তার উল্লিখিত দু'একটি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। তবে পূর্ণরূপে তাহকীক না হওয়া পর্যন্ত সতর্কতাবশত পূর্ববর্তী ইমামগণের সিদ্ধান্তই আমলযোগ্য হবে।

[৪৬২] মাবসূতে সারাখসী: ৩/৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

[৪৬৩] মাবসূতে সারাখসী: ৩/৬৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন; ফাতহুল কাদীর: ২/৩৪৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ভাংবে না।"[৪৬৪]

গ. লোমকূপ। লোমকূপ প্রকৃত পক্ষে কোনো রাস্তা নয় বরং শরীরে অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র, যে ছিদ্র দিয়ে তরল কোনো পদার্থও স্বাভাবিকভাবে প্রবেশ করতে পারে না বরং চুইয়ে চুইয়ে একটু একটু করে যায়। পক্ষান্তরে منفذ বা রাস্তা হলো যেখান দিয়ে স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছু স্থানান্তর হতে পারে। ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে যে, রোযা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু পেটে পৌঁছতে হবে। লোমকূপ যেহেতু منفذ বা রাস্তার সংজ্ঞায় পড়ে না, তাই লোমকূপ দিয়ে কোনো কিছুর প্রতিক্রিয়া ভেতরে প্রবেশ করলেও রোযা নষ্ট হবে না।

مسمة ও منفذ -এর পার্থক্য

منفذ (রাস্তা) مسمة (লোমকূপ) এর পার্থক্য করতে গিয়ে আল্লাম ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

لأن الموجود في حلقه أثر داخل من المسام الذي هو خلل البدن، والمفطر إنما هو الداخل من المنافذ للإتفاق على أن من اغتسل في ماء فوجد برده في باطنه أنه لا يفطر.

"(সুরমা ও তেলের প্রভাব কণ্ঠনালীতে পাওয়া গেলেও রোযার সমস্যা হবে না)। যেহেতু এটা একমন এক প্রভাব যা শরীরের ছিদ্র তথা লোমকূপ দিয়ে প্রবেশ করেছে। আর রোযাভঙ্গকারী হলো ঐ প্রবিষ্ট বস্তু যা প্রবেশের পথ দিয়ে প্রবেশ করে। কারণ ফুকাহায়ে কেরাম একমত হয়েছেন, যে ব্যক্তি পানিতে গোসল করবে এবং পানির শীতলতা ভেতরে অনুভব করবে তাতে রোযা নষ্ট হবে না।"[৪৬৫]

লোমকূপের সাথে ঐ সকল জিনিসও সম্পৃক্ত যার আছর ও প্রতিক্রিয়া চুইয়ে চুইয়ে ভেতরে প্রবেশ করে বা ভেতর থেকে চুষে নেয়। যেমন, সাপের বিষক্রিয়া। তাই কোনো বিষাক্ত সাপ, বিচ্ছু যদি কাউকে দংশন করে এবং বিষক্রিয়া মস্তিষ্কে পৌঁছে যায় তবু রোযা নষ্ট হবে না। কারণ তা স্বাভাবিক রাস্তা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করেনি।[৪৬৬]

২. প্রবেশকৃত বস্তু পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে স্থির হওয়া। সুতরাং কোনো কিছু পেট বা মস্তিষ্কে পৌঁছে স্থির না হলে রোযা নষ্ট হবে না।

আল্লামা ইবনে নুজাইম আল মিসরী রাহ. বলেন-

ولو أدخل خشبة أو نحوها وطرفا منها بيده لم يفسد صومه. قال في البدائع : وهذا يدل على أن استقرار الداخل في الجوف شرط لفساد الصوم.

"যদি কাঠ বা তার মত অন্য কোনো জিনিস শরীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হয় আর তার অপর প্রান্ত তার হাতে থাকে, তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। বাদায়েউস সানায়ে কিতাবে

---

[৪৬৪] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩৭৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৬৫] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩৬৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৬৬] ফাতাওয়া বাইয়িনাত: ৩/৭২, ফাতাওয়ায়ে বাইয়িনাত: জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া বিন্নুরী টাউন পাকিস্তান থেকে তিন খণ্ডে প্রকাশিত; ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়া: ৪/১৫৯

উল্লেখ আছে, এর দ্বারা বুঝা যায়, প্রবিষ্ট বস্তু পেটে স্থির হওয়া রোযা ভঙ্গের জন্য শর্ত।"[৪৬৭]

মোটকথা, এই মূলনীতির দু'টি অংশের কোনো একটি যদি না পাওয়া যায়, তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। এর আলোকেই কিছু আধুনিক বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

ইনজেকশন করলে রোযা ভঙ্গ হবে না

ইনজেকশন দ্বারা বাইর থেকে শরীরের ভেতরে তরল বস্তু প্রবেশ করানো হয়। কিন্তু منفذ তথা অতিক্রমস্থল দিয়ে প্রবেশ করানো হয় না। বরং শরীরের গোশত ছেদ করে ইনজেকশন পুশ করা হয়।

গোশতের ইনজেকশন গোশতেই থেকে যায়। এদিক সেদিক বেশী দূর যায় না। আর যদি পেট পর্যন্ত পৌঁছেই যায় তাহলে তা ঘামের মত চুইয়ে চুইয়ে যায়। আর আমরা ইতিপূর্বে জেনে এসেছি যে, মানফাজ বা অতিক্রমস্থল দিয়ে প্রবেশ না করলে রোযা ভঙ্গ হবে না।

আর যদি রগে ইনজেকশন করা হয় তাহলে তা রগেই চলাফেরা করে। শারীরিক আরামের কারণ হয়। তা পেট বা দেমাগে যায় না।

হাকীমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেছেন-

ڈاکٹروں سے تحقیق کرنے سے نیز تجربہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ انجکشن کے ذریعہ دوا جوف عروق میں پہونچائی جاتی ہے اور خون کے ساتھ شرائیں یا اوردہ میں اسکا سریان ہوتاہے، جوف دماغ یا جوف بطن میں دوا نہیں پہونچتی، اور فساد صوم کے لئے مفطر کا جوف دماغ یا جوف بطن میں پہونچنا ضروری ہے، مطلقا کسی عضو کے جوف میں یا عروق (شرائیں واوردہ) کے جوف میں پہونچنا مفسد صوم نہیں، لہذا انجکشن کے ذریعہ سے جو دوابدن میں پہونچائی جاتی ہے مفسد صوم نہیں۔

"ডাক্তারের গবেষণা ও নিজের অভিজ্ঞতায় একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইনজেকশনের মাধ্যমে ঔষধ রগের মধ্যে পৌঁছায়। রক্তের সাথে পেট বা দেমাগে ঔষধ পৌঁছে না। আর রোযা নষ্ট হওয়ার জন্য বস্তু পেট বা দেমাগে পৌঁছা জরুরী। ব্যাপকভাবে যে কোনো অঙ্গে বা রগের ভেতরে পৌঁছলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে না। এই জন্য ইনজেকশনের মাধ্যমে যে ঔষধ শরীরের অভ্যন্তরে পৌঁছানো হয় তা রোযা ভঙ্গকারী নয়।"[৪৬৮]

মূলনীতি ও উল্লিখিত ফাতাওয়ার আলোকে এ কথাই প্রতীয়মান হলো যে, রোযা অবস্থায় যে কোনো ধরনের ইনজেকশন গ্রহণ করা যাবে। রোযার কোনো ক্ষতি হবে না।

একটি প্রশ্ন ও তার জবাব

এবার একটি প্রশ্ন হতে পারে, রোযা হলো পানাহার থেকে বিরত থাকা। গ্লুকোজ, ইনজেকশন দ্বারা তো পানাহারের কাজ হয়ে যায়। রোযা অবস্থায় গ্লুকোজ, ইনজেকশন ক্ষতিকর না হলে রোযার তাৎপর্য রইলো কোথায়?

---

[৪৬৭] আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৮৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৬৮] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ২/১৪৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

সমাধান: গ্লুকোজ ইনজেকশনে যেহেতু রোযা ভঙ্গের কারণ পাওয়া যায় না তাই রোযা ভঙ্গ হবে না। তবে যেহেতু এ ধরনের ইনজেকশন গ্রহণ করলে রোযার মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া এ ধরনের শক্তিবর্ধক ইনজেকশন গ্রহণ করা মাকরূহ।

روزے کی حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا باقی گلوکوز یاطاقت کا انجکشن لگوانے سے چونکہ مقصد روزہ فوت ہوجاتا ہے، اسلئے طاقت یا غذائیت کا انجکشن استعمال کرنا مکروہ ہوگا۔

"রোযা অবস্থায় ইনজেকশন ব্যবহার করলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে গ্লুকোজ বা শক্তিবর্ধক ইনজেকশন ব্যবহার করলে যেহেতু রোযার মূল উদ্দেশ্য বিঘ্নিত হয় তাই শক্তিবর্ধক বা খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন ব্যবহার করলে রোযা মাকরূহ হবে।"[৪৬৯]

রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার

হাঁপানী অত্যন্ত কষ্টদায়ক একটি রোগ। এই রোগের চিকিৎসা হিসেবে গ্যাসজাতীয় অতি সূক্ষ্ম একটি পদার্থ আবিষ্কার করা হয়েছে। ব্যবহারের সুবিধার্থে কোম্পানি ঔষধটিকে স্প্রে যন্ত্রের ভেতর রাখে যাকে ইনহেলারও বলা হয়।

ব্যবহার পদ্ধতি: হাঁপানী রোগী যন্ত্রের সামনের দিকটি মুখের ভেতরে রেখে মুখ বন্ধ করে ফেলে। অতঃপর স্প্রে করে ঢোক গিলতে থাকে। ফলে শ্বাসরুদ্ধকর স্থানটি প্রশস্ত হয়ে শ্বাস চলাচল স্বাভাবিক হয়ে যায় এবং কষ্টও লাঘব হয়।

ইনহেলার ব্যবহারের হুকুম

ঔষধটি স্প্রে করার সময় যদিও তা গ্যাসের মত মনে হয় প্রকৃতপক্ষে তা হলো- দেহবিশিষ্ট তরল পদার্থ। আর এই তরল পদার্থ যখন মুখ দিয়ে প্রবেশ করে তখন তা পেটে পৌঁছে যায়। তাই রোযা অবস্থায় ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

أنه لو أدخل حلقه الدخان أفطر، في الشامية: حتى لو تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتمه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عنه.

"যদি কণ্ঠনালীতে ধোঁয়া প্রবেশ করায়, তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। তাই যদি ধূপ দ্বারা সুবাসিত হয় এবং তাকে নিজের দিকে টেনে আনে এবং রোযা স্মরণ থাকা সত্ত্বেও শোঁকে তাহলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। কারণ তা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব।"[৪৭০]

ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়াতে উল্লেখ আছে-

الجواب: مذکورہ انہیلرپمپ کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اگر روزہ کي حالت میں انتھائي مجبوري کے وقت اسکو استعمال کیا گیا تو رمضان کے بعد اس روزہ صرف قضا کرنا ہوگي کفارہ نہیں تاہم اگر مریض

---

[৪৬৯] ফাতাওয়ায়ে বায়্যিনাত: ৩/৭৯, মাকতাবায়ে বাইয়িনাত, বিন্নুরী টাউন, করাচী, পাকিস্তান

[৪৭০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৩/৩৬৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

کی حالت ایسی ہو کہ اسکے بغیر اس کا گذارہ نہ ہوتا ہو تو روزہ نہ رکھے صرف فدیہ دینا ہوگا۔

"ইনহেলার ব্যবহার করলে রোযা ভেঙ্গে যাবে। আর যদি রোযা অবস্থায় একান্ত অপারগতায় তা ব্যবহার করতে হয় তাহলে রমযানের পরে শুধু ঐ দিনের রোযা কাজা করলেই হবে। কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি রোগীর অবস্থা এমন মারাত্মক হয় যে, ইনহেলার ব্যবহার ছাড়া থাকতে পারে না, তাহলে কাযা করারও প্রয়োজন নেই। বরং রোযার ফিদিয়া দিবে।"[৪৭১]

মোটকথা, কোনো পদার্থ, তরল হোক বা ধোঁয়া জাতীয় পেটে পৌঁছলেই রোযা ভেঙ্গে যাবে।

ডাক্তারী পরামর্শ

বিজ্ঞ ডাক্তারগণ হাঁপানী রোগীকে সাধারণত দিনে দুইবার ইনহেলার ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। তাই দিনে যদি সাহরীতে একবার ও ইফতারের পর একবার ব্যবহার করলে দিনে কোনো সমস্যা না হয় বিশেষ করে ছোট দিনগুলোতে, তাহলে এই পদ্ধতি গ্রহণ করে রোযা রাখবে।

অপারগদের করণীয়

যদি রোগ মারাত্মক আকার ধারণ করে এবং ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা করা সম্ভব না হয় তাহলে শরী'আত তাকে রোযা রাখতে বাধ্য করেনি, যেমনটি পূর্বে ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়ার উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে। আর আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ

"রোগীর জন্যে কোনো দোষ নেই।"[৪৭২]

পরে যদি রোগী সুস্থ হয় বা ছোট দিনগুলোতে তার জন্য রোযা রাখা সম্ভব হয়, তাহলে শুধু কাযা করে নিবে, কাফফারা দিতে হবে না। আর যদি রোগীর অবস্থা এত নাযুক হয়ে যায় যে, ভালো হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং ইনহেলার ব্যবহার করা ছাড়া সে থাকতে পারে না, তাহলে শরী'আত তাকে রোযা না রেখে ফিদিয়া দেয়ার সুযোগ দিয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

"আর যারা রোযা রাখতে সক্ষম নয় তারা মিসকিনকে খানা দিয়ে ফিদিয়া আদায় করবে।"[৪৭৩]

হ্যাঁ, যদি মৃত্যুর পূর্বে কখনো সুস্থ হয় এবং রোযা রাখতে সক্ষম হয়, তাহলে রোযা রাখবে।

---

[৪৭১] ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়্যাহ: ৪/১৭০, জামিয়া দারুল উলূম হক্কানিয়্যাহ, পাকিস্তান; জামেউল ফাতাওয়া: ৩/৩১৯

[৪৭২] সূরা নূর: ৬১

[৪৭৩] সূরা বাকারা: ১৮৪

রোযা অবস্থায় এন্ডোসকপি

এন্ডোসকপির সংজ্ঞা: লম্বা চিকন একটি পাইপ, যার এক প্রান্তে বাল্বজাতীয় ছোট একটি বস্তু থাকে আর অপর প্রান্তে থাকে মনিটরী। বাল্বযুক্ত মাথাটি গলা দিয়ে প্রবেশ করিয়ে পাকস্থলীতে পৌঁছানো হয়। ফলে অপর প্রান্তের মনিটরীতে পেটের অভ্যন্তরীন সকল অবস্থা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ সাহায্যে ডাক্তারগণ পেটের রোগ নির্ণয় করতে সক্ষম হন। এটাকে এন্ডোসকপি বলা হয়।

এন্ডোসকপি করলে রোযা ভঙ্গ হবে না

এন্ডোসকপি করার সময় সাধারণত পাইপটিতে কোনো ধরনের মেডিসিন বা তৈল ব্যবহার করা হয় না। আর পাইপসহ যা কিছু ঢুকানো হয় সব বের হয়ে আসে।

রোযা ভঙ্গ হওয়ার মূলনীতিতে বলা হয়েছে- বাহির থেকে বস্তু অতিক্রমস্থল দিয়ে প্রবেশ করে পেট বা মস্তিষ্কে স্থির হতে হবে। এন্ডোসকপি করার সময় পাকস্থলীতে বাহির থেকে বস্তু প্রবেশ করে বটে সেখানে স্থির থাকে না, তাই রোযা নষ্ট হবে না। ফিকহের কিতাবে এ ধরনের বেশ কিছু মাসআলা পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

ولو شد الطعام بخيط وأرسله في حلقه، وطرف الخيط في يده، لا يفسد الصوم إلا إذا انفصل.

“যদি কোনো সুতার সাথে খাদ্য বেঁধে তা কণ্ঠনালীতে প্রবেশ করানো হয় আর সুতার অন্যদিক তার হাতে থাকে তাহলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে যদি খাদ্য সুতা থেকে পৃথক হয়ে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।”[৪৭৪]

উল্লিখিত মাসআলা ও এন্ডোসকপির মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। মোটকথা, এন্ডোসকপি করলে রোযা নষ্ট হবে না। তবে হ্যাঁ যদি পাইপের সাথে কোনো ধরনের মেডিসিন বা তেল লাগানো হয়, যা পেটে থেকে যায় তাহলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। যেমন পূর্বোল্লিখিত মাসআলাতে রয়েছে إلا إذا انفصل তবে খাদ্য পৃথক হয়ে গেলে রোযা নষ্ট হয়ে যাবে।

রোযা অবস্থায় রক্ত দেয়া-নেয়া

হাসপাতালগুলোতে রক্ত দেয়া-নেয়া একেবারেই স্বাভাবিক ও অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। রমযান মাসেও এই ধারা অব্যাহত থাকে। কিন্তু অনেক ধর্মপ্রাণ ভাই-বোন শঙ্কায় থাকেন যে, রোযা নষ্ট হয়ে যায় কি না? তাই দলীলভিত্তিক এই মাসআলাটিরও সমাধান পেশ করা হলো।

রোযা অবস্থায় রক্ত দিলে রোযা নষ্ট হবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়ে দূষিত রক্ত বের করেছেন। ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

أن النبي ﷺ احتجم وهو صائم.

“নবী ﷺ রোযা অবস্থায় শিংগা লাগিয়েছেন।”[৪৭৫]

---

[৪৭৪] আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৮৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৭৫] সহীহ বুখারী: ১/২৬০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

তবে রোযা অবস্থায় রক্ত দিলে যদি এমন দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে যে, রোযা ভেঙ্গে ফেলতে হয় তাহলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া রক্ত দেয়া মাকরূহ। ইমাম বুরহানুদ্দীন রাহ. বলেন-

إذا أراد أن يحتجم، إن أمن على نفسه من الضعف لا بأس به، فأما إذا خاف أن يضعفه ذلك، فإنه يكره، وينبغي أن يؤخر إلى وقت الغروب.

"যদি রোযা অবস্থায় শিংগা লাগাতে চায় তাহলে দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত হলে সমস্যা নেই। দুর্বল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা হলে মাকরূহ হবে। তার উচিত সূর্যাস্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা।"[৪৭৬]

সুতরাং বুঝা গেলো, রক্ত দিলে বা শরীরের কোথাও কেটে অনেক রক্ত বের হলে রোযা নষ্ট হবে না। ইমাম বদরুদ্দীন আইনী রাহ. উল্লেখ করেন-

قال ابن عباس وعكرمة: الفطر مما دخل وليس مما خرج.

"ইবনে আব্বাস রাযি. ও ইকরামা রাযি. বলেন, রোযা ভেঙ্গে যায় কোনো কিছু প্রবেশ করলে। কোনো কিছু বের হলে নয়।[৪৭৭] রক্ত দেয়ার সময় শরীরের ভেতর কোনো কিছু প্রবেশ করে না। তাই রোযা ভঙ্গ হওয়ার প্রশ্নই আসে না।"

রক্ত নিলেও রোযা ভাঙ্গে না

শরীরে রক্ত প্রবেশ করানোর হুকুম ইনজেকশনের মতই অর্থাৎ রক্ত স্বাভাবিক প্রবেশ পথ দিয়ে প্রবেশ করে না এবং তা দেমাগ বা পেটে পৌঁছে না, তাই রক্ত নিলে রোযা নষ্ট হবে না।

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

---

[৪৭৬] আল মুহীতুল বুরহানী: ২/৫৬৩, দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন; আল বাহরুর রায়েক: ২/৪৭৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৭৭] উমদাতুল কারী: ৮/১২৩ দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

অধ্যায়ঃ হজ্ব

বদলী হজ্ব: কিছু সমস্যা ও সমাধান

মাওলানা এমদাদুল হক বায়েজিদ মোমেনশাহী

হজ্ব শরী'আতের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান, ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের অন্যতম স্তম্ভ। হজ্ব ফরয হওয়ার পর আদায় না করলে গুনাহগার হবে। এমনকি আদায় করতে বিলম্ব করাও জায়েয নেই। এরপরও ফরয হজ্ব আদায় করতে না পারলে শরী'আত তার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রেখেছে। তা হলো নিজের খরচে নিজের পক্ষ থেকে অন্য কাউকে হজ্বে প্রেরণ করা। অর্থাৎ বদলী হজ্ব করানো। বদলী হজ্বের নানাবিধ মাসায়েল রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে কিছু মাসায়েল নিয়ে আলোচনা করা হলো।

বদলী হজ্ব

হজ্ব ফরয হওয়ার পর যে ব্যক্তি আদায় করতে এমন অক্ষম হয়ে গেছে যে, তা দূর হওয়ার আশা করা যায় না (যেমন অন্ধত্ব, অর্ধাঙ্গ বা প্যারালাইসিস) তাহলে সে নিজের পরিবর্তে অন্য কাউকে হজ্বে পাঠালে তার ফরয হজ্ব আদায় হয়ে যাবে। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর কুদরতে সে সুস্থ হলেও পুনরায় তার হজ্ব করা লাগবে না।

ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع فقالت: يا رسول الله! إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا، لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم.[৪৭৮]

"খাছ'আম গোত্রের জনৈক মহিলা বিদায় হজ্বের সময় এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দার উপর আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে ফরয হজ্ব আমার পিতার উপর এমতাবস্থায় ফরয হয়েছে যে, তিনি বয়োবৃদ্ধ সাওয়ারীর উপর বসতে সক্ষম নন। আমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করলে কি তার পক্ষ থেকে আদায় হবে? রাসূল ﷺ বললেন, হ্যাঁ।"[৪৭৯]

বার্ধক্য এমন ওজর যা পরবর্তীতে দূর হওয়ার আশা করা যায় না। অনুরূপভাবে যে সকল রোগ সেরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই সেক্ষেত্রেও বদলী হজ্ব করানো যাবে। পরবর্তীতে সুস্থ হলেও তার আর হজ্ব আদায় করতে হবে না। আর যদি রোগ এমন হয় যা সেরে যাওয়ার আশা আছে, তাহলে সে ব্যক্তি সেরে যাওয়ার অপেক্ষা করবে। সুস্থ হলে হজ্ব আদায় করবে। হ্যাঁ যদি অপেক্ষা করতে করতে এমন পরিস্থিতিতে পৌঁছে যে, আর ভাল হওয়ার আশা করা যায় না; তখন সে বদলী হজ্ব করাবে। সুস্থ হওয়ার অপেক্ষা করা ছাড়াই যদি বদলী হজ্ব করায় এবং পরবর্তীতে সুস্থ হয়, তাহলে পুনরায় তার হজ্ব আদায় করতে হবে। আল্লামা

---

[৪৭৮] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في «فتح الباري» ٨٦/٤ (ط. دار الكتب العلمية) : قال ابن العربي: حديث الخثعمية أصل متفق على صحته في الحج، خارج عن القاعدة المستقرة في الشريعة من أن ليس للإنسان إلا ما سعى.

[৪৭৯] সহীহ বুখারী: **১/২৫০**, হাদীস নং **১৮৫৪**, মাকতাবায়ে রশীদিয়া দিল্লী

আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

تقبل النيابة عند العجز فقط بشرط دوام العجز إلى الموت (لأنه فرض العمر حتى تلزم الإعادة بزوال العذر) هذا إذا كان المرض يرجى زواله وإن لم يكن كذلك كالعمي والزمانة سقط الفرض بحج الغير عنه فلا إعادة مطلقا، سواء استمر به ذلك العذر أم لا.

"মৃত্যু পর্যন্ত অসুস্থতা স্থায়ী হলে বদলী হজ্ব করানো জায়েয। (আর মৃত্যু পর্যন্ত স্থায়ী না হলে জায়েয নেই) কেননা তা জীবনে একবারই ফরয হয়। সুতরাং অসুস্থতা দূর হয়ে গেলে পুনরায় হজ্ব করা আবশ্যক। এই বিধান তখন, যদি অসুস্থতা ভাল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। আর যদি অসুস্থতা এমন হয়, যা দূর হওয়ার আশা করা যায় না যেমন অন্ধত্ব ও প্যারালাইসিস, তাহলে অন্য কেউ তার অনুমতিক্রমে তার পক্ষ থেকে হজ্ব করলে আদায় হয়ে যাবে। তার আর পুনরায় হজ্ব আদায় করতে হবে না, সে ওজর মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকুক বা না থাকুক।"[৪৮০]

বদলী হজ্বের অসিয়ত

হজ্ব শরী'আতের একটি অকাট্য বিধান, যা ফরয হওয়ার পর আদায় করতেই হবে। অন্যথায় সে গুনাহগার হবে। হ্যাঁ, যদি হজ্ব ফরয হওয়ার পর গড়িমসি করে আদায় না করায় পরবর্তী সময়ে হজ্ব আদায়ের শক্তি হারিয়ে ফেলে, তাহলে অবশ্যই বদলী হজ্বের ব্যবস্থা করতে হবে। জীবদ্দশায় করানোর সুযোগ না হলে কমপক্ষে অসিয়ত করে যেতে হবে যেন তার পক্ষ থেকে তার রেখে যাওয়া সম্পদের এক তৃতীয়াংশ থেকে হজ্ব আদায় করানো হয়। হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

ما حق امرء مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده.

"যে মুমিন ব্যক্তির সম্পদ আছে অসিয়ত করারও ইচ্ছা আছে, অসিয়ত না করে দুই রাত্র বিলম্ব করাও তার জন্য উচিত হবে না।"[৪৮১]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. এ হাদীসের একটি ব্যাখ্যা এভাবে উল্লেখ করেন-

يحمل الحديث بما عليه من الفرائض، والواجبات كالحج والزكاة، والكفارات، والوصية بها واجبة عندنا.

"হাদীসের ব্যাখ্যা হলো, ঐ সকল ফরয ও ওয়াজিবের অসিয়ত যা ঐ ব্যক্তির উপর ওয়াজিব। যেমন হজ্ব, যাকাত এবং কাফ্ফারা আর এ সকল বিষয়ে অসিয়ত করা হানাফী মাযহাবে ওয়াজিব।"[৪৮২]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

من عليه الحج إذا مات قبل أدائه... فإن مات من غير وصية يأثم بلا خلاف.

---

[৪৮০] আদ্দুররুল মুখতার: ৪/১৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৮১] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৬২৭

[৪৮২] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/৪২৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

"ফরয হজ্ব আদায় না করে অসিয়ত করা ব্যতীত মারা গেলে গুনাহগার হবে।"[৪৮৩]

মৃত ব্যক্তির অসিয়ত ব্যতীত যদি তার ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করে তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে যে, মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে হজ্ব করানো জরুরী নয় বিধায় সমস্ত বালেগ ওয়ারিশের অনুমতি নিয়ে আদায় করতে হবে। নাবালেগের অনুমতি নিয়েও তার অংশ থেকে খরচ করা যাবে না। কারণ এক্ষেত্রে নাবালেগের অনুমতি শরী'আতে গ্রহণযোগ্য নয়। আব্দুল্লাহ ইবনে বুরাইদা রাহ. তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন-

جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي ماتت، ولم تحج، أفأحج عنها؟ قال: نعم! حجي عنها.

"এক মহিলা নবী করীম ﷺ এর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার মা হজ্ব না করে ইন্তেকাল করেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করবো? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করো।"[৪৮৪]

এ হাদীসে যেহেতু অসিয়তের কথা উল্লেখ নেই তাই বাহ্যত এটি অসিয়ত না করলেও বদলী হজ্ব জায়েয হওয়ার দলীল। তবে ব্যাপক অর্থ নিলে অসিয়ত করা না করা উভয় অবস্থার জন্য দলীল হওয়ার অবকাশ আছে।

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

وإذا حج الرجل عن أبيه أو عن أمه حجة الإسلام من غير وصية أوصى بها الميت، أجزأه إن شاء الله تعالى.

"কোনো ব্যক্তি যদি তার পিতা-মাতার পক্ষ থেকে অসিয়ত ব্যতীত ফরয হজ্ব আদায় করে তাহলে ইন্‌শাআল্লাহ তা মাইয়িতের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে।[৪৮৫]

বদলী হজ্বে কেমন ব্যক্তিকে পাঠানো উচিত

বদলী হজ্বে প্রেরিত ব্যক্তি তিন প্রকার হতে পারে। **ক.** সে পূর্বে হজ্ব করেছে। **খ.** তার উপর হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেনি। **গ.** তার উপর হজ্ব ফরয হয়নি এবং পূর্বেও হজ্ব আদায় করেনি। প্রত্যেকের বিধান দলীলসহ উল্লেখ করা হলো।

ক. হজ্ব আদায় করেছে, হজ্বের বিধিবিধানও জানা আছে। এমন প্রাপ্তবয়স্ক স্বাধীন পুরুষকে বদলী হজ্বে প্রেরণ করা উত্তম।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

والأفضل إحجاج الحر العالم بالمناسك الذي حج عن نفسه حجة الإسلام.

---

[৪৮৩] বাদায়েউস সানায়েঃ ২/৪৬৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৮৪] জামে তিরমিযীঃ ১/১৮৬, হাদীস নং ৯৪১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ; ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৪৮৫] মাবসূতে সারাখসীঃ ৪/১৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

"হজ্বের মাসায়েল সম্পর্কে অবগত, স্বাধীন পুরুষ যে নিজের ফরয হজ্ব আদায় করেছে এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বে প্রেরণ করা উত্তম।"[৪৮৬]

খ. যে ব্যক্তি নিজের উপরে হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্ব আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বে পাঠানো প্রেরণকারীর জন্য মাকরূহে তানযীহী আর ঐ ব্যক্তির জন্য মাকরূহে তাহরীমী। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

والذي يقتضيه النظر أن حج الصرورة عن غيره إن كان بعد تحقيق الوجوب عليه بملك الزاد والراحلة والصحة فهو مكروه كراهة تحريم، لأنه يتضيق عليه والحالة هذه في أول سنى الإمكان فيأثم بتركه ، وكذا لو تنفل لنفسه، ومع ذلك يصح، لأن النهي ليس لعين الحج المفعول بل لغيره، وهو خشية أن لا يدرك الفرض ، إذ الموت في سنة غير نادر.

"মক্কায় যাতায়াত খরচের সামর্থবান ব্যক্তি হজ্ব ফরয হওয়ার পর যদি অন্যের পক্ষ থেকে হজ্ব করে, তাহলে তার জন্য তা মাকরূহে তাহরীমী হবে। কেননা নিজের ফরয হজ্ব আদায় করা তার জন্য আশঙ্কাজনক হয়ে যায়। কারণ তার হজ্ব আদায়ের প্রথম সুযোগ তো এ বছর। সুতরাং তা পরিহার করার কারণে সে গুনাহগার হবে। এমনিভাবে মাকরূহে তাহরীমী হবে, যদি সে প্রথমে নিজের নফল হজ্ব আদায় করে। এতদাসত্ত্বেও সে বদলী হজ্ব করতে পারবে। কেননা নিষেধাজ্ঞা সরাসরি হজ্বের ব্যাপারে আসেনি; বরং অন্য কারণে এসেছে। আর তা হলো, পরবর্তী সময়ে নিজের ফরয হজ্ব না পাওয়ার আশঙ্কা। কেননা এক বছরের মধ্যে মারা যাওয়া বিচিত্র নয়।"[৪৮৭]

ইবনুল হুমাম রাহ. উল্লিখিত আলোচনা করে বলেছেন যে, শুবরুমার হাদীসে (যা সামনে উল্লেখ করা হবে) حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة এর উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যার উপর হজ্ব ফরয হয়েছে কিন্তু এখনো ফরয হজ্ব আদায় করেনি।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

والحق أنها تنزيهية على الآمر، تحريمية على الصرورة المأمور الذي اجتمعت فيه شروط الحج، ولم يحج عن نفسه، لأنه آثم بالتأخير.

"সঠিক সিদ্ধান্ত হলো, হজ্ব ফরয হওয়া সত্ত্বেও নিজের ফরয হজ্ব আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বে পাঠালে প্রেরণকারীর জন্য মাকরূহে তানযীহী, আর আদিষ্ট ব্যক্তির জন্য নিজের ফরয হজ্ব বিলম্ব করার কারণে মাকরূহে তাহরীমি।"[৪৮৮]

গ. যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হয়নি এবং সে হজ্ব আদায়ও করেনি এমন ব্যক্তির বদলী হজ্ব আদায় করা জায়েয। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বর্ণনা করেন-

---

[৪৮৬] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৪০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪৮৭] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৪৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৪৮৮] আল বাহরুর রায়েক: ৩/১২৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

إن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي ﷺ فقالت: إن أمي نذرت أن تحج، فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية، أقضوا الله فالله أحق بالوفاء.

"যোহায়না গোত্রের জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হয়ে আরজ করলো, আমার মা হজ্বের মান্নত করে তা আদায় না করেই মৃত্যু বরণ করেন। এখন আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে পারি? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন হ্যাঁ, তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্ব আদায় করতে পারো। তোমার মায়ের উপর কারো ঋণ থাকলে তুমি কি তা আদায় করতে না? সুতরাং তোমরা (সকল মুসলমান) আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করে দাও। আল্লাহ তা'আলার হক তো আরো বেশি গুরুত্বের সাথে আদায় করার যোগ্য।"[৪৮৯]

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. যে হজ্ব করেনি তার বদলী হজ্ব করা প্রসঙ্গে দলীল এভাবে উল্লেখ করেন-

ولنا: حديث الخثعمية أن النبي ﷺ قال لها: حجي عن أبيك، ولم يستفسر أنها كانت حجت عن نفسها أوكانت صرورة، ولو كان الحكم يختلف لاستفسر.

"আমাদের দলীল, খাসআম গোত্রের মহিলার সূত্রে বর্ণিত হাদীস। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে তার পিতার পক্ষ থেকে হজ্ব করতে বলেছিলেন, তাকে জিজ্ঞেস করেননি যে সে নিজের পক্ষ থেকে ফরয হজ্ব আদায় করেছে কি না। যদি নিজের হজ্ব আদায় করা না করার সাথে বদলী হজ্বের হুকুম ভিন্ন হতো তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে নিজের হজ্বের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেন।"[৪৯০]

হযরত হাসান বসরী রাহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে-

أنه كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل.[৪৯১]

"হযরত হাসান বসরী রাহ. এর মতে যে ব্যক্তি নিজে হজ্ব করেনি সে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্ব করাতে তিনি কোনো অসুবিধা মনে করতেন না।"[৪৯২]

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

فإن أحج صرورة عن نفسه يجوز عندنا.

"নিজের ফরয হজ্ব আদায় করেনি এমন ব্যক্তিকে যদি হজ্বে প্রেরণ করে, তাহলে আমাদের নিকট তার হজ্ব সহীহ হবে।"[৪৯৩] (অর্থাৎ প্রেরণকারীর পক্ষ থেকে আদায় হবে।)

---

[৪৮৯] সহীহ বুখারী: ১/২২৫, হাদীস নং ১৮১৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৪৯০] বাদায়েউস সানায়ে: ২/৪৫৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৯১] رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (باب في التجارة في الحج) بإسناد لا بأس به. ويشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٣٥٤٢) عن جعفر عن أبيه: أن عليا كان لا يرى بأسا أن يحج الصرورة عن الرجل.

[৪৯২] মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা: হাদীস নং ১৩৫৪৪

[৪৯৩] মাবসূতে সারাখসী: ৪/১৫১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

উল্লিখিত দলীলগুলো এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, বদলী হজ্ব সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বদলী হজ্বকারী পূর্বে হজ্ব আদায় করা বা না করার কোনো দখল নেই। অন্যথায় রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদের জিজ্ঞেস করতেন, অথচ তা করেননি। সুতরাং যে পূর্বে হজ্ব পালন করেছে সে যেভাবে বদলী হজ্ব পালন করতে পারবে তেমনই যে ইতিপূর্বে হজ্ব আদায় করেনি সেও বদলী হজ্ব পালন করতে পারবে। তবে একটি হাদীস থেকে বোঝা যায় যে, বদলী হজ্ব আদায় করতে হলে পূর্বে হজ্ব করতে হবে। নিম্নে হাদীসটি উল্লেখ করে তার ব্যাখ্যা দেয়া হলো।

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن النبي ﷺ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة.[৪৯৪]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক ব্যক্তিকে لبيك عن شبرمة (শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্বের তালবিয়া পড়তে) শুনলেন, নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, শুবরুমা কে? সে বলল, আমার ভাই অথবা আমার আত্মীয়। নবীজী ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি নিজের পক্ষ থেকে হজ্ব করেছো? সে উত্তর দিলো, না। তখন নবীজী ﷺ তাকে বললেন, প্রথমে নিজের হজ্ব আদায় করো, এরপর শুবরুমার পক্ষ থেকে আদায় করো।"[৪৯৫]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. খাস'আমিয়া ও শুবরুমার হাদীসের সমন্বয় করতে গিয়ে বিস্তর আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন-

فحاصله أَمَرَ بأن يبدأ بالحج عن نفسه، وهو يحتمل الندب، فيحمل عليه بدليل وهو إطلاقه عليه الصلاة والسلام قوله للخثعمية : «حجي عن أبيك» من غير استخبارها عن حجها لنفسها قبل ذلك . وترك الاستفصال في وقائع الأحوال ينزل منزلة عموم الخطاب فيفيد جوازه عن الغير مطلقا .

وحديث شبرمة يفيد استحباب تقديم حجة نفسه وبذلك يحصل الجمع ويثبت أولوية تقديم الفرض على النفل مع جوازه .

"মোটকথা নবীজী ﷺ প্রথমে নিজের হজ্ব আদায়ের নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশটি মুস্তাহাব হওয়ার সম্ভাবনা রাখে। সুতরাং মুস্তাহাব হিসেবে ব্যাখ্যা করা হবে নবীজীর এ কথার ব্যাপকতার ভিত্তিতে, যা তিনি খাছ'আম গোত্রের এক মহিলাকে বলেছিলেন, 'তুমি তোমার বাবার পক্ষ থেকে হজ্ব করো।' ইতিপূর্বে নিজে হজ্ব করেছে কি না এ খবর না নিয়েই নবীজী কথাটি বলেছেন। বাস্তব পরিস্থিতির ক্ষেত্রে বিস্তারিত জিজ্ঞাসা পরিহার করাই ব্যাপকভাবে সম্বোধনের পর্যায়। সুতরাং এর দ্বারা অন্যের পক্ষ থেকে হজ্ব করা বৈধ প্রমাণিত হয়। চাই

---

[৪৯৪] واختلفوا في رفع هذا الحديث ووقفه، فرجح عبد الحق وابن القطان رفعه، وصححه البيهقي... ورجح الطحاوي أنه موقوف، وقال أحمد: رفعه خطأ، وقال ابن المنذر: لا يثبت رفعه، كذا قال الشوكاني. (بذل المجهود: ١١١/٣، معهد الخليل الإسلامي)

[৪৯৫] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ১৫৪৬

নিজে আগে হজ্ব করুক বা না করুক। আর শুবরুমার হাদীস আগে নিজে হজ্ব করে নেয়া মুস্তাহাব হওয়া বুঝায়। এভাবে দুই হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান হয়ে যায় এবং নফল হজ্ব আদায় করার পূর্বে ফরয হজ্ব আদায় করা উত্তম প্রমাণিত হয়, যদিও আগে নফল হজ্ব আদায় করা জায়েয।"[৪৯৬]

যে ব্যক্তির উপর হজ্ব ফরয হয়নি এবং হজ্ব আদায়ও করেনি তার মাধ্যমে বদলী হজ্ব করানো জায়েয। তবে এক্ষেত্রে পূর্বে হজ্ব আদায় করেছে এমন ব্যক্তিকে পাঠানোই উত্তম, যা শুবরুমার হাদীস থেকেও অনুমেয়। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. শুবরুমার হাদীসের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। তাছাড়া যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে হজ্ব আদায় করেনি তার বদলী হজ্ব সহীহ হওয়া সম্পর্কে ইমামদের মতবিরোধ রায়েছে। তাই এমন ব্যক্তিকে বদলী হজ্বে পাঠানো মাকরূহে তানযীহী হবে।[৪৯৭]

বদলী হজ্বে ইহরাম

যাকে বদলী হজ্বে পাঠানো হচ্ছে সে মূল ব্যক্তির প্রতিনিধি বা উকিল। তার কর্মক্ষমতা মূল ব্যক্তির সাথে সম্পৃক্ত। সুতরাং মূল ব্যক্তির উপর শুধু হজ্ব ফরয হলে সেও শুধু হজ্ব করার সুযোগ পাবে। হজ্বের সাথে ওমরা করার সুযোগ নেই। কারণ তাকে প্রেরণ করা হয়েছে 'হজ্বে ফরয' আদায় করার জন্য। এখন যদি হজ্বের সাথে ওমরাও করে নেয় তাহলে যার প্রতিনিধিত্ব করছে তাকে অমান্য করা হবে। আর এক্ষেত্রে উকিল তার মুআক্কিলের আদেশের বিপরীত কাজ করলে তা উকীলের উপর বর্তাবে, মুআক্কিলের উপর নয়। সুতরাং তার হজ্বও নিজের পক্ষ থেকে হবে, মূল ব্যক্তির পক্ষ থেকে নয়।

অনুমতি ব্যতীত কিরান হজ্ব করলে একদিক থেকে বদলী হজ্বের আদেশদাতার হুকুম অমান্য করা হয়। আর তা হলো শুধু হজ্ব না করে হজ্ব ও ওমরা উভয়টি করা। আর তামাত্তু হজ্ব করলে দু'দিক থেকে হুকুম অমান্য করা হয়। **ক.** ওমরা করা। **খ.** মীকাত ভিন্ন হওয়া অর্থাৎ আমেরের জন্য মীকাত ছিলো নিজ এলাকা হিসেবে। আর তামাত্তু করলে তার মীকাত হবে মক্কাবাসীর মীকাত। তাই ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রাহ. ইসতেহসানের ভিত্তিতে কিরানের অনুমতি দিলেও তামাত্তুর অনুমতি দেন না।[৪৯৮] মোটকথা, আমেরের হুকুমের অমান্য করায় তাকে নিজের সম্পূর্ণ খরচ বহন করতে হবে।

আল্লামা শামসুল আইম্মা সারাখসী রাহ. বলেন-

ولو قرن مع الحج عمرة كان مخالفا ضامنا للنفقة عند أبي حنيفة رحمه الله... يقول: هو مأمور بإنفاق المال في سفر مجرد للحج، وسفره هذا ما تفرد للحج بل للحج والعمرة جميعا، فكان مخالفا كما لو تمتع.

---

[৪৯৬] ফাতহুল কাদীর: ৩/১৪৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৪৯৭] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া: ৮/১২৯-১৩০, যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ

[৪৯৮] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৪/২১৮, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

“আবু হানীফা রাহ. এর নিকট আদিষ্ট ব্যক্তি হজ্বের সাথে ওমরা করলে আদেশদাতার বিরুদ্ধাচরণকারী সাব্যস্ত হওয়ায় আদেশদাতার সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে... (কারণ হিসেবে) তিনি বলেন, সে (আদিষ্ট ব্যক্তি) শুধুম হজ্বের সফরে সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে আদেশদাতার পক্ষ থেকে আদিষ্ট। অথচ তার এই সফর শুধু হজ্বের জন্য হয়নি বরং হজ্ব ও ওমরাহ উভয়ের জন্য হয়েছে। সুতরাং সে বিরুদ্ধাচরণকারী সাব্যস্ত হবে। যেমনিভাবে সে (আদেশদাতার অনুমতি ছাড়া) হজ্বে তামাত্তু করলে বিরুদ্ধাচরণকারী গণ্য হয়।”[৪৯৯]

তবে যেহেতু বিষয়টি ওকালাত ও প্রতিনিধিত্বের তাই অন্যান্য ক্ষেত্রে যেভাবে মূল মুআক্কিল অনুমতি দিলে ওয়াকীল তার নির্দেশ বহির্ভূত কাজ করতে পারে। যেমন মুআক্কিল যদি উকিলকে কোথাও পাঠায় আর উকিল তার নিজস্ব কাজের অনুমতি নেয়, তাহলে মুআক্কিলের কাজের সাথে সাথে নিজের কাজও করতে পারবে। হজ্বের ক্ষেত্রেও এমন হওয়া উচিত। এ দিকে লক্ষ্য করে অনেক ফকীহ বলেছেন, যদি আমের তথা বদলী হজ্বের আদেশদাতা অনুমতি দেয়, তাহলে বদলী হজ্বকারী তামাত্তু বা কিরান করতে পারবে। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

وأراد بالقران دم الجمع بين النسكين قرانا كان أو تمتعا... لكن بالإذن المتقدم.

“আবুল বারাকাত রাহ. এর دم القران (দমুল কিরান) বলার দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ দম যা দুই ইবাদত তথা হজ্ব ও ওমরাহ একত্রে জমা করার কারণে ওয়াজিব হয় (তথা দমে শোকর)। তা কিরান হজ্ব হোক বা তামাত্তু। তবে কিরান বা তামাত্তু হজ্ব করার জন্য শর্ত হলো আমের তথা বদলী হজ্বের আদেশদাতার পক্ষ থেকে পূর্ব থেকে অনুমতি থাকতে হবে।”[৫০০]

মুফতীয়ে হিন্দ মুফতী কেফায়েতুল্লাহ দেহলভী রাহ.ও এক প্রশ্নের উত্তরে এ মতটি সর্মথন করে বিশদ আলোচনা করেছেন।[৫০১]

মুফতী শফী রাহ. এ মতটি দলীলের দিক থেকে অগ্রগণ্য বলে এভাবে ফায়সালা দিয়েছেন, “বদলী হজ্বের মধ্যে নির্দেশদাতার অনুমতিতে কেরান ও তামাত্তু হজ্ব উভয়টি জায়েয হওয়াটা যদিও দলীল হিসেবে অগ্রগণ্য এবং পরবর্তী ফকীহদের মধ্যে ‘লুবাব’ গ্রন্থকার এবং তার টিকা ‘হুবাব’ ইত্যাদি কিতাবে এ মতকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু মোল্লা আলী কারী রাহ. এবং হযরত রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী রাহ. এর ফাতাওয়া এর বিপরীত। তাঁরা নির্দেশদাতার অনুমতির পরও তামাত্তু হজ্ব জায়েয বলেন না, যেহেতু ফরয আদায়ের বিষয়টি খুবই সংবেদনশীল। এ জন্য সাবধানতা খুবই জরুরী। যথাসম্ভব বদলী হজ্বে ‘ইফরাদ’ বা ‘কিরান’ করবে, তামাত্তু করবে না। কিন্তু বর্তমান যামানায় হজ্ব ও ওমরা করার ব্যাপারে সাধারণ মানুষ স্বাধীন নয়। যখন ইচ্ছা তখনই যেতে পারে না। দীর্ঘ ইহরাম থেকে বাঁচার জন্য ইচ্ছা করলে হজ্বের দিনগুলোর কাছাকাছি সময়ে যেতে পারে না। সব ব্যাপারেই রাষ্ট্রের কঠোর

---

[৪৯৯] মাবসূতে সারাখসী: ৪/১৫৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৫০০] আল বাহরুর রায়েক: ৩/১১৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
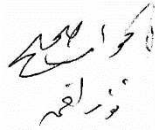
[৫০১] দ্রষ্টব্য, কেফায়েতুল মুফতী: ৪/৩৪৫-৩৪৬, দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান

বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সুতরাং যদি কোনো বদলী হজ্বকারী হজ্বে অনেক পূর্বেই যেতে বাধ্য হয় এবং দীর্ঘ ইহরামের কারণে ইহরামের ওয়াজিব পালনে মুশকিল দেখা দেয়, তাহলে তার জন্য তামাত্তু হজ্বের অবকাশ রয়েছে।"[৫০২]

আমের তথা হজ্বে প্রেরণকারীর জন্য উচিত আদিষ্ট ব্যক্তির নিকট হজ্ব আদায় সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সোপর্দ করা। যাতে সে পূর্ণ স্বাধীনতার সাথে সম্পদ ব্যয় করতে পারে এবং প্রয়োজনে কেরান বা তামাত্তু হজ্ব করতে পারে।
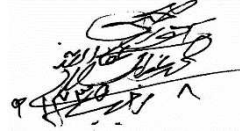
إذا أمر غيره بأن حج عنه ينبغي أن يفوّض الأمر إلى المأمور، فيقول: حج عني بهذا المال كيف شئت، إن شئت حجة وإن شئت حجة وعمرة، وإن شئت قرانا.

"যখন কাউকে বদলী হজ্বে পাঠাবে তখন প্রেরকের উচিত হজ্বের পূর্ণ বিষয়টি মামুরের (আদিষ্ট ব্যক্তি) কাছে সোপর্দ করা। সে এভাবে বলবে যে, এ সম্পদ দ্বারা আমার পক্ষ থেকে যেভাবে চাও হজ্ব করো। যদি চাও ইফরাদ হজ্ব আদায় করো। অথবা চাইলে তামাত্তু হজ্ব বা কেরান হজ্বও আদায় করতে পার।"[৫০৩]
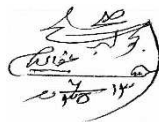
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্‌তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

---

[৫০২] জাওয়াহিরুল ফিহক: ৪/২২৫, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[৫০৩] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান: ১/১৮৭, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

ব্যাংকের মাধ্যমে 'দম' আদায়

মাওলানা ঈসা বিন আব্দুল কাদের বরগুনা

হজ্ব ইসলামের অকাট্য বিধানসমূহের অন্যতম । সামর্থ্যবান আল্লাহ প্রেমিকদের প্রেম নিবেদনের অন্যতম মাধ্যম এ হজ্ব। শরী'আতের অন্যান্য বিধানের ন্যায় হজ্ব সম্পাদন করারও রয়েছে সুনির্দিষ্ট নিয়ম কানুন। সেগুলো ব্যতিক্রম হলে হজ্ব ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। আর কিছু ত্রুটি থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দম বা কুরবানী নিবেদনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যা 'দমে জিনায়াত' নামে পরিচিত। এছাড়াও রয়েছে 'দমে শোকর', 'দমে ইহসার' ও 'দমে তাতাওউ' (تطوع)। তন্মধ্যে কিছু দম নির্দিষ্ট সময়ে আদায়ের শর্ত করা হয়েছে। যেমন 'দমে তামাত্তু' ও 'দমে কিরান'। এগুলো ১০ম তারিখে মাথা মুন্ডানোর আগেই আদায় করতে হয়। তবে হাজীরা অনেক সময় সহজতার জন্য উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আদায় করে থাকেন। আবার বর্তমানে অনেকে ব্যাংকের মাধ্যমেও আদায় করেন।

এটি বাহ্য দৃষ্টিতে সুবিধাজনক মনে হলেও সেখানে সৃষ্টি হয় নানা ধরনের সমস্যা। এ জাতীয় কিছু সমস্যা ও তার শর'য়ী সমাধান নিম্নে পেশ করা হলো।

দশম জিলহজ্বে হাজীগণের কার্যাবলী

১০ই জিলহজ্বে হাজীগণের চারটি কাজ করতে হয়। যথা:

১. রময়ে জিমার বা কঙ্কর নিক্ষেপ।

২. কুরবানী বা দম (যা কেরান হজ্ব ও তামাত্তু হজ্ব আদায়কারীদের উপর ওয়াজিব হয়।[৫০৪])

৩. মাথা মুন্ডানো বা চুল ছাটা।

৪. তাওয়াফে যিয়ারত। (তাওয়াফে যিয়ারত ১১, ১২ তারিখেও করা যায়)

আহকাম চতুষ্ঠয়ের মাঝে তারতীবের হুকুম

রমি, দম ও হলক এই তিনটি কাজের মাঝে তারতীব বা ধারাবহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। ইচ্ছাকৃত, ভুলে অথবা না জেনে ছেড়ে দিলে 'দম' ওয়াজিব হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের হজ্ব আদায় পদ্ধতি থেকে বোঝা যায় যে, তাঁরা উক্ত হুকুমগুলো ধারাবাহিকভাবে আদায় করেছেন। হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বলেন-

أن رسول الله ﷺ أتى منًا، فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى بمنزله بمنى ونحر ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ মিনায় আগমন করে 'জামরায়' আসলেন। এরপর পাথর নিক্ষেপ করে

[৫০৪] 'কিরান হজ্ব' হলো, একই ইহরামে ওমরা ও হজ্ব আদায় করা। এভাবে হজ্ব আদায়কারীকে শর'য়ী পরিভাষায় 'কারিন' বলে। আর 'তামাত্তু হজ্ব' হলো ওমরা একই সফরে, ভিন্ন ভিন্ন ইহরামে আদায় করা। এভাবে হজ্ব ও ওমরা আদায়কারীকে শর'য়ী পরিভাষায় 'মুতামাত্তি' বলে।

মিনায় অবস্থিত তাবুতে গেলেন এবং কুরবানী করলেন। অতঃপর মাথা মুণ্ডনকারীকে স্বীয় মাথা মোবারকের ডান পার্শ্ব অতঃপর বাম পার্শ্বের দিকে ইশারা করে মুণ্ডানোর নির্দেশ দিলেন।"[৫০৫]

উক্ত হাদীসে নবীজী ﷺ নিজে ধারাবাহিকভাবে রমী, কুরবানী ও হলক করেছেন। আর সাহাবারাও রাসূল ﷺ এর অনুরূপ করার চেষ্টা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

من قدم شيئا من حجه أو أخره فليهرق لذلك دما.[৫০৬]

"যে ব্যক্তি হজ্বের কোনো কাজ আগ-পিছ করে ফেলেছে সে যেন একটি দম দেয় (পশু জবেহ করে)।"[৫০৭]

ইমাম তাহাবী রাহ. এ ব্যাপারে وَلَا تَحۡلِقُواْ رُءُوسَكُمۡ حَتَّىٰ يَبۡلُغَ ٱلۡهَدۡيُ مَحِلَّهُۥۚ আয়াত দ্বারাও দলীল পেশ করেন। তিনি বলেন, এই আয়াতে হজ্বের উদ্দেশ্যে গমনকারী যে ব্যক্তির সামনে এমন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়েছে যে, হজ্ব করা সম্ভব না, তাকে মাথা মুন্ডানোর আগে কুরবানীর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তার কুরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডানো সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয। আর মুন্ডালে তার উপর দম ওয়াজিব। দমে ইহসারের ক্ষেত্রে যদি এই হুকুম হয়, তাহলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এমন হুকুম হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। তথা কেরানকারীর জন্য কুরবানীর পূর্বে মাথা মুন্ডানো দুরস্ত নয়। তাই তারতীব ভঙ্গ হয়ে গেলে দম ওয়াজিব হবে।[৫০৮]

ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

من قدم نسكا على نسك كأن حلق قبل الرمي، أو نحر القارن قبل الرمي، أو حلق قبل الذبح، فعليه دم عند أبي حنيفة رحمه الله.

"যদি কেউ হজ্বের কোনো হুকুম অন্যটির আগে করে ফেলে যেমন, পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুন্ডিয়ে ফেললো, অথবা কেরানকারী মাথা মুন্ডানোর আগে কুরবানী করে ফেললো অথবা জবেহের আগে মাথা মুন্ডিয়ে ফেললো, তাহলে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর মতে দম ওয়াজিব হবে।"[৫০৯]

এখানে ব্যাপকভাবে তারতীব ভঙ্গ করার উপর দম ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দেয়া হয়েছে।

---

[৫০৫] সহীহ মুসলিম: ১/৪২১ মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৫০৬] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥١٨٨) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» ١/٤٤٧-٤٤٨ بطريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس موقوفا عليه، رجال الإسناد ثقات غير إبراهيم بن مهاجر، وقد روى له الجماعة غير البخاري قال الإمام أحمد عنه: لا بأس به وقال ابن التركماني المارديني في «الجوهر النقي» (باب التقديم والتأخير في عمل يوم النحر) بعد ما ساقه عن ابن أبي شيبة: وهذا سند صحيح على شرط مسلم والحديث يشهد له ما رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (١٥١٨٩) عن سعيد بن جبير موقوفا عليه.

[৫০৭] শরহু মা'আনিল আছার: ১/৪৪৭-৪৪৮, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত

[৫০৮] শরহু মা'আনিল আছার: ১/৪৪৮, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত

[৫০৯] মাবসূতে সারাখসী: ৪/৪১-৪২ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

আর তারতীব ফাসেদ হওয়ার বিষয়টি ব্যাপক। সুতরাং ইচ্ছাকৃতভাবে হোক বা ভুলে কিংবা না জেনে হোক।

হ্যাঁ, যে হাদীসে এর ব্যতিক্রম বিধান পাওয়া যায়, অর্থাৎ আহকাম চতুষ্ঠয়ের মাঝে তারতীব না থাকলেও সমস্যা না হওয়ার কথা বোঝা যায় তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। যেমন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: فاذبح ولا حرج، قال: ذبحت قبل أن أرمي، قال: ارم ولا حرج.

"এক ব্যক্তি (হজ্ব চলাকালে) নবীজী ﷺ এর কাছে এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি তো জবেহের পূর্বেই মাথা মুন্ডন করে ফেলেছি, এখন কী করবো? নবীজী ﷺ বললেন, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই। এখন জবেহ করে নাও। লোকটি আবার বললো, আমি তো কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছি। এবার কী করবো? নবীজী ﷺ তাকে বললেন, ঠিক আছে কোনো সমস্যা নেই, তুমি এখন কঙ্কর নিক্ষেপ করো।"[৫১০]

এই হাদীসের ব্যাখ্যা: উক্ত হাদীসে জনৈক সাহাবী উল্লিখিত তারতীবের ব্যতিক্রম করার পর বিচলিত হয়ে নবীজী ﷺ কে প্রশ্ন করলে নবীজী তাকে বলেছেন, এতে কোনো সমস্যা নেই। হাদীসের বাহ্যিক বক্তব্য থেকে তারতীব ওয়াজিব না হওয়া প্রতীয়মান হয়। অথচ বিষয়টি এরূপ নয়। আল্লামা আইনী রাহ. এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর ব্যাখ্যা এভাবে উল্লেখ করেছেন-

ثم أجاب أبو حنيفة عن حديث الباب ونحوه، أن المراد بالحرج المنفي هو الإثم، ولا يستلزم ذلك نفي الفدية.

"ইমাম আবু হানীফা রাহ. বলেন, لا حرج 'কোনো সমস্যা নেই' দ্বারা নবীজীর উদ্দেশ্য হলো কোনো গুনাহ হবে না। তবে এর দ্বারা 'দম' ওয়াজিব না হওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না।"[৫১১]

বাস্তব ঘটনা হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এটা ছিলো সাহাবায়ে কেরামের প্রথম হজ্বের সুযোগ। তখনও পর্যন্ত তাঁরা হজ্বের বিধানাবলী সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। তাই তারতীব ভঙ্গ হওয়ার গুনাহ তুলে নেয়া হয়েছিলো। ইমাম তাহাবী রাহ. উক্ত আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করে বলেন-

فدل ما ذكرنا أنه ﷺ إنما أسقط الحرج عنهم في ذلك للنسيان، لا أنه أباح ذلك لهم حتى يكون لهم مباح أن يفعلوا ذلك في العمد.

"আমাদের আলোচিত আয়াত ও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নবীজী ﷺ কর্তৃক সাহাবায়ে কেরাম রাযি. থেকে তারতীব পরিপন্থী হওয়ার গুনাহ মাফ করাটা ভুলবশত

[৫১০] সহীহ মুসলিম: ১/৪২২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৫১১] উমদাতুল কারী: ১৩/১৩০, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

হওয়ার কারণে ছিলো। এর অর্থ এই নয় যে, নবীজী ﷺ তাদের জন্য পরবর্তী সময়ে ঐচ্ছিকভাবে এমন করা বৈধ করে দিয়েছেন।"[৫১২] এর সমর্থনে তিনি নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত পেশ করেন। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سئل رسول الله ﷺ وهو بين الجمرتين عن رجل حلق قبل أن يرمي فقال: لا حرج، وعن رجل ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج، ثم قال: عباد الله! وضع الله عز وجل الحرج والضيق، وتعلموا مناسككم، فإنها من دينكم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কে দুই 'জামারা'র মাঝখানে অবস্থানকালে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো, যে পাথর নিক্ষেপের আগে মাথা মুন্ডন করেছিলো। তিনি বললেন, তাতে কোনো গুনাহ নেই। আরেক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিলো যে পাথর নিক্ষেপের আগেই জবেহ করেছিলো। তিনি বললেন, এতে কোনো গুনাহ নেই। তারপর তিনি বললেন 'হে আল্লাহর বান্দারা! আল্লাহ তা'আলা গুনাহ ও সংকীর্ণতা মাফ করে দিয়েছেন। তোমরা তোমাদের হজ্বের আহকামগুলো শিখে নাও। কেননা এটা তোমাদের দ্বীনের অংশ।"[৫১৩]

বোঝা গেলো لا حرج 'কোন সমস্যা নেই' হুকুম সর্বদার জন্য ছিলো না। لا حرج সম্বলিত হাদীসের বর্ণনাকারী সাহাবী ইবনে আব্বাস রাযি. কর্তৃক দম ওয়াজিব হওয়ার ফাতওয়া প্রদান করাই এর স্পষ্ট প্রমাণ। ইমাম তাহাবী রাহ. ইবনে আব্বাস রাযি. এর لا حرج সম্বলিত রেওয়ায়েত উল্লেখ করে বলেন-

فهذا ابن عباس رضي الله عنهما يوجب على من قدم شيئا من نسكه أو أخره دما، وهو أحد من روى عن النبي ﷺ أنه ما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر من أمر الحج إلا قال: لا حرج، فلم يكن معنى ذلك عنده معنى الإباحة في تقديم ما قدموا، ولا في تأخير ما أخروا مما ذكرنا، إذ كان يوجب في ذلك دما، ولكن كان معنى ذلك عنده على أن الذين فعلوا في حجة النبي ﷺ كان على الجهل منهم بالحكم فيه كيف هو؟- فعذرهم بجهلهم وأمرهم في المستأنف أن يتعلموا مناسكهم...

"হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. হজ্বের কাজগুলোকে আগ পিছকারীর উপর 'দম' ওয়াজিব করেছেন। আর তিনি হলেন لا حرج সম্বলিত হাদীসের রাবীগণের অন্যতম। সুতরাং তাঁর মতে 'কোনো সমস্যা নেই' কথার অর্থ এই নয় যে, সাহাবায়ে কেরামকৃত তারতীব পরিপন্থী কাজগুলোকে আগে পরে করা বৈধ। কেননা তিনি নিজেই সেক্ষেত্রে দম ওয়াজিব হওয়ার হুকুম দিয়েছেন। বরং তার নিকট 'কোন সমস্যা নেই' কথাটির মর্ম হলো তারা আহকাম সম্পর্কে অবগত না হওয়ার কারণে নবীজী ﷺ এর সাথে হজ্ব করাকালে এমনটি করেছিলেন। ...যেমনটি তাঁদের প্রশ্ন করা থেকে বুঝা যায়। তাই তো নবীজী ﷺ তাঁদের অজ্ঞতাজনিত ওজরকে গ্রহণ করেছেন এবং নতুনভাবে হজ্বের আহকাম শেখার নির্দেশ

[৫১২] শরহু মা'আনিল আছার: ১/৪৪৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৫১৩] শরহু মা'আনিল আছার: ১/৪৪৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

দিয়েছেন।"[৫১৪]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হলো যে, গুনাহ না হওয়াটা 'দম' ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী নয়। অর্থাৎ গুনাহ না হলেই 'দম' ওয়াজিব হবে না- এমন নয়।

যেমন ইহরাম অবস্থায় কারো যদি কষ্ট বা রোগ ব্যাধির কারণে মাথা মুণ্ডাতে হয়, তাহলে এটা কুরআনের স্পষ্টভাষ্য মতে বৈধ। এতে কোনো গুনাহ নেই। তা সত্ত্বেও এর পরিবর্তে 'দম' ইত্যাদি দেয়া সর্বসম্মতিক্রমে ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ۚ

"আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কুরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। তবে তোমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় কোনো অসুবিধা থাকবে, (তারা এর আগেই মাথা মুন্ডাতে পারবে।) তখন তার পরিবর্তে রোযা রাখবে কিংবা সদকা দেবে অথবা কুরবানী করবে।"[৫১৫]

অনুরূপভাবে এখানে গুনাহ না হওয়া সত্ত্বেও 'দম' ওয়াজিব হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ ﷺ এর ঘোষণা خذوا عني مناسككم (আমার থেকে তোমরা তোমাদের হজ্ব আদায়ের পদ্ধতি শিখে রাখো) থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হজ্বের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর আমলই আদর্শ ও অনুসরণীয়। আর সাহাবায়ে কেরাম হজ্বের সফরে সর্বদা লক্ষ্য রেখেছেন রাসূলের আমলের প্রতিই, যা একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তাই হজ্বের ক্ষেত্রে রাসূলের আমল সম্বলিত হাদীস অগ্রগণ্য হওয়াটাই অধিক যৌক্তিক।

এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, উক্ত সময়ে (বিদায় হজ্বে) হজ্বের আহকাম সম্পর্কে অবগত না হওয়া সময়ে ওযর ছিলো। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যখন আহকাম বিস্তারিত বর্ণিত হয়েছে, তখন থেকে আর অজ্ঞতা ওযর হিসেবে গণ্য হবে না। তাই আবু হানীফা রাহ. অজ্ঞতাবশত তারতীব ভঙ্গ হলেও 'দম' ওয়াজিব হওয়ার কথা বলেন।

ব্যাংকের মাধ্যমে 'দম' আদায়

যেহেতু হানাফী মাযহাবে হজ্বের বিধান চতুষ্ঠয়ের মাঝে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। আর ব্যাংকের মাধ্যমে যদি 'দম' আদায় করা হয়, তাহলে হতে পারে যে, তারা 'দম' আদায়ে 'হলক' বা 'কসর' থেকে বিলম্ব করে ফেলবে। সেক্ষেত্রে আরেকটি দম হাজীর উপর ওয়াজিব হয়ে যাবে।

তাই হাজী সাহেবদের জন্য উচিত হলো তারা যেন নিজেরা অথবা নিজেদের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে কুরবানী করার ওয়াদা নেয়। যাতে সে নির্দিষ্ট

---

[৫১৪] শরহু মা'আনিল আছার: ১/৪৪৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৫১৫] সূরা বাকারা: ১৯৬
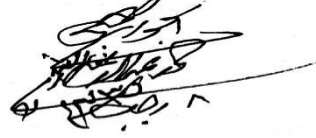
সময়ে কুরবানী করার পর হাজী সাহেব ইহরাম থেকে মুক্ত হতে পারেন।

আর বিজ্ঞজনদের অভিজ্ঞতা হলো ব্যাংক বা কুরবানীর কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলরা সময় মত 'দম' আদায় করে না; বরং কোনো কোনো সময় ১০ তারিখের কুরবানী তিন চার দিন পরে করে থাকে। তাই ব্যাংকের মাধ্যমে 'দম' আদায় করার অবকাশ নেই। সুতরাং হাজী সাহেবদের কর্তব্য হলো ব্যাংক বা কুরবানীর কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 'দম' আদায় না করা।
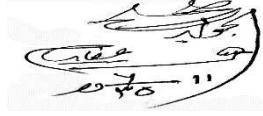
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

অধ্যায়: নিকাহ ও তালাক

সংসারে স্ত্রীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

মাওলানা আব্দুল ওয়াহেদ টাঙ্গাইলী

পুরুষ ও নারী একজন অন্যজনের পরিপূরক। দু'জন মিলেই একটি সংসার গড়ে ওঠে। সংসারে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অবদান কম নয়। আর একটি সংসারে শান্তি ও উন্নতি উভয়ের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই সাধিত হয়। তাই এখানে একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও তার সহযোগী হতে হবে। ইসলাম যেভাবে স্বামীকে নির্দেশ দিয়েছে স্ত্রীর প্রতি কল্যাণকামী হতে। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন-

واستوصوا بالنساء خيرا.

"তোমরা স্ত্রীদের প্রতি কল্যাণকামী হও।"[৫১৬]

অনুরূপ স্ত্রীকে আদেশ দিয়েছে স্বামীর অনুগত হতে এবং তাকে সম্মান করতে। হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ ... قال اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل أصفر إلى جبل أسود ومن جبل أسود إلى جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعله.[৫১৭]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং বড়দের সম্মান করো। যদি আমি কাউকে কারো সিজদা করার আদেশ করতাম, তাহলে স্ত্রীকে তার স্বামীর সিজদা করার নির্দেশ দিতাম। স্বামী যদি স্ত্রীকে হলুদ পাহাড় থেকে কালো পাহাড়ে এবং কালো পাহাড় থেকে সাদা পাহাড়ে কোনো জিনিস স্থানান্তর করার (অর্থাৎ কোনো কষ্টসাধ্য কাজেরও) নির্দেশ দেয়, স্ত্রীর জন্য উচিত তা করা।"[৫১৮]

মোটকথা সংসারে একজন স্ত্রী নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল সদস্য নয়, যার উপস্থিতিই শুধু কাম্য, তার না আছে কোনো দায়িত্ব ও কর্তব্য, না আছে অধিকার। বরং স্ত্রী সংসারের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য শরী'আতে যার দায়-দায়িত্ব ও নিশ্চিত অধিকার রয়েছে। সংসারে তার রয়েছে অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে তাদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্যের আলোচনা তুলে ধরা হলো।

রাসূল ﷺ এর স্ত্রীগণের সংসারে কর্মতৎপরতা

হযরত আয়েশা রাযি. 'ইফকের' আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

وأما علي فقال ... وسل الجارية تصدقك فقال: هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: ما رأيت أمرا أكثر

---

[৫১৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৪৭৮৭

[৫১৭] أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه» بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا علي بن زيد، فقد روى له مسلم في «صحيحه» مقرونا، وصحح له الترمذي غير ما حديث.

[৫১৮] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৪৪৭১, মুআস্সাসাতুর রিসালাহ; সুনানু ইবনি মাজাহ: হাদীস নং ১৮৫২

من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله.

"আর আলী রাযি. বললেন, দাসীকে জিজ্ঞেস করুন। সে সত্য বলবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বাঁদিকে বললেন, তুমি কি তার মাঝে দোষণীয় কোনো বিষয় দেখেছো? উত্তরে সে বললো, আমি শুধু তার মধ্যে এ বিষয়টি পেয়েছি যে, সে অল্প বয়সের মেয়ে হওয়ায় (পরিবারের লোকদের জন্য রুটি তৈরির) খামির রেখে ঘুমিয়ে যেতো। ফলে ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলতো।"[৫১৯]

এছাড়াও রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্ত্রীদের খেদমত গ্রহণ করেছেন এবং তাঁরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে করেছেন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

قال لي رسول الله ﷺ ناوليني الخمرة من المسجد، قالت: فقلت: إني حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, মসজিদ থেকে চাদরটি নিয়ে এসো। উত্তরে আমি বললাম, আমি তো হায়েযগ্রস্ত। রাসূল ﷺ বললেন, তোমার হায়েয তো তোমার হাতে নেই।"[৫২০]

তিনি নিজের খেদমত সম্পর্কে বলেন-

أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي ﷺ ثم أراه فيه بقعة أو بقعا.

"তিনি রাসূল ﷺ এর কাপড় থেকে বীর্য ধুতেন। আর কাপড়ে তার দাগ দেখা যেতো।"[৫২১]

তিনি আরো বলেন-

كنت أطيب رسول الله ﷺ فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে সুগন্ধি লাগিয়ে দিতাম। অতঃপর তিনি স্ত্রীদের কাছে যেতেন। এরপর সকালে ইহরাম পরতেন। আর পানি দ্বারা সুগন্ধি ধুয়ে নিতেন।"[৫২২]

ইমাম ইবনে কুদামা রাহ. সংসারে স্ত্রীর খেদমত বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন-

وقد كان النبي ﷺ يأمر نساءه بخدمته، فقال: يا عائشة! اسقينا، يا عائشة! أطعمينا، يا عائشة! هلمي الشفرة، واشحذي بها بحجر.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্ত্রীদেরকে খেদমতের হুকুম দিতেন, বলতেন হে আয়েশা! খাবার আনো, পানি পান করাও, ছুরি আনো এবং পাথর দিয়ে ধার দাও।"[৫২৩]

আল্লামা আবু যাহরা রাহ. রাসূলুল্লাহ ﷺ এর স্ত্রীদের সংসারে কর্মতৎপরতা সম্পর্কে বলেন-

---

[৫১৯] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৪১৪১
[৫২০] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৪৫০
[৫২১] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২২৫
[৫২২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৫৯
[৫২৩] আল মুগনী: ৮/১৩০, দারুল কুতুবিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

وذلك لما ورد من الآثار الصحاح التي تثبت أن نساء النبي ﷺ كن يقمن بخدمة البيت، ونساء الصحابة كن كذلك، ... والعرف جار بأن خدمة البيت بما يليق بمثل زوجها واجبة عليها. وإن الرجل الذي لا خادم له، إن جعلنا خدمة البيت ليست عليها تكون عليه، فيقوم بالخدمة في البيت والعمل في الخارج، وذلك ليس من العدل في شيء.

"অনেক সহীহ হাদীস বর্ণিত হয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিবিগণ ঘরোয়া কাজ-কর্ম আঞ্জাম দিতেন এবং সাহাবায়ে কেরামের স্ত্রীগণও এমনই করতেন। এবং স্বামীর অবস্থা অনুযায়ী স্ত্রীর উপর খেদমত আবশ্যক হওয়ার প্রচলনও রয়েছে। এছাড়া যে ব্যক্তির কোনো খাদেম নেই, ঘরের কাজকর্ম যদি স্ত্রীর দায়িত্বে না দেওয়া হয়, তাহলে স্বামীর দায়িত্বে আসবে। তখন সে ঘরের কাজ করবে, আবার বাইরের কাজকর্মও করবে। এটা কোনোভাবেই ইনসাফ হতে পারে না।"[৫২৪]

মহিলা সাহাবীদের সংসারে কর্মতৎপরতা

ইতিহাস ও হাদীসের বিভিন্ন আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয় যে, তখন আরবের স্বাভাবিক নিয়ম ছিলো, যে ঘরে পূর্ব থেকে খাদেম নেই সে ঘরে স্ত্রীই ঘরোয়া কাজ আঞ্জাম দিতো। নিম্নে মহিলা সাহাবীদের সাংসারিক তৎপরতার আলোচনা তুলে ধরা হলো। ইবনে আবী মুলাইকা রাহ. থেকে বর্ণিত-

أن أسماء قالت: كنت أخدم الزبير خدمة البيت، وكان له فرس، وكنت أَسُوسُه، فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس، كنت أحتش له، وأقوم عليه، وأسوسه، قال: ثم إنها أصابت خادما جاء النبي ﷺ سبي فأعطاها خادما. قالت: كفتني سياسة الفرس فألقت عني مئونته.

"আসমা রাযি. বলেন, যোবায়ের রাযি. এর ঘরোয়া কাজকর্ম আমিই আঞ্জাম দিতাম। তাঁর একটি ঘোড়া ছিলো। এর পরিচর্যা করতাম। আর আমার জন্য ঘোড়ার লালন-পালন সর্বাধিক কষ্টকর কাজ ছিলো। আমি তার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতাম এবং তার পরিচর্যা করতাম। অতঃপর একজন খাদেমের ব্যবস্থা হলো, যা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, তখন খাদেম ঘোড়া লালন-পালনের কাজ আঞ্জাম দিতো, আমি ঘোড়া লালন-পালনের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হলাম।"[৫২৫]

হযরত আলী রাযি. হযরত ফাতেমা রাযি. এর সংসারের কাজ সম্পর্কে বলেন-

عن ابن أعبد قال: قال لي علي ﷺ : ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله ﷺ وكانت من أحب أهله إليه؟ قلت: بلى، قال: إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها، واستقت بالقربة حتى أثر في نحرها، وكنست البيت حتى اغبرت ثيابها، فأتى النبي ﷺ خدم، فقلت: لو أتيت أباك فسألتيه خادما! فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت، فأتاها من الغد فقال: ما كان حاجتك؟ فسكتت، فقلت: أنا أحدثك يا

---

[৫২৪] আল আহওয়ালুস শাখসিয়্যাহ: ১৬৬, দারুল ফিকরিল আরাবী, কায়রো, মিসর

[৫২৫] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৪০৫১

رسول الله! جرت بالرحى حتى أثرت في يدها، وحملت بالقربة حتى أثرت في نحرها، فلما أن جاءك الخدم أمرتها أن تأتيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه. قال: اتقي الله يا فاطمة! وأدي فريضة ربك، واعملي عمل أهلك، فإذا أخذت مضجعك فسبحي ثلاثا وثلاثين، واحمدي ثلاثا وثلاثين، وكبري أربعا وثلاثين، فتلك مائة فهي خير لك من خادم. قالت: رضيت عن الله عز وجل وعن رسوله ﷺ

"ইবনে আ'বুদ বর্ণনা করেন, আমাকে আলী রাযি. বলেন, আমি কি তোমাকে আমার ও রাসূলুল্লাহ ﷺ এর প্রিয়তম কন্যা ফাতেমা রাযি. এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কিছু বলবো? আমি বললাম, অবশ্যই বলুন। তখন তিনি বললেন, যাতার চাকা ঘুরিয়ে ফাতেমার হাতে দাগ পড়ে গিয়েছিলো। পানি ভর্তি মশক বহন করে বুকের উপরিভাগে দাগ হয়ে গিয়েছিল। ঘর ঝাড়ু দিয়ে কাপড় ময়লা হয়ে গিয়েছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে কিছু খাদেম আসলো। তখন আমি ফাতেমাকে বললাম, তুমি তোমার পিতার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চাও। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে এসে কোনো সমস্যা দেখে চলে গেলেন। পরের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বললেন, কী প্রয়োজনে গিয়েছিলে? ফাতেমা রাযি. কথা না বলে চুপ থাকলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার কাছে বিষয়টি আমিই তুলে ধরছি। যাতার চাকা ঘুরিয়ে তাঁর হাতে দাগ পড়ে গেছে। পানির মশক বহন করে বুকের উপরিভাগ দাগ হয়ে গেছে। অতঃপর যখন আপনার নিকট (গনীমতের) খাদেম আসলো, আমি তাকে বললাম, সে যেন আপনার কাছে গিয়ে একটি খাদেম চায়। যে তাঁর কাজে সহযোগিতা করে তাঁর কাজের কষ্ট লাঘব করবে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, হে ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করো, তোমার প্রতিপালকের ফরয আদায় করো ও ঘরোয়া কাজগুলো সম্পাদন করো। রাতে যখন বিছানায় যাবে, তখন তেত্রিশবার সুবহানাল্লাহ, তেত্রিশবার আলহামদুলিল্লাহ ও চৌত্রিশবার আল্লাহু আকবার, মোট একশত তাসবীহ পাঠ করা তোমার জন্য খাদেমের চেয়ে উত্তম। ফাতেমা রাযি. বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর প্রতি সন্তুষ্ট।"[৫২৬]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বলেন-

مر بي رسول الله ﷺ وأنا أطين حائطا لي أنا وأمي، فقال: ما هذا يا عبد الله! فقلت: يا رسول الله! شيء أصلحه. فقال: الأمر أسرع من ذلك.

"আমি ও আমার মা ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। দেখে জিজ্ঞেস করলেন, হে আব্দল্লাহ! কী করছো? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! ভাঙ্গা দেয়াল মেরামত করছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, মৃত্যু তার চেয়ে অধিক দ্রুত আসবে।"[৫২৭]

[৫২৬] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৫০৬৩
[৫২৭] সুনানে আবু দাউদ: ৪/২২২৪ হাদীস নং ৫২৩৫

সংসার গোছানো বিবাহের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত

বিবাহ অর্থই একটি সংসার গড়া। নানাবিধ কাজ ও দায়িত্বের সমন্বয়েই একটি সংসার চলতে থাকে। এখানে একজন নিষ্ক্রিয় থাকবে আর একজন খেটে মরবে তা খুবই বেমানান। এছাড়া স্ত্রীকে আল্লাহ তা'আলা স্বামীর মিরাছের অংশ দিয়ে এটা বুঝিয়েছেন যে, স্ত্রী নিষ্ক্রিয় নয়। স্বামীর সংসারে তাঁর রয়েছে ব্যাপক ভূমিকা। ঘর-বাড়ি গোছানো, ছেলে-সন্তান লালন-পালন, আরো অনেক দায়িত্ব। তাই তো দুধ পান করানোর জন্য অন্যত্র ব্যবস্থা না হলে বা স্বামীর সামর্থ্য না থাকলে স্ত্রীর জন্য নিজ সন্তানকে দুধ পান করানো ও লালন-পালন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। তবে সবই হতে হবে সাধ্যের সীমারেখার মাঝে। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো। আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ قال: ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা সকলে দায়িত্বশীল। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। সুতরাং শাসক দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর ব্যক্তি তার পরিবারের দায়িত্বশীল, সে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। আর স্ত্রী আপন স্বামীর ঘরোয়া বিষয় ও সন্তানের দায়িত্বশীল, সে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[৫২৮]

সম্পদ হেফাজত ও অন্যান্য সাংসারিক কাজ আঞ্জাম দেয়াও বিবাহের একটি বড় উদ্দেশ্য, যা হাদীস থেকেও বুঝা যায়। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

إنما كانت المتعة في أول الإسلام كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شيه حتى إذا نزلت الآية ﴿إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَٰجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُهُمْ﴾

"ইসলামের সূচনাকালে 'নিকাহে মুত'আ' বৈধ ছিলো। কেননা লোকেরা অপরিচিত দূর এলাকায় সফরে যেতো। অতঃপর সেখানে কোনো মহিলাকে বিবাহ করে তার কাছে থাকতো। আর স্ত্রী তার সম্পদ হেফাজত করতো এবং তার জন্য খাবার প্রস্তুত করতো। অবশেষে যখন এ আয়াত নাযিল হয়, 'তবে তাদের স্ত্রী ও অধিনস্ত বাঁদিরা ব্যতীত' (তখন থেকে 'মুত'আ বিবাহ' নিষিদ্ধ হয়ে যায়)।"[৫২৯]

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার হয় যে, বিবাহের উদ্দেশ্য শুধু চাহিদা পূরণ নয়। বরং স্ত্রী সংসারকে আগলে রাখবে এটাও বিবাহের উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত। যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি.

[৫২৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৬০৫
[৫২৯] জামে তিরমিযী: ৩/২৮০, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

غزوت مع رسول الله ﷺ وقد كان رسول الله ﷺ قال لي حين استأذنته: ما تزوجت أبكرا أم ثيبا؟ فقلت له: تزوجت ثيبا، قال: أفلا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها؟ فقلت له: يا رسول الله! توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار، فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن، فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن، فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. وفي رواية: فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن. قال: فبارك الله لك أو قال لي خيرا. وفي رواية أخرى: امرأة تقوم عليهن وتمشطهن قال: أصبت.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে যুদ্ধ অভিযানে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে ঘরে ফেরার অনুমতি চাইলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি 'বাকেরা মেয়ে' (কুমারী) বিবাহ করেছো না 'সাইয়িবা মহিলা' (বিধবা)? উত্তরে বললাম, 'সাইয়িবা মহিলা' বিবাহ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন 'বাকেরা মেয়ে' কেন বিবাহ করনি? তাহলে তোমরা পরস্পর অনেক আমোদ ফূর্তি করতে পারতে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা-মাতা আমার ছোট ভাই-বোন রেখে শহীদ হয়ে গেছেন। এ অবস্থায় তাদের অনুরূপ বাকেরা মেয়ে বিবাহ করতে অপছন্দ করি। কেননা সে তাদের শিষ্টাচার ও দেখাশোনা করতে পারবে না। তাই সাইয়িবা মহিলা বিবাহ করেছি, যেন সে তাদের দেখাশোনা ও শিষ্টাচার শেখাতে পারে।"[৫৩০]

এ হাদীসে হযরত জাবের রাযি. এর বর্ণনা আরো জোরালো। তাকে রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞেস করেছেন, বাকেরা কেন বিবাহ করনি। তিনি উত্তরে বলেছেন, আমার ঘরে কাজ আছে, ছোট বোন আছে, তাদের দেখা-কোনো ও অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিতে হবে। আর এজন্য তালাকপ্রাপ্ত মেয়ে বিবাহ করাই সমীচীন ছিলো। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সমর্থন করে আর কিছু বলেননি। বরং বরকত ও কল্যাণের দু'আ করেছেন।

এখান থেকে দুটি বিষয় বোঝা যায়। ১. ঘরের কাজ স্ত্রী করবে- এটাই স্বাভাবিক নিয়ম ছিলো। এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে যদি আমরা হযরত খাদীজা রাযি. এর কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করি। রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঁচু পাহাড়ের গুহায় (গারে হেরা) ইবাদতরত থাকতেন, হযরত খাদীজা রাযি. মহিলা হয়েও পাহাড়ে উঠে স্বামীর খাবার পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতেন। বলাবাহুল্য যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ স্ত্রীর প্রতি জুলুম করেননি। খাদীজা রাযি. যা করেছেন তা সেই পরিবেশের সামঞ্জস্য পূর্ণ ছিলো। ২. রাসূলুল্লাহ ﷺ তার কথা শুনে সমর্থন করেছেন এতেই বিষয়টি আরো জোরালো হয় যে, মহিলাদের স্বামীর বাড়ির কাজ করতে হবে। এ ধরনের আলোচনা আরো অনেক হাদীসে রয়েছে। এ ছাড়া কোথাও এমন পাওয়া যায় না যে, রাসূল ﷺ স্ত্রী থেকে কাজ নিতে নিষেধ করেছেন, বা সামর্থ্য না থাকা সত্ত্বেও কাউকে স্ত্রীর জন্য খাদেম রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। আর রাসূলের ঘর এক্ষেত্রে উত্তম আদর্শ।

[৫৩০] সহীহ মুসলিম: ২/৫২৫, হাদীস নং ৭১৫

ফিক্‌হের আলোকে

পূর্বের আলোচনার পর এ বিষয়টি পরিষ্কার করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়ায় যে, ফিকহের কিতাবে স্ত্রীর জন্য খাদেম নিযুক্ত করার যে কথা আছে তা কোনো পর্যায়ের? এ বিষয়ে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

খাদেম দেয়ার কথা মূলত নাফাকার (খোরপোশ) সাথে সম্পৃক্ত। নাফাকা যেভাবে স্ত্রীর প্রয়োজন পূরণের খাতিরে করা হয়, ঠিক খাদেমের ব্যবস্থাও তার অন্তর্ভুক্ত। তাও যদি সামর্থ্য থাকে। যেমন কুদুরীর কিছু নুসখাতে উল্লেখ আছে-

تفرض على الزوج إذا كان مؤسرا نفقة خادمها.

"সামর্থ্যবান স্বামীর উপর স্ত্রীর খাদেমের ভরণ-পোষণ দেয়াও আবশ্যক।"[৫৩১]

ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

وجهه أن كفايتها واجبة عليه، وهذا من تمامها، إذ لا بد لها منه.

"স্ত্রীকে তার প্রয়োজন পরিমাণ জিনিস দেয়া স্বামীর উপর আবশ্যক। আর খাদেম প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। কেননা স্ত্রীর (খেদমতের) জন্য খাদেম আবশ্যক।"[৫৩২]

তিনি আরো বলেন-

وقوله في الكتاب: إذا كان مؤسرا، إشارة إلى أنه لا تجب نفقة الخادم عند إعساره، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، وهو الأصح، خلافا لما قاله محمد، لأن الواجب على المعسر أدنى الكفاية، وهي قد تكتفي بخدمة نفسها.

"কিতাবে إذا كان مؤسرا (যদি স্বামী সামর্থ্যবান হয়) এ কথা বলে এ দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দরিদ্র স্বামীর উপর স্ত্রীর খাদেমের ভরণ-পোষণ আবশ্যক নয়। এটি আবু হানীফা রাহ. এর সূত্রে হাসান রাহ. এর বর্ণনা। এটি অধিক সহীহ। তবে মুহাম্মদ রাহ. এর বিপরীত বলেছেন। বিশুদ্ধতম মতের কারণ হলো, দরিদ্র স্বামীর উপর শুধু প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো দেয়া আবশ্যক, যা না হলেই নয়। আর খাদেমের বিষয়টি এমন নয়।"[৫৩৩]

উপরের আলোচনা থেকে অবস্থাভেদে স্ত্রীর খোরপোশের কয়েকটি স্তর নির্ণয় হয়। বোঝার সুবিধার্থে কয়েক স্তরে আলোচনা করা হলো।

ক. كفايتها واجبة عليه

খ. بالمعروف

গ. إيسار وإعسار

---

[৫৩১] হেদায়া: ২/৪৩৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৫৩২] হেদায়া: ২/৪৩৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৫৩৩] হেদায়া: ২/৪৩৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

নিম্নে প্রত্যেকটি সম্পর্কে কিছু আলোচনা পেশ করা হলো।

ক. বিবাহ করার সাথে সাথে স্ত্রীর কিফায়াত বা প্রয়োজনীয় বিষয়াদির আঞ্জাম দেয়া। অর্থাৎ একজন স্ত্রী স্বামীর বাড়িতে থাকার জন্য যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। তবে এটা ব্যাপক নয়। বরং পরিবেশ ও সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখেই এর দায়-দায়িত্ব বর্তাবে। যে যে পরিবেশের, তার জন্য ঐ পরিবেশ হিসেবে কিফায়াত (যথেষ্ট পরিমাণ)। এমনিভাবে স্বামীর সামর্থ্য যেমন কিফায়াত (যথেষ্ট পরিমাণ খোরপোশ) তেমনই হবে। সুতরাং কোনো মহিলা পিতার ঘরে নিজে কাজ করতে অভ্যস্ত হলে খাদেম নিযুক্ত করা তার কিফায়াতের মাঝে শামিল হবে না এবং নিজের হক হিসেবে সে তা দাবিও করতে পারবে না।

আর যে মহিলা নিজ বাড়িতে নিজে কাজ না করে খাদেমের মাধ্যমে কাজ করা অভ্যস্ত, সে সামর্থ্যবান স্বামীর নিকট খাদেম দাবি করতে পারে।

ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. ফকীহ্ আবুল লাইছ সামারকান্দী রাহ. এর উক্তি উল্লেখ করেছেন-

وذكر الفقيه أبو الليث رحمه الله أن هذا إذا كان بها علة، لا تقدر علي الطبخ والخبز، أو كانت من بنات الأشراف. فأما إذا كانت تقدر علي ذلك، وهي ممن تخدم بنفسها، تجبر علي ذلك.

"এই হুকুম (স্ত্রীকে স্বামীর ঘরের খেদমতে বাধ্য না করা) প্রযোজ্য হবে যদি স্ত্রী এমন অসুস্থ হয় যে, রান্না ইত্যাদি করতে অক্ষম, বা অভিজাত পরিবারের মেয়ে। আর যদি সে কাজকর্ম করতে পারে এবং সে এমন পরিবারের মেয়ে, যে নিজের কাজ নিজে করে অভ্যস্ত, তখন তাকে (স্বামীর) খেদমতের জন্যে বাধ্য করা হবে।"[৫৩৪]

ফাতাওয়ায়ে ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে-

امرأة منكوحة أو معتدة أبت أن تطبخ، أو تخبز، إن كانت المرأة لها علة، لا تقدر علي الطبخ، أو الخبز، أو كانت من بنات الأشراف، فعلي الزوج أن يأتيها بمن يطبخ ويخبز، لأنها غير متعنتة. وأما إذا كانت تقدر، وهي ممن يخدم بنفسها تجبر، لأنها متعنتة. فإن رسول الله ﷺ جعل الخدمة التي هي داخل البيت علي المرأة. كذا قضي بين علي وفاطمة رضي الله عنهما.

"বিবাহিতা বা 'ইদ্দত' পালনরত স্ত্রী রান্না-বান্না করতে অস্বীকার করলো, এখন তার যদি এমন কোনো সমস্যা থাকে যে, রান্না ইত্যাদি করতে পারে না বা সে অভিজাত পরিবারের মেয়ে, তাহলে স্বামীর উপর রান্নার জন্য খাদেমের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। কেননা স্ত্রী (এ বিষয়ে) জেদী নয়। আর যদি সে কাজ করতে পারে এবং সে এমন পরিবারের মেয়ে যে, নিজের কাজ নিজে করে, তাহলে তাকে (কাজ করার জন্য) বাধ্য করা হবে, কেননা সে জিদকারী। এর কারণ হলো, রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ঘরোয়া কাজ কর্মের দায়িত্ব স্ত্রীর উপর

[৫৩৪] বাদায়েউস সানায়ে: ৩/৪৩০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৪৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; দ্রষ্টব্য, ফাতাওয়ায়ে কাযীখান: ১/২৫৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

দিয়েছেন। হযরত আলী ও ফাতেমা রাযি. এর মাঝে এভাবেই ফায়সালা করেছেন।"[৫৩৫]

তাই এ কথা বলা সঠিক নয় যে, বিবাহ করলেই স্ত্রীর জন্য খাদেমের ব্যবস্থা করতে হবে। কোনো স্ত্রী যদি মনে করে যে, সংসারে তার কোনো দায়িত্ব নেই। সে শুধু স্বামীর জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। আর বাকি সব কাজ স্বামী আঞ্জাম দিবে, তাহলে একেবারেই অযৌক্তিক।

স্বামীর উপর যেভাবে নাফাকা (খোরপোশ) ওয়াজিব, সুকনার (বাসস্থান) ব্যবস্থাও ওয়াজিব। কিন্তু আমাদের পরিবেশে স্ত্রীর জন্য স্বতন্ত্র রুমের ব্যবস্থা করার প্রচলন নেই। সাধারণত স্বামী স্ত্রী এক ঘরেই অবস্থান করে থাকে। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো স্ত্রী ভিন্ন কামরার দাবি করে না। কারণ সবাই এ কথা বুঝে নিয়েছে যে, এ পরিবেশে সুকনা এভাবেই। আর এটাই তার জন্য 'কিফায়াত' বা যথেষ্ট পরিমাণ। কিফায়াতের আলোচনা আরো পরিষ্কার হবে, যদি আমরা ঐ আয়াতগুলো দেখি যেখানে নাফাকা ও সুকনাকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে উরফের[৫৩৬] সাথে।

খ. بالمعروف **:** অনেক আয়াতেই স্ত্রীর নাফাকা ও সুকনার আলোচনাকে উরফের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ

"আর পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর অধিকার রয়েছে, তেমন স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর নিয়মানুযায়ী।"[৫৩৭]

এ আয়াতে بالمعروف শব্দ ব্যবহার করে পরস্পরের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে এমন সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে। বলা হচ্ছে যে, অধিকার প্রচলিত ন্যায়নীতির ভিত্তিতে হতে হবে। কারণ 'মারূফ' শব্দের অর্থ এমন বিষয় যা শরী'আত অনুযায়ী নাজায়েয নয় এবং সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী যাতে কোনো ধরনের জবরদস্তি বা বাড়াবাড়ি নেই।

সারকথা, স্বামী-স্ত্রীর অধিকার সংরক্ষণ এবং তাদেরকে কষ্ট থেকে রক্ষা করার জন্য নিয়ম জারি করাই যথেষ্ট নয়, বরং প্রথা প্রচলনের প্রতিও লক্ষ্য রাখতে হবে। প্রথা অনুযায়ী কারো আচরণ অন্যের পক্ষে কষ্টের কারণ হলে তা জায়েয হবে না। যদি কোরআনের এ শিক্ষার উপর আমল করা হয়, তাহলে ঘরে বাইরে সারা বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলা বিরাজ করবে এবং ঝগড়া-বিবাদ চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।[৫৩৮]

গ. 'কিফায়াত' ও 'উরফ' উভয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ফুকাহায়ে কেরাম নাফাকাকে দুই ভাগে ভাগ করে থাকেন। সচ্ছল ব্যক্তির নফকা এবং অসচ্ছল ব্যক্তির নাফাকা। সবার জন্য এক প্রকারের নাফাকা নয়। যে যে ধরনের পরিবার ও পরিবেশে থাকে সে সে ধরনের নাফাকাই

---

[৫৩৫] আল ফাতাওয়াল ওয়ালওয়ালিজিয়্যা: ১/৩৮৫, মাকতাবায়ে দারুল আইমান

[৫৩৬] যে সমাজে বা দেশে সে আছে সেখানকার সুস্থ রুচিবান ব্যক্তিদের মাঝে যে বিষয়টির স্বাভাবিক প্রচলন রয়েছে তাকেই 'উরফ' বলে।

[৫৩৭] সূরা বাকারা: ২২৯

[৫৩৮] সংক্ষিপ্ত বাংলা মা'আরেফুল কুরআন: ১২২-১২৪; তাফসীরুল মানার: ২/৩০৫

পাবে। তাও স্বামীর সামর্থ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে। মোটকথা সুনির্দিষ্ট কোনো পর্যায় নেই যা বহাল রাখতেই হবে। বরং স্বামী স্ত্রী, পরিবার ও পরিবেশ সব কিছু লক্ষ্য রেখেই নাফাকা, সুকনা নির্ধারিত হবে। আর খাদেমের বিষয় তো নাফাকার সাথেই সম্পৃক্ত।

মোটকথা, স্বামীর দায়িত্ব পরিবারের সদস্যদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। স্ত্রীর দায়িত্ব স্বামীর সহযোগিতা করা। ঘরোয়া কাজ আঞ্জাম দেয়া। হ্যাঁ, স্বামী যদি সচ্ছল ও সামর্থ্যবান হয় এবং স্ত্রী পিত্রালয়ে খাদেমের সহযোগিতা নিতে অভ্যস্ত হয়, তাহলে স্বামীর কর্তব্য হলো তার জন্য খাদেমের ব্যবস্থা করা। আর সর্বাবস্থায় প্রতি কাজে থাকবে ইনসাফ ও উত্তম আদর্শ। পরিশেষে আল্লামা আব্দুল হামিদ মাহমুদ তহমায রাহ. এর বক্তব্য উল্লেখ করা হলো।
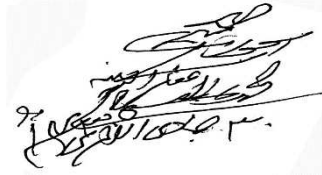
ومن طاعة الزوجة لزوجها أن تقوم بأعمال البيت المختلفة، وأن تسعي لتأمين راحة زوجها في بيته، فتحضرله طعامه، وتغسل ثيابه، وترتب متاعه إلي غير ذلك من أعمال البيت المختلفة. فالزوج مكلف بالعمل والاكتساب خارج البيت. والمرأة مكلفة بأعمال البيت في داخله. هكذا يتم التعاون بين الزوجين، وتنتظم معيشتهما، وإلا فسد الحال بينهما.

“এটাও স্ত্রী স্বামীর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত যে, সে ঘরের বিভিন্ন কাজকর্ম সম্পাদন করবে এবং ঘরে স্বামীর আরাম আয়েশের জন্য চেষ্টা করবে। তার খাবার প্রস্তুত করবে। কাপড় পরিষ্কার করবে। আসবাবপত্র গুছিয়ে রাখবে। এছাড়া ঘরের অন্যান্য কাজ আঞ্জাম দিবে। বাইরের কাজকর্ম ও উপার্জনের দায়িত্ব স্বামীর এবং ঘরোয়া কাজকর্মের দায়িত্ব স্ত্রীর। এভাবেই স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারিক সহযোগিতা পরিপূর্ণ হবে ও তাদের দাম্পত্য জীবন সুন্দর ও সুখী হবে। এর ব্যতিক্রম হলে তাদের মাঝে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি বিরাজ করবে।”[৫৩৯]
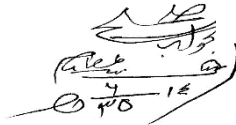
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৫৩৯] আল ফিক্হুল হানাফী ফী ছাওবিহীল জাদীদ: ২/১৩৬

তালাক ও ডিভোর্সের শর'য়ী বিধান

মাওলানা কাউসারুদ্দীন চকরিয়া

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ দ্বীন ও জীবন ব্যবস্থা। এর অন্যতম সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্যসমূহ হলো- ইসলাম মানুষের স্বভাব ও চাহিদাকে সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করে না; বরং তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তাই ইসলাম অন্যান্য বিধানের মত তালাকের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ পথ অবলম্বন করেছে। একদিকে যেমন বৈধ পন্থায় স্বভাবজাত চাহিদা পূরণ করার ব্যবস্থা হিসেবে বিবাহের বিধান রেখেছে, অন্যদিকে এই চাহিদা পূরণের অবৈধ পন্থা ব্যভিচারকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। কখনো কখনো সংসার জীবনে স্বামী-স্ত্রীর আন্তরিক সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি হওয়াটাও বিচিত্র কিছু নয়, তাই বৈবাহিক সম্পর্ক বহাল রাখার উপর যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করলেও একান্ত প্রয়োজনে রেখেছে তালাকের বিধান।

ইসলামে তালাকের অবস্থান

যেহেতু নারী-পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্কের উপর গোটা মানবজাতির অস্তিত্ব নির্ভরশীল, তাই সম্ভাব্য যে কোনো উপায়ে এমনকি প্রয়োজনে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে হলেও ইসলাম স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্ক ও পারিবারিক বন্ধন রক্ষা করতে উৎসাহ দিয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথার কারণে এ বন্ধন ছিন্ন হওয়া ইসলামে কখনো কাম্য নয়। কিন্তু অনেক সময় অবস্থা এমন গুরুতর আকার ধারণ করে যে, বিবাহ বহাল রাখার কোনো উপায় থাকে না। বরং উভয়ের জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ, তিক্ত ও বিষাক্ত। তখন বাস্তবতার অনিবার্য প্রয়োজনে ইসলাম বিবাহ বিচ্ছেদ তথা তালাকের অনুমোদন দিয়েছে। সুতরাং তালাকের বিধান প্রণয়নের মাধ্যমে ইসলাম কারো উপর জুলুম করেনি বরং মানবিক অধিকার সুনিশ্চিত করেছে।

তালাকের অধিকার কার ও কেন?

নারী-পুরুষ উভয়কে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ। উভয়ের বিবেক, বুদ্ধি ও যোগ্যতা সম্বন্ধে একমাত্র তিনিই পূর্ণরূপে অবগত। তিনি উভয়ের মধ্যে তালাক প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছেন স্বামীকে; স্ত্রীকে নয়। আর এর পেছনে অবশ্যই রয়েছে হিকমত বা গূঢ়রহস্য, তা মানুষের বোধগম্য নাও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নারীজাতি সৃষ্টিগতভাবে দুর্বল মেধা সম্পন্ন'। এছাড়া আবেগ তাড়িত হওয়ায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী স্বভাবগত দুর্বল। তাই ঝুঁকিপূর্ণ কোনো সিদ্ধান্ত নেয়ার ভার তার উপর ছেড়ে না দেয়াই যুক্তিযুক্ত। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

قال في الفتح: ومنها أي من محاسنه جعله بيد الرجال دون النساء، لا ختصاصهن بنقصان العقل، وغلبة الهوى، ونقصان الدين.

"দ্বীন ও বিবেক বুদ্ধির অসম্পূর্ণতা ও কুপ্রবৃত্তির আধিক্যের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ক্ষমতা অর্পণ না করে স্বামীর হাতে অর্পণ করা শ্রেয় ও অধিক যুক্তিযুক্ত।"[৫৪০]

[৫৪০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৪২৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

অধিকন্তু কুরআন পাকে তালাকের বিধান সম্বলিত আয়াতসমূহে তালাকের সম্বোধন স্বামীর দিকে করা হয়েছে; স্ত্রীর দিকে নয়। ইরশাদ হচ্ছে-

وَإِنْ عَزَمُوا۟ ٱلطَّلَٰقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

"আর যদি তারা (পুরুষেরা) তালাক দেয়ার সংকল্প করে তবে আল্লাহ তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"[৫৪১]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ

"যখন তোমরা স্ত্রীকে তালাক দাও এবং তারা 'ইদ্দত' পূর্তির নিকটবর্তী হয় তখন তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে দিবে অথবা বিধিমত মুক্ত করে দেবে।"[৫৪২]

উক্ত আয়াতদ্বয়সহ কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে[৫৪৩] তালাক প্রদানের ক্ষমতার বিষয়ে শুধুমাত্র পুরুষকে সম্বোধন করা হয়েছে। স্ত্রী বা অন্য কারো দিকে করা হয়নি। তাই স্ত্রী বা কোনো শ্রেণীর তালাক দেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। তালাক দেয়ার ক্ষমতা বা অধিকার একমাত্র স্বামীর।

তালাকপূর্ব করণীয় ও তালাক দেয়ার পদ্ধতি

তালাক প্রদানের পদ্ধতিতে ইসলাম অত্যন্ত সতর্কতামূলক মানবিক পন্থা অবলম্বন করেছে এবং পুরো প্রক্রিয়ায় উভয় পক্ষের শুভবুদ্ধির উদয়ের এবং পুনরায় দাম্পত্য সম্পর্কে ফিরে আসার সুযোগ রেখেছে। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদেরকে সদুপদেশ দাও, তারপর তাদের শয্যা বর্জন করো এবং তাদেরকে প্রহার করো (যা সীমাতিরিক্ত হবে না)। যদি এতে তারা তোমাদের অনুগত হয় তবে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অন্বেষণ করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহান, শ্রেষ্ঠ। আর তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশঙ্কা করলে তোমরা স্বামীর পরিবার হতে একজন ও স্ত্রীর পরিবার হতে একজন সালিস নিযুক্ত করবে। তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চাইলে আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।"[৫৪৪]

---

[৫৪১] সূরা বাকারা: ২২৭
[৫৪২] সূরা বাকারা: ২৩১
[৫৪৩] সূরা বাকারা: ২২৯, ২৩০ ও ২৩১
[৫৪৪] সূরা নিসা: ৩৪-৩৫

উক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট যে, একান্ত প্রয়োজনে স্ত্রীকে তালাক প্রদানের পূর্বে চারটি স্তর অবলম্বন করবে। প্রথম পর্যায়ে নম্রভাবে তাকে বুঝানো বা নসীহত করা, এতে যদি স্ত্রী সংশোধন না হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে তার বিছানা পৃথক করে দেয়া। যেন সে স্বামীর অসন্তুষ্টি উপলব্ধি করে নিজের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়। যদি এতেও সংশোধন না হয়, তাহলে তৃতীয় পর্যায়ে তাকে হালকাভাবে প্রহার করা (যাতে শর'য়ী সীমা লঙ্ঘন না হয়। যেমন, চেহারায় আঘাত না করা, শরীরে দাগ কাটে এমন প্রহার না করা)।

উপরোক্ত পদ্ধতিসমূহের উপর আমল করার পরও যদি সংশোধন না হয়, তাহলে চতুর্থ পর্যায়ে উভয়ের অভিভাবকদের মধ্য হতে নির্ভরযোগ্য দু'জন ব্যক্তিকে সালিশ নিযুক্তের মাধ্যমে তাদের মাঝে সমঝোতার চেষ্টা করা। তবে সেক্ষেত্রে উত্তম হলো, উভয়ের অভিভাবক, একজন করে বিজ্ঞ আলেম বা মুফতী অথবা শর'য়ী মূলনীতি বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিকে বিচারক নির্বাচন করবে, যাঁরা উভয়ের অভিযোগ শোনে ইনসাফের সাথে সমঝোতা করে দেবেন। (উপরোক্ত সমস্ত পন্থা অকার্যকর হলে শর'য়ী নিয়ম মোতাবেক তালাকের পথ অবলম্বন করতে পারবে।) তালাক দেয়ার শর'য়ী নিয়ম হলো- 'হায়েয' পরবর্তী সহবাসমুক্ত 'তুহুরে' (পবিত্রাবস্থায়) প্রথমে এক তালাকে রজয়ী দিবে; এর বেশি নয়। তারপর স্ত্রীর সাথে মেলামেশা না করে তাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিবে এবং তার অবস্থা লক্ষ্য করতে থাকবে। যদি স্ত্রী অনুতপ্ত হয়ে পূর্বের ন্যায় সংসার করতে ইচ্ছা পোষণ করে তাহলে স্বামী-স্ত্রী সূলভ যে কোনো আচরণ (যেমন, আলিঙ্গন বা সহবাস ইত্যাদি) এর মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে তার সাথে ঘর সংসার করা যাবে। এরপর আর তালাক না দিয়ে রেখে দিবে। আর যদি এক 'তালাকে রাজয়ী' দেয়ার পরে ইদ্দতের মধ্যে স্বামী-স্ত্রী সূলভ আচরণ না করে- এভাবে ইদ্দত শেষ হয়ে যায়, তাহলে এমনিতেই 'তালাকে বায়েন' পড়ে যাবে। তখন স্ত্রী চাইলে অন্যত্র বিবাহ বসতে পারবে। আর স্বামীর জন্য নববিবাহের মাধ্যমে উক্ত মহিলাকে গ্রহণ করার সুযোগ থাকবে। উল্লেখ্য যে, কোনোক্রমেই একত্রে বা ভিন্নভাবে তিন তালাক দেয়া উচিত নয়। কারণ এতে স্ত্রী 'শর'য়ী হীলা' ব্যতীত হারাম হয়ে যায়। নববিবাহের মাধ্যমেও তাকে আর ফিরিয়ে নেয়া যায় না। তখন আফসোস আর পরিতাপের কোনো সীমা থাকে না।

তালাকের প্রকারভেদ

প্রদান করার দিক থেকে তালাক তিন ভাগে বিভক্ত। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

الطلاق على ثلاثة أوجه: حسن وأحسن وبدعي، فالأحسن أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، ويتركها حتى تنقضي عدتها...والحسن هو طلاق السنة وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة أطهار...وطلاق البدعة أن يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة أو ثلاثا في طهر واحد، فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا.

"তালাক তিন প্রকার। (এক) 'তালাকে আহসান' বা সর্বোত্তম তালাক। এমন 'তুহুরে' (পবিত্রতায়) এক তালাক দেয়া, যাতে স্বামী-স্ত্রীর সহবাস হয়নি। এরপর কোনো তালাক না

দেয়া যাতে ইদ্দত শেষ হলে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। (দুই) 'তালাকে হাসান' যাকে সুন্নাত তালাকও বলা হয়। তা হলো তিন 'তুহুরে' আলাদাভাবে তিন তালাক প্রদান করা। (তিন) 'তালাকে বিদ'আত' তথা নাজায়েয তালাক। আর তা হলো- এক সাথে এক বাক্যে তিন তালাক দেয়া (যেমন, 'তোমাকে তিন তালাক দিলাম' বলা)। তেমনি এক 'তুহুরে' ভিন্ন ভিন্ন শব্দে তিন তালাক দেয়া, কিংবা মাসিক চলাকালীন বা এমন পবিত্রতায় তালাক দেয়া যাতে স্বামী-স্ত্রীর মিলন হয়েছে, এক বা একাধিক তালাক হোক না কেন। উপরোক্ত সকল প্রকার তালাক প্রদান নাজায়েয হলেও তালাক হয়ে যাবে।"[৫৪৫]

পরিণাম হিসেবে তালাক তিন প্রকার

১.'তালাকে রাজয়ী' অর্থাৎ এমন তালাক যে তালাকের পর ইদ্দত শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিবাহ বহাল থাকে এবং ইদ্দতের ভেতর নতুন করে বিবাহ করা ব্যতীত স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। আর ইদ্দত শেষ হয়ে গেলে সম্পূর্ণরূপে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যায়। তবে পুনরায় নতুন মোহর ধার্য করে উক্ত মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যাবে।

২.'তালাকে বাইন' অর্থাৎ এমন তালাক যার দ্বারা বিয়ে ভেঙ্গে যায় কিন্তু উভয়ে সম্মত হলে মোহর ধার্য করে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যায়।

৩. 'তালাকে মুগাল্লাযা' অর্থাৎ স্ত্রীকে তিন তালাক দেয়া। যার কারণে স্ত্রী সম্পূর্ণরূপে হারাম হয়ে যায়। শর'য়ী হালালা[৫৪৬] ব্যতীত তাকে নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনা যায় না।

উকিলের মাধ্যমে তালাক প্রদান

স্বামী যদি কাউকে উকিল বানিয়ে বলে যে, আপনি আমার স্ত্রীকে তালাক দিন। তখন সে উকিল হিসেবে যত তালাক দেয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়, তার স্ত্রীকে তত তালাক দিতে পারবে। কিন্তু তালাক দেয়ার পূর্বেই যদি তার ওকালতি বাতিল করে দেয় তখন তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার অধিকার থাকবে না।

পোস্টকার্ড ও টেলিফোনের মাধ্যমে তালাক

পোষ্টকার্ড ও টেলিফোনের মাধ্যমে তালাক দিলে তালাক হয়ে যাবে। যদি স্ত্রী সম্পূর্ণ নিশ্চিত হয় যে, এটা স্বামীর চিঠি বা তালাক প্রদানকারী তার স্বামী বা স্বামীর স্বীকারোক্তি।[৫৪৭]

অস্বাভাবিক অবস্থায় তালাকের বিধান

তালাক অধ্যায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, অনিবার্য প্রয়োজনে তালাক প্রদানের জন্য শরী'আতের নির্ধারিত পূর্বোক্ত সুন্দর ব্যবস্থা উপেক্ষা করে কেউ যদি রাগের মাথায়, কিংবা হাস্যোচ্ছলে অথবা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক প্রদান করে তাহলে তার কী হুকুম? এ সম্পর্কে ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও তাঁর অনুগামী সকল ইমাম ও ফকীহ একমত যে, হেসে কেঁদে,

---

[৫৪৫] হেদায়া: ২/৩৫৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৫৪৬] তালাকের 'ইদ্দত' শেষ হওয়ার পর অন্যত্রে বিবাহ হতে হবে এবং দ্বিতীয় স্বামীর সাথে সহবাস হতে হবে। পরবর্তীতে দ্বিতীয় স্বামী তালাক দিলে বা মৃত্যুবরণ করলে 'ইদ্দত' পালনের পর প্রথম স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। -মুখতাসারুল কুদুরী: ৩৭৭, মুআস্সাসাতুর রাইয়ান, বৈরুত, লেবানন

[৫৪৭] আশরাফুল ফাতাওয়া: ৩/৮০, মাকতাবায়ে সমাদিয়া, চট্টগ্রাম

নরমে-গরমে যেভাবেই তালাক দেবে তা কার্যকর হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, মানুষ সাধারণত রাগের বশেই তালাক দিয়ে থাকে। তাই রাগ থাকাটা তালাক হওয়ার ব্যাপারে প্রতিবন্ধক নয়। কিন্তু রাগ হলে মানুষের কখনো এমন অবস্থা হয় যে, সে বোধ, বুদ্ধি ও জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে। ফলে সে এমন কিছু আচরণ ও উচ্চারণ করে থাকে যা একজন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ করতে পারে না। আর এ জ্ঞানশূন্য অবস্থায় যদি সে তালাক দেয় এবং শর'য়ী সাক্ষ্য বা তালাকদাতার কসম করার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, তালাক দেয়া অবস্থায় তার হুশ ছিলো না, তাহলে তালাক পতিত হবে না। আর যদি শর'য়ী সাক্ষ্য বা নিজের কসমের মাধ্যমে তালাক দেয়ার সময় এ অবস্থা প্রমাণিত না হয়, তাহলে তালাক পতিত হয়ে যাবে। তার রাগ যতই থাকুক না কেন তা বিবেচ্য নয়।[৫৪৮]

মুফতী শফী রাহ. মা'আরেফুল কুরআনে বলেন- 'কর্মের পাপ হওয়া কর্মের প্রতিক্রিয়াকে রহিত করতে পারে না, অন্যায় অস্ত্রাঘাত যেমন প্রাণ সংহার করে তেমনি বৈধ পন্থায় ও অবৈধ পন্থায় তালাক প্রদান অনিবার্য বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে।

তাছাড়া বিবাহ ও তালাক এমনই স্পর্শকাতর বিষয় যে, তাতে 'ইচ্ছা' বিবেচ্য নয়, উচ্চারণই বিবেচ্য। সহীহ হাদীসে এসেছে যে, বিবাহ, তালাক ও গোলাম আযাদ- এই তিনের অর্থপূর্ণ উচ্চারণও অর্থপূর্ণ এবং পরিহাসপূর্ণ উচ্চারণও অর্থপূর্ণ। পরিণাম ও পরিণতি বিবেচনা না করে তালাকের মত অতি স্পর্শকাতর বিষয়কে যারা ছেলেখেলায় পরিণত করে তাদের জন্য এটা হলো শরী'আত প্রদত্ত একটি কঠিন মানসিক শাস্তি। তেমনিভাবে একজন নিরীহ নির্যাতিতা স্ত্রীর অসৎ অত্যাচারী স্বামী থেকে রক্ষা পাওয়ার মাধ্যমও বটে।[৫৪৯]

জোরপূর্বক তালাক প্রদান

যদি কাউকে জোরপূর্বক তালাক প্রদানে বাধ্য করা হয়, আর সে বাধ্য হয়ে মৌখিকভাবে তালাক দেয়, তাহলে তার তালাক পতিত হবে। কেননা সে জোর প্রয়োগের সময় দু'টি অপ্রত্যাশিত কাজের সম্মুখীন হয়েছে। ১. নিজের জীবন বিপন্ন করা। ২. স্ত্রীকে তালাক দেয়া। তালাক প্রদানের মাধ্যমে সে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়টি একপ্রকার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে। সুতরাং তা তার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় তালাক হিসাবে গণ্য হয়ে তালাক পতিত হয়ে যাবে। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

وكذلك المكره مختار في التكلم اختيارا كاملا في السبب إلا أنه غير راض بالحكم لأنه عرف الشرين فاختار أهونهما عليه.

"এমনিভাবে 'মুকরাহ' ব্যক্তি (অর্থাৎ যাকে তালাক দিতে বাধ্য করা হয়েছে) অনিচ্ছা সত্ত্বেও তালাক শব্দ উচ্চারণ করার ব্যাপারে পূর্ণ ইখতিয়ার রাখে, তাই তার তালাক পতিত হবে। কেননা সে জোর প্রয়োগের সময় দু'টি অপ্রত্যাশিত কাজের সম্মুখীন হয়েছে। (১. নিজের

---

[৫৪৮] আশরাফুল ফাতাওয়া: ৩/৮৭, মাকতাবায়ে সমাদিয়া, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম

[৫৪৯] উক্ত বিষয়সমূহের প্রমাণাদি পেতে নিম্নে বর্ণিত কিতাবসমূহ দেখা যেতে পারে। ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৪৫২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ: ২৯/১৮ ওয়ারাতুল আওকাফ ওয়াশ শুউনিল ইসলামিয়া, কুয়েত; হেদায়া: ২/৩৫৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

জীবন বিপন্ন করা। ২. স্ত্রীকে তালাক দেয়া)। অতঃপর সে তালাক প্রদানের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত সহজ বিষয়টি এক প্রকারের স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছে।"[৫৫০]

আর যদি মৌখিক উচ্চারণ ছাড়া জোরপূর্বক স্বাক্ষর করানো হয়, তাহলে তা প্রযোজ্য হবে না। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

فلو أكره على أن يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق، لأن الكتابة أقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولاحاجة هنا.

"যদি কাউকে তালাকনামা লেখার জন্য বাধ্য করার কারণে সে তালাকনামা লিখে দেয়, তাহলে তার স্ত্রী তালাকপ্রাপ্তা হবে না। কেননা, প্রয়োজনের কারণে লেখা কথার স্থলবর্তী হয়। আর এখানে এ জাতীয় কোনো প্রয়োজন নেই।"[৫৫১]

স্ত্রীর তালাক গ্রহণ প্রসঙ্গ

শরী'আত তালাকের অধিকার স্বামীকে প্রদান করলেও স্ত্রীর উপর জুলুম করেনি, বরং তার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করেছে। যেমন-

প্রথমত বিবাহের আক্‌দের সময় তাকে স্বামী থেকে শর্ত করে তালাক গ্রহণের অধিকার দিয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায় যাকে 'তাফবীযে তালাক' বলে।

দ্বিতীয়ত বিবাহের পরে অর্থের বিনিময়ে স্বামী থেকে তালাক গ্রহণের সুযোগ দিয়েছে। শরী'আতের পরিভাষায় যাকে 'খোলাতালাক' বলে। সুতরাং এ দাবির কোনো সুযোগ নেই যে, শরী'আত তালাকের ক্ষমতা একমাত্র স্বামীকে অর্পণ করে জুলুম করেছে।

খোলা তালাকের নিয়ম

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে বনিবনা না হলে এবং স্বামীও তালাক না দিলে স্ত্রীর জন্য স্বামীকে একথা বলা জায়েয আছে যে, আমার নিকট থেকে কিছু টাকা নিয়ে বা আমার মোহরের পাওনা টাকার বিনিময়ে আমাকে মুক্ত করে দাও। জবাবে স্বামী যদি বলে আচ্ছা, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। তাহলে এরূপ উক্তিতে স্ত্রীর উপর এক 'তালাকে বায়েন' পতিত হবে। তখন স্বামীর জন্য স্ত্রীকে নতুন সূত্রে বিবাহ ব্যতীত ফিরিয়ে নেয়ার সুযোগ থাকবে না। (অবশ্য যদি ঐ মজলিসে কিছু না বলে স্বামী উঠে চলে যায় অথবা স্বামী কিছু বলার পূর্বেই স্ত্রী উঠে চলে যায়, তারপর স্বামী বলে, আচ্ছা তোমাকে ছেড়ে দিলাম, এতে খোলা হবে না, কথোপকথন এক জায়গায় হতে হবে) যেহেতু শর্ত হলো পূর্ণ। এ উপায়ে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করাকে 'খোলা তালাক' বলে।

কাবিননামায় 'তাফবীযে তালাক' প্রসঙ্গ

স্বামী প্রদত্ত অধিকারকে বলে স্ত্রীকে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারে। স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে এ অধিকার প্রদান করাকে শর'য়ী পরিভাষায় 'তাফবীযে তালাক' বলে। বিবাহে উভয় পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে শর্তসাপেক্ষে বা বিনাশর্তে উক্ত চুক্তিনামা লিপিবদ্ধ করে রাখতে

---

[৫৫০] ফাতহুল কাদীর: ৩/৪৭০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৫৫১] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৪৪০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

পারে। আমাদের দেশে সরকারীভাবে মুসলিম পারিবারিক বৈবাহিক হিসাব সংরক্ষণের স্বার্থে কাবিননামার প্রবর্তন করা হয়েছে, যা শরী'আত পরিপন্থী নয়। তবে এর ব্যবহার পদ্ধতি সহীহ হতে হবে। আমাদের দেশে প্রচলিত পদ্ধতি অনুযায়ী কাবিননামায় তাফবীযে তালাকের তিনটি পদ্ধতি হতে পারে।

১. বিবাহের পূর্বে কাবিননামা লেখানো। এ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য শর্ত হলো, বিবাহের সাথে সমন্ধ করা। যেমন বলা 'আমি অমুকের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর কাবিননামায় প্রদত্ত কোনো শর্তের খেলাফ করলে, যে কোনো সময় সে নিজের উপর তালাক গ্রহণ করে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারবে।' যদি বিবাহের সাথে সম্বন্ধ না করা হয়, তাহলে উক্ত কাবিননামা কোনো কাজে আসবে না। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

في تنوير الأبصار: وشرط الملك كقوله لمنكوحته إن ذهبت فأنت طالق، أو الإضافة إليه كإن نكحتك فأنت طالق، فلغى قوله لأجنبية إن زرت زيدا فأنت طالق. إلخ

"তালাক সহীহ হওয়ার শর্ত হলো মালিকানা থাকা। যেমন স্বামী স্ত্রীকে বলা, যদি তুমি যাও তাহলে তুমি তালাক। অথবা বিবাহের সাথে সম্বন্ধ করা যেমন বলা আমি যদি তোমাকে বিবাহ করি তাহলে তুমি তালাক।"[৫৫২]

অতএব যদি কোনো বেগানা মহিলাকে বিবাহের সাথে সম্বন্ধ না করে বলে, যদি যায়েদের সাথে দেখা করো- তাহলে তুমি তালাক। তাহলে উক্তিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

২. বিবাহের সময় মুখে বলে দেয়া। তবে এক্ষেত্রে নিয়ম হলো- যদি বিবাহের প্রস্তাব প্রথমে মেয়ের পক্ষ থেকে হয় এবং বিবাহের জন্য তাফবীযের শর্ত দেয় আর স্বামী মেনে নেয়, তখন উল্লিখিত 'তাফবিযের' শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রীর নিজের উপর তালাক গ্রহণ করে বিবাহ বিচ্ছেদের ক্ষমতা থাকবে। আর যদি স্বামীর পক্ষ থেকে প্রথমে প্রস্তাব হয় এবং মেয়েপক্ষ 'তাফবীযে তালাকের' শর্তের সাথে কবুল করে, তাহলে বিবাহ সঠিক হয়ে গেলেও শর্ত বাতিল বলে গণ্য হবে। তাই সেক্ষেত্রে স্ত্রীর জন্য তালাক গ্রহণের অধিকার থাকবে না। আল্লামা শামী রাহ. বলেছেন-

(قوله: صح) مقيد بما إذا ابتدأت المرأة فقالت: زوجت نفسي منك على أن أمري بيدي أطلق نفسي كلما أريد، وعلى أني طالق، فقال الزوج قبلت، وأما لو بدأ الزوج لا تطلق. ولا يصير الأمر بيدها.

"তালাক গ্রহণ করার ক্ষমতা স্ত্রীর কাছে থাকার শর্তে বিবাহ করলে তা সহীহ হয়ে যাবে। (এটা সেক্ষেত্রে) যখন স্ত্রী প্রথমে বলবে 'আমি তোমার সাথে এ শর্তে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম যে, যখন ইচ্ছা আমি নিজের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবো।' অতঃপর স্বামী বললো, আমি কবুল করলাম। তাহলে তালাকের ক্ষমতা অর্জিত হবে। আর যদি প্রথমে স্বামী বিবাহের প্রস্তাব দেয় আর স্ত্রী তালাক গ্রহণের শর্ত দিয়ে তা কবুল করে, তাহলে তালাকের

---

[৫৫২] আদ্দুররুল মুখতার: ৪/৫৯৩, তা'লীক অধ্যায়, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ক্ষমতা অর্জিত হবে না।"[৫৫৩]

৩. বিবাহের পর কাবিননামা লেখানো। এক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সম্মতিতে গৃহীত শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রীর জন্য নিজের উপর তালাক গ্রহণের ক্ষমতা থাকবে। উল্লেখ্য যে, স্ত্রী যদি বলে 'আমি স্বামীকে তালাক দিলাম' তাহলে তালাক সহীহ হবে না। বরং বৈবাহিক সম্পর্ক পূর্বের ন্যায় বহাল থাকবে।[৫৫৪]

প্রচলিত কাবিননামায় স্বাক্ষরের শর'য়ী বিধান

উপরোক্ত আলোচনা অনুযায়ী প্রচলিত কাবিননামায় লিখিত শর্ত পাওয়া গেলে স্ত্রী নিজের উপর তালাক পতিত করার ক্ষমতা রাখে। তবে শর্ত হলো, স্বামীর সে সকল শর্ত মেনে নিয়ে কাবিননামা পড়ে বা শুনে স্বাক্ষর করতে হবে। অনুরূপভাবে কাবিননামার শর্তগুলো মেনে নিয়ে স্বাক্ষর করলেও তা প্রযোজ্য হয়ে যাবে, শর্তগুলো পড়ুক বা না পড়ুক। যদি স্বামী 'কাবিননামা' পূরণ করার পূর্বেই স্বাক্ষর করে এবং কাজী সাহেব শর্তগুলো লিখে দেয়, তাহলেও স্বামী শর্ত মেনে নিয়েছে বলে সাব্যস্ত হবে। কেননা বর্তমান সমাজের প্রচলন অনুযায়ী নিকাহ রেজিস্টারদের নিষেধ না করা হলে তারা ১৮নং ধারায় স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা দেয়ার কথা লিখে দিয়ে থাকে। তাই উক্ত সময়ে স্বামী নিষেধ না করে কাবিননামায় ঘরগুলো খালি রেখে দস্তখত করলে সাব্যস্ত হবে যে, সে প্রচলন অনুযায়ী তালাক গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করেছে। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ولو قال للكاتب: اكتب طلاق امرأتي، كان إقرارا بالطلاق، وإن لم يكتب؛ ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها، أو قرأه على الزوج، فأخذه الزوج، وختمه وعنونه، وبعث به إليها، فأتاها، وقع إن أقر الزوج أنه كتابه.

"আর যদি স্বামী লেখককে বলে তুমি 'আমার স্ত্রী তালাক' কথাটি লেখো, তা তালাকের স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। যদিও সে নিজে তালাকনামা না লিখে। আর যদি লেখকের মাধ্যমে তার স্ত্রীর তালাকনামা লেখায় বা তালাকনামা লেখার পর স্বামীর সামনে পড়ে এবং সে তা গ্রহণান্তে সিল-স্বাক্ষর করত তাতে ঠিকানা লিখে স্ত্রীর কাছে পাঠায় তাহলে তা স্ত্রীর নিকটে পৌঁছামাত্র সে তালাকপ্রাপ্তা বলে গণ্য হবে, যদি স্বামী উক্ত তালাকনামাকে তার পক্ষ থেকে প্রেরিত বলে স্বীকার করে।"[৫৫৫]

কোর্ট থেকে তালাক গ্রহণ

আমাদের দেশে কোর্ট অথবা কাজী অফিসে গিয়ে তালাকনামার সরকারী ফরম পূরণের মাধ্যমে স্ত্রীর স্বামী থেকে তালাক গ্রহণের অর্থাৎ স্ত্রী নিজের প্রতি তালাক দেয়ার নিয়ম প্রচলিত আছে। এক্ষেত্রে বিধান হলো, কাবিননামায় তাফবীযে তালাকের ১৮নং ঘরে যে সমস্ত শর্ত লেখা থাকে যদি সেগুলো পাওয়া যায়, তাহলে স্ত্রী কোর্টের মাধ্যমে (বা কোর্টের

৫৫৩ ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৫৭৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

৫৫৪ আল হিলাতুন নাজেযাহ, ৪০-৪২, গাউছিয়া পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

৫৫৫ ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৪৫৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মাধ্যম ছাড়াই) তালাক গ্রহণ করে ইদ্দত পালন শেষে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, কোর্ট থেকে তালাক গ্রহণের সময় বলতে হবে 'আমি স্বামী প্রদত্ত ক্ষমতা বলে নিজের উপর শর্ত মোতাবেক তালাক গ্রহণ করলাম'। পক্ষান্তরে যদি বলে 'আমি স্বামীকে তালাক দিলাম' তাহলে তালাক গ্রহণ সহীহ হবে না। তবে 'তাফবীযে তালাকের' ঘরে উল্লিখিত শর্ত স্বামী কর্তৃক খেলাফ না হলে কোর্ট থেকে তালাক গ্রহণ করা সহীহ হবে না। বরং সে প্রথম স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই গণ্য হবে। তাই দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করা সম্পূর্ণরূপে হারাম হবে।[৫৫৬]

ডিভোর্স

Divorce এর আভিধানিক অর্থ বিবাহ বিচ্ছেদ। আদালতের মাধ্যমে স্বামী স্ত্রীর ইচ্ছাক্রমে অথবা স্বামীর তালাকের মাধ্যমে বা যে প্রকারেই বিবাহ বিচ্ছেদ হওক না কেন, তাকে Divorce বলা হয়।[৫৫৭]

অর্থাৎ তালাক শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো Divorce (ডিভোর্স)। শরী'আতে তালাকের ন্যায় ডিভোর্স প্রদানের ক্ষমতা দিয়েছে একমাত্র স্বামীকে, স্ত্রীকে নয়। তাই স্ত্রী স্বামীকে তালাক বা ডিভোর্স দিতে পারে না। সুতরাং যদি স্ত্রী স্বামীকে তালাক বা ডিভোর্স দেয়, তাহলে সেই তালাক বা ডিভোর্স কার্যকর হবে না; বরং পূর্বের ন্যায় তাদের বিবাহ বহাল থাকবে। হ্যাঁ, যদি স্বামী শর্তের সাথে বা শর্তহীনভাবে স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করে, সেক্ষেত্রে সে নিজের নফসের উপর তালাক গ্রহণ করতে পারবে। তাকে এভাবে বলতে হবে যে, আমি আমার স্বামীর প্রদত্ত 'তাফবীযে তালাকের' (স্ত্রীকে তালাক গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ) ক্ষমতাবলে নিজ পক্ষান্তরে নফসের উপর তালাক বা ডিভোর্স গ্রহণ করলাম। যদি বলে, আমার স্বামীকে তালাক বা ডিভোর্স দিলাম, তাহলে তালাক হবে না।

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৬ রজব ১৪৩৫হি.

---

[৫৫৬] দ্রষ্টব্য- আশরাফুল ফাতাওয়া: ৩/৮১, মাকতাবায়ে সমাদিয়া, চট্টগ্রাম

[৫৫৭] আইন কোষ: ১১৩, মুহাম্মদ আব্দুল হামীদ জেলা ও দায়েরা জজ রচিত, বাংলা একাডেমী ঢাকা

জন্মনিয়ন্ত্রণ: শরী'আত কী বলে?

মাওলানা মুহাম্মদ ওমর ফারুক ইবনে আব্দুল হাই কুমিল্লায়ী

বর্তমান যামানায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের এমন সব পদ্ধতি আবিস্কৃত হয়েছে যা পূর্বের যুগে কল্পনাও করা যেত না। বরং যে সময়ে বেশি সন্তান হওয়াকে মানুষ গর্বের বিষয় মনে করতো। কিন্তু, যুগের বিবর্তনে জন্মনিয়ন্ত্রণ এখন শুধু সামাজিকরূপ লাভ করেই ক্ষান্ত হয়নি, বরং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও লাভ করেছে। জন্মনিয়ন্ত্রণের নতুন নাম রাখা হয়েছে 'পরিবার পরিকল্পনা।' প্রতিটি পরিবার যেন পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ করে সে জন্য বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিচ্ছে সরকার। পরিবার পরিকল্পনার সুফল ফলাও করে প্রচার করছে মিডিয়া। সাথে সাথে পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করার কুফল বর্ণনায়ও কসুর করছে না। যদি পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ না করা হয়, তাহলে আগামী প্রজন্ম খাদ্য ও বাসস্থানের তীব্র সংকটে পড়বে। ইত্যাকার অপপ্রচারের ফলে মানুষ কোনোদিকে না তাকিয়েই গ্রহণ করছে পরিবার পরিকল্পনা। তাই এ বিষয়ে শর'য়ী বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা জরুরী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথমত দু'প্রকার। অস্থায়ী ব্যবস্থা ও স্থায়ী ব্যবস্থা। অস্থায়ী ব্যবস্থা আবার কয়েক ধরনের। স্থায়ী পদ্ধতিও বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় ও হুকুম বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হলো।

১. অস্থায়ী ব্যবস্থার পরিচয়

অস্থায়ী ব্যবস্থা হলো যা ক্ষণকাল জন্মনিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং যা দ্বারা আজীবনের জন্য প্রজনন ক্ষমতা নষ্ট হয় না। এ ধরনের ব্যবস্থা কখনো নিতান্ত সাময়িক হয়ে থাকে, কখনো নির্দিষ্ট মেয়াদী হয়ে থাকে। উভয় প্রকারের হুকুম নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. নিতান্ত সাময়িক ব্যবস্থা। যেমন, কনডম ব্যবহার করা। নিরাপদ কাল মেনে চলা। তথা ঋতুস্রাবের পরে জরায়ু-মুখ বন্ধ হওয়ার আগ পর্যন্ত সঙ্গম থেকে বিরত থাকা। পিল ব্যবহার করা আযল করা ইত্যাদি।

২. মেয়াদী ব্যবস্থা। যেমন, মহিলা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ইনজেক্শন নেয়া। প্লাস্টিক কয়েল ব্যবহার করা অর্থাৎ মহিলা শরীরের কোনো অঙ্গে অপারেশনের মাধ্যমে প্লাস্টিক কয়েল স্থাপন করা ইত্যাদি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের সাময়িক ব্যবস্থার একটি পদ্ধতি হলো আযল। আযলের বিধান ফিকহের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। আযলের হুকুমের প্রতি লক্ষ্য করলে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের অন্যান্য পদ্ধতির হুকুমও সহজে বোঝা যাবে। তাই প্রথমে সংক্ষেপে আযল সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। এরপর মূল বিষয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

আযল: পরিচয় ও বিধান

সঙ্গমের সময় স্বামী স্ত্রীর যোনীর বাইরে বীর্যপাত করাকে আযল বলা হয়। আযল সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তবে হাদীসসমূহ থেকে না পরিষ্কার নিষেধাজ্ঞা বুঝে আসে,

আবার না সুস্পষ্ট অনুমতি বোঝা যায়। তবে এ কাজ নবীজী ﷺ এর মনঃপূত না হওয়ার বিষয়টি কিছু হাদীস থেকে বুঝা যায়। এ জন্য পূর্বসূরী ওলামায়ে কেরামের মাঝে এ ব্যাপারে মতবিরোধ ছিলো। কেউ কেউ আযলকে একেবারে নাজায়েয বলেছেন। কারো মতে কাজটি মূলত অপছন্দনীয়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে জায়েয। আর যদি শরী'আত পরিপন্থী কোনো উদ্দেশ্যে (যার বর্ণনা সামনে আসছে) করা হয়, তাহলে না জায়েয। যেমন, খাদ্য ও বাসস্থানের সঙ্কটের আশঙ্কায় করা। প্রথমে অনুমতিজ্ঞাপক হাদীসগুলো উল্লেখ করা হলো। হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

أن رجلا أتى رسول الله ﷺ، فقال: إن لي جارية وهي خادمتنا ومسانيتنا وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال : «اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها» فلبث الرجل، ثم أتاه، فقال : إن الجارية قد حبلت، فقال : «قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها».

"একবার এক লোক রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর দরবারে এসে বললো, আমার সেবিকা দাসীর সাথে আমি দৈহিক মেলামেশা করি, কিন্তু সে গর্ভবতী হোক এটা আমি চাই না। তিনি বললেন, "তুমি চাইলে তার সাথে আযল করতে পার, তবে তার ভাগ্যে যা আছে তা হবেই (গর্ভবতী হবেই)।" কিছুদিন পর লোকটি এসে বললো, হুজুর! সে তো গর্ভবতী হয়ে গেছে। তখন নবী কারীম ﷺ বললেন, "আমি তো তোমাকে আগেই বলেছিলাম, তার ভাগ্যে যা আসার তা আসবেই।"[৫৫৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رجلا قال: يا رسول الله! إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل الموؤدة الصغرى، قال: «كذبت اليهود لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».

"এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার একটি বাঁদী আছে। আমি তার সাথে সঙ্গমের পর আযল করি। তার কারণ, গর্ভবতী হওয়াকে আমি অপছন্দ করি। তবে তার সাথে মেলামেশা করতে চাই। আর ইহুদীরা বলে, আযল জীবন্ত সমাহিত করার নামান্তর। নবীজী ﷺ বলেন, ইহুদীরা মিথ্যা বলেছে। যদি আল্লাহ তা'আলা কিছু সৃষ্টি করতে চান, তাহলে তুমি তা ফেরাতে পারবে না।"[৫৫৯]

এই হাদীস দু'টির মাঝে প্রথমটিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ উক্ত ব্যক্তিকে আযল করার পরামর্শ দিয়েছেন। আর দ্বিতীয়টিতে ইহুদীদের কথাকে খণ্ডন করে বৈধতার স্বীকৃতি বোঝা যায়। তবে হাদীসদ্বয়ের ভাষা ও ধরন থেকে কাজটি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর মনঃপূত না হওয়াও বুঝে আসে।

এ বিষয়ে আরো কিছু হাদীস উল্লেখ করে ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

فهذه الأحاديث ظاهرة في جواز العزل، وقد روي عن عشرة من الصحابة: علي، وسعد بن أبي وقاص،

---

[৫৫৮] সহীহ মুসলিম : ১/৪৬৫

[৫৫৯] সুনানে আবু দাউদ: ১/২৯৫; মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১১২৮৮, হাদীসটি সহীহ।

وزيد بن ثابت، وأبي أيوب، وجابر، وابن عباس، والحسن بن علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وعبد الله بن مسعود ﷺ.

"এ সকল হাদীস থেকে স্পষ্ট যে, আযল জায়েয। দশজন সাহাবী থেকে বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে। তাঁরা হলেন, আলী, সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস, যায়েদ ইবনে ছাবেত, আবু আইয়ূব, জাবের, ইবনে আব্বাস, হাসান ইবনে আলী, খাব্বাব ইবনুল আরাত, আবু সাঈদ খুদরী ও আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম।"[৫৬০]

আযল নিষেধ সম্বলিত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা

হযরত জুযামা বিনতে ওহাব রাযি. বলেন-

حضرت رسول الله ﷺ إلى أن قالت : ثم سألوه عن العزل، فقال رسول الله ﷺ : «ذلك الوأد الخفي وهي وإذا الموءودة سئلت». (رواه مسلم)

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট উপস্থিত হলাম, (সাহাবায়ে কেরাম নবীজী ﷺ -এর সাথে কথাবার্তা বলছিলেন) একপর্যায়ে তাঁরা রাসূল ﷺ কে আযল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, "এটা সূক্ষ্মভাবে জীবন্ত সমাহিত করার নামান্তর। এবং وإذا الموءودة سئلت (যখন জীবন্ত সমাহিত কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে) এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।"[৫৬১]

হাদীসটি থেকে আযল অবৈধ হওয়ার বিষয়টি বুঝে আসে, যেহেতু আযলকে নবী কারীম ﷺ জীবন্ত সমাহিত করার নামান্তর বলেছেন যা হারাম। জুযামার উক্ত হাদীসের ভাষ্য পূর্বোল্লিখিত হাদীসের বিপরীত। কারণ, এখানে আযল থেকে অস্বীকৃতি বোঝা যায়, অথচ পূর্বের হাদীসের ভাষ্য থেকে অনুমতি বোঝা যায়। উভয় হাদীসের সমাধান দিতে গিয়ে ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

وحديث السنن (حديث أبي سعيد الخدري) يدفع حديث جذامة وهو وإن كان في السنن فهو حديث صحيح.

"সুনানের হাদীস অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর বর্ণিত হাদীস জুযামা রাযি. এর বর্ণিত হাদীসকে রদ করে দেয়। আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর বর্ণিত হাদীসটি যদিও সুনানের কিতাবে আছে, কিন্তু হাদীসটি সহীহ।"[৫৬২]

তিনি আরো বলেন-

أن كثرة الأحاديث تدل على اشتهار خلافه.

"আযল বৈধ হওয়ার হাদীসের আধিক্য এ কথা প্রমাণ করে যে, আযল বৈধ হওয়ার হাদীস অবৈধ হওয়ার হাদীসের তুলনায় প্রসিদ্ধ।"[৫৬৩]

---

[৫৬০] ফাতহুল কাদীর: ৩/৩৭৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
[৫৬১] ই'লাউস সুনান : ১১/২৯৫, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
[৫৬২] ফাতহুল কাদীর: ৩/৩৭৮-৩৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
[৫৬৩] ফাতহুল কাদীর: ৩/৩৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

তিনি জুযামার হাদীসে الوأد الخفي (জীবন্ত সমাহিত করার নামান্তর) এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন-

وقد اتفق عمر وعلي رضي الله عنهما أنها لا تكون موءودة حتى تمر عليها التارات السبع.

"হযরত ওমর ও আলী রাযি. এ ব্যাপারে একমত যে, আযল জীবন্ত সমাহিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সাতটি স্তর অতিক্রম না করবে।"[৫৬৪]

মুফতী শফী রাহ. বলেন, 'উভয় ধরনের হাদীসের সামঞ্জস্য বিধানে ওলামায়ে কেরাম বিভিন্ন মত বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে স্পষ্ট ও নিরাপদ উক্তি হলো এই যে, জুযামা রাযি. এর হাদীসের ফলে আযলকে মাকরূহ বলা হবে আর অন্যান্য হাদীসের ফলে জায়েয বলা হবে। এখন সমস্ত হাদীস থেকে এই ফলাফল বের হবে যে, আযল জায়েয তবে মাকরূহ।'[৫৬৫]

মোটকথা, অধিকাংশ হাদীস থেকে আযলের অনুমতি বোঝা যায়। যদিও হাদীসের আলোচনার ধরন থেকে রাসূল ﷺ এর মনঃপূত না হওয়াও অনুমান করা যায়। তাই আযল মূলত মুবাহ তবে শরী'আতের দাবী ও মূলনীতির পরিপন্থী হওয়ার কারণে মাকরূহে তানযিহী[৫৬৬] হবে। আর যদি খাদ্য ও বাসস্থানের সংকটের আশঙ্কায় জন্মনিয়ন্ত্রণ করা হয়, তাহলে তা সর্বাবস্থায় হারাম।

অস্থায়ী ব্যবস্থার হুকুম

পূর্বোল্লিখিত অস্থায়ী ব্যবস্থার বিভিন্ন পদ্ধতির হুকুম স্বাভাবিক অবস্থায় আযলের মতই মাকরূহ। তবে বাচ্চা নেয়ার দ্বারা যদি স্ত্রী বা সন্তানের কোনো সমস্যা হয়, তাহলে অভিজ্ঞ দ্বীনদার ডাক্তারের পরামর্শের ভিত্তিতে প্রয়োজনে যে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে শর্ত হলো, শরী'আত পরিপন্থী কোনো নিয়ত না থাকতে হবে। যেমন খাদ্য বা বাসস্থানের সংকটের ভয় ইত্যাদি।

জন্মনিয়ন্ত্রণের শর'য়ী জরুরত উল্লেখ করে আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب مخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة خلق ويريد فراقها مخاف أن تحبل، (إلى أن قال) قال ابن وهبان : ومن الأعذار أن ينقطع لبنها بعد ظهور الحمل وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاكه.

"স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজ এলাকা থেকে বহুদূরে কোনো সফরে থাকা, অথবা দারুল হরবে থাকা যেখানে সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে, অথবা মহিলা অসৎ চরিত্রবান হওয়ায় স্বামী স্ত্রী থেকে পৃথক হওয়ার ইচ্ছা থাকলে, গর্ভধারণে দুধ শুকিয়ে পূর্বের বাচ্চার স্বাস্থ্যহানীর আশঙ্কা দেখা দিলে এবং দুধের বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হলে আযল করতে পারবে।"[৫৬৭]

---

৫৬৪ ফাতহুল কাদীর: ৩/৩৭৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

৫৬৫ জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৭/৮৭, মাকতাবা দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

৫৬৬ والظاهر أن النهي محمول على التنزيه. (مرقاة المفاتيح: ٣٤٧/٦ المكتبة الحبيبية، كوئته، باكستان)

৫৬৭ ফাতাওয়ায়ে শামী : ৪/৩৩৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

গর্ভপাতের হুকুম

জরায়ুতে বীর্য প্রবেশ করার পর সেই ভ্রূণ নষ্ট করে ফেলাকে গর্ভপাত বলে। গর্ভস্থিত বাচ্চার বয়সের ভিন্নতা হিসেবে গর্ভপাতের হুকুমও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। গর্ভস্থিত বাচ্চার প্রথমত দুই অবস্থা। যথা- বাচ্চার ভেতর রূহ আসা বা রূহ না আসা। রূহ না আসলে আবার দুই অবস্থা। বাচ্চার কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ হওয়া বা না হওয়া। প্রত্যেক প্রকারের হুকুম ভিন্ন ভিন্ন, যা নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. গর্ভস্থিত সন্তানের মধ্যে রূহ আসার পর গর্ভপাত করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয ও হারাম। আল্লামা ইবনে হাজার মাক্কী রাহ. বলেন-

والتسبب في إسقاطه بعد نفخ الروح فيه محرم إجماعا، وهو من قتل النفس.

"প্রাণ আসার পর গর্ভপাত করার কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয ও হারাম। কারণ, এটা প্রাণী হত্যার শামিল।"[৫৬৮]

২. যদি গর্ভস্থিত সন্তানের মধ্যে রূহ না আসে কিন্তু তার কোনো অঙ্গ প্রকাশ পায়, তাহলে বিনা প্রয়োজনে গর্ভপাত করা মাকরূহ। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وما استبان بعض خلقه كظفر وشعر، كتمام فيما ذكر من الأحكام وعدة ونفاس.

"নখ, চুল ইত্যাদি কিছু অঙ্গ যদি প্রকাশ পায়, তাহলে বিভিন্ন হুকুম, ইদ্দত ও নেফাসের ক্ষেত্রে পূর্ণ বাচ্চার মত।"[৫৬৯] কিন্তু যেহেতু তার মাঝে এখনো রূহ আসেনি তাই মানব হত্যার হুকুম তার উপর বর্তাবে না।

৩. যদি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পায়; তাহলে গর্ভপাত করা মুবাহ। তবে তাকওয়া পরিপন্থি। ইমাম ইবনুল হুমাম ও আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وهل يباح الإسقاط بعد الحبل؟ يباح ما لم يتخلق شيء منه، ثم في غير موضع قالوا: ولا يكون ذلك إلا بعد مائة وعشرين يوما.

"গর্ভপাত করা যাবে কি না তার জবাবে বলা হবে, যদি তার মাঝে আকৃতি (রূহ ফুঁকা না হয়) না আসে, তাহলে তা পারবে। (বাচ্চার মাঝে কখন রূহ আসে) এ ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরাম একাধিক স্থানে বলেছেন যে, তা ১২০ দিনের পরে হয়ে থাকে।"[৫৭০]

এ মতটি আরো অনেক ফুকাহায়ে কেরামেরও। যেমন-

وإذا أسقطت الولد بالعلاج قالوا : إن لم يستبن شيء من خلقه لا تأثم.

"মহিলা যদি চিকিৎসার মাধ্যমে বাচ্চা ফেলে দেয় তার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি শারীরিক গঠন প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে মহিলা গর্ভপাত ঘটায়, তাহলে সে গুনাহগার হবে না।"[৫৭১]

---

[৫৬৮] জাদীদ ফিকহী মাসায়েল সূত্রে ফাতহুল মালেক: ৫/১৩১, কুতুবখান নাঈমিয়্যা, দেওবন্দ

[৫৬৯] আদ্দুররুল মুখতার: ১০/২৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৫৭০] ফাতহুল কাদীর : ৩/৩৮০, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন; ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/৩৩৫, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৫৭১] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান [আলমগীরীর টিকায়]: ৩/৪১০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ইমাম কাযীখান রাহ. ওজর না থাকার সূরতে মুবাহ হওয়ার ব্যাপারে দ্বিমত করলেও ওজর থাকা অবস্থায় তিনিও মুবাহ বলেছেন।

المرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها، وليس لأبي الصغير ما يستأجر به الظئر، ويخاف هلاك الولد، قالوا: يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل نطفة أو علقة أو مضغة لم يخلق له عضو.

"স্তন্যদানকারিণী গর্ভবতী হওয়ার কারণে যদি তার দুধ বন্ধ হয়ে যায় ও শিশুর পিতার অন্য কোনো স্তন্যদানকারিণী ভাড়া নেয়ার সামর্থ্য না থাকে এবং বাচ্চা মারা যাওয়ার আশঙ্কা থাকে, এ অবস্থায় ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, জমাট রক্ত কিংবা গোস্তের টুকরার আকারে থাকলে এবং অঙ্গ প্রকাশ না পেলে, চিকিৎসার মাধ্যমে গর্ভপাত করা যেতে পারে।"[৫৭২]

মোটকথা, রূহ আসার পর গর্ভপাত করা নাজায়েয ও হারাম। আর রূহ আসার পূর্বে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ পায়, তাহলে বিনা প্রয়োজনে মাকরূহ। আর যদি কোনো অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ না পায়, তাহলেও তাক্বওয়া পরিপন্থি।

২. স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের পরিচয়

এমন পদ্ধতি গ্রহণ করা যা স্থায়ীভাবে পুরুষ বা মহিলার প্রজনন ক্ষমতা বা সন্তান ধারণের ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট করে দেয়। সাধারণত এর জন্য বর্তমানে নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা হয়। যথা :

১. 'ভ্যাসেক্টমি' (অণ্ডকোষের নিঃস্বরণ নালীর ছেদন) অর্থাৎ পুরুষকে বন্ধাকরণের সহজ অস্ত্রোপচার বিশেষ। এতে শুক্রকীটবাহী নালীকা আংশিক বা সম্পূর্ণ কেটে ফেলা হয়।

২ 'টিউভেল লাইগেশন' অর্থাৎ মহিলার শুক্র নালী কেটে ফেলা, অথবা কাটা ব্যতীত এমনভাবে বেঁধে দেয়া যার ফলে বীর্য প্রবেশ বন্ধ হয়ে যায়। এ দুই পদ্ধতি ছাড়াও যে কোনো পন্থায় প্রজনন ক্ষমতা চিরতরে নষ্ট করে ফেলা স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত হবে।

স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের হুকুম

নবীজী ﷺ -এর যুগে স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণের পদ্ধতি ছিলো খাসি হওয়া তথা অণ্ডকোষ কেটে ফেলা। এ ব্যাপারে হাদীসে সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। ঐ সকল হাদীসের উপর ভিত্তি করে বর্তমান ওলামায়ে কেরাম আধুনিক স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতিকে হারাম বলেছেন। এখানে জন্মনিয়ন্ত্রণ নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক কতিপয় হাদীস উল্লেখ করা হলো। হযরত কায়েস রাহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال عبد الله ﷺ : كنا نغزو مع رسول الله ﷺ وليس لنا شيء، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم قرأ علينا ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تُحَرِّمُوا۟ طَيِّبَٰتِ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾﴾.

"হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ -এর সাথে যুদ্ধে যেতাম, আর আমাদের সাথে আমাদের স্ত্রীগণ থাকতো না। (আমাদের যৌন চাহিদা হতো)।

[৫৭২] ফাতাওয়ায়ে কাযীখান [আলমগীরীর টিকায়]: ৩/৪১০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

তাই রাসূল ﷺ -এর নিকট যৌনশক্তি চিরতরে নিঃশেষ করে দেয়ার অনুমতি চাইলে তিনি তা থেকে নিষেধ করলেন, এবং উল্লিখিত আয়াতটি পাঠ করে শোনালেন, হে মু'মিনগণ! আল্লাহ তোমাদের জন্য উৎকৃষ্ট যেসব বস্তু হালাল করেছেন সেই সমুদয়কে তোমরা হারাম করো না এবং সীমালজ্ঘন করো না। নিশ্চয় আল্লাহ সীমালজ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না।"[৫৭৩]

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্ট যে, স্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ সীমালজ্ঘনের অন্তর্ভূক্ত এবং আল্লাহ কর্তৃক বৈধ জিনিসকে হারাম করার নামান্তর। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قلت يا رسول الله! إني رجل شاب وأنا أخاف على نفسي العنت، ولا أجد ما أتزوج به النساء، فسكت عني، ثم قلت: مثل ذلك، فسكت عني، فقلت له : مثل ذلك، فسكت عني، ثم قلت : مثل ذلك، فقال النبي ﷺ : يا أبا هريرة! جف القلم بما أنت لاق، فاختص على ذلك أوذر.

"আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি একজন যুবক, আমি ব্যভিচারের আশঙ্কা করছি। বিবাহ করার মত সামর্থ্যও আমার নেই। এখন আপনি কি আমাকে যৌনশক্তি নিঃশেষ করে দেয়ার অনুমতি দেবেন? তিনি কিছুক্ষণ নিরব থাকলেন। আমি আবার বললাম। তিনি আবারো নিরব রইলেন। (তিনি বলেন) আমি আবারো জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবারো চুপ রইলেন। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "হে আবু হুরায়রা! তুমি যৌনশক্তি বিলুপ্ত করো আর নাই করো যা তোমার থেকে হওয়ার সে ব্যাপারে কলম শুকিয়ে গেছে, (অর্থাৎ তাকদীরে যা আছে তা সংঘটিত হবেই)।"[৫৭৪]

উল্লিখিত হাদীসসমূহের ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

وهو محرم بالاتفاق.

"আর খাসি হওয়া সর্বসম্মতিক্রমে হারাম।"[৫৭৫]

ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-

والحجة فيه أنهم اتفقوا على منع الجب والخصاء، فيلحق بذلك ما في منعاه من التداوي بالقطع أصلا.

"এ সকল হাদীস এ কথার প্রমাণ যে, পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলা ও খাসি করা সর্বসম্মতিক্রমে নিষেধ এবং এ হুকুম আরোপ করা হবে ঐ ক্ষেত্রেও যেখানে ঔষধের মাধ্যমে চিরতরে প্রজনন ক্ষমতা বিলুপ্ত করা হয়।"[৫৭৬]

উল্লিখিত হাদীস ও তার ব্যাখ্যা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, কোনোভাবেই প্রজনন ক্ষমতা একেবারে নষ্ট করা যাবে না। সুতরাং জন্মনিয়ন্ত্রণের স্থায়ী যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা নাজায়েয ও হারাম।

কিন্তু যদি জরায়ুতে এমন রোগ দেখা দেয়, যেমন টিউমার, ক্যান্সার ইত্যাদি যার কারণে

---

[৫৭৩] সহীহ বুখারী: ২/৭৫৯; ফাতহুল বারী : ৯/১৪৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বাইরুত

[৫৭৪] সহীহ বুখারী: ২/৭৫৯

[৫৭৫] উমদাতুল কারী : ১৪/১৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৫৭৬] ফাতহুল বারী : ৯/১৩৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

অপারেশনের মাধ্যমে জরায়ু কেটে ফেলা ব্যতীত আরোগ্য লাভ করা সম্ভব, তাহলে বিজ্ঞ দ্বীনদার মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শে তা কেটে ফেলা জায়েয। কারণ ইসলামী শরী'আতের একটি মূলনীতি হলো-

الضرورات تبيح المحظورات

"অনোন্যাপায় প্রয়োজন নিষিদ্ধ জিনিসকে হালাল করে দেয়।"[৫৭৭]

মানুষের প্রাণনাশ জরুরতের অন্তর্ভুক্ত। তাই বিজ্ঞ দ্বীনদার মুসলিম ডাক্তারের পরামর্শক্রমে যদি মহিলার প্রাণনাশের কথা প্রমাণিত হয়, তাহলে এ পদ্ধতি গ্রহণ করা বৈধ।

এমনিভাবে বারংবার সিজারে সন্তান গ্রহণ করার পর বিজ্ঞ দ্বীনদার মুসলিম ডাক্তার যদি বলে, আর সন্তান গ্রহণ করা সম্ভব নয় (তথা ঝুঁকিপূর্ণ), তাহলেও এই পদ্ধতি গ্রহণ করার অবকাশ থাকবে।

সারকথা, জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি প্রথমত দুই প্রকার। যথা : ১. অস্থায়ী ব্যবস্থা। ২. স্থায়ী ব্যবস্থা। অস্থায়ী ব্যবস্থা আবার দু'ভাগে বিভক্ত। যথা: ক. সাময়িক ব্যবস্থা। খ. মেয়াদী ব্যবস্থা। গর্ভপাত ব্যতীত উভয় প্রকারের হুকুম হলো প্রয়োজন হলে মুবাহ, নতুবা মাকরূহ। আর গর্ভপাত যদি কোনো অঙ্গ প্রকাশ পাওয়ার পর করা হয়, তাহলে মাকরূহ আর প্রকাশ পাওয়ার পূর্বে করা হলে, মুবাহ; তবে তাকওয়া পরিপন্থী। স্থায়ী ব্যবস্থার হুকুম হলো, তা নতুন বা পুরোনো যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক, পুরুষ বা মহিলা যেই গ্রহণ করুক, তা কোনোভাবেই জায়েয নয়, বরং সর্বাবস্থায় হারাম।
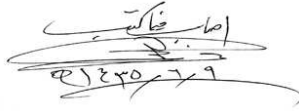
<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৯ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৫৭৭] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫১, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

অধ্যায়: ক্রয়-বিক্রয়

প্রচলিত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর‘য়ী বিধান

মাওলানা আবু হানীফ পিরোজপুরী

বর্তমানে শেয়ার ব্যবসা একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক রূপ লাভ করেছে। আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ পরিবার এ ব্যবসার সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। কিন্তু অনেকের কাছে এর শর‘য়ী বিধান পরিষ্কার নয়। তাই এ বিষয়ে শর‘য়ী পর্যালোচনা পেশ করা সময়ের গুরুত্বপূর্ণ দাবি। তবে মূল আলোচনার পূর্বে শেয়ার বিষয়ক কিছু পরিভাষা পরিষ্কার করে নেয়া আবশ্যক।

শেয়ারের পরিচয়

শেয়ার (Share) একটি ইংরেজি শব্দ, যাকে আরবী ভাষায় ‘সাহ্‌মুন’, উর্দু ভাষায় ‘হিছ্‌ছা’ আর বাংলায় অংশ বলা হয়।

পরিভাষায়ঃ কোনো কোম্পানি (অংশীদারি কারবারের ভিত্তিতে গঠিত প্রতিষ্ঠান) এর অংশকে ‘শেয়ার’ বলে। আর যিনি কোম্পানির আংশিক মালিকানা লাভ করেন তাকে ‘শেয়ার হোল্ডার’ বলা হয়।

শেয়ারে ব্যবসাঃ খুব সহজে বললে, দুই-তিনজন মিলে কোনো ব্যবসা করাই শেয়ারে ব্যবসা। সুতরাং দুই বা ততোধিক ব্যক্তির অংশীদারিতে যে ব্যবসা পরিচালিত হয়, প্রকৃত অর্থে তা-ই শেয়ারে ব্যবসা। বর্তমান পরিভাষায় যাকে Partnership বলা হয়।

বর্তমান শেয়ার ব্যবসাঃ কোম্পানি থেকে প্রথমে শেয়ার ক্রয় করে পরবর্তীতে তা সেকেন্ডারি মার্কেটে একজন থেকে আরেকজন ক্রয় করে। এভাবে হাত বদল করে ক্রয়-বিক্রয় করাকে শেয়ার ব্যবসা বলে।

স্টক-এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) এর পরিচিতি

কোনো কোম্পানি অস্তিত্ব লাভ করার পর নির্দিষ্ট অংশের মাঝে অন্যদেরকে অংশীদার হওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। ঐ কোম্পানির পক্ষ থেকে অন্যদের মাঝে অংশীদারিত্ব বণ্টনের জন্য বিভিন্ন প্যাকেজ প্রাইমারি মার্কেটে (Primary Market) ছাড়া হয়। ঐ প্যাকেজকে শেয়ার বলা হয়। আর সাধারণ জনগণ এক বা একাধিক প্যাকেজ (শেয়ার) ক্রয় করতে পারে। যে শেয়ার ক্রয় করে তাকে শেয়ার হোল্ডার (Share Holder) বলা হয়।

মোটকথা, প্রথমে যে মার্কেটে শেয়ার ছাড়া হয় তাকে প্রাইমারি মার্কেট (Primary Market) বলে।

অনেক সময় কোম্পানিতে শেয়ার হোল্ডারের বিনিয়োগকৃত টাকা ফেরত নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। অথচ কোম্পানি থেকে সরাসরি টাকা ফেরত নেয়ার কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই তাকে বাধ্য হয়েই কারো আগ্রহী কাছে নিজের শেয়ার বিক্রি করতে হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু

ক্রেতা সরাসরি কোম্পানি থেকে শেয়ার ক্রয় করে না; বরং শেয়ার হোল্ডার থেকে সার্টিফিকেট গ্রহণ করে থাকে, তাই দ্বিতীয় পর্যায়ের এই লেনদেনকে সেকেন্ডারি মার্কেট (Secondary Market) বলা হয়।

যেহেতু ক্রেতাকে যে কোনো সময় পাওয়া যায় না, তাই বিক্রেতার সহযোগিতার জন্য সৃষ্টি হয় মধ্যস্থতাকারী ব্রোকার (Broker) অর্থাৎ দালাল, যে ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সম্পর্ক করে দেবে। এই ব্রোকাররা বিক্রেতাদের কাছ থেকে বিক্রির অর্ডার নিয়ে ক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে যেভাবে বিক্রেতার পক্ষ থেকে ব্রোকার থাকে তেমনি ক্রেতার পক্ষ থেকেও ব্রোকার থাকে। আর উভয় পক্ষের ব্রোকারের মাঝে যে লেনদেন হয়, তাকে এক্সচেঞ্জ (Exchange) বলে। আর যেখানে এসকল ব্রোকার একত্রিত হয়ে লেনদেন করে, তাকে স্টক এক্সচেঞ্জ (Stock Exchange) বলা হয়। অর্থাৎ স্টক এক্সচেঞ্জ এমন বাজারকে বলে, যেখানে ব্রোকাররা একত্রিত হয়ে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে।

শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়েছে যে, শেয়ার ক্রয় বিক্রয় হয় দুই মার্কেটে।

১. প্রাইমারি মার্কেট। ২. সেকেন্ডারি মার্কেট।

শর'য়ী বিধান জানার পূর্বে একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, শেয়ারক্রেতারা সবাই এক উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয় করে না। কেউ মূল কোম্পানির অংশীদার হওয়ার জন্যই শেয়ার ক্রয় করে থাকে। তার উদ্দেশ্য থাকে, কোম্পানির অংশীদার হয়ে লভ্যাংশ হাসিল করবে। কেউ শেয়ার ক্রয় করে ব্যবসার উদ্দেশ্যে, অর্থাৎ কোনো কোম্পানির শেয়ার কিনে রেখে দেয়। পরবর্তী সময়ে যখন সেই কোম্পানির শেয়ারের দাম বেড়ে যায়, তখন বিক্রি করে।

প্রাইমারি মার্কেটে হোক বা সেকেন্ডারি মার্কেটে, কেউ কোম্পানির লভ্যাংশ[৫৭৮] পাওয়ার আশায় শেয়ার ক্রয় করতে চাইলে সে কিছু শর্ত সাপেক্ষে ক্রয় করতে পারবে। এখন আমরা কোম্পানির শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত আলোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

এক. যে সকল কোম্পানির মূল কারবারসহ অন্য সকল শাখাগত কারবার বৈধ পদ্ধতিতে পরিচালিত, এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা জায়েয। এতে কোনো বাধা নেই। কেননা যে কোনো বৈধ অংশীদারি কারবারের মত বৈধ কোম্পানিগুলোর শেয়ার ক্রয় করে অংশীদার হওয়া যায়।

ক্রেতা কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করে যেভাবে কোম্পানির আংশিক মালিক হতে পারে, ঠিক তেমন তার মালিকানাধীন অংশটুকু বিক্রিও করতে পারে। শেয়ার বিক্রয়ের অর্থ হলো কোম্পানির সমুদয় সম্পদ থেকে তার সার্টিফিকেটে উল্লিখিত টাকার সমপরিমাণ অংশ অন্যের কাছে বিক্রি করে দেয়া। আর ফুকাহায়ে কেরাম বলেন, কোনো বস্তুতে একাধিক

---

[৫৭৮] আর যদি শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় অর্থায়নের উদ্দেশ্যে হয়, তাহলে এর হুকুম এ প্রবন্ধের শেষে 'ব্যবসার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়' শিরোনামে আলোচনা করা হবে।

অংশীদার হলে তা থেকে কোনো অংশীদার যদি নিজের অংশ বিক্রি করতে চায়, তবে তা জায়েয।[৫৭৯]

তবে মনে রাখতে হবে, ক. শেয়ার কেনার অর্থ কোম্পানির আংশিক মালিক হওয়া। আর সাধারণ নিয়ম হলো, শেয়ার কেনার পর পরই কোম্পানির পক্ষ থেকে মালিকানা সার্টিফিকেট প্রদান করা হয় না। বরং কখনো ৪-৫ দিন, কখনো এর চেয়ে বেশি সময় লেগে যায়। তবে শেয়ার কেনার পরই শেয়ার হোল্ডারকে একটা অস্থায়ী রশিদ দেয়া হয়। এখন প্রশ্ন হলো, শেয়ারের মালিকানা সার্টিফিকেট না পেলেও কেবল অস্থায়ী রশিদ দ্বারা শেয়ার হোল্ডারের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কি না? এ অবস্থায় সে তা অন্য কারো কাছে বিক্রি করতে পারবে কি না? এর জবাব হলো, বিক্রি করতে পারবে। কারণ তাকে যে রশিদ দেয়া হয়েছে যেহেতু তার ক্ষেত্রে এটা সবার কাছে স্বীকৃত মালিকানা ডকুমেন্ট। তাই এই রশিদ কব্জা করলেই সে শেয়ারের পূর্ণ মালিক বলে ধরে নেয়া হবে। তবে সতর্কতা হলো সার্টিফিকেট হাতে পাওয়ার পর বিক্রি করা।

খ. যদি কোম্পানি এখনো কোনো পণ্য বা প্রয়োজনীয় আসবাব, মেশিনারি ইত্যাদি না কিনে থাকে- অর্থাৎ কোম্পানি অস্তিত্ব লাভ করেছে বটে কিন্তু উন্নয়নমূলক কোনো কার্যক্রম শুরু হয়নি, এ অবস্থায় শেয়ার বিক্রি করলে সার্টিফিকেটে উল্লিখিত অংকের সমপরিমাণ মূল্যে বিক্রি করতে হবে, কম বেশি করা যাবে না। অন্যথায় সুদি কারবার হবে।

গ. সার্টিফিকেটের গায়ের মূল্যের (Face Value- ফেইস ভ্যালু) চেয়ে কম-বেশি করে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোম্পানির সম্পূর্ণ পুঁজি তরল[৫৮০] (Liquid Assets- লিকুইড অ্যাসেট্স্) নগদ অর্থ না হতে হবে। বরং কোম্পানির কিছু পণ্য-দ্রব্য (Fixed Assets- ফিক্সড অ্যাসেট্স্) থাকা আবশ্যক। যেমন কোম্পানি নিজস্ব অর্থায়নে জায়গা ক্রয় করে বিল্ডিং তৈরি করলো, বা মেশিনারি ইত্যাদি ক্রয় করলো কিংবা পণ্য ইত্যাদি তৈরির জন্য বিভিন্ন রকম উপাদান বা কাঁচামাল ক্রয় করলো। মোটকথা যখন কোম্পানি তার মূলধনের একাংশকে দ্রব্যগত মূলধনে রূপান্তর করবে, এবং সমস্ত মূলধন তরল না হবে, তখনই শেয়ারকে সার্টিফিকেটের গায়ের মূল্যের (Face Value- ফেইস ভ্যালু) চেয়ে কম বা বেশিতে বিক্রি করা যাবে।

কিছু মূলধন পণ্যে রুপান্তর করার পর ফেইস ভ্যালুর (Face Value) চেয়ে কম বা বেশি দামে শেয়ার বিক্রি করা বৈধ হবে এ জন্য যে, তা তখন স্বর্ণের কারুকার্যখচিত তরবারি ক্রয়-বিক্রয়ের (بیع سیف محلی) মাসআলার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আর স্বর্ণখচিত তরবারি স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করতে হলে ঐ তরবারিতে যে পরিমাণ স্বর্ণ রয়েছে, মূল্য হিসেবে

[৫৭৯] হেদায়াঃ ২/৬০৪, আশরাফী বুক ডিপো সাহারানপুর; ফিকহী মাবাহেসঃ ১৬/৭৩, ইদারাতুল কুআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

[৫৮০] অর্থাৎ মালিকদের থেকে কোম্পানির সঞ্চিত মূলধনের কোন অংশ যদি এখনো কোম্পানির কোন কাজে ব্যবহৃত না হয়; যেমন কোম্পানির কাজের জন্য জমি ক্রয় করে ভবন নির্মাণ করা, মেশিনারি ইত্যাদি ক্রয় করা, তৈরি মাল বা পণ্য তৈরির জন্য বিভিন্ন উপাদান ক্রয় করা ইত্যাদি। তাহলে তাকে তরল অর্থ বলা হবে।

ধার্যকৃত স্বর্ণের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি হলে বিক্রি সহীহ হবে, কম হলে সহীহ হবে না। এর ব্যাখ্যা এই যে, ধার্যকৃত মূল্য থেকে তরবারিতে থাকা স্বর্ণের সমপরিমাণ স্বর্ণকে তরবারির স্বর্ণ খচিত অংশের মূল্য ধরা হবে। ফলে স্বর্ণের বিনিময়ে সমতা রক্ষা হওয়ার কারণে এই বিনিময় সুদি লেনদেনের আওতায় পড়বে না। আর মূল্যের অবশিষ্ট স্বর্ণ-মুদ্রাকে স্বর্ণহীন অংশের মূল্য ধরা হবে। যেহেতু তরবারি ও মুদ্রা সমজাতীয় নয়, অতএব এক্ষেত্রে সমতা রক্ষার প্রয়োজন হবে না। তাই এ অংশে কম বেশি হলেও লেনদেনটি বৈধ হবে।[৫৮১]

এ থেকে সাধারণভাবে বোঝা যায় যে, কোম্পানির আংশিক মূলধন যদি দ্রব্যে রূপান্তর করা হয়ে থাকে, তাহলে ফেইস ভ্যালুর (Face Value) চেয়ে বেশি যে কোনো দামে তা ক্রয়-বিক্রয় করা যাবে। তবে ফেইস ভ্যালুর (Face Value) চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করার ক্ষেত্রে লক্ষ রাখতে হবে যে, আংশিক মূলধন দ্রব্যে রূপান্তরের পর অবশিষ্ট তরল মূলধনের (Liquid Assets) আনুপাতিক হার যত দাঁড়ায় তার চেয়ে কম মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হবে না। তার চেয়ে বেশি মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করলে বৈধ হবে। যেমন ধরুন, কোম্পানি তার কারবারে উন্নতি করার ফলে একশ টাকা মানুষের হাতে পাওনা (কর্জ) আর একশ টাকা নগদ হয়ে গেলো, চল্লিশ টাকা বিল্ডিং, বিশ টাকা কাঁচামাল ও বিশ টাকা মেশিনারীতে চলে গেল। এভাবে কোম্পানির মোট টাকা হলো ২৮০/- আর একটি শেয়ারের বর্তমান মূল্য হলো ২৮/- টাকা। ছকের মাধ্যমে উদাহরণ:

উন্নতির ফলে কোম্পানির মোট টাকা ২৮০/-
বিল্ডিং ৪০/-
মেশিনারী ২০/-
কাঁচামাল ২০/-
নগদ ১০০/-
কর্জ ১০০/-

এমতাবস্থায় শেয়ারের ব্র্যাক অব ভেলু বা একটি শেয়ারের বর্তমান মূল্য হবে ২৮/- টাকা অর্থাৎ

বিল্ডিং ৪/-
মেশিনারী ২/-
কাঁচামাল ২/-
নগদ ১০/-
কর্জ ১০/-
মোট ২৮/- টাকা

এমতাবস্থায় (শেয়ার ক্রেতাদের মধ্যে) কোনো একজন যদি নিজের শেয়ার বিক্রি করতে

[৫৮১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৩/২২২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

চায় তাহলে **২১** টাকার কমে বিক্রি করা তার জন্য জায়েয হবে না।[৫৮২]

দুই. যে সকল কোম্পানির মূল কারবার বৈধ হলেও কোনো না কোনোভাবে সুদি কারবারের সাথে জড়িত। যেমন ব্যাংক থেকে সুদভিত্তিক লোন গ্রহণ বা ব্যাংকে মূলধন জমা দিয়ে সুদ গ্রহণ ইত্যাদি। এ সকল কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করার বিধান জানার পূর্বে কয়েকটি বিষয় আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. সুদ এতই নিন্দিত যে, কোনোভাবেই ইসলামে সুদের আদান-প্রদান বা সমর্থনের সুযোগ নেই।

খ. কোনো কোম্পানি সুদি কারবারে জড়িত হলে কোম্পানির প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের উপর তার অংশের সুদের দায় দায়িত্ব বর্তাবে। এ জন্য একথা বলার সুযোগ নেই যে, 'কোম্পানির মূল পরিচালক সব কিছু করে থাকে, এখানে আমাদের কোনো হাত নেই। তাই সে যদি কোনো সুদি কারবারে যুক্ত হয় তাহলে তাতে আমাদের হাত না থাকায় দায় দায়িত্ব আমাদের উপর বর্তাবে না।'

তার কারণ, পরিচালক যে কেউ হোক না কেন, সুদি কারবারে জড়িত হলেই অংশীদারদের উপর আনুপাতিক হারে সুদের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে যা অংশীদারদের নিকটও পরিষ্কার। তাই তো কোম্পানি কখনো বিলুপ্ত হলে সব হিসাবের সাথে সুদের হিসাবের ভার সব মালিককেই নিতে হবে।

সর্বোপরি কোনো কোম্পানি সুদে জড়িত আছে, এ কথা জানা সত্ত্বেও সেই কোম্পানির শেয়ার ক্রয় করা মানে পরোক্ষভাবে সুদি কারবারকে সমর্থন দেয়া ও তাতে অংশগ্রহণ করা। যা কোনো ভাবেই জায়েয হতে পারে না।

সহজে এভাবে বলা যায় যে, একটি কোম্পানি শুরু করার জন্য ২০,০০০ টাকার প্রয়োজন। তার মাঝে উদ্যোক্তারা ১০,০০০ টাকা দিলো। ৫,০০০ টাকা সুদের উপর ঋণ গ্রহণ করল। আর বাকি ৫,০০০ টাকার শেয়ার ছাড়লো। এখন শেয়ার ক্রয়ের অর্থ হলো উক্ত সুদের দায় দায়িত্ব গ্রহণ করেই অংশীদার হওয়া। এটি কোনোভাবেই বৈধ নয়।

গ. কোনো কোম্পানি পূর্ব থেকেই সুদি কারবারে জড়িত। আর একথাও পরিষ্কার যে, কোম্পানির কোনো কারবার রদবদল করার ক্ষেত্রে আমার ন্যূনতম অধিকার নেই, আমার কথা কোনোভাবে আমলে নেয়া হবে না। এরপরও এ আশা করা সম্পূর্ণ অমূলক যে, আমার দায়িত্ব তো সুদের বিরোধিতা করা। কর্তৃপক্ষের আমলে নেয়া না নেয়া তাদের ব্যাপার।

প্রথমেই যখন আমি জানি যে, আমার কথা আমলে নেয়া হবে না। এরপরও আমি শেয়ার গ্রহণ করলাম। তার অর্থ দাড়ালো আমার কথা গ্রহণ করা হবে না তারা তাদের মত সুদি কারবারে জড়িত থাকবে, তা জানা সত্ত্বেও আমি শেয়ার ক্রয় করলাম। এর শর'য়ী হুকুম

---

[৫৮২] ফিকহী মাকালাত: ১/১৪৭-১৪৮, যমযম বুক ডিপো, দেওবন্দ

পাঠকের সহজেই অনুমেয় যে, তা জায়েয হবে না।

ঘ. অনেকই এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের কথা আসলেই হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী রাহ. এর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে থাকেন। অথচ হযরত থানভী রাহ. শেয়ার গ্রহণ করা বৈধ বলেছেন তখনকার অবস্থা, পরিস্থিতি ও প্রশ্নের ধরনের উপর ভিত্তি করে। আর বলা বাহুল্য যে, তখনকার শেয়ার বিক্রয় আর এখনকার শেয়ার বাজার (স্টক এক্সচেঞ্জ) এক নয়। বরং দু'টোর মাঝে বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তর তফাত রয়েছে। এছাড়া থানভী রাহ. এর আলোচনা 'মুবতালাবিহি' (ইতোমধ্যে যে এধরনের লেনদেনে জড়িয়ে পড়েছে) বা নিতান্ত অপারগতার শিকার এ ধরন ব্যক্তি সম্পর্কে। যে অর্থায়নের জন্য বা ব্যবসার জন্য শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তার জন্য নয়। যেমনটি তাঁর এ বক্তব্য থেকে অনুমেয়।

يقول أشرف علي: إن هذا التوسع كله في أمثال هذه المعاملات لمن ابتلي بها، أو اضطر إليها، وأما غيره فالتوقي الورع.

"আশরাফ আলী এ মর্মে ঘোষণা করছে যে, এ ধরনের লেনদেনে এই ছাড় ও সুযোগ সম্পূর্ণরূপে ঐ ব্যক্তির জন্য যে এই বিপদে পড়ে গেছে অথবা এই লেনদেন করতে চরমভাবে বাধ্য হয়েছে। এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য এ থেকে দূরে থাকাই হচ্ছে তাকওয়া।"[৫৮৩]

তাহলে স্পষ্ট যে, থানভী রাহ. 'মুবতালাবিহি' (ইতোমধ্যে যে এধরনের লেনদেনে জড়িয়ে পড়েছে) ছাড়া অন্যদেরকে এ ধরনের কোম্পানির শেয়ার ক্রয় থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

মোটকথা, যে সকল কোম্পানি কোনো না কোনোভাবে সুদি কারবারের সাথে জড়িত, সেগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। তা অর্থায়নের উদ্দেশ্যে হোক বা কোম্পানির লভ্যাংশ প্রাপ্তির জন্য। যেহেতু এতে সুদি লেনদেনে জড়িত হতে হয়।

তিন. অনুরূপ যে সকল কোম্পানির মূল কারবারই হারাম, সেগুলোর শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় কোনোভাবেই জায়েয নেই।

ব্যবসার উদ্দেশ্যে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়

অনেকেই আছেন যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়কে ব্যবসা হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। তাদের মূল কাজ হলো, শেয়ার কিনে পরবর্তী সময়ে দাম বেড়ে গেলে স্টক এক্সচেঞ্জে বিক্রি করে দেয়া। এভাবে শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার জন্য শর্ত হলো, কোম্পানির মূল কারবারসহ অন্য সকল শাখাগত কারবার সুদমুক্ত হওয়া ও কোম্পানির সম্পূর্ণ পুঁজি তরল না হওয়া; বরং কিছু অর্থের পণ্য-দ্রব্য থাকা।
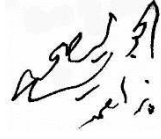
কোম্পানির বাস্তবে কোনো পণ্য বা ইন্ডাস্ট্রি নেই। শুধু সার্টিফিকেটই তাদের পুঁজি এবং তা এক হাত থেকে অন্য হাতে পরিবর্তন হয় মাত্র।

---

[৫৮৩] ইমদাদুল ফাতাওয়া: ৩/৪৯৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

এমন হলে বহু সমস্যা সৃষ্টি হয়। যেমন, যেহেতু কোম্পানির উন্নয়নমূলক কোনো কার্যক্রম বাস্তবে নেই, তাই দিনের পর দিন এই কোম্পানির সঞ্চিত মূলধনের উপরই ক্রয়-বিক্রয় ও লাভ-লোকসান আবর্তিত হচ্ছে। যা সুস্পষ্ট সুদ।
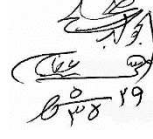
এছাড়াও কোম্পানির বাস্তবে ডেভোলাপমূলক কোনো কার্যক্রম না থাকায় নির্দিষ্ট গ্রুপ নিজেদের স্বার্থ হাসিল করে উধাও হয়ে যায়। ফলে হাজারো মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এটি 'গরার' বা ধোকার শামিল।

সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ-অবৈধ হওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে না জেনে এ জাতীয় লেনদেনে জড়িত হওয়া উচিত নয়।
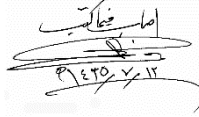
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১২ রজব ১৪৩৫হি.

দরদাম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান

মাওলানা আব্দুল হামীদ সিলেটী

একটা যুগ ছিল, যখন মানুষ লম্বা সময় নিয়ে দেখে শুনে, দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করত। কিন্তু ব্যস্ত পৃথিবীর এ সময়ে অনেকের এই ফুরসতটুকু নেই। বরং ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই চাহিদা এখন দ্রুততার সাথে ঝামেলামুক্ত হওয়া। মানুষের এই চাহিদার ফলে ক্রয়-বিক্রয় উদ্ভাবিত হয়েছে নতুন অনেক পদ্ধতি-প্রক্রিয়া। সৃষ্টি হয়েছে অনেক জটিলতা। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আমরা দরদাম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের শর'য়ী পর্যালোচনা করবো ইন্‌শাআল্লাহ।

প্রথমে বহুল প্রচলিত পদ্ধতিগুলো আলোচনা করবো। এরপর সেগুলোর শর'য়ী পর্যালোচনা পেশ করবো।

দরদাম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়ের প্রচলিত কিছু পদ্ধতি

১. ক্রেতা পণ্যের গায়ের মূল্য দেখে দর কষাকষি ছাড়া চাহিদামত পণ্য নিয়ে নেয়। এরপর মূল্য নগদ দিয়ে দেয়, অথবা বাকি রেখে পরবর্তী সময়ে পরিশোধ করে।

২. বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা জেনে সে অনুযায়ী পণ্য তার বাসায় পৌঁছে দেয় এবং সাথে মেমো দিয়ে দেয়। আর ক্রেতা মেমো অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করে।

৩. ক্রেতা পণ্যের মূল্যের ব্যাপারে কোনোরূপ অবগতি ছাড়াই পণ্য নিয়ে নেয়, অথবা বিক্রেতা ক্রেতার চাহিদা জেনে তার কাছে পণ্য পাঠিয়ে দেয়। আর বিক্রেতা হিসাব কষে রাখে। সপ্তাহ, মাস বা যে কোনো একটি মেয়াদে মোট হিসাব টেনে দেনা-পাওনা চূড়ান্ত করে। মূল্য অগ্রীম থাকে কখনো হিসাব করার পর মূল্য পরিশোধ করা হয়। যেমন যায়েদ দোকানদারের সাথে এভাবে সমঝোতা করলো যে, সে তার নিকট থেকে পণ্য-দ্রব্য নিবে এবং এক মাস পর হিসাব করে মূল্য পরিশোধ করবে।

শর'য়ী পর্যালোচনা

প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকারকে শরী'আতের পরিভাষায় البيع بالتعاطي (মুখে কিছু না বলে হাতে হাতে ক্রয়-বিক্রয়) বলা হয়।

এধরনের ক্রয়-বিক্রয় বৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোনো কোনো ইমাম ভিন্নমত পোষণ করলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ ইমামগণ এটাকে বৈধ বলেছেন।[৫৮৪]

তৃতীয় প্রকারকে শরী'আতের পরিভাষায় بيع الاستجرار (বাইয়ে এসতেজরার) বলা হয়। আর استجرار শব্দটি استجرّ المال (অর্থাৎ অল্প অল্প করে মাল নেয়া) থেকে গৃহীত। এক্ষেত্রে যেহেতু ক্রেতা বেশ কিছু দিন অল্প অল্প করে মাল নিয়ে এরপর এক সাথে হিসাব চূড়ান্ত করে, তাই ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে بيع الاستجرار নাম দিয়েছেন।

---

[৫৮৪] আল মুগনী: ৪/৪-৫ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা: ১/৫১, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

بيع الاستجرار এর বিশেষ কিছু সূরত ও তার পর্যালোচনা

দোকান বা বিপনন কেন্দ্রের মালিকের সাথে সমঝোতা থাকে যে, নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তার থেকে বাকিতে মাল নেবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে দাম পরিশোধ করবে তবে-

১. ক্রেতা যখনই পণ্য নেয়, বিক্রেতা মূল্য বলে দেয় অথবা ক্রেতা যে কোনোভাবে মূল্য জেনে নেয়। মোটকথা, ক্রেতা মূল্য জেনেই পণ্য নেয়।

এই সূরত পূর্বালোচিত البيع بالتعاطي এর মতোই। সেটাকে যারা জায়েয বলেছেন, তাদের কাছে এটাও জায়েয। সুতরাং জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ইমামের মতে তা জায়েয।

২. ক্রেতা পণ্য নেয়ার সময় বিক্রেতা মূল্য বলে দেয় না। ক্রেতাও অন্য মাধ্যমে তা জানতে পারে না। কিন্তু শুরু থেকেই তার বিক্রেতার সঙ্গে চুক্তি হয়ে আছে যে, পণ্যটা নেয়ার সময়ে বাজারমূল্য যা হবে সে হিসেবে মূল্য পরিশোধ করবে। পণ্যের অবস্থাভেদে এটা দুই ধরনের হতে পারে।

ক. পণ্য এমন যে, তার সমশ্রেণীর মাঝে পরিমাণে তারতম্য হয় না এবং মূল্য তারতম্য হয় না। ফলে এর মূল্য নির্ধারণ করা নিয়ে কোনোরূপ বিবাদ ও জটিলতায় পড়তে হয় না। এধরনের পণ্যে পরিমাণ নির্ধারিত হওয়াই মূল্য নির্ধারিত হওয়ার শামিল। ফলে ক্রেতা পণ্য নেয়ার সাথে সাথে লেনদেন চূড়ান্ত হয়ে যায়। বর্তমান বাজারে এ জাতীয় পণ্যের পরিমাণ অনেক বেশি। ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মূল্যের পরিমাণ জানা না থাকলে চুক্তি সহীহ হয় না এ প্রসঙ্গে বলেন-

ومما لا يجوز البيع به: البيع بقيمته أو بما حل به أو بما تريد أو تحب أو برأس ماله أو بما اشتراه أو بمثل ما اشترى فلان لا يجوز... وكذا لا يجوز بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت كالخبز واللحم.

"যে ধরনের চুক্তি দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয় না তার কিছু হলো- পণ্য বিক্রয় করা বাজারমূল্যে কিংবা এর যে দাম আসে তা দিয়ে কিংবা তুমি যা চাও তা দিয়ে কিংবা এর মূল দামে কিংবা সে যে দামে ক্রয় করেছে তা দিয়ে কিংবা অমুক ব্যক্তি যে দামে ক্রয় করেছে তার সমপরিমাণ দিয়ে। অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই যদি এভাবে চুক্তি করে, লোকজনের মাঝে এ পণ্য যে মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় হয় অনুরূপ মূল্য দিয়ে। তবে যদি পণ্যটা এমন হয় যার (পরিমাণ ও মূল্যে) সাধারণত তারতম্য হয় না। যেমন রুটি, গোস্ত ইত্যাদি। (সেক্ষেত্রে বাজারমূল্যে ক্রয়-বিক্রয় জায়েয)।"[৫৮৫]

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন, ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য মূল্যের পরিমাণ জানা থাকা শর্ত, অন্যথায় চুক্তি সহীহ হবে না। যেমন-

ما لو كان الثمن مجهولا، كالبيع بقيمته أو برأس ماله، أو بما اشتراه أو بمثل ما اشتراه فلان ... ومنه

---

[৫৮৫] ফাতহুল কাদীরঃ ৬/২৪১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

أيضا مالو باعه بمثل ما يبيع الناس إلا أن يكون شيئا لا يتفاوت.

"যদি পণ্যের মূল্য অজ্ঞাত থাকে যেমন, কেউ ক্রয়-বিক্রয় করলো এভাবে যে, পণ্য বাজারমূল্যে বিক্রয় করলাম কিংবা তার মূল দামে বিক্রি করলাম বা কেনা দামে বিক্রি করলাম, অথবা অমুক যে দামে কিনেছে তার সমপরিমাণ দিয়ে বিক্রি করলাম। (এ সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সহীহ হবে না) অনুরূপ কেউ বলল, লোকজন যে মূল্য দিয়ে বিক্রি করে আমি অনুরূপ মূল্য দিয়ে বিক্রি করলাম। তবে যদি পণ্যটা এমন হয় যার (পরিমাণ ও মূল্যের) মাঝে সাধারণত তারতম্য হয় না (তাহলে মূল্য জানা না থাকলেও চুক্তি সহীহ হবে)।"[৫৮৬]

খ. ক্রেতা পণ্য নেয়ার সময় তো মূল্য একেবারেই তার অজানা থাকে। আবার বাজারে পণ্যটির সমশ্রেণীর মাঝে পরিমাণে ও মূল্যে এত ব্যবধান যে, বিক্রেতা না বললে জানা সম্ভব নয়। অর্থাৎ লেনদেন সম্পন্ন হয় মূল্য জানা ছাড়াই। অথচ ক্রেতার নিকট মূল্য অজ্ঞাত থাকলে ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হয় না। তাই বাহ্যত এধরনের ক্রয়-বিক্রয় অবৈধ হওয়ার কথা। কিন্তু হানাফী মাযহাবের পরবর্তী ইমামগণ এ ধরনের লেনদেন জায়েয বলেছেন, যদিও পণ্য নেয়ার সময় মূল্য অস্পষ্ট থাকে।

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. এ ধরনের লেনদেন প্রসঙ্গে বলেন-

ما يستجره الإنسان من البياع إذا حاسبه على أثمانها بعد استهلاكها جاز استحسانا.

"মানুষ দোকান থেকে অল্প-সল্প জিনিস ক্রয় করতে থাকে এবং তা ব্যবহার করার পর মূল্য হিসাব করে পরিশোধ করে। এই পদ্ধতিকে استحسانا অর্থাৎ সূক্ষ্ম ইজতেহাদের ভিত্তিতে জায়েয বলা হয়েছে।"[৫৮৭]

আল্লামা ইবনে নুজাইম মিসরী রাহ. বলেন, চুক্তির মাঝে পণ্য উপস্থিত থাকা শর্ত তবে কিছু সূরতে ছাড় দেয়া হয়েছে। যেমন-

ومما تسامحوا فيه وأخرجوه عن هذه القاعدة ما في القنية: الأشياء التي توخذ من البياع على وجه الخرج كما هو العادة من غير بيع، كالعدس والملح والزيت ونحوها، ثم اشتراها بعد ما انعدمت صح إلخ. فيجوز بيع المعدوم هنا.

"লেনদেনের যে সকল সূরতে হানাফী ফিকহের ইমামগণ ছাড় দিয়েছেন এবং (বিনিময় অস্পষ্ট থাকলে বিক্রি শুদ্ধ হয় না) এই মূলনীতির আওতাভুক্ত ধরেননি তার একটি যা কিনয়া কিতাবে উল্লেখ রয়েছে তা হলো ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি যে সকল জিনিস মানুষ সাধারণত প্রয়োজন মাফিক ক্রয়-বিক্রয়ের কথাবার্তা ছাড়াই বিক্রেতার কাছ থেকে নিয়ে আসে, এরপর সে জিনিস খরচ করার পর ক্রয়-বিক্রয়ের আলোচনা হয়, এ লেনদেন শুদ্ধ ও শরী'আত সম্মত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বর্তমান নেই এমন জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ।"[৫৮৮]

---

[৫৮৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৪৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৫৮৭] আদ্দুররুল মুখতার: ৭/৩১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৫৮৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৩০-৩১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে এ বিষয়টি স্পষ্ট যে, এ ধরনের লেনদেনে মূল্য ও পণ্য সংক্রান্ত কিছু শর্ত পাওয়া না গেলেও استحسانا তথা সূক্ষ্ম ও উত্তম বিবেচনায় জায়েয বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্রেতা পণ্য গ্রহণকালে মূল্য অজ্ঞাত থাকায় যদিও বিক্রয় সংঘটিত হয় না, কিন্তু কোনো মেয়াদে গিয়ে যখন হিসাব চূড়ান্ত করা হবে, তখন এই লেনদেন পূর্ণতা লাভ করবে। যদিও এ সময় পণ্যটা বর্তমান থাকে না। যা ক্রয়-বিক্রয় সহীহ না হওয়ার অন্যতম কারণ। কিন্তু পদ্ধতিটি জনসাধারণের মাঝে ব্যাপকতা লাভ করায় এবং ক্রেতা-বিক্রেতার মাঝে পূর্ব থেকে এক প্রকার সমঝোতা থাকায় জায়েয বলা হয়েছে। সুতরাং মূল্য পরিশোধ করার সময় চুক্তিটি পূর্ণতা লাভ করলেও ক্রয়ের সময়েই পরিপূর্ণভাবে সংঘটিত হয়েছে বলে ধরা হবে। যেমন চোর, ডাকাত ও ছিনতাইকারী যদি অন্যের সম্পদের হরণ করে নিঃশেষ করে ফেলে, তারপর জরিমানা দিয়ে দেয়, তাহলে তারা সে সম্পদের মালিক হয়ে যায় এবং তার মালিকানা ধরা হবে হরণ করার সময় থেকে, জরিমানা আদায়ের সময় থেকে নয়।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

وما أفاده كلامه (أي كلام صاحب الدر) من أن الملك في المغصوب ثابت قبل أداء الضمان، وإنما المتوقف على أداء الضمان الحل هو ما في عامة المتون.

وقال الرافعي تحته (أي تحت كلام صاحب الدر): أي فيكون كالبيع بشرط الخيار للمشتري يملكه بالشراء عند سقوط خياره.

"আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. এর বক্তব্য থেকে যে বিষয়টি বোঝা যায়, তা হলো, হরণকৃত সম্পদে হরণকারীর মালিকানা সাব্যস্ত হয় জরিমানা আদায়ের পূর্বেই। আর জরিমানা আদায়ের সঙ্গে ঝুলন্ত থাকে হরণকৃত জিনিসটি ব্যবহারের বৈধতার হুকুম। আর এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে ফিকহের প্রায় সব 'মতনে'।

আল্লামা রাফেয়ী রাহ. আল্লামা হাসকাফী রাহ. এর বক্তব্যের ব্যাখ্যায় বলেন, তাহলে তো এটা ক্রেতার জন্য খেয়ারে শর্ত (ক্রেতার জন্য পণ্য গ্রহণ করা না করার সুযোগ থাকার শর্ত) রেখে বিক্রির মত হলো, যেখানে খেয়ারে শর্তে সময় উত্তীর্ণ হলে ক্রয়ের কারণেই ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়।"[৫৮৯]

মূল্য অগ্রীম পরিশোধের হুকুম

এ ধরনের লেনদেনের ক্ষেত্রে কখনো ক্রেতা মাসব্যাপী দোকান থেকে পণ্য নেয়। মূল্য মাস শেষে পরিশোধ করে। কোনো কোনো সময় এমন হয় যে, ক্রেতা পূর্বেই দোকানদারকে টাকা দিয়ে দেয় এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পণ্য নিতে থাকে আর দোকানদার তার অগ্রীম টাকা থেকে মূল্য কেটে রাখে। এ পদ্ধতির হুকুম প্রথম পদ্ধতির মতই।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. বলেন-

---

[৫৮৯] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৩২১, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

قال في الولوالجية: دفع دراهم إلى خباز فقال: اشتريت منك مأة منّ من خبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة أمناء فالبيع فاسد، وما أكل فهو مكروه، لأنه اشترى خبزا غير مشار إليه، فكان المبيع مجهولا. ولو أعطاه الدراهم وجعل يأخذ منه كل يوم خمسة أمناء ولم يقل في الابتداء اشتريت منك يجوز، وهذا حلال، وإن كان نيته وقت الدفع الشراء، لأنه بمجرد النية لا ينعقد البيع، وإنما ينعقد البيع الآن بالتعاطي، والآن المبيع معلوم فينعقد البيع صحيحا الخ. قلت ووجهه أن ثمن الخبز معلوم، فإذا انعقد بيعا بالتعاطي وقت الأخذ مع دفع الثمن قبله، فكذا إذا تأخر دفع الثمن بالأولى.

"ওয়াল ওয়ালিজিয়্যাহ গ্রন্থকার বলেন, যদি কেউ রুটি বিক্রেতার কাছে টাকা জমা রেখে বলে, আমি তোমার কাছ থেকে ১০০ মন (এক প্রকার পরিমাপ) রুটি ক্রয় করলাম। অতঃপর সে বিক্রেতার কাছ থেকে প্রতিদিন ৫ মন করে রুটি নিতে থাকে, তাহলে এই বিক্রয় অশুদ্ধ বলে গণ্য হবে এবং ক্রেতার হস্তগত রুটিগুলো খাওয়া মাকরূহ হবে। কারণ সে অনির্দিষ্ট রুটি ক্রয় করেছে। ফলে পণ্য অস্পষ্ট রয়ে গেছে। (আর পণ্য অস্পষ্ট থাকা ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধক।)

আর যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে কিছু টাকা দিয়ে দেয়। আর প্রতিদিন তার কাছ থেকে ৫ মন করে রুটি নিতে থাকে। কিন্তু টাকা দেয়ার সময় একথা বলেনি যে, আমি তোমার কাছ থেকে এতগুলো রুটি ক্রয় করলাম। এই পদ্ধতিতে বিক্রয় শুদ্ধ হবে এবং এই রুটিগুলো খাওয়া হালাল হবে, যদিও টাকা দেয়ার সময় রুটি ক্রয় করার ইচ্ছা থেকে থাকে। কারণ শুধু নিয়তের দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় সম্পন্ন হয় না; বরং পণ্য গ্রহণের প্রাক্কালে بيع بالتعاطي এর তরিকায় বিক্রয়টা সংঘটিত হয়। আর এখন তো পণ্যটা নির্ধারিত। তাই বিক্রয়টাও শুদ্ধরূপে চূড়ান্ত হচ্ছে।

আল্লামা শামী রাহ. বলেন, উক্ত পদ্ধতিতে বিক্রয় সংঘটিত হওয়ার কারণ এই যে, এখানে রুটির মূল্য নির্ধারিত। আর ক্রেতা মূল্য অগ্রীম পরিশোধ করা সত্ত্বেও যখন পণ্য হস্তগত করার সময় বিক্রয়টি بيع بالتعاطي হিসেবে সহীহ হয়ে যাচ্ছে, সেখানে যে সকল পদ্ধতিতে ক্রেতা মূল্য পরে প্রদান করে সে সকল ক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কথা তো বলার অপেক্ষা রাখে না।"[৫৯০]

ইমাম মালেক রাহ. স্বীয় গ্রন্থ 'মুয়াত্তায়' উল্লেখ করেন-

ولا بأس أن يضع الرجل عند الرجل درهما ثم يأخذ منه بربع أو بثلث أو كسر معلوم سلعة معلومة.
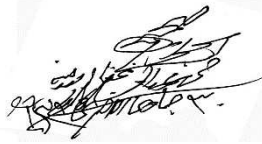
"এর মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই যে, কোনো ব্যক্তি ব্যবসায়ীর কাছে এক দিরহাম রেখে দেয়। অতঃপর ব্যবসায়ী থেকে ঐ দিরহামের এক চতুর্থাংশ অথবা এক তৃতীয়াংশ অথবা কোনো নির্দিষ্ট অংশের বিনিময়ে কোনো নির্দিষ্ট পণ্য ক্রয় করে।"[৫৯১]

---

[৫৯০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৩১ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; ওয়াল ওয়ালিজিয়্যা: ৩/১৪৯ দারুল ঈমান, ইউ পি
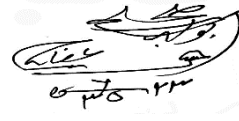
[৫৯১] মুআত্তা মালেক: ৫৯১

মোটকথা, এ সকল পদ্ধতিতে টাকা পরে পরিশোধ করা হোক বা পূর্বেই টাকা জমা রাখা হোক উভয় অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় সহীহ হবে। ক্রেতার পণ্য গ্রহণ করা ও ব্যবহার করা এবং বিক্রেতারও মূল্য নেয়া ও লাভ করার ব্যাপারে শর'য়ী আপত্তি নেই। এটাও মনে রাখতে হবে যে, বৈধ তখন হবে যখন ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে সমঝোতা থাকবে এবং ঝগড়া বিবাদের আশঙ্কা থাকবে না। তবে সতর্কতা হলো পণ্য স্বাভাবিকভাবে দরদাম করে ক্রয় করা।
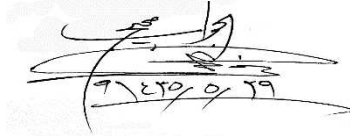
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৯ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয়ের শর'য়ী বিধান

মাওলানা শহীদুল ইসলাম

কিস্তিতে ক্রয়-বিক্রয় মূলত বাকিতে লেনদেনের একটি রূপ। যখন থেকে মানুষের পারস্পরিক লেনদেন শুরু, প্রয়োজনের তাগিদে তখন থেকেই এর সূচনা। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর চাহিদা, ধরন ও পদ্ধতিতে পরিবর্তন এসেছে মাত্র। বর্তমান যুগ যেহেতু অর্থ-বাণিজ্যের বিকাশ ও বিপ্লবের যুগ, তাই এ সময়ে এসে এর চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে এতে প্রবেশ করেছে নতুন অনেক কৌশল ও পদ্ধতি, সৃষ্টি হয়েছে বহু জটিলতা।

এ ধরনের লেনদেনের মূলকথা হলো পণ্য নগদ, মূল্য বাকি। মৌলিকভাবে বাকি বা কিস্তিতে লেনদেন উভয়টাই শরী'আত অনুমোদন করে।

বাকিতে লেনদেন সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ

"হে মুমিনগণ! যখন তোমরা একে অন্যের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ঋণের কারবার কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও।"[৫৯২]

হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

إن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهن درعا له.

"রাসূল ﷺ এক ইহুদী থেকে নির্দিষ্ট মেয়াদের বাকিতে খাবার ক্রয় করেছিলেন এবং তাঁর একটি বর্ম ইহুদীর কাছে বন্ধক রেখেছিলেন।"[৫৯৩]

আর কিস্তিতে লেনদেনের ব্যাপারে হযরত বারীরা রাযি. এর হাদীসটি স্পষ্ট-

عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : جائت بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية.

"হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, বারীরা রাযি. আমাদের কাছে এসে বললো, আমি আমার মনিবের সঙ্গে নয় উকিয়ার বিনিময়ে কিতাবাত চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছি। এ শর্তে যে, বছরে এক উকিয়া করে পরিশোধ করবো।"[৫৯৪]

স্বাভাবিকভাবে বাকিতে বা কিস্তিতে লেনদেনে শরী'আতের পক্ষ থেকে কোনো বাধা নিষেধ নেই। কিন্তু বর্তমানে কিছু নতুন পদ্ধতি যুক্ত হওয়ায় জটিলতা দেখা দিয়েছে, তাই আমরা তার শর'য়ী সমাধান তুলে ধরবো।

---

[৫৯২] সূরা বাকারা: ২৮২
[৫৯৩] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৩৮৬, ২৫০৯; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৬০৩
[৫৯৪] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২১৬৮,২৫৬৩; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৫০৪

কিস্তিতে লেনদেনের কিছু মূলনীতি

এখন আমরা কিস্তিতে লেনদেনের শরী'আত অনুমোদিত পন্থাসমূহ এবং বৈধ-অবৈধ লেনদেনের মাঝে পার্থক্যের মূলনীতিসহ আলোচনা করব। তবে আলোচনার সহজার্থে প্রথমে মূলনীতিগুলো খুব সংক্ষেপে আলোচনা করে নিচ্ছি।

১ম মূলনীতি: বাকিতে লেনদেনের ক্ষেত্রে টাকা কম-বেশি যাই ধার্য করা হোক তার সম্পূর্ণটাই পণ্যের বিনিময় হিসেবে ধার্য করতে হবে, মেয়াদের বিনিময় হিসেবে নয়। অর্থাৎ এক মাসের বাকিতে কোনো পণ্য ক্রয় করলে মূল্য পণ্যের বিনিময় হিসেবেই স্থির হবে। কিছু মূল্য পণ্যের বিনিময় আর কিছু মেয়াদের বিনিময় এমন না হতে হবে।

মেয়াদের বিনিময় ধার্য করা এবং বাকি বিক্রিতে পণ্যের মূল্য নগদের তুলনায় বেশি ধার্য করা; দুটির পার্থক্য অনেকের কাছেই অস্পষ্ট। ফলে কেউ প্রথমটিকে হারাম জেনে দ্বিতীয়টিকেও হারাম বলে থাকেন। আবার কেউ দ্বিতীয়টিকে বৈধ জেনে প্রথমটি বৈধ বলার চেষ্টা করেন। অথচ দুটির প্রয়োগক্ষেত্র ও হুকুমের মাঝে রয়েছে বিস্তর ব্যবধান। প্রথমটি হারাম ও সুদী লেনদেনের অন্তর্ভুক্ত আর দ্বিতীয়টি বৈধ।

জাহেলী যুগের মুশরিকরা দু'টিকে একই ধরতো। ফলে তারা বলে ফেললো-

إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟

"ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মত।"[৫৯৫]

অনেক বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, এখানে ক্রয়-বিক্রয় বলতে তাদের উদ্দেশ্য ঐ বেচাকেনাই ছিল যেখানে বাকির কারণে বিক্রেতা দাম বাড়িয়ে দিত। তাদের বক্তব্য হলো, বাকিতে বিক্রয়ের সময় মূল্য বাড়িয়ে দিলে জায়েয বলা হয়। কিন্তু ক্রেতা সময়মত মূল্য আদায় করতে না পেরে বিক্রেতার কাছে আরও সময় চাইলে বিক্রেতা যদি অতিরিক্ত সময়ের জন্য অতিরিক্ত মূল্য দাবি করে, তাহলে তাকে সুদ ও অবৈধ বলা হচ্ছে! এর উত্তরে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন-

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟

"অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল ও সুদকে হারাম করেছেন।"[৫৯৬]

এ থেকে বোঝা যায়, বাকি বিক্রয়ে মূল্য বাড়িয়ে দিলে সেটা শরী'আত অনুমোদিত ক্রয়-বিক্রয়েরই অন্তর্ভুক্ত। কারণ তখন পুরো মূল্য ধার্য করা হয় পণ্যের বিনিময়েই, যদিও তা সাধারণ বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি হয়।

আর সুদ হলো, যা কোনো পণ্যের বিনিময় ছাড়া অতিরিক্ত ধার্য করা হয় বা এমন কিছুর বিনিময় হিসেবে ধার্য করা হয় যা শরী'আতের দৃষ্টিতে বিনিময় হওয়ার যোগ্য নয়। যেমন সময়ের বিনিময় ধার্য করা। শরী'আত সময়কে বিনিময়যোগ্য কোনো বস্তু হিসেবে স্বীকৃতি

[৫৯৫] সূরা বাকারা: ২৭৫

[৫৯৬] সূরা বাকারা: ২৭৫

দেয়নি।

হযরত কাতাদা রাহ. থেকে জাহিলিয়্যাতের সুদের ব্যাখ্যায় একটি রেওয়ায়েত উল্লেখপূর্বক হাফেজ ইবনে জারীর তাবারী রাহ. মুশরিকদের উত্থাপিত আপত্তির ব্যাখ্যায় বলেন-

يقولون إنما البيع –الذي أحله الله لعباده– مثل الربا، وذلك أن الذين كانوا يأكلون من الربا من أهل الجاهلية كان إذا حل مال أحدهم على غريمه يقول الغريم لغريم الحق: زدني في الأجل وأزيدك في مالك. فكان يقال لهما إذا فعلا ذلك: هذا ربا لا يحل، فإذا قيل لهما ذلك، قالا: سواء علينا زدنا في أول البيع أو عند محل المال، فكذبهم الله في قيلهم فقال: وأحل الله البيع.

"তারা বলতো, যে বেচাকেনাকে আল্লাহা তা'আলা বান্দাদের জন্য হালাল করেছেন তা তো সুদের মতই । কেননা জাহিলিয়্যাতে যারা সুদ গ্রহণ করতো, মেয়াদ শেষ হবার পর তাদের কাছে ঋণগ্রহীতারা এসে বলতো, আমাকে সময় বাড়িয়ে দিন আপনাকে মাল (মূল্য) বাড়িয়ে দিব। তারা উভয়ে এ কাজ করলে তাদেরকে বলা হতো, এটা সুদ যা হালাল নয়। এর উত্তরে তারা বলত- বেচাকেনার শুরুতে মূল্যবৃদ্ধি কিংবা সময় শেষ হওয়ার পর মূল্যবৃদ্ধি উভয়টিই আমাদের কাছে সমান। আল্লাহ পাক তাদের মিথ্যায়ন করে ইরশাদ করেন- আল্লাহ বেচাকেনাকে হালাল করেছেন।"[৫৯৭]

বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে বেশি মূল্য গ্রহণের বৈধতার ব্যাপারে আরও কয়েকটি বর্ণনা ও ইমামদের উক্তি লক্ষণীয়।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন-

لا بأس أن يقول للسلعة: هي بنقد بكذا ونسيئة بكذا، ولكن لا يفترقا إلا عن رضا.[৫৯৮]

"কোনো পণ্যের ক্ষেত্রে একথা বলতে অসুবিধা নেই যে, নগদ হলে এত দাম আর বাকিতে হলে এত দাম। তবে এক পক্ষ চূড়ান্ত না করে চুক্তির মজলিস ভাঙ্গবে না।"[৫৯৯]

হযরত তাউস ও আতা রাহ. বলেন-

لا بأس أن يقول: هذا الثوب بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، ويذهب به على أحدهما.[৬০০]

"একথা বলাতে অসুবিধা নেই যে, এই কাপড় নগদে এত আর বাকিতে এত। তবে এর যে

---

[৫৯৭] তাফসীরে ইবনে জারীর: ৩/১৪২-১৪৩, দারুল ফিকর

[৫৯৮] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ٥٩٢/١٠ بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا أشعث بن سوار، قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٥٨٩٢) : أشعث بن سوار فيه ضعف وقد وثق، وقال ابن عدي في «الكامل» بعد ما ترجم له: ولم أجد لأشعث فيما يرويه متنا منكرا، إنما في الأحايين يخلط في الإسناد ويخالف. روى له مسلم متابعة.

[৫৯৯] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১০/৫৯২, হাদীস নং ২০৮২৬, মাকতাবা দারুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা

[৬০০] أما إسناد عطاء فرجاله ثقات، وأما إسناد طاوس فرجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم، فقد حسن له الترمذي في «سننه» (٣٠٣١) وقال: قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. وقال ابن عدي في «الكامل» بعد ما ترجم له: ليث بن أبي سليم له من الحديث أحاديث صالحة غير ما ذكرت، وقد روى عنه شعبة والثوري وغيرهما من ثقات الناس، ومع الضعف الذي فيه يكتب حديثه. انتهى

কোনো একটিকে গ্রহণ করতে হবে।"[৬০১]

২য় মূলনীতি: ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে মিলে চুক্তি চূড়ান্ত করা-

ক. পণ্য ও তার গুণাবলী নিশ্চিত করা।

খ. বাকিতে হলে সুস্পষ্টভাবে একটি মেয়াদ নির্ধারণ করা।

গ. এবং একই সাথে একটি মূল্যও নির্ধারণ করা।

কেননা এ বিষয়গুলো অস্পষ্ট থাকলে ক্রেতা বিক্রেতার মাঝে বিবাদের সমূহ আশঙ্কা থাকে। আর ফিকহের একটা স্বতঃসিদ্ধ মূলনীতি হল-

الجهالة المفضية إلى المنازعة تمنع جواز البيع.

"যে অস্পষ্টতা বিবাদ সৃষ্টির সম্ভাবনা রাখে তা লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।"[৬০২]

এ সংক্রান্ত আরও প্রমাণাদি সামনে আসছে।

৩য় মূলনীতি: একটি মেয়াদ ও একটি মূল্য নির্ধারণের পর যদি নির্ধারিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অথচ ক্রেতা নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতে না পারে, তাহলে বিলম্বের কারণে নির্ধারিত মূল্যের বাইরে কোনো অর্থ ধার্য করা যাবে না।

৪র্থ মূলনীতি: নির্ধারিত মেয়াদের আগেই টাকা পরিশোধ করলে নির্ধারিত মূল্য থেকে কমানোও যাবে না; বরং চুক্তির সময় যা ধার্য করা হয়েছিল তার পুরোটাই পরিশোধ ও গ্রহণ করতে হবে।

৩য় ও ৪র্থ মূলনীতির ক্ষেত্রে একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় হলো-

কেউ কারো ঋণ পরিশোধকালে ঋণদাতার পক্ষ থেকে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই যদি কিছু বাড়িয়ে দেয় তাতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে- হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

جاء أعرابي يتقاضى النبي ﷺ بعيرا فقال النبي ﷺ : التمسوا له مثل سن بعيره، قال: فالتمسوا فلم يجدوا إلا فوق سن بعيره ، فقال الأعرابي: أوفيتني أوفاك الله، فقال النبي ﷺ: إن خيركم خيركم قضاء.

"হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন, এক গ্রাম্য সাহাবী রাসূল ﷺ এর কাছে পাওনা উট নিতে এলে রাসূল ﷺ উপস্থিত সাহাবা কেরামকে বললেন, তার উটের মত একটা উট খুঁজে বের কর। তখন সাহাবা কেরাম অনেক চেষ্টা করেও তার উটের বয়সী কোনো উট পেলেন না, বরং তার উটের চেয়ে বয়সে বড় উন্নত একটা উট এনে তাকে দিলেন। তখন গ্রাম্য সাহাবী রাসূল ﷺকে উদ্দেশ্য করে বললেন, আমার ঋণ যেভাবে আদায় করেছেন আল্লাহ তা'আলা আপনাকে এর যথাযথ প্রতিদান দিন। তখন রাসূল ﷺ বললেন,

---

[৬০১] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ১০/৫৯৩, হাদীস নং ২০৮৩২, মাকতাবা দারুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা

[৬০২] হেদায়া: ৩/২১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই, যে পাওনাদারের পাওনা উত্তমরূপে আদায় করে।"[৬০৩]

তদ্রূপভাবে ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ঋণ গ্রহণকালে কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই যদি পাওনাদার ঋণের পরিমাণ থেকে কিছু কমিয়ে রাখে তাহলে তাতেও কোনো অসুবিধা নেই। ইমাম আবু বকর জাস্‌সাস রাহ. বলেন-

ومن أجاز من السلف إذا قال: عجل لي وأضع عنك فجائز أن يكون أجازوه إذا لم يجعله شرطا فيه وذلك بأن يضع عنه بغير شرط ويعجب الآخر الباقي بغير شرط.

"যে সকল ইমাম ঋণ তাড়াতাড়ি পরিশোধ করলে ঋণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়াকে জায়েয বলেছেন, তারা এটাকে তখনই জায়েয বলেছেন, যখন তা করা হবে কোনোরূপ শর্ত ছাড়া।"[৬০৪]

এখন আমরা কিস্তিতে লেনদেনের শরী'আত অনুমোদিত পন্থাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ দেবো এবং বর্তমান বাজারের বহুল প্রচলিত কয়েকটি পন্থা উল্লেখপূর্বক শর'য়ী মূলনীতির আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা করব। ইনশাআল্লাহ।

কিস্তিতে লেনদেনের শরী'আত অনুমোদিত পন্থাসমূহের নমুনা

প্রথম প্রকার: ক্রেতা বিক্রেতা উভয় পক্ষের মাঝে সম্পন্ন একটি চুক্তির বিবরণ-

১. পণ্যের বিবরণ: . . .

২. পণ্যের মূল্য: ৫০০০ টাকা

৩. বাকির মেয়াদ: ৫ বছর। ১লা জানুয়ারী ২০১৪ ইং থেকে ৩০শে ডিসেম্বর ২০১৮ ইং। প্রতি মাসে ৮৩.৩৩ টাকা করে আদায় করতে হবে।

এখানে চুক্তির একটি মাত্র মেয়াদ ও একটি মূল্য উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লিখিত মূল্যটি যদিও বর্তমান বাজারমূল্য অপেক্ষা বেশি হয় তবুও কয়েকটি শর্তে এই লেনদেনটি শরী'আতসম্মত।

১ম শর্ত: প্রতিশ্রুত মেয়াদ অতিক্রান্ত হলে নির্ধারিত মূল্যের বাইরে কোনো অর্থ আদায়ের শর্ত করা যাবে না।

কারণ এটা আকদের (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তির) মাঝে নিষিদ্ধ শর্ত হওয়ার সাথে সাথে সুদের একটা প্রকার হয়ে যায়। প্রাচীন জাহেলী যুগে যেরকম সুদের প্রচলন ছিল। হাদীস শরীফে এর বিস্তারিত বর্ণনা পাওয়া যায়। হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম রা. বর্ণনা করেন-

كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل. فإذا حل الأجل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضى أخذ وإلا زاده في حقه وأخر عنه في الأجل.

"জাহেলী যুগের সুদের একটা প্রকার ছিলো এমন, যদি কারো কাছে মেয়াদী কোন পাওনা

---

[৬০৩] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৮৮৯৭; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৬০১

[৬০৪] আহকামুল কুরআন লিল জাস্‌সাস: ২/১৮৭, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

থাকত, কিন্তু সেই মেয়াদের ভেতর ঋণী ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ করতে না পারতো, তখন পাওনাদার ঋণীকে বলতো, ঋণ পরিশোধ করবে নাকি টাকা আরও বাড়িয়ে দেবে? অতঃপর সে যদি ঋণ পরিশোধ করতো তাহলে তো নিয়ে নিত। অন্যথায় ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতো এবং মেয়াদও দীর্ঘ করে দিতো।"[৬০৫]

২য় শর্ত: মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে টাকা পরিশোধ করতে পারলে নির্ধারিত মূল্য থেকে টাকা কর্তন করার শর্তও করা যাবে না। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত ইবনে ওমর ও ইবনুল মুসাইয়্যিব রাযি. বলেন-

من كان له حق على رجل إلى أجل معلوم فتعجل بعضه وترك له بعضه فهو ربا. قال معمر: ولا أعلم أحدا قبلنا إلا وهو يكرهه.[৬০৬]

"যদি কারো কাছে মেয়াদী ঋণ পাওনা থাকে, অতপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পাওনাদার নির্ধারিত পাওনা থেকে কিছু কমিয়ে নেয়ার শর্তে অবশিষ্ট টাকা অগ্রীম গ্রহণ করে তাহলে তা সুদ হবে।"[৬০৭]

আর এই মতই গ্রহণ করেছেন চার মাযহাবের ইমামগণসহ প্রায় সব ফকীহ ও মুহাদ্দিস। ইমাম মালেক রাহ. বলেন-

والأمر المكروه الذي لا اختلاف فيه عندنا أن يكون للرجل على الرجل الدين إلى أجل فيضع عنه الطالب ويعجله المطلوب. قال مالك: وذلك عندنا بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيد الغريم في ثمنه . قال: فهذا ربا بعينه لا شك فيه.

"যে বিষয়টি অপছন্দ হওয়ার ব্যাপারে কোনো দ্বিমত নেই তা হলো, কেউ কারো কাছে একটা মেয়াদী ঋণ পাওনা। এমতাবস্থায় পাওনাদার মোট ঋণের কিছু অংশ কমিয়ে দিলো অবশিষ্ট ঋণটা মেয়াদোত্তীর্ণ হওয়ার আগেই পরিশোধ করার শর্তে। তিনি বলেন, এই লেনদেন ঐ কারবারের মতই হলো, যেখানে ঋণের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ঋণী ঋণের পরিমাণ বাড়িয়ে দিলো এবং পাওনাদার বাড়িয়ে দিলো মেয়াদ। এসবই সুদ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। মা'মার রাহ. বলেন, আমার জানামতে পূর্ববর্তীরাও একে অপছন্দ করতেন।"[৬০৮]

ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

وبهذا نأخذ. من وجب له على إنسان إلى أجل فسأل أن يضع عنه ويعجل ما بقى لم ينبغ ذلك. لا يعجل قليلا بكثير دينا. فكأنه يبيع قليلا نقدا بكثير دينا. وهو قول عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. وهذا قول أبي حنيفة.

---

[৬০৫] মুআত্তা: ৬০৬, প্রকাশক: নূর মুহাম্মদ, তিজারতে কতুব আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

[৬০৬] أخرجه الإمام عبد الرزاق في «مصنفه» ورجال الإسناد كلهم ثقات.

[৬০৭] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ৮/৭১, হাদীস নং ১৪৩৫৪, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, পাকিস্তান

[৬০৮] মুআত্তা মালেক: ৬০৬, প্রকাশক: নূর মুহাম্মদ, তিজারতে কতুব আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

"উপরে যে মত উল্লেখ করা হয়েছে আমাদেরও এ বিষয়ে একই মত। অর্থাৎ কেউ যদি কারো কাছে কোনো মেয়াদী ঋণ পাওনা থাকে, অতঃপর সে ঋণীকে এই প্রস্তাব দেয় যে, তুমি মেয়াদের আগেই দিয়ে দাও, আমি ঋণের পরিমাণ কিছু কমিয়ে দেব। এটা একেবারেই অনুচিত কাজ। নির্দিষ্ট মেয়াদের ঋণ মেয়াদের আগে কমিয়ে উসূল করা জায়েয নেই। কেননা, এখানে যেন সে মেয়াদী একটা মোটা অঙ্কের ঋণের বিনিময়ে গ্রহণ করলো নগদ স্বল্প পরিমাণের অর্থ। আর এই একই মত পোষণ করেছেন হযরত ওমর রাযি. ইবনে ওমর রাযি. ও যায়েদ ইবনে ছাবেত রাযি.। ইমাম আবু হানীফা রাহ. এই অভিন্ন মতই পোষণ করেছেন।"[৬০৯]

২য় প্রকার: কোনো বিক্রেতা পণ্যের দাম এভাবে পেশ করলো-

১. পণ্যের নগদ মূল্য: ১৪০০০ টাকা

২. ৫ বছর মেয়াদী বাকি মূল্য: ২০০০০ টাকা

এখানে কিন্তু নগদ ও বাকীকে কেন্দ্র করে দুই ধরনের প্রস্তাব পেশ করা হয়েছে। কয়েকটি শর্তে এই লেনদেনটিও শুদ্ধ ও শরী'আতসম্মত।

১ম শর্ত: চুক্তিতে নগদ-বাকীর যে দু'টি দিক উল্লেখ আছে, মজলিসে থাকতেই তার কোনো একটিকে চূড়ান্ত করে নিতে হবে। অর্থাৎ যদি নগদ হয় তাহলে তো হলো। আর বাকি হলে নির্দিষ্ট একটা মেয়াদ এবং একটা মূল্য নির্ধারণ করে চুক্তি চূড়ান্ত করতে হবে।

এ ব্যাপারে হাদীস ও ফিকহ গ্রন্থের বক্তব্য নিম্নরূপ-

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

نهى رسول الله ﷺ عن بيعتين في بيعة.[৬১০]

وقال الترمذي: وقد فسر بعض أهل العلم، قالوا: بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين، ولا يفارقه على أحد البيعتين. فإذا فارق على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما.

"রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক চুক্তির মাঝে দুই চুক্তি করতে নিষেধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, ইমামগণ এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এক চুক্তিতে দুই চুক্তি করার অর্থ হলো- 'কোন বিক্রেতা বললো এই কাপড়টা নগদে ১০ টাকা আর বাকিতে ২০ টাকা। কিন্তু এই দুই প্রস্তাবের কোনো একটা চূড়ান্ত না করেই ক্রেতা বিক্রেতা চুক্তির মজলিস ত্যাগ করলো।' যদি কোনো একটিা প্রস্তাব চূড়ান্ত না করেই মজলিস ত্যাগ করে, তাহলে এই লেনদেনটা শুদ্ধ হবে না । আর যদি কোনো একটা প্রস্তাব চূড়ান্ত করেই মজলিস ত্যাগ করে তাহলে লেনদেনট হয়ে যাবে। এতে কোনো অসুবিধা নেই।"[৬১১]

---

[৬০৯] মুয়াত্তা মুহাম্মদ: ৩৩৪, ইয়াসির নদীম এন্ড কোম্পানি, দেওবন্দ

[৬১০] قال الإمام الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم.

[৬১১] জামে তিরমিযী: ১/২৩৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

আর মাবসুত কিতাবে ইমাম সারাখসী রহ. বলেন-

وإذا عقد العقد على أنه إلى أجل كذا بكذا وبالنقد بكذا أو قال :إلى شهر بكذا أو إلى شهرين بكذا فهو فاسد.لأنه لم يعاطه على ثمن معلوم، ولنهي النبي ﷺ عن شرطين في بيع. وهذا هو تفسير الشرطين في بيع... وهذا إذا افترقا على هذا، فان كانا يتراضيان بينهما ولم يتفرقا حتى قاطعه على ثمن معلوم وأتما العقد عليه فهو جائز. لأنهما ما افترقا إلا بعد تمام شرط صحة العقد.

"কোনো চুক্তি যদি সম্পন্ন করা হয় এভাবে, পণ্যটি অমুক মেয়াদ পর্যন্ত বাকিতে এত টাকা, আর নগদে হলে এত টাকা। কিংবা যদি এভাবে বলে, এক মাসের বাকিতে নিলে এত টাকা। আর দুই মাসের বাকিতে নিলে এত টাকা, তাহলে এই লেনদেনটা বাতিল। কেননা আর একটি নির্ধারিত মূল্যের উপর চুক্তিটি সম্পন্ন হয়নি। আরেকটি কারণ হলো, রাসূল সা. একটা লেনদেনের মাঝে দুই ধরনের প্রস্তাব জুড়ে দিতে নিষেধ করেছেন। আমাদের আলোচ্য সূরতটি এমনই। আর চুক্তিটা তখনই বাতিল হবে যখন কোনো একটা প্রস্তাব চূড়ান্ত না করেই তারা চুক্তির মজলিস ত্যাগ করবে। পক্ষান্তরে তারা যদি পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে একটা মূল্য চূড়ান্ত করে তো উপর চুক্তি সম্পন্ন করে, তাহলে চুক্তি জায়েয বলে গণ্য হবে। কেননা তখন লেনদেন শুদ্ধ হওয়ার যাবতীয় শর্ত পূর্ণ করেই তারা মজলিস ত্যাগ করেছে।"[৬১২]

২য় শর্ত: কিস্তি পরিশোধে বিলম্ব হলে বা নির্ধারিত মেয়াদে টাকা পরিশোধ করতে না পারলে বিলম্বের কারণে নির্ধারিত মূল্যের বাইরে কোনো অর্থ ধার্য করা যাবে না। এ বিষয়ের প্রমাণাদি পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় শর্ত: মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে পাওনা পরিশোধ করতে পারলে নির্ধারিত ঋণ থেকে কর্তন করার শর্ত করাও যাবে না। এর প্রমাণাদিও পিছনে আলোচনা করা হয়েছে।

৩য় প্রকার: কোনো বিক্রেতা তার পণ্যের মূল্য পেশ করলো এভাবে-

১. নগদ মূল্য: ১০,০০০ টাকা

২. ১ বছর মেয়াদী বাকি মূল্য: ১২,০০০ টাকা

৩. ২ বছর মেয়াদী বাকি মূল্য: ১৪,০০০ টাকা

এখানে কিন্তু শুধু বাকি নগদের ব্যবধানে মূল্যের তারতম্য বর্ণনায় সীমাবদ্ধ থাকেনি; বরং মেয়াদের ব্যবধানে মূল্যের ব্যবধানেরও একটা লম্বা ফিরিস্ত্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

এ ধরনের সূরতের ব্যাপারে মুফতী তাকী ওসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন,

لم أر في ذلك تصريحا من الفقهاء، وقياس قولهم السابق أن يجوز ذلك أيضا، لأنه إذا جاز اختلاف الأثمان على أساس كونها نقدا أو نسيئة، جاز اختلافها على أساس آجال مختلفة، لأنه لا فارق بين الصورتين.

---

[৬১২] মাবসূতে সারাখসী: ১৩/৭-৮, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

"এমন সূরতের ক্ষেত্রে ইমামদের পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট কোনো বক্তব্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তথাপি এ ব্যাপারে তাঁদের থেকে বর্ণিত সামগ্রিক বক্তব্যের যৌক্তিক দাবী এটাই যে, এমন লেনদেনও জায়েয। কারণ নগদ বাকির ব্যবধানকে কেন্দ্র করে যখন মূল্যের তারতম্য করা বৈধ, তখন মেয়াদের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে মূল্যের তারতম্য করতে কোনো অসুবিধা নেই। কেননা বাস্তবে উভয় সূরতের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।"[৬১৩]

সুতরাং আগের সূরতে বর্ণিত ৩টি শর্তে এই লেনদেনাও শুদ্ধ। যথা:

১. মজলিসে থাকতে কোনো একা প্রস্তাব চূড়ান্ত করে নিতে হবে।

২. কিস্তি আদায়ে বিলম্ব হলে বা নির্ধারিত মেয়াদে ঋণ আদায় করতে না পারলে অতিরিক্ত কোনো অর্থ ধার্য করা যাবে না ।

৩. মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগে ঋণ পরিশোধ করলে নির্ধারিত ঋণ থেকে কর্তন করাও যাবে না।

এখন আমরা বর্তমানে কিস্তিতে লেনদেনের বহুল প্রচলিত অথচ অবৈধ কয়েকটি পদ্ধতি উল্লেখ করে বর্ণিত মূলনীতির আলোকে সেগুলোর পর্যালোচনা করব।

এক. মালিক পক্ষ পণ্যের মূল্য এভাবে পেশ করলো- পণ্যের মূল্য: ২০০০ টাকা। আর প্রতি বছর দিতে হবে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা করে। এখন যে কয় বছরের বাকিতে নিবে সে অনুযায়ী মূল্য পরিশোধ করবে এবং একথার উপরই উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হলো।

পর্যালোচনা: ক্রেতা যদি এধরনের লেনদেনে রাজিও হয়ে যায় তবুও তা বাতিল। কেননা এখানে বাতিল হওয়ার কয়েকটি কারণ একত্রিত হয়েছে।

ক. আমাদের বর্ণিত মূলনীতির প্রথমটি হলো- টাকা যা ধার্য করা হবে তার পুরোটাই হতে হবে পণ্যের মূল্য হিসেবে। কিন্তু এখানে পণ্যের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২০০০ টাকা। আর প্রতি বছর যে অতিরিক্ত ৫০০ টাকা পরিশোধ করার শর্ত করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট সুদ।

খ. আমাদের বর্ণিত মূলনীতির দ্বিতীয়টি হলো- মজলিসে থাকতেই একটি মেয়াদ ও একটি মূল্য নিশ্চিত করে চুক্তি সম্পন্ন করতে হবে। এখানে সে শর্তটিও অনুপস্থিত।

দুই. মালিক পক্ষ পণ্যের মূল্য পেশ করলো এভাবে, পণ্যের মূল্য ২০০ টাকা আর প্রতি মাসে যুক্ত হবে অতিরিক্ত ৫% করে। একথার উপরই উভয় পক্ষের মাঝে চুক্তি সম্পন্ন হলো।

পর্যালোচনা: আগের প্রকারের মত এ প্রকারও বাতিল। কারণ এখানে ১ম ও ২য় মূলনীতির শর্তগুলো লঙ্ঘিত হয়েছে। আমাদের বর্ণিত ১ম মূলনীতি ছিল, যে অর্থ ধার্য করা হবে তার পুরোটাই হবে পণ্যের মূল্য হিসেবে। অথচ এখানে পণ্যের মূল্য ধার্য করা হয়েছে ২০০ টাকা। আর প্রতি মাসে যে অতিরিক্ত ৫% আদায়ের শর্ত করা হয়েছে তা সুস্পষ্ট সুদ।

তাছাড়া ২য় মূলনীতিতে শর্ত ছিল একটি মেয়াদ ও একটি মূল্য নিশ্চিত করে চুক্তি চূড়ান্ত

---

[৬১৩] বুহুছ ফী কযায়া ফিহহিয়্যা মুআসারা: ১/৯ মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

করতে হবে। এখানে সেই শর্তটিও রক্ষা করা হয়নি।
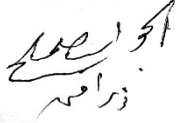
উপরন্তু এটা সুদী লেনদেনের একটা ঘৃণ্যতম প্রকার, যা সমাজে দরিদ্রতা জিইয়ে রাখে এবং সাধারণ মানুষকে দেউলিয়া বানানোর কার্যকরী কৌশল হিসেবে প্রমাণিত।

এ প্রকার লেনদেনের জঘন্যতার আর একটি দিক হলো, এতে চক্রাকারে সুদ আসে। যেমন ধরুন- কেউ একটা পণ্য ক্রয় করলো ২০০ টাকা মূল্যে। এতে সুদ আসবে মাসিক ৫% হারে। এখন ১ মাসের মধ্যে টাকাটা পরিশোধ করলে তাকে দিতে হবে ২১০ টাকা। ২য় মাসে দিলে পরিশোধ করতে হবে ২২০.৫০ টাকা। পণ্যের মূল্য ২০০ টাকা + গত মাসের সুদ ১০ টাকা + এই মাসে ২০০ টাকা পণ্যের মূল্যের উপরে সুদ ১০ টাকা + গত মাসের সুদের ১০ টাকার উপরে সুদ ০.৫০ টাকা = ২২০.৫০ টাকা। এভাবে প্রতি মাসে বিগত মাসের সুদের উপর সুদ আসতে থাকবে। ফলে হাজার টাকার ঋণ লক্ষ টাকা ছাড়িয়ে যায়। এক পর্যায়ে সুদের মাসুল দিতে ভিটেমাটিও হারাতে হয়।
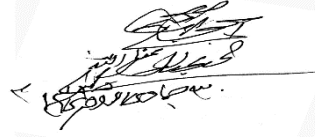
অনেকে আবার প্রতিমাসের শুধু সুদ আদায় করেই দেউলিয়া হয়ে যায়। মূল ঋণ থাকে অপরিশোধিত।

বিশ্বের সুদী প্রতিষ্ঠানগুলো বা সুদী মহাজনরা সরলমনা মুসলমানদের ধোকা দেওয়ার জন্য একেক সময় সুদের একেক নামকরণ করে থাকে, যেন সুদের ঘৃণাটা অন্তরে না আসে। যেমন লাভ, ফায়দা, ইন্টারেস্ট। কখনো আবার ভ্যাট শব্দও প্রয়োগ করে থাকে।
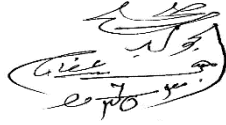
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

এম. এল. এম. এর শর'য়ী বিধান

মাওলানা জহিরুল ইসলাম কিশোরগঞ্জ

এম. এল. এম. বর্তমান সময়ে সর্বাধিক আলোচিত অন্যতম ব্যবসা পদ্ধতি। ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে সর্বপ্রথম এর উদ্ভব ঘটে আমেরিকায়। অল্প সময়ে তা ছড়িয়ে পড়ে গোটা বিশ্বে। একপর্যায়ে ৯০ এর দশকে এর অনুপ্রবেশ ঘটে বাংলাদেশেও। মাত্র দশ বছরের ব্যবধানে দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এর শাখা প্রশাখা। সাধারণ জনগণের পাশাপাশি বহু ধর্মপ্রাণ মুসলমানও যুক্ত হয় এ ব্যবসায়। তবে এর বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনদের মনে নানাবিধ সংশয়ের দানা বাঁধে। এ সংশয় নিরসনে তারা ওলামায়ে কেরামের শরণাপন্ন হন। জানতে চান এর শর'য়ী বিধান। ওলামায়ে কেরামও সাধ্যমত এর সমাধান দিয়ে আসছেন। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

এম. এল. এম. এর পরিচিতি

এম. এল. এম. বা মাল্টিলেভেল মার্কেটিং একটি ব্যবসা প্রক্রিয়া, যা বহুমূখী দালালীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়। যাকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং, ডাইরেক্ট সেলিং ও রেফারাল মার্কেটিংও বলা হয়।

এ সকল কোম্পানির মূল কাজ হলোঃ ১. বিনা পুঁজিতে ব্যবসার একটি কৌশল অবলম্বন করা। ২. বিজ্ঞাপন ব্যয় ছাড়াই কোম্পানির পণ্য বাজারজাত করার একটি পদ্ধতি অবলম্বন করা। ৩. ডিস্ট্রিবিউটরের (পরিবেশক) মাধ্যমে বিনা বিজ্ঞাপনে সহজেই সারা দেশে পণ্য ছড়িয়ে দেয়া। ৪. ডিস্ট্রিবিউটর, এজেন্ট ও সরবরাহের ঝামেলা অন্যের উপর চাপিয়ে দিয়ে কৌশলে বিপুল পরিমাণ লাভবান হওয়া।

বিক্রয় বিপণন, তথ্যবিনিময়ের মাধ্যমে নতুন ক্রেতা সৃষ্টি করা, নতুন নতুন ব্যবসার ক্ষেত্র তৈরী করা ব্যবসায়িক কার্যক্রমের এক অবিচ্ছেদ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ, ব্যবসার কাজ হলো পণ্যদ্রব্য ও সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের হাতে পৌঁছানো। তাই উৎপাদকগণ তাদের সেবা সামগ্রী ভোক্তাদের হাতে পৌঁছাতে নানাবিধ কৌশল অবলম্বন করে থাকেন। মাল্টিলেভেল মার্কেটিং তারই একটি রূপ, একথাই বলতে চায় এম. এল. এম. কোম্পানিগুলো।

এম. এল. এম. এর কার্যক্রম

এম. এল. এম. এর শর'য়ী বিধান জানতে হলে, প্রথমে প্রয়োজন এর নীতি ও কর্মপদ্ধতি জানা। তাই নিম্নে এর ফরম ও প্রচারিত বই-পুস্তকলব্ধ কিছু নমুনা তুলে ধরা হলো।

১. এম. এল. এম. কোম্পানিগুলো সারা দেশে পণ্য বিক্রয়ের জন্য ডিস্ট্রিবিউটর বা পরিবেশক তৈরি করে থাকে। তবে পণ্য বিক্রয়ের তুলনায় পরিবেশক তৈরি করা বা পণ্য ক্রয়ের চেয়ে পরিবেশক হওয়াটাই মূখ্য হয়ে থাকে। যে কারণেই স্বল্পমূল্যের পণ্য কয়েক গুণ বেশি মূল্য দিয়ে সংশয়হীনভাবে ক্রয় করে থাকে।

২. এ সকল কোম্পানিগুলোতে পরিবেশক হতে হলে তাদের নির্ধারিত মূল্যে পণ্য ক্রয় করতে হয়।

৩. কোনো ব্যক্তি কোম্পানির পরিবেশক হওয়ার পর যদি কোনো নতুন ব্যক্তিকে কোম্পানির নিয়মে ক্রেতা ও পরিবেশক বানায় তাহলে এর বিনিময়ে সে ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা কমিশনের নামে পেয়ে থাকে। আর এভাবে ডাউন লাইন যতই বাড়তে থাকবে তার কমিশনও একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে বাড়তে থাকবে, যদিও সে নিজে কোনো কাজ না করে। অর্থাৎ তার কমিশন প্রাপ্তি ডাউন লাইনের শ্রমের সাথে শর্তযুক্ত। ফলে যথাসাধ্য শ্রম দেয়ার পরও নির্দিষ্ট পরিমাণ নতুন পরিবেশক বানাতে না পারলে প্রথম ব্যক্তি কোনো পারিশ্রমিক বা কমিশন পাবে না।

৪. এছাড়াও কিছু কিছু এম. এল. এম. কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগের ব্যবস্থা আছে। এ সকল কোম্পানিতে টাকা বিনিয়োগ পদ্ধতি হলো, কোনো ব্যক্তি এ সকল কোম্পানিতে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা বিনিয়োগ করলে কোনো প্রকার ঝুঁকি গ্রহণ করা ছাড়াই তাকে নির্দিষ্ট সময়ের পর পূর্ব নির্ধারিত হারে লাভ দেয়া হয়।

৫. এমনিভাবে কিছু এম. এল. এম. কোম্পানি। যেমন, ডেসটিনি ২০০০ লিঃ বৃক্ষায়নে বিনিয়োগ করে থাকে। আর তাদের বৃক্ষায়ণের বিনিয়োগ পদ্ধতি নিম্নরূপ-

যদি কোনো ব্যক্তি ৬/১২ বছরের জন্য ৩০টি গাছ ক্রয় বাবদ ১০,০০০/= টাকা বিনিয়োগ করে তাহলে তাকে (বিনিয়োগকারীকে) একটি মালিকানা সনদপত্র দেয়া হয়। অতঃপর, ৬/১২ বছর পর কোনো রকম ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়া ছাড়াই ২৫/৫০ হাজার টাকা তাকে ফেরত দেয়া হবে।[৬১৪]

উল্লেখ্য, বিনিয়োগকারীকে চুক্তির সময় গাছ দেখানো হয় না। এম. এল.এম. এর বিনিয়োগ পদ্ধতিতেও রয়েছে মাল্টিলেভেল সিস্টেম অর্থাৎ এখানে কেউ বিনিয়োগ করতে চাইলে তাকে অবশ্যই ডিস্ট্রিবিউটর ধরে আসতে হবে এবং বিনিয়োগ করার পর সেও ডিস্ট্রিবিউটর হয়ে যাবে। এরপর তার নিচে যারা বিনিয়োগ করবে তাদের থেকে সেও একটা কমিশন পেতে থাকবে। উল্লেখ্য, এ প্রবন্ধে এম. এল. এম. এর নীতি ও কার্যক্রম থেকে শরী'আতের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু দিক তুলে ধরা হলো।

এম. এল. এম. কোম্পানির শরী'আত নিষিদ্ধ বিষয়াবলী

শরী'আত মু'আমালাতের ক্ষেত্রে বহু বিষয়কে নিষিদ্ধ করেছে। যার মধ্য হতে কিছু বিষয় এম. এল. এম. ব্যবসা পদ্ধতিতে পাওয়া যায়। যেমন-

১. এক চুক্তির মধ্যে অন্য চুক্তির শর্ত করা (صفقتان في صفقة)।

---

[৬১৪] দ্রষ্টব্য, রফিকুল আমীন এর সহযোগিতায় মোঃ আবুল কাশেম রচিত ডেসটিনির ট্রিপ্ল্যানটেশন ও এম. এল. এম এর অপূর্ব পণ্য বৃক্ষায়ণ শিল্প ও মাল্টিলেভেল মার্কেটিং : ৩৬, ৩৮. ৪১, ৫১

২. চুক্তিকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা (التعليق بالشرط) ।

৩. ধোঁকা ও অনিশ্চয়তা (غرر)।

৪. বিনিময়হীন শ্রম (العمل بلا أجرة)।

৫. শ্রমহীন বিনিময় (الأجرة بلا عمل) ।

৬. সুদ (الربا) ইত্যাদি ।

১. এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তির শর্ত করা (صفقتان في صفقة)।

এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তির শর্ত করা শরী'আতে নিষিদ্ধ। এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তিকে শর্ত করার উদাহরণ হলো কোনো দোকানদার এ শর্তে পণ্য বিক্রি করলো যে, তার দোকানের পণ্য ক্রয় করলে তার দোকানের পরিবেশক হতে হবে। এখানে ক্রয়ের জন্য পরিবেশক হওয়াকে শর্ত করা হয়েছে। আর এখানে দু'টি চুক্তির সমন্বয় ঘটেছে। এক. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। দুই. ইজারা (চাকুরী বা কর্মচারী) চুক্তি। প্রথম চুক্তি সম্পাদনের জন্য দ্বিতীয় চুক্তিকে শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং এ চুক্তিতে صفقتان في صفقة (এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তিকে শর্ত করার) বিষয়টি সুস্পষ্ট।

পূর্বের বিবরণ অনুযায়ী এম.এল.এম এ صفقتان في صفقة (এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তিকে শর্ত করার) বিষয়টি পাওয়া যায়। এ কোম্পানিগুলোর বিক্রয় ও বিপণন পদ্ধতিতে ডিস্ট্রিবিউটর হওয়ার জন্য পণ্য ক্রয়কে যেমন শর্ত করা হয়ে থাকে, তেমন পণ্য ক্রয়ের জন্য ডিস্ট্রিবিউটরের মাধ্যম অবলম্বন করাকেও শর্ত করা হয়ে থাকে। এম.এল.এম কোম্পানিগুলোর অন্যান্য বিনিয়োগ পদ্ধতি ও ডেসটিনির ট্রি প্লানটেশনেও তা বিদ্যমান। তা এভাবে যে, তাদের কোম্পানিগুলোতে বিনিয়োগ করতে হলে ডিস্ট্রিবিউটর ধরে আসতে হয় এবং তার বিনিয়োগ ডিস্ট্রিবিউটর থেকে একটা কমিশন পায়। এভাবে তার ডাউন লাইন যত লম্বা হতে থাকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তার কমিশনও বাড়তে থাকে। মোটকথা, এখানে বিনিয়োগ করলে ডিস্ট্রিবিউটর হতে হবে বা ডিস্ট্রিবিউটর হতে হলে বিনিয়োগ করতে হবে। আর এ ধরনের চুক্তিতে صفقتان في صفقة (এক চুক্তির জন্য অন্য চুক্তিকে শর্ত করার) বিষয়টি সুস্পষ্ট, যা শরী'আতের দৃষ্টিতে অবৈধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ তা নিষেধ করেছেন। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

نهى رسول الله ﷺ عن صفقتين في صفقة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এক চুক্তির মাঝে (দুই চুক্তি করা) অন্য চুক্তিকে শর্ত করা থেকে নিষেধ

করেছেন।”[৬১৫]

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ যা উল্লেখ করেছেন তার সারমর্ম হলো, প্রত্যেক ঐ চুক্তি যা অপর চুক্তির সাথে শর্তযুক্ত তা নিষিদ্ধ। এর মূল কারণ হলো, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের সন্তুষ্টি আবশ্যক। কিন্তু এ ধরনের চুক্তিতে কোনো এক পক্ষ একটি চুক্তিতে রাজি থাকলেও অপরটিতে রাজি থাকে না; বরং বাধ্য হয়ে গ্রহণ করে। তাহলে এ ধরনের চুক্তিতে পরিপূর্ণ সন্তুষ্টি পাওয়া যায় না। অথচ কুরআনে অপরের মাল নিজের জন্য হালাল হতে মালিকের সন্তুষ্টিকে শর্ত করা হয়েছে। যেমন ইরশাদ হয়েছে -

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ

“হে ঈমানদারগণ তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না। তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টিক্রমে ব্যবসার মাধ্যমে (ভক্ষণ করতে পারো)।”[৬১৬]

আল্লামা আলী আল মারগিনানী রাহ. উল্লেখ করেছেন-

لو باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهرا، أو دارا على أن يسكنها، أو على أن يقرضه المشتري درهما، أو على أن يهدي له هدية، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد المتعاقدين. ولأنه ﷺ نهى عن بيع وسلف. ولأنه لو كان الخدمة والسكنى يقابلهما شيء من الثمن يكون إجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون إعارة في بيع وقد نهى النبي ﷺ عن صفقتين في صفقة.

“যদি কেউ এ শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, বিক্রেতা গোলাম থেকে একমাস খেদমত নিবে, অথবা এ শর্তে ঘর বিক্রি করলো যে, বিক্রেতা সেখানে একমাস থাকবে। অথবা এ শর্তে যে, ক্রেতা-বিক্রেতাকে কিছু ধার দিবে বা হাদিয়া দিবে। (তাহলে ক্রয়-বিক্রয় ফাসেদ হয়ে যাবে)। কারণ, এখানে এমন শর্ত করা হয়েছে যা মূল চুক্তি সম্পর্কীয় নয় এবং তাতে ক্রেতা ও বিক্রেতার যে কোনো একজনের লাভ রয়েছে। আর এ ধরনের এক চুক্তির মাঝে আরেক চুক্তিকে শর্ত করতে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।”[৬১৭]

উল্লেখ্য যে, এম.এল.এম কোম্পানিগুলোতে যে পরিবেশক ও পণ্য ক্রয় একটা আরেকটার সাথে শর্তযুক্ত তা কোনো নমনীয় শর্ত নয়। যা মূল চুক্তির মাঝে তেমন ভূমিকা রাখবে না বরং উভয় পক্ষ এতটাই গুরুত্ব দেয় যে, এ শর্তের সামান্য ব্যতিক্রম হলে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ আশঙ্কা থাকে। কাজেই বিষয়টিকে নমনীয় দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ নেই।

---

[৬১৫] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৩৭৮৩, হাদীসটি সহীহ।
[৬১৬] সূরা নিসা: ২৯
[৬১৭] হেদায়া: ৩/৬০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

২. চুক্তিকে শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা (تعليق بالشرط)।

এম. এল. এম. কোম্পানিগুলোতে এ বিষয়টিও লক্ষ্য করা যায়। কেননা, একজন ডিস্ট্রিবিউটর ফরম পূরণ তথা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সময় তার ডাউন নেট সম্প্রসারণ হওয়ার সম্ভাবনা ও না হওয়ার আশঙ্কা উভয়টিরই দখল থাকে। তাই তার কমিশন প্রাপ্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ ডাউন নেট সম্প্রসারণ হওয়ার সাথে ঝুলন্ত থাকে অর্থাৎ সে পরিবেশক হিসেবে কমিশন পাওয়ার জন্য ডাউন লেভেল লোকের শ্রমকে শর্ত করা হয়। আর শরী'আতে এ ধরনের শর্তযুক্ত চুক্তি অবৈধ।

ইমাম আবুল বারাকাত নাসাফী রাহ. ক্রয় চুক্তি ও ইজারা চুক্তিকে ঐ সকল চুক্তির অন্তর্ভুক্ত করেছেন যা শর্তের সাথে ঝুলিয়ে রাখলে সহীহ হয় না। তিনি বলেন-

ما يبطل بالشرط الفاسد لا يصح تعليقه بالشرط: البيع... الإجارة...

"যে সকল চুক্তি ফাসেদ শর্ত সেগুলোকে দ্বারা বাতিল হয় শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখলে সহীহ হয় না যেমন বিক্রয়... ইজারা ইত্যাদি।"

আল্লামা শামী রাহ. এর ব্যাখ্যায় বলেন-

الأول: «ما يبطل بالشرط الفاسد» أي إذا ذكر في العقد شرطا فاسدا لا يقتضيه العقد، كبعتك العبد على أن يخدمني شهرا مثلا فإنه يبطل البيع.

والثاني: ما لا يصح تعليقه بالشرط، بأن صدر العقد معلقا بأداة الشرط، كبعتك العبد إن قدم زيد، ولم يقيد الشرط الثاني بكونه فاسدا كما قيده أولا بقوله: ما يبطل بالشرط الفاسد، فأفاد أن التعليق يبطل العقد سواء كان الشرط فاسدا أو لا.

"প্রথম হলো: যে চুক্তি ফাসেদ শর্ত দ্বারা বাতিল হয়ে যায়, অর্থাৎ যখন ক্রয়-বিক্রয়র মধ্যে এমন ফাসেদ শর্ত উল্লেখ করা হয়, যা ক্রয়-বিক্রয়র চাহিদার পরিপন্থী। যেমন, কেউ বললো, 'আমি তোমার কাছে গোলাম বিক্রি করলাম এ শর্তে যে, গোলাম একমাস আমার খেদমত করবে।' এ শর্তটি ক্রয়-বিক্রয়কে বাতিল করে দেয়।"

দ্বিতীয় হলো: যে চুক্তি শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা সহীহ নয়, এভাবে যে, চুক্তি শর্তের শব্দের সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় সংগঠিত হলো। যেমন, কেউ বললো, 'যদি যায়েদ আসে, তাহলে আমি তোমার কাছে গোলাম বিক্রি করবো।' দ্বিতীয় শর্ত ফাসেদ হওয়ার কথা বলা হয়নি যেভাবে এ বাক্যের দ্বারা ঃ (ما يبطل بالشرط الفاسد) প্রথমটিকে ফাসেদ হওয়ার শর্ত করা হয়েছে। সুতরাং বোঝা গেলো, التعليق বা শর্তের সাথে ঝুলন্ত রাখা চুক্তিকে বাতিল করে দেয়, শর্তটি ফাসেদ হোক বা না হোক।"[৬১৮]

---

[৬১৮] মিনহাতুল খালেক: ৬/২৯৭-২৯৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী রাহ. উল্লেখ করেছেন-

قوله: (والإجارة) أي كأن آجر داره على أن يقرضه المستأجر، أو يهدي إليه، أو إن قدم زيد عيني ومن ذلك استأجر حانوتا بكذا على أن يعمره... وتمامه في البحر، وبه علم أنها تفسد بالشرط الفاسد وبالتعليق.

"এক ব্যক্তি তার ঘর ভাড়া দিলো এ শর্তে যে, ভাড়াটিয়াকে কিছু ধার দিতে হবে, অথবা তাকে কিছু হাদিয়া দিতে হবে অথবা যদি যায়েদ আসে (তাহলে তোমাকে ভাড়া দিবো) ... এর দ্বারা বোঝা গেলো ভাড়া চুক্তি ফাসেদ শর্ত ও তা'লীক (শর্তযুক্ত করে ঝুলিয়ে রাখা) দ্বারা ফাসেদ হয়ে যায়।"[৬১৯]

উল্লিখিত ভাষ্য থেকে বোঝা গেলো যে, ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি ও ইজারা চুক্তি কোনো শর্তের সাথে ঝুলন্ত থাকলে শরী'আতের দৃষ্টিতে তা বৈধ হবে না। অথচ এম. এল. এম. কোম্পানিতে কমিশন প্রাপ্তির চুক্তি ডাউন লেভেলের শ্রমের সাথে ঝুলন্ত থাকে। সুতরাং এ ধরনের কারবার সহীহ হবে না।

৩. ধোঁকা ও অনিশ্চয়তা (غرر)।

মু'আমালাতের ক্ষেত্রে শরী'আত নিষিদ্ধ আরেকটি বিষয় হলো الغرر বা ধোঁকা।

الغرر اصطلاحا ما يكون مستور العاقبة ولا يدرى أ يكون أم لا. وفي جامع الأصول: الغرر ما له ظاهر تؤثره وباطن تكرهه. فظاهره يغر المشتري وباطنه مجهول. الغرر ما يكون مستور العقبة.

''পরিভাষায় غرر বলা হয় যার পরিণাম অস্পষ্ট এবং জানা যায় না যে, তা পাওয়া যাবে কি না জামেউল উসূলে আছে, যার বাহ্যিক দিক মানুষকে উৎসাহী করলেও তার ভেতরগত দিক নিরুৎসাহী করে।"[৬২০]

غرر এর উল্লিখিত সংজ্ঞানুযায়ী এম. এল. এম. কোম্পানিগুলোতে غرر এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যেহেতু কোম্পানি তার ডিস্ট্রিবিউটরদের সাথে এ চুক্তি করে যে, ডিস্ট্রিবিউটর বা ডাউন লাইন থেকে চুক্তিদারী কমিশন পেয়ে থাকবে- যা একটি অনিশ্চিত গন্তব্য। কেননা ডিস্ট্রিবিউটর তার ডাউন লাইন বাড়াতে পারবে এর কোনো নিশ্চয়তা নেই। এ ধরনের অনিশ্চয়তাকে غرر বলা হয়, যা ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر.

---

[৬১৯] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৭/৫০০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬২০] মাবসূতে সারাখসী: ১২/১৯৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; জামিউল উসূল: ১/৫২৭

''রাসূলুল্লাহ ﷺ পাথর নিক্ষেপের মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় ও ধোঁকার ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।"[৬২১]

ইমাম নববী রাহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

أما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع.

''ধোঁকার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা ব্যবসা সংক্রান্ত অধ্যায়ের একটি বড় মূলনীতি।"[৬২২]

৪. বিনিময়হীন শ্রম (العمل بلا أجرة)।

এম. এল. এম. কোম্পানিগুলোতে বিনিময়হীন শ্রমও রয়েছে। তা এভাবে যে, ডিস্ট্রিবিউটর তার ডাউন লাইন থেকে কমিশন পেতে হলে ডাউন লাইনের লোকজনকে নির্দিষ্ট পয়েন্ট পরিমাণ পণ্য ক্রয় করতে হবে। ক্রেতা (ডাউন লাইন) যদি ৫০০ পি.ভি. এর কম মূল্যমানের পণ্য ক্রয় করে তাহলে ডিস্ট্রিবিউটর এ বাবদ কোনো কমিশন পাবে না। ফলে তা একটি বিনিময়হীন শ্রমে পরিণত হলো। কারণ সে তো যথাসাধ্য শ্রম ব্যয় করেছে, কিন্তু এর বিনিময় সে কিছুই পেলো না। অথচ ইজারা সহীহ হওয়ার জন্য বিনিময় সুনির্দিষ্ট থাকতে হবে এবং শ্রম অনুপাতে বিনিময় দিতে হবে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-

عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى : ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعط أجره.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কিয়ামতের দিন তিন ব্যক্তির বিপক্ষে স্বয়ং আমি বাদী হবো। ১. যে ব্যক্তি কাউকে আমার নামে নিরাপত্তা বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভঙ্গ করেছে। ২. যে ব্যক্তি কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভক্ষণ করেছে। ৩. যে ব্যক্তি কোনো শ্রমিক থেকে পূর্ণ শ্রম আদায় করে নিয়েছে, কিন্তু তার পারিশ্রমিক পরিশোধ করেনি।"[৬২৩]

হাদীসে কুদ্সীতে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

عن أبي هريرة ﷺ عن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى : أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه.[৬২৪]

"তোমরা শ্রমিকের প্রাপ্য তার শরীরের ঘাম শুকানোর পূর্বেই পরিশোধ করে দাও।"[৬২৫]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. উল্লেখ করেন-

---

[৬২১] সহীহ মুসলিম: ২/২

[৬২২] শরহু সহীহ্ মুসলিম লিন্ নববী: ২/২

[৬২৩] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২২২৭

[৬২৪] هذا الحديث أصله في «صحيح البخاري» وغيره من حديث أبي هريرة وأورده البغوي في «المصابيح» في قسم الحسان.

[৬২৫] সুনানে ইবনে মাজাহ: হাদীস নং ২৪৪৩

وشرطها (الإجارة) كون الأجرة والمنفعة معلومتين، لأن جهالتهما تفضي إلى المنازعة.

"ইজারা বা ভাড়া সহীহ হওয়ার জন্য শর্ত হলো পারিশ্রমিক ও লাভ জানা থাকা। কেননা, সেগুলোর অস্পষ্টতা ঝগড়া সৃষ্টি করে।"[৬২৬]

আল্লামা আলাউদ্দীন আফিন্দী রাহ. লিখিত ফাতওয়া দিয়ে বিনিময় গ্রহণ করা যাবে কি না এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেন-

وتمامه في شرح الوهبانية قال فيه: والأصح أنه: أي الأجر بقدر المشقة... وفي العمادية عن الملتقط: وإنما له أجر مثله بقدر مشقته وبقدر صنعته وعمله، وفي شرح التمرتاشي عن النصاب: يجب بقدر العناء والتعب وهذا أشبه بأصول أصحابنا.

"আর শ্রম অনুপাতে পারিশ্রমিক নির্ধারিত হওয়া আবশ্যক। আর এ নীতিটি হানাফী মাযহাবের মূলনীতির সাথে অধিক সামাঞ্জস্যপূর্ণ।"[৬২৭]

৫. শ্রমহীন বিনিময় (الأجرة بلا عمل)।

শ্রমহীন বিনিময় এম. এল. এম. কোম্পানিগুলোতে লক্ষ্য করা যায় তাদের ডাউন লাইনের ব্যক্তিদের থেকে আপলাইনের ব্যক্তিদের কমিশনে। অথচ ডিস্ট্রিবিউটরের নিকটতম ব্যক্তি ছাড়া অন্যদের জন্য আপলাইনের শ্রম নেই বললেই চলে, অথচ ডাউন লাইন যতই দীর্ঘ হবে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আপলাইনের লোকদের কমিশন (শ্রম ছাড়া) ততই বাড়তে থাকবে। সুতরাং এখানে শ্রমহীন বিনিময় পাওয়া গেলো। আর শ্রমহীন বিনিময় অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ ও সুদের অর্ন্তভুক্ত। রঈসুল মুফাস্‌সিরীন আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ এর ব্যাখ্যায় বলেন-

يأكله بغير عوض.

"একপক্ষের বিনিময় ছাড়া অপরপক্ষ কোনো কিছু ভোগ করলেই তা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ (আকল বিল বাতিল) এর অর্ন্তভুক্ত হবে।"[৬২৮]

এখানেও একপক্ষ কোনো প্রকার শ্রম ছাড়াই কমিশন ভোগ করে। সুতরাং তা শ্রমহীন বিনিময়ের অর্ন্তভুক্ত হয়ে নিষিদ্ধ হবে।

৬. সুদ (الربا)।

এম. এল. এম এর ট্রি প্ল্যানটেশন ও টাকা বিনিয়োগ পদ্ধতিতে الربا বা সুদ বিদ্যমান। কাউকে অর্থ প্রদান করে মেয়াদান্তে লোকসানের আশঙ্কা ছাড়া অতিরিক্ত অংক বিনিময়ের

---

[৬২৬] আদ্দুররুল মুখতার: ৯/৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬২৭] তাকমিলাতু রদ্দিল মুহতার: ১১/৭৫-৭৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
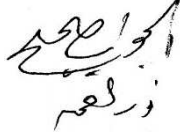
[৬২৮] আহকামুল কুরআন লিল-জাস্‌সাস: ৩/১২৭, দারু ইহইয়াইত তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

চুক্তিই হলো সুদী কারবার। আর এটা উল্লিখিত দু'টি পদ্ধতিতে পাওয়া যায়।

সারকথা

এম.এল.এম. এর কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ, তাদের নিয়ম-পদ্ধতির বিশ্লেষণ ও এ সকল প্রতিষ্ঠানের অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমতের আলোকে জানা যায় যে, এ ব্যবসা পদ্ধতিতে উল্লিখিত নিষিদ্ধ বিষয়গুলো ছাড়াও আরোও কিছু শরী'আত নিষিদ্ধ বিষয় রয়েছে। সুতরাং কোনো মুসলমানের জন্য এ সকল কোম্পানির সাথে কোনোভাবে সম্পৃক্ত হওয়া জায়েয ও বৈধ হবে না। তাই প্রতিটি মুসলমানের উচিত ঈমানী দাবিতে এম. এল. এম. বর্জন করা। আল্লাহ তা'আলা সকল মুসলমানকে এম. এল. এম. সহ সকল প্রকার নাজায়েয লেনদেন থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥
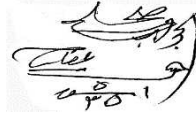
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০১ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

সেলামীর বিধান

মাওলানা আলাউদ্দীন লক্ষ্মীপুরী

বর্তমানে বহুল প্রচলিত ভাড়া পদ্ধতি হলো সেলামী। মালিকের দীর্ঘ মেয়াদে ভাড়া দেয়া জিনিসের নিশ্চয়তার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। এর বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে বিধানসহ সে পদ্ধতিগুলোর উপর পর্যালোচনা করা হবে। প্রথমেই সেলামীর পরিচয় আলোচনা করা সঙ্গত মনে হচ্ছে।

সেলামীর সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ

মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে এককালীন কিছু টাকার লেন-দেনকে সেলামী বলা হয়।

সেলামীর লেনদেন আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে এর ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত আমাদের দেশে তিন পদ্ধতিতে সেলামীর লেনদেন হয়ে থাকে।

১. মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে আসল (মাসিক) ভাড়া ব্যতীত প্রথমেই অতিরিক্ত এককালীন কিছু টাকা মালিককে দেয়ার চুক্তি হয়।

২. মেয়াদ শেষ হলে মালিক তার দোকান বা ঘর ছেড়ে দিতে বললে ঐ সময় ভাড়াটিয়া মালিকের কাছে কিছু টাকা দাবি করে।

৩. প্রথম ভাড়াটিয়া দ্বিতীয় ভাড়াটিয়াকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে তার থেকে এককালীন কিছু টাকা (ভাড়া ব্যতীত) নিয়ে থাকে।

প্রথম পদ্ধতি: কোনো ঘর বা দোকান ভাড়া দেয়ার সময় মালিক ভাড়াটিয়ার সাথে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, এই ঘরটি তোমার কাছে এত বছরের জন্য ভাড়া দিলাম, মাসিক ভাড়া এত টাকা। সাথে সাথে এ চুক্তিও হয় যে, আমাকে এককালীন কিছু টাকা দিতে হবে। এই টাকা তোমাকে ভাড়ার মেয়াদ শেষে ফেরত দিবো।

মালিক ভাড়াটিয়া থেকে এককালীন টাকা নেয়ার কারণ হলো, যদি ভাড়াটিয়া কোনো কারণ বশত ভাড়া না দিয়ে চলে যায়, তাহলে উক্ত টাকা থেকে ভাড়া কেটে নেয়া হবে। অনুরূপভাবে যদি ভাড়াটিয়া ঘর বা দোকানের কোনো ক্ষতি করে ফেলে, তাহলে উক্ত টাকা দ্বারা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। মোটকথা নিরাপত্তা গ্রহণের জন্য মালিক ভাড়াটিয়া থেকে অগ্রীম এককালীন কিছু টাকা নিয়ে নেয়।

সাধারণত দু'ভাবে টাকা ফেরত দেয়া হয়ে থাকে।

১. প্রতি মাসে ভাড়া হিসেবে কাটার মাধ্যমে ফেরত দেয়া। অর্থাৎ যদি মাসিক ভাড়া পাঁচ হাজার টাকা হয়, তাহলে নগদ দিতে হবে চার হাজার টাকা। আর বাকি এক হাজার টাকা উক্ত এককালীন টাকা থেকে কাটা হবে। এক্ষেত্রে সেলামীর টাকা অগ্রীম ভাড়া হিসেবে গণ্য

হবে। আর যেহেতু অগ্রীম ভাড়া আদায় করা সহীহ, তাই সেলামীর এ পদ্ধতিটিও সহীহ। কেননা, যদি ঘর বা দোকানের মালিক অগ্রীম ভাড়া পরিশোধের শর্ত করে, তাহলে ভাড়াটিয়ার জন্য তা অগ্রীম আদায় করা জরুরী। আল্লামা আলী আস-সুগদী রাহ. বলেন-

الأجرة على أربعة أوجه. إما تكون معجلة... فإن كانت معجلة، فليس للمستأجر أن يؤجلها.

"ভাড়া চার প্রকার। প্রথমত অগ্রীম ভাড়া আদায় করা। যদি অগ্রীম ভাড়া দেয়ার চুক্তি থাকে, তাহলে ভাড়াটিয়ার জন্য দেরিতে আদায় করার সুযোগ নেই।"[৬২৯]

উল্লিখিত ভাষ্য অনুযায়ী অগ্রীম ভাড়া হিসেবে সেলামীর লেনদেন করা জায়েয হবে।

২. চুক্তি শেষ হওয়ার পর মালিক ভাড়াটিয়াকে এককালীন পূর্ণ টাকা ফেরত দেবে। আর এতদিন পর্যন্ত তা মালিকের কাছে জামানত হিসেবে থাকবে। বর্তমানে এর প্রচলন ব্যাপক এবং সাধারণত ভাড়ার অতিরিক্ত এককালীন টাকা না দিলে ঘর ভাড়া পাওয়া প্রায় অসম্ভব, তাই জামানত হিসেবে টাকা প্রদান ও গ্রহণ করার অবকাশ আছে। তবে এ সুরত ফিকহী দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় প্রথমটি গ্রহণ করা উত্তম। অনেকে ভাড়ার অতিরিক্ত এককালীন (অফেরতযোগ্য) টাকা দাবি করে এবং ভাড়াটিয়াও দিতে প্রস্তুত থাকে, যা মূলত পজিশন বিক্রির নামে লেনদেন হয়। এ ধরনের লেনদেন শরী'আতসম্মত নয়।

দ্বিতীয় পদ্ধতি: ভাড়ার মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে বা উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে মালিক নিজের দোকান বা বাসা ফেরত নিতে চাইলে, ভাড়াটিয়া মালিকের কাছে কিছু টাকার দাবি করে, এই টাকাকেও সেলামী বলে।

যদি মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে এমন কোনো চুক্তি বা ওয়াদা না থাকে যে, এ সময় পর্যন্ত ভাড়া দিলাম বা নিলাম। অথবা চুক্তির নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার পর মালিক ভাড়াটিয়াকে তার ঘর ছেড়ে দিতে বলে, তাহলে ভাড়াটিয়ার জন্য উক্ত ঘর বা দোকান ছেড়ে দেয়া আবশ্যক। এক্ষেত্রে মালিক তার ঘর বা দোকান খালি করতে ভাড়াটিয়াকে বাধ্য করতে পারবেন এবং ভাড়াটিয়াও ঘর বা দোকান খালি করে দিতে বাধ্য থাকবেন।

এখন যদি ভাড়াটিয়া মালিকের কাছে কিছু টাকা দাবি করে বলে, আমি ঘর বা দোকান ছেড়ে দিবো তবে আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে। এরকম দাবি করা ভাড়াটিয়ার জন্য জায়েয নেই। এটা জুলুম ও ঘুষ হবে। তবে মালিক অপারগ অবস্থায় নিজ অধিকার আদায়ের স্বার্থে ভাড়াটিয়াকে কিছু টাকা দিতে পারবে।

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. ما حرم أخذه حرم إعطاءه 'যা নেয়া হারাম, তা দেয়াও হারাম' মূলনীতির আলোচনায় বলেন, কিছু মাসআলা আছে যা এ মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তার মাঝে الرشوة لخوف على ماله নিজ সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কায় ঘুষ দেয়া।[৬৩০]

---

[৬২৯] আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া: ৩৪১, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

[৬৩০] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/৩৯১, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

হ্যাঁ, যদি মালিক ও ভাড়াটিয়ার মাঝে নির্দিষ্ট সময়ের চুক্তি থাকে আর মালিক নির্ধারিত সময় শেষ হবার পূর্বেই ভাড়াটিয়াকে ঘর বা দোকান ছেড়ে দিতে বলে, তাহলে ভাড়াটিয়ার জন্য ঘর বা দোকান খালি করে দেয়া আবশ্যক নয়। কেননা অনেক সময় ভাড়াটিয়াকে ক্ষতি ও ঝুঁকির মুখোমুখি হতে হয়। অনেকে এরকম প্রতিকূল অবস্থায় না পড়ার জন্যই সেলামী দিয়ে থাকে।

এখন যদি ভাড়াটিয়া মালিকের কাছে কিছু টাকা দাবি করে বলে, আমি ঘর বা দোকান ছেড়ে দিবো ঠিক কিন্তু আমাকে এককালীন কিছু টাকা দিতে হবে। এ দাবী করা ভাড়াটিয়ার জন্য বৈধ হবে। কেননা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভাড়াটিয়ার জন্য উক্ত ঘর বা দোকানে থাকার অধিকার ছিলো। অথচ এখন সে এ অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই নিজ অধিকার থেকে বঞ্চিত হবার ক্ষতিপূরণ হিসেবে মালিকের কাছ থেকে টাকা নেয়া জায়েয হবে। কারণ যদি কেউ কোনো হকের সরাসরি মালিক হয়, তাহলে সন্ধির মাধ্যমে নিজের হক ছেড়ে দেয়ার সময় বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয আছে। যেমন কিসাস গ্রহণের হক।

এক্ষেত্রে অনেকই হাসান রাযি. এর ঘটনাকে পেশ করে থাকেন। হাসান রাযি. খলীফা হওয়ার পরে যখন সদলবলে মু'আবিয়া রাযি. এর দিকে রওয়ানা হন, তখন মু'আবিয়া রাযি. দুইজন ব্যক্তিকে সন্ধির জন্য প্রেরণ করেন। ঘটনার বিবরণ দিতে গিয়ে হযরত হাসান বসরী রাহ. বলেন-

بعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، فأتياه فدخلا عليه فتكلما ... قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك، قال: فمن لي بهذا قالا: نحن لك به فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به فصالحه.

"হযরত মু'আবিয়া রাযি. হযরত হাসান রাযি. এর প্রতি দুইজন কুরাইশী অর্থাৎ আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা ও আব্দুল্লাহ ইবনে আমের রাযি. কে প্রেরণ করে বললেন, তোমরা দু'জন হাসান রাযি. এর কাছে যাও এবং তাঁর কাছে সম্পদ পেশ করো এবং তাঁকে মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য সন্ধির কথা বলে খেলাফত তলব করো। তারা দু'জন হাসান রাযি. এর কাছে এসে বললেন, মু'আবিয়া রাযি. আপনার কাছে এত এত সম্পদ পেশ করে আপনার সাথে খেলাফতের সন্ধি করতে চান। তখন তিনি বললেন, এর যামীন কে হবে? তারা দু'জন বললো, এটা আমাদের জিম্মায়। এরপর হাসান রাযি. যা কিছু চেয়েছেন এর পরিপ্রেক্ষিতে তারা দু'জন বলেছে, এটা আমাদের জিম্মায়। অতঃপর সন্ধি সংঘটিত হয়।"[৬৩১]

আল্লামা আইনী রাহ. এই ঘটনার ব্যাখ্যায় বলেন-

[৬৩১] সহীহ বুখারী: ১/৩৭৩, হাদীস নং ৭২০৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

فيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، وجواز أخذ المال على ذلك، وإعطائه بعد استيفاء شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل وأن يكون المبذول من مال الباذل.

"হযরত হাসান রাযি. এর খেলাফত হস্তান্তরের উক্ত ঘটনা থেকে সুস্পষ্ট হয় যে, খলীফার জন্য স্বেচ্ছায় তার দায়িত্ব থেকে পদত্যাগ করা জায়েয যদি তাতে মুসলমানদের কল্যাণ থাকে এবং এর বিনিময়ে ধন-সম্পদ গ্রহণ করাও জায়েয, এবং তাকে তা দেয়া হবে কতিপয় শর্ত পাওয়া গেলে। যেমন যার হাতে খেলাফত হস্তান্তর করা হচ্ছে তিনি পদত্যাগকারীর চেয়ে উত্তম হওয়া। এবং যে সম্পদ তাকে দেয়া হচ্ছে তা যিনি দিচ্ছেন তার নিজস্ব সম্পদ হওয়া।"[৬৩২]

তৃতীয় পদ্ধতি: সেলামীর তৃতীয় পদ্ধতি হলো প্রথম ভাড়াটিয়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা। অর্থাৎ ভাড়াটিয়া অন্য কারও নিকট উক্ত ঘর বা দোকান ভাড়া দেয়া এবং ২য় ভাড়াটিয়া থেকে প্রথম ভাড়াটিয়া এককালীন কিছু টাকার দাবি করা, এর উপর মালিক রাজি থাকুক বা না থাকুক।

এ পদ্ধতিতে সেলামির লেনদেন জায়েয হবে। কেননা ভাড়াটিয়ার জন্য শরী'আতের পক্ষ থেকে এ অধিকার আছে যে, সে অন্যের নিকট ভাড়া দিতে পারবে। যেমন আল্লামা আব্দুর রহমান শাইখীযাদা রাহ. বলেন-

(فلو شرط) المؤجر سكنى واحد بعينه في إجارة الدار، جاز للمستأجر (أن يسكن غيره) لأن الشرط ليس بمفيد، لعدم التفاوت في السكنى.

"যদি মালিক ঘর ভাড়া দেয়ার সময় শর্তারোপ করে যে, আপনাকেই উক্ত ঘরে থাকতে হবে। তারপরও ভাড়াটিয়া উক্ত ঘর অন্য কাউকে বসবাসের জন্য ভাড়া দিতে পারবে। কেননা বসবাসের উপযুক্ততায় তারতম্য না হওয়ায় এ জাতীয় শর্তারোপ করা অনর্থক।"[৬৩৩]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

ولو استأجر دارا وقبضها ثم أجرها فإنه يجوز أن آجرها بمثل ما استأجرها أو أقل ، ولو زاد في الدار زيادة، كما لو وتد فيها وتدا، أو حفر فيها بئرا، طابت له الزيادة.

"যদি কোনো ব্যক্তি ঘর ভাড়া নিয়ে হস্তান্তরের পর অন্যের নিকট ভাড়া দেয় তাহলে তা ভাড়াটিয়ার জন্য বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো, ভাড়া সমপরিমাণ অথবা কম হতে হবে। যদি ভাড়া বেশি হয়, তাহলে অতিরিক্ত ভাড়া মালিক পাবে। কিন্তু যদি উক্ত ঘরের ভেতর কোনো কিছু বৃদ্ধি করে যেমন- পেরেক মারলো অথবা কূপ খনন করলো ইত্যাদি। তাহলে বেশি

---

[৬৩২] উমদাতুল কারী: ১৬/৩৬৮, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
[৬৩৩] মাজমাউল আনহুর: ৩/৫২৪, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

ভাড়া নেয়া জায়েয হবে।”[৬৩৪]

<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৬৩৪] ফাতাওয়ায়ে আমলগীরী: ৪/৪২৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, ভারত

অধ্যায়ঃ কুরবানী ও আকীকা

মুরগি ড্রেসিং ও যান্ত্রিক জবেহের শর'য়ী বিধান

মাওলানা নুরুদ্দীন মোমেনশাহী

ব্রয়লার মুরগি বর্তমানে বহুল প্রচলিত খাদ্য। ঘরোয়া খাবার থেকে শুরু করে যে কোনো ভোজেই এর উপস্থিতি। ব্যাপক চাহিদার ফলে মানুষের সুবিধার্থে প্রযুক্তির ছোঁয়া এখানেও লেগেছে। তাই অনেকে মুরগি কিনে নিজে জবেহ করে পরিষ্কার করার পরিবর্তে ড্রেসিংয়ের সাহায্য গ্রহণ করে থাকে। অন্য দিকে চাহিদার আধিক্যের কারণে দ্রুত জবেহ করার নিমিত্তে মেশিন ব্যবহার করা হয়। এ বিষয়গুলো সংক্রান্ত শর'য়ী বিধান নিম্নে তুলে ধরা হলো।

শরী'আতসম্মত জবেহের কিছু শর্ত

জবেহের সময় জবেহকারীর জন্য আল্লাহ তা'আলার নাম নেয়া আবশ্যক। কেননা কুরআন হাদীসে আল্লাহ্‌র জবেহকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার অন্যতম শর্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ

"যেসব জন্তুর উপর (জবেহের সময়) আল্লাহর নাম নেয়া হয় না, সেগুলো থেকে ভক্ষণ করো না। এ ভক্ষণ করা গুনাহ।"[৬৩৫]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাদীসে

আল্লাাহর নাম নেয়াকে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। রাফে ইবনে খাদিজ রাযি. থেকে বর্ণিত-

قال رسول الله ﷺ : ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكل.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, আল্লাহর নাম নিয়ে যে জন্তু জবেহ (রক্ত প্রবাহিত) করা হয়, তা খাও।"[৬৩৬]

ফুকাহায়ে কেরামও বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক হওয়ার কথা ফিকহের কিতাবাদিতে উল্লেখ করেছেন। তাঁদের আলোচনা সামনে রাখলে বোঝা যায়, বিসমিল্লাহ বলা জবেহ করার সাথে সম্পর্ক প্রাণীর সংখ্যার সাথে নয়। অর্থাৎ ছুরি চালানোর সময় বিসমিল্লাহ বলতে হবে, একবার ছুরি চালালে যতগুলো প্রাণী জবেহ হোক না কেন। সুতরাং একবার বিসমিল্লাহ বলে ছুরি চালালে, এর দ্বারা দুই বা ততোধিক প্রাণী এক সাথে জবেহ হলে তাও হালাল হবে। যেমন ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

ولو أضجع إحدي الشاتين علي الأخري، تكفي تسمية واحدة إذا ذبحهما بإمرار واحد.

"যদি একটি বকরী অন্য একটি বকরীর উপর শুইয়ে উভয়টি একবার ছুরি চালিয়ে জবেহ

[৬৩৫] সূরা আনআম: ১২১

[৬৩৬] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ২৪৮৮

করা হয়, তাহলে একবার ‘বিসমিল্লাহ’ বলাই যথেষ্ট হবে।”[৬৩৭]

আরো উল্লেখ হয়েছে-

ولو جمع العصافير في يده، فذبح وسمي، وذبح آخر علي إثره ولم يسم لم يحل الثاني. ولو أمر السكين علي الكل جاز بتسمية واحدة.

“বিসমিল্লাহ পড়ে কয়েকটি চড়ুই পাখি থেকে একটি জবেহ করার পর, তাৎক্ষণিক বিসমিল্লাহ না পড়ে আরেকবার ছুরি চালিয়ে আরেকটি চড়ুই জবেহ করলে, দ্বিতীয়টি হালাল হবে না। তবে সবগুলো চড়ুই পাখি একসঙ্গে ছুরি চালিয়ে জবেহ করলে, একবার বিসমিল্লাহ পড়াই যথেষ্ট হবে।”[৬৩৮]

মোটকথা, বিসমিল্লাহ বলে একবার ছুরি চালনোর দ্বারা এক সাথে কয়েকটি জন্তু জবেহ হলে সবগুলোই হালাল হবে। পক্ষান্তরে যদি একবার বিসমিল্লাহ বলে একটি জন্তু জবেহ করা হলো, এরপর আরো একটি জবেহ করা হলো বিসমিল্লাহ না বলেই, তাহলে প্রথম বার বিসমিল্লাহ বলার দ্বারা দ্বিতীয় বারের জন্তু হালাল হবে না।

মেশিনে জবেহের সময় একবার মেশিন চালু করার পর দিনব্যাপী সর্বক্ষণ চলতেই থাকে। অনেক সময় তো রাতদিন একাধারে মেশিন চালু থাকে এবং একেকবার হাজার হাজার মুরগি একের পর এক জবেহ হতে থাকে। এক্ষেত্রে প্রথমবার জবেহকৃত মুরগিগুলো বৈধ হওয়ার সুযোগ থাকলেও দ্বিতীয় বারেরগুলো হালাল হওয়ার সুযোগ নেই।

শরী‘আতসম্মত জবেহের আরেকটি শর্ত হলো, জবেহকারী মুসলমান বা আহলে কিতাব হওয়া, সে জিম্মী হোক বা হারবী।

আল্লামা তুমারতাশী রাহ. বলেন-

وشرط كون الذابح مسلما... أو كتابيا ذميا، و حربيا، فتحل ذبيحتهما، ولو الذابح... صبيا يعقل التسمية والذبح.

“জবেহকারী মুসলমান বা আহলে কিতাব হওয়া শর্ত, সে জিম্মী হোক কিংবা হারবী। তাদের জবেহকৃত পশু খাওয়া হালাল হবে। যদিও জবেহকারী হয় বুঝমান বাচ্চা, যে বিসমিল্লাহ পড়া এবং জবেহ করা বোঝে।”[৬৩৯]

মুরগি জবেহের আধুনিক পদ্ধতি

কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং জাজিরাসহ বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রে মুরগি জবেহ থেকে শুরু করে প্যাকেট কাত করা পর্যন্ত সবকাজই অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন করা হয়।

মেশিনের একদিকে জীবিত মুরগি দিলে অপরদিকে প্যাকেট হয়ে বেরিয়ে আসে। মুরগি

[৬৩৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/২৮৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৩৮] ফতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/২৮৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৩৯] আদ্দুররুল মুখতার: ৯/৪২৭, (তানবীরুল আবসারের ইবারাত) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

জবেহ, দেহ থেকে চামড়া অপসারণ, পেটের ভেতর থেকে নাড়িভুঁড়ি বের করা, গোশত পরিষ্কার হয়ে প্যাকেট হওয়া ইত্যাদি সবগুলো পর্যায়ই একটি বৈদ্যুতিক অটো মেশিনের সাহায্যে সম্পন্ন হয়ে থাকে।

মেশিনের যন্ত্রপাতিগুলো লোহার দীর্ঘ একটি পাটাতনের উপর স্থাপিত। এই পাটাতনটি মূলত বিশাল কারখানার ভেতর নির্মিত দুটি দেয়ালের উপর স্থাপন করা হয়ে থাকে। পাটাতনের নিচে অসংখ্য নিম্নমুখী হুক থাকে। ট্রাক বা লরিতে করে হাজার হাজার মুরগি আনা হয় এবং মুরগিগুলোর উভয় পা হুকের সঙ্গে এমনভাবে টানিয়ে দেয়া হয় যে, সেগুলোর দেহ ও মাথা নিচের দিকে ঝুলন্ত থাকে। অর্থাৎ মুরগির পা থাকে উপরের দিকে এবং মাথা নিচের দিকে। অতঃপর মেশিন চালু করার সঙ্গে সঙ্গে পাটাতনের সঙ্গে টানানো হুকগুলো মুরগিসহ চলতে শুরু করে। তারপর হুকে ঝুলন্ত মুরগিগুলোকে ছোট ছোট ঝরনা থেকে নির্গত ঠান্ডা ও শীতল পানি দ্বারা ধোয়া হয়। উদ্দেশ্য হলো প্রথমে তার দেহে লেগে থাকা ময়লাগুলো ভালোভাবে পরিস্কার করে নেয়া। কোনো কোনো সময় ঐ পানিতে বিদ্যুতেরও সংযোগ থাকে, যার ফলে মুরগিগুলো অচেতন হয়ে যায়।

অতঃপর হুকগুলো মুরগিসহ এমন স্থানে চলে যায়, যার নিচে ঘূর্ণায়মান ছুরি স্থাপিত থাকে। ছুরিগুলো খুব দ্রুতগতিতে ঘুরতে থাকে। হুকের সঙ্গে টানানো মুরগিগুলো ছুরির উপর আসতেই মুরগির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এভাবে সামান্য সময়ে অসংখ্য মুরগির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর হুকগুলো মুরগিসহ আরো সামনে অগ্রসর হয়, যেখানে উপর থেকে প্রবল বেগে গরম পানি এসে মুরগির দেহের পরগুলো পরিষ্কার করে ফেলে। পরবর্তী পর্যায়ে পেটের নাড়িভুঁড়ি বের করা, গোশত পরিষ্কার করা, টুকরো টুকরো করা এবং সর্বশেষ প্যাকেট কাত করার কাজগুলো এভাবেই আধুনিক এ মেশিনের সাহায্যে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য যে, এই অত্যাধুনিক মেশিন সারা দিন একটানা চালু থাকে। আবার কোনো কোনো সময় রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টাই চালু থাকে। বিশেষ পরিস্থিতিতে কখনো সাময়িকভাবে বন্ধ থাকলে ভিন্ন কথা।[৬৪০]

আধুনিক পদ্ধতিতে মুরগি জবেহে নিম্নোক্ত দূষণীয় বিষয়াবলী বিদ্যমান

১. বিদ্যুৎ সংযোজিত ঠাণ্ডা পানির ভেতর মুরগি অতিবাহিত হলে, স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে বলা যায় যে, বিদ্যুৎ সংযোজন পশুর মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। তবে তার বোধশক্তি হারিয়ে অবশ হয়ে যায়। এমনকি কোনো কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির ধারণা হলো, বিদ্যুতের সংযোজনে শতকরা নব্বই ভাগ মুরগিই চেতনা শক্তি হারিয়ে ফেলে। এ কারণে এ জাতীয় পশুকে জবেহ করলে ততটুকু রক্ত প্রবাহিত হয় না, স্বাভাবিক জবেহে যতটুকু রক্ত প্রবাহিত হয়। উপরন্তু এ সকল কার্যক্রমের কারণে জবেহের পূর্বে পশুগুলো মারা যাওয়ারও প্রবল আশংকা থাকে।

---

[৬৪০] বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারাহঃ ২/৪১-৪২, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

২. মেশিনে সংযোজিত ছুরিগুলো মুরগির গলার রগগুলো কাটার জন্য যথেষ্ট হলেও কোনো কোনো সময় যে কোনো কারণে হুকে টানানো মুরগিগুলোর গলা অকর্তিত থেকে যায়। কিংবা অল্প কেটে বেশি অংশ অকর্তিত থেকে যায়। আর এই দুই অবস্থায় শরী‘আতসম্মত জবেহ হয় না।

৩. মেশিনে ছুরিগুলো সংযোজিত থাকলে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। কারণ জবেহকারী নির্ধারণ করা আবশ্যক। যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়া জবেহকারীর উপর ওয়াজিব। সুতরাং যদি জবেহকারী ব্যতীত অন্য কেউ বিসমিল্লাহ পড়ে এবং জবেহকারী ইচ্ছাকৃতভাবে বিসমিল্লাহ ছেড়ে দেয় তাহলে ঐ পশু খাওয়া হালাল হবে না। যদি মেনেও নেয়া হয়, যে ব্যক্তি মেশিন চালু করে সেই জবেহকারী। তবুও প্রতিটি মুরগী হালাল না হওয়ার আশংকা বিদ্যমান, যেহেতু তার পক্ষে প্রতিটি মুরগির জন্যে বিসমিল্লাহ পড়া সম্ভব নয়। কেননা যে ব্যক্তি সকালে মেশিন চালু করলো, সে তো একবার চালু করার পর মেশিনটি দিনব্যাপী সর্বক্ষণ চলতেই থাকে। আবার অনেক সময় তো রাতদিন লাগাতার মেশিন চালু থাকে। আর হাজার হাজার মুরগির মাথা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকে। এছাড়াও ছুরির সামনে দাঁড়ানো কোনো ব্যক্তির বিসমিল্লাহ পড়া শরী‘আতের চাহিদা পূরণে যথেষ্ট নয়।

৪. মেশিনে জবেহ করলে মুরগির মাথা দেহ থেকে আলাদা হয়ে যায়, এটি মাকরূহ। আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

ومن بلغ بالسكين النخاع، أو قطع الرأس، كره له ذلك، وتؤكل ذبيحته.

“জবেহে গর্দানের শেষ হাড্ডি পর্যন্ত কাটা বা মাথাকে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা মাকরূহ। তবে তার গোশত খাওয়া যাবে।”[৬৪১]

৫. গরম পানির ভেতর মুরগির অতিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে দুটি প্রশ্ন উত্থাপিত হয়-

ক. যেসব মুরগির গলা ঘূর্ণায়মান ছুরির দ্বারা একেবারেই কাটেনি, বা অল্প কেটেছে এবং তার ভেতর প্রাণ অবশিষ্ট রয়েছে, গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হওয়ার কারণে সেগুলোর মৃত্যু ঘটার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে।

খ. মুরগিগুলো নাড়িভুঁড়ি বের করার পূর্বেই গরম পানির ভেতর দিয়ে অতিবাহিত হয়ে থাকে। যদি পানি উত্তপ্ত গরম হয় এবং এতটুকু সময় পানিতে থাকে যে, নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ঐ গোশত খাওয়া হালাল হবে না।

উল্লিখিত সমস্যাগুলোর আলোকে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যায় যে, অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করা জায়েয নেই। কেননা আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করলে তা হারাম হওয়ার সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ একাধিক হাদীসে সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত আদী ইবনে হাতিম রাযি. বর্ণনা করেন-

---

[৬৪১] হেদায়া: ৪/৪৩৮, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

قلت: يا رسول الله! إني أرسل كلبي، وأجد معه كلبا آخر، لا أدري أيهما أخذه، فقال: لا تأكل، فإنما سميت علي كلبك ولم تسم علي غيره.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! শিকারের উদ্দেশ্যে পাঠানো (প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) কুকুরের সঙ্গে অন্য কুকুরও দেখতে পাই এবং জানতে পারি না, কোনো কুকুর শিকার করেছে? রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, এরকম শিকার খেয়ো না। কেননা তুমি তোমার কুকুরের উপর বিসমিল্লাহ পড়েছ; অন্যটির উপর নয়।"[৬৪২]

শিকার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন-

إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فإنك لا تدري، الماء قتله أو سهمك.

"যদি তুমি (শিকার করা প্রাণী) পানিতে পাও, তাহলে তা খেয়ো না। কেননা তোমার জানা নেই, ঐ প্রাণীটি পানিতে ডোবার কারণে মরেছে, না তোমার তীরের আঘাতে মরেছে?"[৬৪৩]

উপরোল্লিখিত উভয় হাদীসের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ সন্দেহ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ প্রদান করেছেন। তবে উক্ত দূষণীয় বিষয়াবলী সংশোধন করা হলে অত্যাধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহ করতে কোনো অসুবিধা নেই।

এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, মেশিনের জবেহ কুকুর দ্বারা শিকার করার মত। অর্থাৎ কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিলে সে যতগুলো প্রাণী শিকার করবে সবই হালাল। এখানেও একবার বিসমিল্লাহ পড়ে মেশিনের সুইচ দিলে এক স্টার্টে ক্রমান্বয়ে জবেহকৃত সকল জন্তুও হালাল হবে।

এক্ষেত্রে এ যুক্তি সঠিক নয়। কারণ কুকুরের শিকার (ذبح اضطراري) 'জবহে ইযতেরারী'। আর ছুরি দিয়ে জবেহ করা হলো (ذبح اختياري) 'জবহে ইখতিয়ারী'।[৬৪৪] আর উভয়ের বিধিবিধান ভিন্ন, এক নয়। তাই একটার উপর ভিত্তি করে অন্যটার বিধান স্থির করার সুযোগ নেই। এ ছাড়াও যেহেতু বর্তমানে কাজের লোক বিপুল, তাই জবেহ ইত্যাদি যে কাজগুলো মেশিনের সাহায্যে করলে শর'য়ী আপত্তি রয়েছে সেগুলো লোক দিয়ে করার পূর্ণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও, মেশিনে করাকে জরুরী মনে করা ঠিক হবে না।

আধুনিক মেশিনের সাহায্যে পশু জবেহের জটিলতা নিরসন

উপরোল্লিখিত দূষণীয় বিষয়গুলোর ধারাবাহিক সংশোধন-

১. ঠাণ্ডা পানিতে বিদ্যুৎ সংযোগ না দেয়া। কিংবা কোনো প্রক্রিয়ায় এই বিষয়টি নিশ্চিত

---

[৬৪২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৪৮৬

[৬৪৩] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৯২৯

[৬৪৪] জবহে ইযতেরারী: যে জবেহ একান্ত অপারগতা বশত হয়ে থাকে। যেমন কুকুর ইত্যাদি কোন শিকারী প্রাণীর মাধ্যমে শিকার করা হলে শিকারী প্রাণীর আঘাতকেই জবেহ ধরে নেয়া হয়। কেননা এক্ষেত্রে ছুরি দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করে জবেহ করা সম্ভব নয়।
জবহে ইখতিয়ারী: যে জবেহ স্বাভাবিক অবস্থায় হয়ে থাকে। যেমন ছুরি দিয়ে জবেহ করা। এটাই আসল জবেহ। এটা সম্ভব হলে প্রথমটা গ্রহণ করা অনুচিত।

হওয়া যে, জবেহের আগেই বিদ্যুতের স্পর্শে মুরগির মৃত্যু হয়নি।

২. মেশিন থেকে ছুরি খুলে তার পরিবর্তে কয়েকজন মুসলমান দাঁড় করিয়ে দেবে। যখন মুরগিগুলো দাঁড়ানো লোকদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করবে তখন তারা পর্যায়ক্রমে প্রতিটি মুরগি বিসমিল্লাহ পড়ে জবেহ করবে।

তদ্রূপভাবে যদি এমন কোনো মেশিন তৈরি করা যায়, যার সংযুক্ত ছুরিগুলো একজন মুসলমান নিয়ন্ত্রণ করবে এবং সে প্রতিবার বিসমিল্লাহ বলে সুইচ দিবে। এভাবে যে বার বিসমিল্লাহ বলে সুইচ দিবে সে বারে যে মুরগিগুলো জবেহ হবে সেগুলোর উপর বিসমিল্লাহ বলার কারণে এই জবেহ শর'য়ী জবেহ হবে।

৩. এই বিষয়টি নিশ্চিত হওয়া জরুরী যে, গরম পানির ভেতর যে মুরগি অতিবাহিত হয়, তা যেন ফুটন্ত পানির ভেতর এতক্ষণ সময় না থাকে যা দ্বারা অভ্যন্তরের নাপাকি গোশতের ভেতর প্রবিষ্ট হয়। উপরোক্ত সংশোধনী গ্রহণের পর মেশিনে জবাইকৃত মুরগিগুলো হালাল হয়ে যাবে।[৬৪৫]

ড্রেসিংয়ের পদ্ধতি ও তার শর'য়ী হুকুম

জবেহকৃত মোরগ-মুরগি গরম পানিতে ডুবিয়ে মেশিনের সাহায্যে ড্রেসিংয়ের কতিপয় পদ্ধতি।

ক. মোরগের নাড়িভুঁড়ি বের না করে পবিত্র বা অপবিত্র উত্তপ্ত গরম পানিতে দীর্ঘ সময় রাখা। যার ফলে নাপাকির ক্রিয়া গোশতের ভেতর ঢুকে যায়।

খ. মোরগের নাড়িভুঁড়ি বের করে অপবিত্র উত্তপ্ত গরম পানিতে দীর্ঘ সময় রাখা। যার দরুন অপবিত্র পানি গোশতের ভেতর ঢুকে যায়।

উক্ত দুই অবস্থায় গোশত হারাম হয়ে যাবে, হালালের কোনো ব্যবস্থা নেই। এ কথার উপরই ফাতওয়া।

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ولو ألقيت دجاجة حالة الغليان في الماء قبل أن يشق بطنها لتنتف أو كرش قبل الغسل، لا يطهر أبدا.

"যদি মুরগির নাড়িভুঁড়ি বের করার পূর্বে ড্রেসিংয়ের জন্য উত্তপ্ত গরম পানিতে চুবিয়ে দেয়, তাহলে তা (নাপাক হয়ে যাবে) কখনো পাক হবে না।"[৬৪৬]

গ. মোরগের নাড়িভুঁড়ি বের করা ও উপরের ময়লা পরিষ্কার করার পর পবিত্র উত্তপ্ত গরম পানিতে দীর্ঘ সময় বা সামান্য সময় রাখা। এই সুরতে কোনো সমস্যা নেই।

ঘ. মোরগের নাড়িভুঁড়ি বের করার পূর্বে বা পরে সামান্য গরম পানিতে এত অল্প সময় রাখা, যার দরুন ভেতরের নাপাকি বা নাপাক পানির আছর গোশতের ভেতর ঢুকে না। এই অবস্থায় গোশত হারাম হবে না। তবে বহিরাংশে নাপাক লাগার কারণে তিনবার ধোতে হবে।

---

৬৪৫ বুহুছ ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারাহ: ২/৫০-৫১ মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

৬৪৬ ফাতহুল কাদীর: ১/২১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

فالأولى في السميط أن يطهر بالغسل ثلاثا لتنجس سطح الجلد بذلك الماء، فإنهم لا يحترسون فيه عن المنجس.
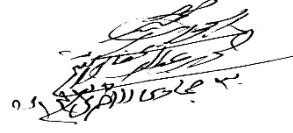
"যে মুরগি পরিষ্কারের উদ্দেশ্যে গরম পানিতে চুবানো হয়েছে, তার চামড়ার উপরিভাগ নাপাক হওয়ার কারণে তিনবার ধুয়ে নিবে।"[৬৪৭]

তাই সতর্কতামূলক প্রচলিত পদ্ধতিতে ড্রেসিং না করে স্বাভাবিক পদ্ধতিতে বাড়িতে ড্রেসিং করাই উচিৎ। একান্ত যদি বাজারে কিংবা দোকানে ড্রেসিং করতেই হয়, তাহলে প্রথমে জবেহকৃত মোরগ-মুরগির নাড়িভুঁড়ি বের করে শরীরে লেগে থাকা নাপাকী পরিষ্কার করে নিবে। এরপর পবিত্র গরম পানিতে অল্প সময় রেখে ড্রেসিং করবে।
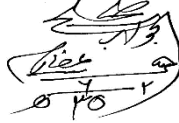
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৬৪৭] ফাতহুল কাদীর: ১/২১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আকীকা: কিছু সমস্যা ও সমাধান

মাওলানা নোমান পটুয়াখালী

আকীকা একটি বিশেষ ইবাদত। যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে পালন করা হয়। মূলত আকীকা হলো সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার শুকরিয়া আদায়ার্থে জন্তু কুরবানী করা। নিম্নে আকীকা সম্পর্কে কিছু সমস্যা ও সমাধান তুলে ধরা হলো।

আকীকার হুকুম

ইমাম তাহাবী রাহ. বলেন-

والعقيقة تطوع، من شاء فعلها، ومن شاء تركها.

"আকীকা একটি নফল ইবাদত, যা আদায় করা ও না করার ব্যাপারে স্বাধীনতা রয়েছে।"[৬৪৮]
কিছু কিছু হাদীসে আকীকা সম্পর্কে আদেশবাচক শব্দ ব্যবহার হলেও অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিষয়টিকে ঐচ্ছিক রেখেছেন। ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন-

سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: لا أحب العقوق، وكأنه إنما كره الاسم، وقال: من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, আমি 'উকুক' পছন্দ করি না। যেন রাসূলুল্লাহ ﷺ শব্দটি অপছন্দ করলেন। এবং বলেন, কারো সন্তান ভূমিষ্ট হলে, সে যদি চায় সন্তানের পক্ষ থেকে 'নুসুক' (কুরবানী) আদায় করতে, সে যেন তা করে।"[৬৪৯]
ইমাম আবু দাউদ রাহ. বর্ণনা করেন-

عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده قال: سئل رسول الله ﷺ عن العقيقة، فقال: لا يحب الله العقوق. كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد، فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.[৬৫০]

"আমর ইবনে শোয়াইব তার পিতা থেকে বর্ণনা করে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ কে আকীকা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে, রাসূল ﷺ বলেন, আল্লাহ 'উকুক' পছন্দ করেন না। যেন রাসূল ﷺ শব্দটি অপছন্দ করলেন। তারপর বলেন, কারো সন্তান হওয়ার পর তার পক্ষ থেকে 'নুসুক' আদায় করতে চাইলে ছেলে সন্তানের জন্য সমপর্যায়ের দু'টি বকরি আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি বকরি জবেহ করবে।"[৬৫১]
ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন-

وظاهر هذا اللفظ يدل على أنها غير واجبة، لأنه قال: «من أحب أن ينسك عن ولده، فليفعل»، فعلّق

---

[৬৪৮] মুখতাসারুত তাহাবী: ২৯৯, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান
[৬৪৯] মুআত্তা মালেক: হাদীস নং ১৮৩৮
[৬৫০] أخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري في «المستدرك» ٧٥٩٢ وصححه ووافقه الذهبي في «التلخيص» وقواه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى »
[৬৫১] আল মুসতাদরাক লিল হাকেম: হাদীস নং ৭৫৯২

فعله بمحبته، فإذا لم يحبه، لم يكن عليه.

"হাদীসের বাহ্যিক ভাষ্য এ কথাই বুঝায়, আকীকা ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কেউ চাইলে আকীকা করতে পারে আর না চাইলে নাও করতে পারে। অর্থাৎ আকীকা করাটা ঐচ্ছিক বিষয়। করা না করা পুরোটাই ইচ্ছাধীন।"[৬৫২]

আল্লামা আইনী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন-

فهذا (الحديث) يدل على الاستحباب.

"হাদীসটি আকীকা মুস্তাহাব হওয়ার প্রমাণ বহন করে।"[৬৫৩]

ইমাম মালেক রাহ. আহলে মদীনার আমল উল্লেখ করে বলেন-

وليست العقيقة بواجبة، ولكنها يستحب العمل بها، وهي من الأمر الذي لم يزل عليه الناس عندنا.

"আকীকা ওয়াজিব নয়। বরং মুস্তাহাব আমল, যা মদীনাবাসীর মাঝে ধারাবাহিকভাবে চলে আসছে।"[৬৫৪]

আকীকার দিন

নবজাতক শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিন আকীকা করা মুস্তাহাব। হযরত সামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত-

قال رسول الله ﷺ : الغلام مرتهن بعقيقته، تذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه.[٦٥٥]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, শিশু (অর্থাৎ তার ভাল-মন্দ) নিজ আকীকার সাথে সম্পৃক্ত ও আবদ্ধ থাকে। সুতরাং সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে জন্তু জবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুন্ডাবে।"[৬৫৬]

ইমাম তাবারানী রাহ. বর্ণনা করেন-

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال: إذا كان يوم سابعه، فأهرقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى، وسموه.[٦٥٧]

"হযরত ইবনে ওমর রাযি. রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণনা করে বলেন, সপ্তম দিনে শিশুর পক্ষ থেকে জন্তু জবেহ করো, মাথা মুন্ডাও এবং নাম রাখো।"[৬৫৮]

হাদীসে সপ্তম দিনের কথা উল্লেখ থাকলেও আকীকা সপ্তম দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। কারণ আরো কিছু হাদীস থেকে সপ্তম দিনের পরেও আকীকা করার অনুমতি বোঝা যায়। ইমাম তিরমিযী রাহ. এর উপর আমলও নকল করেছেন-

قال أبو عيسى: والعمل على هذا عند أهل العلم، يستحبون أن يذبح عن الغلام العقيقة يوم السابع فإن

---

[৬৫২] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ৭/২৯৩, মাকতাবায়ে কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৬৫৩] উমদাতুল কারী: ১৭/২৩৫, মাকতাবায়ে তাওফিকিয়া

[৬৫৪] মুআত্তা মালেক: ১৯২

[٦٥٥] رواه الترمذي في «جامعه» وقال: حسن صحيح.

[৬৫৬] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ১৫২২

[٦٥٧] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (١٦٩٣) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» و«الكبير»، ورجاله ثقات.

[৬৫৮] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদীস নং ১৬৯৩

لم يتهيأ يوم السابع، فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ عق عنه يوم حادي وعشرين.

"ওলামায়ে কেরামের নিকট সপ্তম দিনে আকীকা করা মুস্তাহাব। সপ্তম দিনে সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিনে, তাও সম্ভব না হলে একুশতম দিনে আকীকা করবে।"[৬৫৯]

হাকেম আবু আব্দুল্লাহ নিশাপুরী রাহ. বর্ণনা করেন-

عن أم كرز و أبي كرز قالا : نذرت امرأة من آل عبد الرحمن بن أبي بكر إن ولدت امرأة عبد الرحمن نحرنا جزورا، فقالت عائشة رضي الله عنها : لا بل السنة أفضل عن الغلام شاتان مكافئتان، و عن الجارية شاة... فيأكل و يطعم و يتصدق، و ليكن ذاك يوم السابع، فإن لم يكن ففي أربعة عشر، فإن لم يكن ففي إحدى و عشرين.[৬৬০]

"আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকর রাযি. এর স্ত্রী মানত করেছিলো যে, আব্দুর রহমানের কোন সন্তান হলে আমি একটি উট আকীকা হিসেবে জবেহ করবো। আয়েশা রাযি. তার একথা শুনে বললেন, আকীকার জন্য উট জবেহ করো না। বরং উত্তম হলো, ছেলে সন্তানের জন্য সমবয়সের দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের জন্য একটি ছাগল জবেহ করা... আর (তার গোস্ত নিজেরা) খাবে, অন্যদের খাওয়াবে এবং সদকা করবে। আর তা যেন হয় সপ্তম দিনে, সম্ভব না হলে চৌদ্দতম দিনে, অথবা একুশতম দিনে।"[৬৬১]

আল্লামা যফর আহমদ থানভী রাহ. হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন-

وفي الحديث المذكور أيضا أنها إن لم تذبح في السابع ذبحت في الرابع عشر، وإلا ففي الحادي والعشرين.

"উল্লিখিত হাদীসে এও আছে যে, সপ্তম দিনে আকীকা করতে না পারলে চৌদ্দতম দিনে বা একুশতম দিনে করবে।"[৬৬২]

ইমাম আব্দুর রাজ্জাক সান'আনী রাহ. বর্ণনা করেন-

عن ابن عيينة قال : سمعت عطاء يقول : يعق عنه يوم سابعه ، فإن أخطأهم فأحب إلي أن يؤخروه إلى السابع الآخر.

"ইবনে উয়াইনা রাহ. বলেন, আমি আতা রাহ. কে বলতে শুনেছি যে, সপ্তম দিনে সন্তানের আকীকা করবে। যদি করতে না পারে, তাহলে পরবর্তী সপ্তম দিনে করবে।"[৬৬৩]

যদি একুশতম দিনেও আকীকা করা সম্ভব না হয়, তাহলে সপ্তম দিনের হিসাবে যে কোন দিন আকীকা করলে তা আদায় হয়ে যাবে। তবে বালেগ হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করা ঠিক নয়।

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ولو قدم يوم الذبح قبل يوم السابع أو أخره عنه جاز إلا أن يوم السابع أفضل.

"সপ্তম দিন ব্যতীত অন্যান্য দিন আকীকা করলেও তা আদায় হয়ে যাবে। তবে উত্তম হলো,

---

[৬৫৯] জামে তিরমিযীঃ ৩/৫১১, দারুল হাদীস, হাদীস নং ১৫২২

[৬৬০] أخرجه الحاكم في «المستدرك» وقال: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه وأقره الذهبي في «التلخيص».

[৬৬১] মুসতাদরাক লিল হাকেম: ৪/২৩৮, দারুল মা'রেফা

[৬৬২] ই'লাউস সুনান: ১৭/১১৭, এদারাতুল কুরআন, করাচী, পাকিস্তান

[৬৬৩] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: হাদীস নং ৭৯৬৯

সপ্তম দিনে করা।"[৬৬৪]

হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাব মতে বড় হয়ে কেউ যদি নিজের আকীকা নিজে করতে চায় তাও করতে পারবে। তবে মাসনূন আকীকার সাওয়াব পাবে না।

وأخرج ابن أبي شيبة عن محمد بن سيرين قال: لو أعلم أني لم يعق عني لعققت عن نفسي.[৬৬৫]

"মুহাম্মদ ইবনে সীরীন রাহ. বলেন, যদি আমি জানতাম আমার আকীকা করা হয়নি, তাহলে আমি নিজেই আমার আকীকা করতাম।"[৬৬৬]

قال عطاء والحسن: يعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه.[৬৬৭]

"আতা ও হাসান বসরী রাহ. বলেন, কোন ব্যক্তি নিজের আকীকা নিজে করতে পারে। কেননা আকীকা করা শরী'আতের একটি বিধান। তাছাড়া প্রত্যেক ব্যক্তিসত্তা আকীকার কাছে দায়বদ্ধ থাকে। তাই তার জন্য উচিত হলো, এই দায় থেকে নিজেকে মুক্ত করা।"[৬৬৮]

মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রাহ. বলেন, অনেক ওলামায়ে কেরাম সপ্তম দিনের মূলনীতির ভিত্তিতে বলেন, বালেগ হওয়া পর্যন্ত আকীকা করতে পারবে। আর অনেকে তো কোন সময়ই নির্ধারণ করেন না। তাদের দলীল হলো রাসূলুল্লাহ ﷺ ৫০ বছর বয়সে আকীকা করেছেন। অথচ রেওয়ায়েতটি য'য়ীফ। উপরন্তু তা ছিল অপারগতার অবস্থা। বর্তমানে মানুষ উল্লেখযোগ্য কোন কারণ ছাড়াই 'আকীকা' মাসের পর মাস এমনকি কয়েক বছরও বিলম্ব করে থাকে। বিভিন্ন পরিবারেও বিবাহ, খতনা, (আকীকা) ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক প্রথার রূপ লাভ করেছে। আর সপ্তম দিনের প্রতি লক্ষ্য না করেই আকীকা করে থাকে। অথচ তা মুস্তাহাব পরিপন্থী।

সুতরাং আকীকা মুস্তাহাব পদ্ধতিতে আদায় করা চাই। সপ্তম দিনে আকীকা করা উত্তম। সম্ভব না হলে চৌদ্দ বা একুশতম দিনে আকীকা করবে। একান্ত অপারগতা ছাড়া এর চেয়ে বেশি বিলম্ব করবে না।[৬৬৯]

কখন থেকে সাত দিনের হিসাব শুরু হবে

ইমাম আবু হানীফা রাহ. ইমাম আবু ইউসূফ রাহ. ও অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে নবজাতক শিশুর জন্মদিনসহ সাত দিন হিসাব করা হবে। যদিও সূর্য অস্ত যাওয়ার সামান্য পূর্বে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। আল্লামা শামী রাহ. এর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়-

وليس من السبعة يوم الولادة، خلافا للشيخين.

"সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন সাত দিনের মধ্যে গণনা করা হবে না। তবে ইমাম আবু হানীফা ও

---

[৬৬৪] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যাঃ ২/৩৬৮, কদীমী কুতুবখানা

[৬৬৫] رواه ابن أبي شيبه في «المصنف» (٢٤٧١٨) بطريق أشعث عن محمد بن سيرين، فهذا أشعث الراوي عن ابن سيرين إن كان ابن عبد الله الحداني أو ابن عبد الملك الحمراني –وكلاهما بصري ثقة– فإسناده صحيح، أما إن كان ابن سوار الكوفي فهو صالح.

[৬৬৬] ফাতহুল বারীঃ ৯/৭৪২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরূত, লেবানন

[৬৬৭] رواه ابن حزم في «المحلى» (٣٢٢/٨) من طريق ربيع ابن صبيح عن الحسن البصري: إذا لم يعق عنك فعق عن نفسك وإن كنت رجلا. وهذا إسناد حسن.

[৬৬৮] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাঃ হাদীস নং ২৪৭১৮; আল মুগনীঃ ১১/১২৩, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৬৬৯] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়াঃ১০/৬০,মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ইমাম আবু ইউসূফ রাহ. এর মত ভিন্ন। (অর্থাৎ ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিন সাত দিনের মধ্যে গণনা করা হবে)।"[৬৭০]
তবে শিশু রাতে জন্ম গ্রহণ করলে সুবহে সাদিকের পর থেকে অর্থাৎ রাতের পর দিন থেকে সাত দিনের হিসাব হবে। আল্লামা শামী রাহ.বলেন-

ولو ولد ليلا حسبت الذبيحة من صبيحته.

"যদি সন্তান রাতে ভূমিষ্ঠ হয়, পরদিন থেকে সাত দিনের হিসাব হবে।"[৬৭১]

সন্তানের আকীকা কে করবে?

এ বিষয়ে মূলনীতি হলো, নবজাতকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যার উপর সে যদি সামর্থ্যবান হয়, তাহলে সে বাচ্চার আকীকা করবে।
আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রাহ. বলেন-

مسئلہ: بر ہر کسے کہ نفقۂ مولود واجب باشد ،اور عقیقۂ او ہم از مال خود باید کرد... واگر پدرش محتاج باشد مادرش عقیقہ نماید اگر میسر باشد۔

"সন্তানের খোরপোষের দায়িত্বশীল নিজ সম্পদ দ্বারা বাচ্চার আকীকা করবে... পিতা অসহায় হলে মা সন্তানের আকীকা করবে, যদি সামর্থ্যবান হয়।"[৬৭২]
আল্লাম শামী রাহ. বলেন-

يستحب لمن ولد له أن يسميه يوم أسبوعه ... ثم يعق عند الحلق عقيقة إلخ.

"যার সন্তান হয়েছে তার জন্য মুস্তাহাব হলো, সপ্তম দিনে বাচ্চার নাম রাখা, মাথা মুন্ডানোর সময় আকীকা করা।"[৬৭৩]
সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, হযরত হাসান ও হুসাইন রাযি. এর আকীকা তাঁদের পিতা আলী ও মাতা ফাতেমা রাযি. করেননি বরং তাঁদের নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন। কেননা রাসূল ﷺ হযরত আলী ও ফাতেমা রাযি. এর দরিদ্রতার দরুন হাসান হুসাইনের খোরপোষ ও ভরণপোষণের জিম্মাদার ছিলেন। সুতরাং রাসূল ﷺ এর আকীকা করা মূলনীতি অনুযায়ী ছিল। ইমাম নববী রাহ. বলেন-

أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله ﷺ.

"আলী ও ফাতেমা রাযি. এর দরিদ্রতার দরুন হাসান হুসাইনের খোরপোষের দায়িত্ব রাসূল ﷺ এর নিকট ছিলো।"[৬৭৪]
নবজাতকের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব যার, তার অনুমতি নিয়ে অন্য কোন ব্যক্তি (সন্তানের চাচা, মামা, দাদা, নানা ইত্যাদি কেউ) আকীকা করলে আকীকা আদায় হয়ে যাবে।
মুফতী আব্দুর রহীম রাহ. বলেন-

---

[৬৭০] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা: ২/৩৬৯, কদীমী কুতুবখানা আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান
[৬৭১] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা: ২/৩৬৯, কদীমী কুতুবখানা আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান
[৬৭২] মা-লা বুদ্দা মিনহু: ১৭২
[৬৭৩] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৮৫ যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৬৭৪] আল মাজমু শরহুল মুহায্যাব: ৮/৪৩২, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

دوسرے کرنا چاہیں اور والدین رضامند ہوں تو کافی ہوجائے گا دوبارہ کرنا ضروری نہیں۔

"যদি অন্য কেউ আকীকা করতে চায় আর পিতা-মাতাও রাজি থাকে, তাহলে যথেষ্ট হবে। পুনরায় করতে হবে না।"[৬৭৫]

তবে অনুমতি না নিয়ে আকীকা করবে না। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-

ولا يفعلها من لا تلزمه النفقة إلا بإذن من تلزمه .

"যে সন্তানের দেখাশুনা করে তার অনুমতি না নিয়ে অন্য কেউ সন্তানের আকীকা করবে না।"[৬৭৬]
না।"[৬৭৬]

যমজ সন্তানের আকীকা কয়টি পশু দ্বারা করবে?

আকীকার সম্পর্ক সন্তানের সাথে, তাই যমজ সন্তান অর্থাৎ একই গর্ভ থেকে এক সাথে একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করলে প্রত্যেক সন্তানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন আকীকা করবে। একাধিক শিশুর পক্ষ থেকে একটি বকরি জবেহ করলে কারো আকীকা আদায় হবে না। হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. বলেন-

فلو ولد اثنان في بطن واحد، استحب عن كل واحد عقيقة. ذكره ابن عبد البر عن الليث وقال: لا أعلم عن أحد من العلماء خلافه.

"ইমাম ইবনু আব্দিল বার রাহ. লাইছ রাহ. এর উদ্ধৃতিতে উল্লেখ করেন, যদি একই গর্ভ থেকে দু'টি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক আকীকা করা মুস্তাহাব। এ কথার বিপরিত কেউ বলেছেন বলে আমার জানা নেই।"[৬৭৭]

হিজড়া সন্তানের আকীকা কয়টি পশু দিয়ে করবে?

উভলিঙ্গ (অর্থাৎ যার পুরুষত্ব ও নারীত্বের নিদর্শন রয়েছে কিন্তু উভয়ই অসম্পূর্ণ) যার মধ্যে পুরুষের দিকটি প্রবল তার জন্য দু'টি এবং যার মধ্যে নারীর দিকটি প্রবল তার জন্য একটি বকরি জবেহ করা মুস্তাহাব। আর খুনছায়ে মুশকিলা তথা যার মধ্যে পুরুষ কিংবা নারী কোনটিই নয়, তার জন্য দু'টি বকরী জবেহ করা উত্তম। তবে একটি দ্বারা করলেও আকীকা আদায় হয়ে যাবে। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وعن الخنثى المشكل واحدة، والاحتياط ثنتان.

"খুনছা মুশকিলের জন্য একটি বকরি জবেহ করবে। তবে সতর্কতা হলো, দু'টি বকরি জবেহ করা।"[৬৭৮]

আকীকার উভয় ছাগলের বয়স

ছেলে হলে দু'টি ছাগল আকীকা করা মুস্তাহাব। উভয় ছাগলের বয়স সমান হওয়া জরুরী নয়। তবে বয়সে সমপর্যায়ের হওয়া উত্তম।

হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন-

---

[৬৭৫] ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যা: ১০/৬২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৭৬] দ্রষ্টব্য, ফাতহুল বারী: ৯/৭৪৩, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন; আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ: ৩০/২৭৮, কুয়েত

[৬৭৭] ফাতহুল বারী: ৯/৭৩৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৬৭৮] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা: ২/৩৬৯, কদীমী কুতুবখানা

أن رسول الله ﷺ أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.

"রাসূল ﷺ তাদেরকে ছেলে সন্তানের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল আর মেয়ে সন্তানের পক্ষ থেকে একটি ছাগল আকীকা হিসেবে জবেহ করার আদেশ দিয়েছেন।"[৬৭৯]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ويسن عن الذكر شاتان مستويتان . انتهى .

"ছেলের পক্ষ থেকে সমবয়সী দু'টি ছাগল জবেহ করা উত্তম।"[৬৮০]

আকীকার পশু কেমন হবে

কুরবানীর জন্তুর মধ্যে যে সকল শর্ত জরুরী, আকীকার জন্তুর ক্ষেত্রেও সেগুলো জরুরী। অর্থাৎ যে জন্তু দিয়ে কুরবানী জায়েয তা দিয়ে আকীকা করা জায়েয। আর যে জন্তু দিয়ে কুরবানী করা জায়েয নেই তা দিয়ে আকীকা করাও জায়েয নেই।

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وهي شاة تصلح للأضحية تذبح للذكر والأنثى.

"যে বকরি দ্বারা কুরবানী সহীহ তা দিয়ে আকীকা করবে, ছেলে হোক বা মেয়ে।"[৬৮১]

স্বতন্ত্রভাবে বড় পশু দিয়ে আকীকা করার হুকুম

বড় পশু তথা উট, গরু, মহিষ ইত্যাদি দিয়ে আকীকা করা জায়েয। কেননা হাদীসে আকীকা বোঝানোর জন্য 'নুসুক' শব্দ ব্যবহার হয়েছে। ফলে শব্দের ব্যাপকতায় উট, গরুসহ কুরবানীর উপযুক্ত যে কোন প্রাণী অন্তর্ভুক্ত। আল্লামা যফর আহমদ থানভী রাহ. বলেন-

وأيضا فقول رسول الله ﷺ «من ولد له ولد فأحب أن ينسك عن ولده فليفعل» . رواه أبو داود والنسائي...

وفيه أنه ﷺ سماه نسيكة ونسكا، وهو يعم الإبل والبقر والغنم إجماعا. وفيه دليل لقول الجمهور: لا يجزئ في العقيقة إلا ما يجزئ في الأضحية...اه

"রাসূল ﷺ এর বাণী, 'কারো সন্তান হলে, সে সন্তানের 'নুসুক' করতে আগ্রহী হলে করতে পারে।' উল্লিখিত হাদীসে রাসূল ﷺ আকীকাকে নাসীকা ও নুসুক শব্দে ব্যক্ত করেছেন। আর নুসুক সকলের ঐক্যমতে উট, গরু ও ছাগলকে শামিল করে। উক্ত হাদীসে জুমহুরের এ কথারও প্রমাণ রয়েছে, কুরবানীর পশুর যে সকল শর্ত রয়েছে আকীকার পশুর ক্ষেত্রেও সে সকল শর্ত আবশ্যক।"[৬৮২]

অনেক সাহাবী থেকে উট দিয়ে আকীকা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। হাফেয তাবারানী রাহ. কাতাদা রাহ. সূত্রে বর্ণনা করেন-

أن أنس بن مالك كان يعق عن بنيه الجزور.[৬৮৩]

"আনাস রাযি. নিজ সন্তানদের আকীকা উট দিয়ে করতেন।"[৬৮৪]

---

[৬৭৯] জামে তিরমিযী: হাদীস নং ১৫৯৫; ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৬৮০] তানকীহুল ফাতাওয়াল হামিদিয়্যা: ২/৩৬৯, কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

[৬৮১] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৮৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৮২] ই'লাউস সুনান: ১৭/১১৬, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যা, করাচী, পাকিস্তান

[৬৮৩] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح .

[৬৮৪] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৯/১০৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

উট, গরু দিয়ে জায়েয হলেও উত্তম হলো, হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী ছাগল দিয়ে আকীকা করা। যেমন আমরা উম্মে কুরযের হাদীসে আয়েশা রাযি. এর কথা উল্লেখ করে এসেছি। তবে এখানে এ কথা বলার সুযোগ নেই যে, ছাগল ছাড়া আকীকা হবেই না। কারণ আয়েশা রাযি. উট দ্বারা আকীকাকে অস্বীকার করেননি। তবে অনুত্তম বলেছেন, যা হাদীসের শব্দ থেকে অনুমেয়। এমনিভাবে উক্ত হাদীসের উপর ভিত্তি করে আকীকার বিষয়টি ছাগলের মাঝে সীমাবদ্ধ বলারও সুযোগ নেই। কারণ এতে অন্যান্য হাদীসের বর্ণিত 'নুসুক' শব্দের ব্যাপকতাকে দলীল ছাড়াই ছেড়ে দেয়া হবে, যা গ্রহণযোগ্য নয়।

একই পশুতে কুরবানী ও আকীকা

কুরবানীর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো ইবাদত ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য অর্জন। অনুরূপ আকীকার উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জন। আর ভিন্ন ভিন্ন ইবাদতের নিয়তে বড় পশুতে একাধিক ব্যক্তি শরীক হতে পারে। সুতরাং কুরবানীর বড় পশুতে আকীকার অংশ নেয়া যাবে। এতে কুরবানী ও আকীকা দু'টিই সহীহ হবে। ইমাম আলাউদ্দীন কাসানী রাহ. বলেন-

ولو أرادوا القربة الأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم، سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا... وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب إلى الله عز شأنه بالشكر على ما أنعم عليه من الولد.
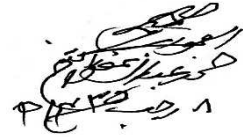
"যদি অংশীদাররা বড় পশুতে কুরবানী বা অন্য কোন ইবাদতের নিয়ত করে, তাহলে সকলের ইবাদত হয়ে যাবে। ইবাদতটি ওয়াজিব হোক বা নফল। অনুরূপ কেউ যদি নিজ সন্তানের আকীকার নিয়ত করে তবুও তা সহীহ হবে। কেননা আকীকাও সন্তান জন্মের শুকরিয়া স্বরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য করা হয়।"[৬৮৫]

এছাড়াও আকীকার জন্য 'নুসুক' শব্দ ব্যবহার হওয়ায় কুরবানীর বিধান এখানেও প্রযোজ্য হবে।
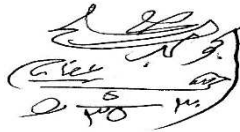
<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস
দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০৮ রজব ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

---

[৬৮৫] বাদায়েউস সানায়ে: ৬/২৯১, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

অধ্যায়: সিয়ার ও সিয়াসাত

ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা

মাওলানা খান মুহাম্মদ মাহবুবুল হক

রাজনীতি ইসলামে কোন নতুন বিষয় নয়। কেননা রাজনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতি। আর মুসলমানগণ রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন হাজার বছরের বেশি সময়। সুতরাং রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামী নির্দেশনা মুসলমানদের কাছে দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে রাজনীতি সম্পর্কে বহু নওও মুসলমান বিভ্রান্তির শিকার। তাই ইসলামের রাজনৈতিক নির্দেশনা সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্যই মূলত ইসলামে রাজনীতি বিধিবদ্ধ হয়েছে। তাই প্রথমে খেলাফত সম্পর্কে আলোচনা হবে। এরপর রাজনীতি নিয়ে আলোচনা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয়

প্রখ্যাত ইসলামী রাষ্ট্র বিজ্ঞানী আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ার্দী রাহ. খেলাফত বা ইমামতের সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين، وسياسة الدنيا.

"দ্বীন সংরক্ষণ ও রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে নবীজী ﷺ এর প্রতিনিধিত্ব করা হল ইমামত বা খেলাফত।"[৬৮৬]

আর শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. খেলাফতের পরিচয় এভাবে উল্লেখ করেছেন-

الخلافة هي الرياسة العامة في التصدي لإقامة الدين بإحياء علوم الدين، وإقامة أركان الإسلام، والقيام بالجهاد وما يتعلق به من ترتيب الجيوش، والفرض للمقاتلة، وإعطاءهم من الفيء، والقيام بالقضاء، وإقامة الحدود، ورفع المظالم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي ﷺ.

"খেলাফত হলো, আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে নবী ﷺ এর প্রতিনিধি হিসেবে পূর্ণ মনোনিবেশ সহকারে সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব দান করা। (আর দ্বীনের পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি সম্ভব হবে) দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রসার, ইসলামী বিধি-বিধানের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রচেষ্টা এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিষয় সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন। যেমন, দ্বীন ও রাষ্ট্র রক্ষার জন্য সৈন্য বাহিনী বিন্যস্ত করা, সৈন্যদের জন্য ভাতা নির্ধারণ করা এবং তাদেরকে মালে ফাই থেকে প্রদান করা, বিচার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা ও তার মাধ্যমে শরী'আত নির্ধারিত শাস্তি কার্যকর করা, অন্যায় ও জুলুম প্রতিহত করা এবং ন্যায়ের নির্দেশ দান ও

[৬৮৬] আল আহকামুস সুলতানিয়া: ১৫, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

অন্যায় থেকে বারণের মাধ্যমে।[৬৮৭]

শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. এর সংজ্ঞায় রাষ্ট্রীয় দায়-দায়িত্বের কথাও উল্লেখ হয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রের সংজ্ঞার সাথে শাহ ওয়ালিউল্লাহ রাহ. এর সংজ্ঞা সমন্বিত করে খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্রের সংজ্ঞা এভাবে দেয় যায়:

"খেলাফত বা ইসলামী রাষ্ট্র হলো, ঐশীপ্রতিনিধিত্ব মূলক এমন এক গণপ্রতিষ্ঠান, যা একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড জুড়ে বিস্তৃত ও বহিঃশক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত থেকে উক্ত ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণকে ঐশী বিধানের আলোকে পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে।[৬৮৮]

খেলাফতের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

ইসলামে খেলাফতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণে নবীজী ﷺ এর ইন্তেকালের পর কাফন-দাফনের পূর্বেই খেলাফতের সমাধান করা হয়েছে। প্রথমে খলীফা নির্বাচিত হয়েছে। এরপর খলীফার অধীনে কাফন-দাফন সম্পন্ন হয়েছে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ونصبه أهم الواجبات، فلذا قدموه على دفن صاحب المعجزات.

"খলীফা নিয়োগ দেয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই নবীজী ﷺ এর দাফনের পূর্বে খলীফা নিয়োগকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।"[৬৮৯]

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ার্দী রাহ. বলেন-

وجوب الإمامة ففرضها على الكفاية، كالجهاد، وطلب العلم، فإذا قام بها من هو من أهلها، سقط فرضها على الكفاية.

"খলীফা নিয়োগ দেয়া ফরযে কিফায়া, জিহাদ এবং ইলম শিক্ষার ন্যায়। যখন কর্তৃত্বসম্পন্ন ব্যক্তিগণ খলীফা নির্বাচন করবেন, তখন সকলেই দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে।"[৬৯০]

ইসলামের বহু বিধান এমন রয়েছে, যা খেলাফতের সাথে সংশ্লিষ্ট। খেলাফত সঠিক ও মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না থাকলে সে বিধানগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। খেলাফত সুসংহত ও প্রতিষ্ঠিত থাকতে হলে একজন খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধানের প্রয়োজন। খলীফার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আল্লামা সা'আদুদ্দীন তাফতাযানী রাহ. বলেন-

والمسلمون لا بد لهم من إمام، يقوم بتنفيذ أحكامهم، وإقامة حدودهم، وسد ثغورهم، وتجهيز جيوشهم، وأخذ صدقاتهم، وقهر المتغلبة، والمتلصصة وقطاع الطريق، وإقامة الجمع والأعياد، وقطع المنازعات الواقعة بين العباد، وقبول الشهادة القائمة على الحقوق، وتزويج الصغار والصغائر الذين لا أولياءلهم،

[৬৮৭] ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা: ১/১৩, কদীমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান

[৬৮৮] আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইসলাম: ২৬১, বিশ্বকল্যাণ পাবলিকেশন্স, বাংলাবাজার, ঢাকা

[৬৮৯] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৩৩৩, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৬৯০] আল আহকামুস সুলতানিয়া: ১৭, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

وقسمة الغنائم ونحو ذلك.

"মুসলমানদের একজন ইমাম বা খলীফা থাকা জরুরী। যার কাজ হবে জনসাধারণের উপর শর'য়ী আহকাম জারি করা। হদ বা দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা। রাষ্ট্রের সীমান্ত রক্ষা করা। জিহাদের জন্য বাহিনী প্রস্তুত করা। যাকাত আদায় করা। বিদ্রোহী, চোর ও ডাকাতদের দমন করা। জুম'আ ও দুই ঈদের নামায কায়েম করা। জনগণের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ মিটানো। মানুষের হক আদায়ের জন্য সাক্ষ্য গ্রহণ করা। এতিম ও অসহায় সন্তানদের বিবাহের ব্যবস্থা করা। গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করা ইত্যাদি (এসবই ইসলামী রাষ্ট্র ও খলীফার দায়িত্বের আওতাভুক্ত।"[৬৯১]

খলীফা নির্বাচন করা হয় মূলত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত ও সুসংহত রাখার জন্য। অতএব খলীফা নিয়োগের যে হুকুম খেলাফত প্রতিষ্ঠার হুকুমও তাই। সুতরাং খেলাফত প্রতিষ্ঠা ফরযে কিফায়া, খলীফা নিয়োগ দেয়া ফরযে কিফায়া। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

(ونصبه) أي الإمام المفهوم من المقام قوله (أهم الواجبات) أي من أهمها لتوقف كثير من الواجبات الشرعية عليه.

"ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) নির্বাচন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। কেননা শরী'আতের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিধান ইমাম নির্বাচনের উপর নির্ভরশীল।"[৬৯২]

খেলাফত সম্পর্কে কিছু ধারণা লাভ করার পর রাজনীতির পরিচয়, বিধান ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা তুলে ধরা হলো।

রাজনীতির সংজ্ঞা

রাজনীতির আভিধানিক অর্থ হলো রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতি। অবশ্য অনেকেই রাজার নীতি থেকে রাজনীতি শব্দের উৎপত্তি বলে মতামত ব্যক্ত করেছেন। অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে রাজার নীতি কীরূপ হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কীয় মতামতকে রাজনীতি বলে। রাজনীতির আরবী প্রতিশব্দ হলো সিয়াসাত (سياست)। সিয়াসাত শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো জাতিকে পরিচালনা করা ও তাদের নেতৃত্ব দেয়া। অভিধানবিদরা সিয়াসাতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন-

هي فن الحكم وإدارة أعمال الدولة الداخلية والخارجية.

"সিয়াসাত বা রাজনীতি হলো রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিষয়। আভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্ব সংক্রান্ত রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করাকে সিয়াসাত বা রাজনীতি বলে।"[৬৯৩]

শায়েখ আহমদ মুস্তফা সিয়াসাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা দিয়েছেন এভাবে-

---

[৬৯১] শরহে আকাইদ: ১৪২-১৪৩ মাকতাবায়ে যমীরিয়া, চট্টগ্রাম; ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২৮০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৯২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/২৭৮-২৮০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৬৯৩] আল মুনজিদ ফিল লুগাহ: ৩৬২, মাদ্দাহ (سوس), ইনতিশারাতে ইসলাম, ইরান

وهو علم يعرف منه أنواع الرياسات، والسياسات، والاجتماعات المدنية، وأحوالها: من أحوال السلاطين والملوك والأمراء، وأهل الاحتساب والقضاة والعلماء، وزعماء الأموال ووكلاء بيت المال، ومن يجري مجراهم.

“সিয়াসাত বা রাজনীতি বলা হয় এমন বিদ্যাকে, যার দ্বারা নেতৃত্ব, রাজনীতি ও সামাজিক জীবনের প্রকারভেদ ও অবস্থা জানা যায়। যেমন, রাজা-বাদশা, আমীর-উমারা, কাজী-বিচারক, আলেম-ওলামা, রাষ্ট্রীয় কোষাগার ও সরকারী সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারীদের অবস্থা জানা।”[৬৯৪]

ইসলামে রাজনীতির অবস্থান

ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবনাদর্শ। ব্যক্তির আত্মিক উৎকর্ষ বিধান, ব্যক্তিগত আচার-আচরণ পরিশুদ্ধকরণ, দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম আঞ্জাম দান, পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনসহ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যে কোন সমস্যার সর্বোন্নত সমাধান রয়েছে ইসলামে। খোলাফায়ে রাশেদীন এরই আলোকে রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন। অর্ধ পৃথিবীব্যাপী রাষ্ট্রীয় পরিধি প্রসারিত করেছেন। পৃথিবীর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সুন্দর সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ তাদের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছিল। সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ তাঁরাই পৃথিবীকে উপহার দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। এ এক ঐতিহাসিক প্রমাণিত সত্য।

কিন্তু কালের বিবর্তনে ইসলামী খেলাফতের পতন, ইসলাম বিদ্বেষী শক্তির উত্থান ও অপপ্রচারের ফলে ইসলামে রাজনীতির অবস্থানের ব্যাপারে মানুষের মাঝে নানা ধরনের ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। ইসলামী রাজনীতির ব্যাপারে সাধারণত মানুষ তিন ধরনের ভুলের শিকার।

১. ইসলাম ব্যক্তি জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য এসেছে, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। (এটা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের ধারণা।) আর এই ধারণার জন্ম হয়েছে রাষ্ট্র ও গীর্জার দ্বন্দ্বের ফলে।

এই ভুল দৃষ্টিভঙ্গিটি খুবই মারাত্মক। কেননা, কারো বিশ্বাস যদি এমনই হয় যে, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতির সাথে ইসলামের কোন সম্পর্ক নেই, তাহলে তার ঈমানের উপর প্রচণ্ড আঘাত আসার আশঙ্কা রয়েছে। কারণ, এগুলোর সাথে ইসলামের শুধু সম্পর্ক আছে তাই নয় বরং কুরআনের বহু আয়াতে (সমাজনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতি) সম্পর্কিত বিধান আছে। সুতরাং ইসলামে রাজনীতি নেই এই কথা বিশ্বাস করা মানে এ সম্পর্কিত আয়াতগুলোকে অস্বীকার করা। সুতরাং তার ঈমান থাকবে না।

আল্লামা মুশাহেদ আলী রাহ. বলেন, যারা বলে, ইসলাম শুধু নামায রোযা ও হজ্ব, যাকাতের নাম, ইসলামে রাজনীতি বলতে কিছু নেই, এ শ্রেণীর লোক বিভ্রান্তকারী। আর যদি তাদের আকীদা বিশ্বাস প্রকাশ্য বক্তব্য অনুযায়ী হয়, তাহলে তারা কাফের। মহান আল্লাহ এ ধরনের

---

[৬৯৪] মিফতাহুস সা‘আদাহ ওয়া মিসবাহুস সিয়াদাহ: ১/৩৮৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

লোকদের ব্যাপারে ইরশাদ করেন-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ

"তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অস্বীকার করো?"[৬৯৫]

ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনের অকাট্যভাবে প্রমাণিত কোন বিষয়কে অস্বীকার করে কিংবা শরী'আতের কোন বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করে (যদিও তা সুন্নত হয়) তাহলে সে কাফের। কেননা ঈমান হচ্ছে নবীজী ﷺ যে সকল বিষয়সহ প্রেরিত হয়েছেন তার সব কিছুকে সত্য বলে মেনে নেয়া। তার প্রতি সন্তুষ্ট থাকা। তাতে আত্মসমর্পণ করা এবং সেই সাথে তার প্রতি মহাত্মবোধ ও শ্রদ্ধা পোষণ করা।[৬৯৬]

২. ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত না হলে, একজন মুসলমান মুসলমানই থাকতে পারে না। কেননা রাজনীতি ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাই ইসলামের অভিষ্ঠ লক্ষ্য। এই ভুল ধারণা সৃষ্টি হয়েছে, সেকুলারিজমের মোকাবেলা করতে গিয়ে ইসলামের সামাজিক ও রাজনৈতিক দিকটির উপর একটি দলের অত্যধিক গুরুত্বারোপের ফলে। রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ইসলামের লক্ষ্য একথা বলেই তারা ক্ষান্ত হয়নি; বরং আগে বেড়ে তারা বলে, মানব সৃষ্টির লক্ষ্যই হলো রাজনীতি ও রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা। অন্যান্য ইবাদত হলো রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যম।

এ দৃষ্টিভঙ্গিও ভুল। ইসলামের মূল লক্ষ্য হুকুমত প্রতিষ্ঠা নয়, বরং মূল লক্ষ্য হলো আল্লাহর ইবাদত করা। আর হুকুমত ইবাদতের জন্য সহায়ক। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

ٱلَّذِينَ إِن مَّكَّنَّٰهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ أَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَمَرُوا۟ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا۟ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَٰقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿٤١﴾

"এসব লোক হচ্ছে তারা যাদেরকে আমি ভূপৃষ্ঠে ক্ষমতা দিলে নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। সমস্ত বিষয়ের পরিণাম আল্লাহর হাতে।"[৬৯৭]

আর মানব সৃষ্টির লক্ষ্যও আল্লাহর ইবাদত। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন-

وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধু আমার ইবাদতের জন্য।"[৬৯৮]

৩. ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ সেকেলে। বর্তমান যুগে তা অচল। এই ভুল ধারণার সৃষ্টি

---

[৬৯৫] সূরা বাকারা: ৮৫

[৬৯৬] ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন: ৭, আহমদিয়া লাইব্রেরী, সিলেট

[৬৯৭] সূরা হজ্ব: ৪১

[৬৯৮] সূরা যারিয়াত: ৫৬

হয়েছে পাশ্চাত্যের আদর্শঘেঁষা কিছু কিছু মুসলমানের কারণে। তারা ইউরোপিয়ান আদর্শ গুরুদের শিক্ষার বদৌলতে এরূপ একটি ধ্যান-ধারণার শিকার হয় যে, ইসলামে একটি রাজনৈতিক মতবাদ থাকলেও তা সেকেলে। আধুনিক যুগের ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সাথে তাল মিলিয়ে এগুবার মত পর্যাপ্ত উপাদানে সমৃদ্ধ নয়।

এ দৃষ্টিভঙ্গি ঈমান পরিপন্থী। কেননা, তাদের এ বক্তব্য, 'ইসলামের রাজনৈতিক মতবাদ সেকেলে, বর্তমান যুগে তা অচল।' এ কথার অর্থ হলো, রাজনীতি সম্পর্কে ইসলামের বিধান পূর্ণাঙ্গ নয়। অথচ আল্লাহ তা'আলা স্পষ্টভাষায় ঘোষণা দিয়েছেন-

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করে দিলাম। তোমাদের উপর আমার নেয়ামতকে পূর্ণতা দান করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের জন্য ধর্ম হিসেবে মনোনীত করলাম।"[৬৯৯]

ইসলামের রাজনৈতিক দর্শন সম্পর্কে এ তিন ধরনের ধারণাই প্রান্তিক, অজ্ঞতাপ্রসূত ও বিভ্রান্তিকর। এর কোনটিতেই বাস্তব অবস্থার চিত্রায়ন নেই।

প্রকৃত সত্য হলো, ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা। এখানে মানুষের বিশ্বাস ও ঈমানের পরিশুদ্ধির দিক নির্দেশনা যেমন রয়েছে, তেমনি ইবাদত বন্দেগীর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নির্দেশনাও রয়েছে। আবার মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের পন্থাও নির্দেশ করা হয়েছে। ব্যক্তিজীবনের পাশাপাশি, অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এমনকি আন্তর্জাতিক জীবনের পূর্ণাঙ্গ পথ নির্দেশনাও এতে রয়েছে। এই সামগ্রিকতার উপরই প্রতিষ্ঠিত ইসলামের পূর্ণাঙ্গ প্রাসাদ।

রাজনীতি করার বিধান

ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা যেমন ফরযে কিফায়া, তেমনি ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করা হলে, সেরূপ রাজনীতি করাও হবে ফরযে কিফায়া। অন্তত কিছু লোক এ দায়িত্ব পালন না করলে সকলেই দায়ী থাকবেন। তবে রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের দ্বীন ও ঈমান বাঁচানো সম্ভব না হলে, সেরূপ রাজনীতি থেকে বিরত থাকাই জরুরী। কেননা রাজনীতি মূল উদ্দেশ্য নয়, মূল উদ্দেশ্য হলো, ঈমান ও আমল।

আলেম নন এরূপ লোকদের নেতৃত্বে পরিচালিত রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের কর্তব্য হলো, ওলামায়ে কেরাম থেকে নির্দেশনা ও পরামর্শ গ্রহণ করে দলীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা এবং ওলামায়ে কেরামের দায়িত্ব হলো তাদের রাহনুমায়ী করা। তবে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি ওলামায়ে কেরামের রাহনুমায়ীতে পরিচালিত না হন, সেরূপ ক্ষেত্রে সহীহ রাজনীতি করার জন্য বা-হিম্মত (সাহসী) ওলামায়ে কেরামকে এগিয়ে আসতে হবে।[৭০০]

---

[৬৯৯] সূরা মায়েদা: ৩

[৭০০] হাকীমুল উম্মত থানভী কী সিয়াসী আফকার: আহকামে যিন্দেগী সূত্রে: ৫৬৮

যে সব রাজনৈতিক দল ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য নয় বরং ক্ষমতার মোহে বা পার্থিব কোন স্বার্থে কিংবা কুফুর প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালিত হয়, তাতে যোগদান করা বা তাদের সহযোগিতা করা জায়েয নয়।[৭০১]

বর্তমান যুগে খেলাফত প্রতিষ্ঠার পদ্ধতি

বর্তমানে পৃথিবীর বহু অমুসলিম দেশের ন্যায় বহু মুসলিম দেশেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনীতি ও রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। গণতন্ত্র মৌলিকভাবে একটি কুফরী মতবাদ।[৭০২] গণতন্ত্রে জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মনে করা হয়। আর ইসলামী আকীদা হলো, সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ তা'আলা। যেমন কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে-

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ ۖ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ ۖ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٦﴾

"বলুন, হে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক আল্লাহ! আপনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা প্রদান করেন এবং যার নিকট থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা কেড়ে নেন; যাকে ইচ্ছা ইজ্জত দান করেন আর যাকে ইচ্ছা হীন করেন। কল্যাণ আপনার হাতেই। নিশ্চই আপনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।"[৭০৩]

প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে সর্বপ্রকার আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়। এ ধারাটিও আকীদা পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা মতে, বিধান দেয়ার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ

"আল্লাহ ছাড়া কারো বিধান দেয়ার ক্ষমতা নেই।"[৭০৪]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ ফরমান-

وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٤٤﴾

"আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন সে অনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই কাফির।"[৭০৫]

এতক্ষণের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে, মৌলিকভাবে গণতন্ত্র একটি কুফরী মতবাদ। এ মতবাদ অনুসারেই আমাদের দেশ পরিচালিত হচ্ছে, যা কোন মুসলমানই মেনে নিতে পারেনা। সুতরাং এর অবসান ঘটাতে হবে এবং ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। কেননা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরযে কিফায়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, গণতন্ত্রের অবসান

---

[৭০১] আহকামে যিন্দেগী: ৫৬৮, মাকতাবাতুল আবরার, বাংলাবাজার, ঢাকা

[৭০২] বর্তমানে অনেক দেশেই গণতন্ত্রিক পদ্ধতি কার্যকর। তবে সবাই নির্দিষ্ট এক অর্থে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয়। তাই ব্যপকভাবে গণতন্ত্র মতাদর্শীদের উপর শরঈ হুকুম আরোপের ক্ষেত্রে সতর্কতা বাঞ্চনীয়।

[৭০৩] সূরা আল ইমরান: ২৬

[৭০৪] সূরা ইউসুফ: ৪০

[৭০৫] সূরা মায়িদা: ৪৪

কীভাবে ঘটানো হবে? আর কোন পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা হবে?

খেলাফত প্রতিষ্ঠার মেহনত বিভিন্নভাবে হতে পারে। যথা:

১. নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের সকল জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যোগে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। যেমন, মদীনায় রাসূল ﷺ সকলের সন্তুষ্টিচিত্তে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭০৬]

২. শর'য়ী জিহাদের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ জিহাদের মাধ্যমে মক্কায় ইসলামী হুকুমত প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।[৭০৭]

৩. সরকার প্রধানকে অপসারণ করে খলীফা নিয়োগ দেয়া। আর এটা তখনই বৈধ হবে যখন বর্তমান সরকারপ্রধান থেকে সুস্পষ্ট কুফরী পাওয়া যাবে। যেমন হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযি. বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে যে বাই'আত নিয়েছিলাম তার মধ্যে ছিলো-

بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان.

"আমরা যেন উপস্থিত সরকারের আইন শুনতে থাকি ও মানতে থাকি। পছন্দের পরিবেশে থাকি অথবা অপছন্দের পরিবেশে, সংকটে থাকি বা সাচ্ছন্দে, এবং আমাদের উপর অন্যদেরকে প্রাধান্য দেয়া হোক। আমরা যেন ক্ষমতাশীলদের সাথে ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব না করি। তবে তোমরা যদি এমন সরাসরি কুফুর দেখতে পাও, যার সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ আছে, তাহলে ভিন্ন কথা।"[৭০৮]

রাষ্ট্রপ্রধান যদি লোকজনকে গুনাহ করানোর জন্য স্বতন্ত্র কৌশল গ্রহণ করে থাকেন আর এর কারণ যদি এই হয় যে, তিনি অনৈসলামিক আইনগুলোকে শরী'আতের মোকাবেলায় উত্তম মনে করেন এবং ইসলামি আইনকে প্রকৃত অর্থেই অনুপযোগী মনে করেন, তাহলে এটা খোলাখুলি কুফর (সুতরাং স্পষ্ট কুফুরের ক্ষেত্রে যেমন সরকার অপসারণের আন্দোলন বৈধ এক্ষেত্রেও তা বৈধ হবে।)

কোথাও সরকার অপসারণের আন্দোলন জায়েয হতে হলে দু'টি শর্ত জরুরী, এ কথার উপর সমস্ত ফকীহ একমত। **এক.** শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারকে অপসারণের ক্ষমতা থাকা। **দুই.** তাকে অপসারণের ক্ষেত্রে তার চেয়ে বড় ফেতনার আশঙ্কা না থাকা।[৭০৯]

৩. নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক দল গঠন করা এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে বিধি মোতাবেক ক্ষমতা গ্রহণ করা। তবে শর্ত হলো, ইসলাম সমর্থিত রাজনীতি হতে হবে। ইসলামের নামে অনৈসলামিক রাজনীতি হতে পারবে না। এরপর প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে পূর্ণ ইসলামী খেলাফত কায়েম করা। যেমন হাকীমুল উম্মত আশরাফ আলী থানভী

---

[৭০৬] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৩/২৭২-২৭৬, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী বৈরুত, লেবানন

[৭০৭] সহীহ বুখারী: ২/৬১২; আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৪/৩১৭, দারু ইহইয়ায়িত তুরাছিল আরাবী বৈরুত, লেবানন

[৭০৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৭০৫৬

[৭০৯] ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়াত: ৩৬৭, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ

রাহ. বলেন, 'যদি রাষ্ট্র শরী'আত মোতাবেক না চলে তাহলে ওলামায়ে কেরাম দেশের শাসকশ্রেণীকে শরী'আত মোতাবেক চলার পরামর্শ দিবেন, তারা যদি পরামর্শ মেনে শরী'আত মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনা করে, তাহলে তো ভাল, অন্যথায় বা-হিম্মত ওলামায়ে কেরামকে সঠিক রাজনীতি করার জন্য নামতে হবে।[৭১০]

বর্তমানে সরকার প্রধান নির্বাচিত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট বা মতামতের মাধ্যমে। শরী'আতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অবস্থান কী তা আমাদের জানা দরকার। গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতই হক-বাতিলের মানদণ্ড। একারণে ব্যাভিচার ও সমকামিতার মতো গর্হিত কাজ- যা সব ধর্মেই নিষিদ্ধ- সংগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রে বৈধতা পেয়েছে। কিন্তু শরী'আতে হক-বাতিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের কোন মূল্যায়ন নেই। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٦﴾

"যদি আপনি জমিনে বসবাসরত সংখ্যাগরিষ্ঠের পেছনে চলেন, তাহলে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করে দিবে। তারা শুধু ধারণার আনুগত্য করে এবং অনুমানের তীর ছোঁড়ে।"[৭১১]

সুতরাং হক-বাতিল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের কোন মূল্য দেয়া যাবে না। এক্ষেত্রে মূল্য হলো, শর'য়ী দলীল তথা কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা, কিয়াসের। যে বিষয়ে শরী'আতে কোন সুস্পষ্ট দলীল রয়েছে, সে বিষয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী কোনক্রমেই ফায়সালা দেয়া যাবে না। তবে শরী'আতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত একেবারে মূল্যহীন এমনও নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অধিকাংশের মতামত বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন-

১. যদি কোন মুবাহ বিষয়ে কয়েকটি পথ খোলা থাকে, তাহলে কোন একটি গ্রহণের ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত অগ্রগণ্য হতে পারে। এ ব্যাপারে দলীল হলো, হযরত ফারুকে আযম রাযি. এর ঐতিহাসিক বাণী, যা তিনি পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের জন্য মনোনীত বিশিষ্ট ছয় সাহাবীকে বলেছিলেন-

تشاوروا في أمركم فإن كان اثنان واثنان فارجعوا في الشورى، وإن كان أربعة واثنان، فخذوا صنف الأكثر.

"তোমরা এ বিষয় (খলীফা নির্বাচন) নিয়ে পরামর্শ করবে। যদি দুইজন একদিক আর দুইজন অপর দিক গমন করে (অর্থাৎ দুই দিকে রায় সমান হয়) তাহলে পুনরায় পরামর্শ করবে। আর যদি চারজন একদিকে এবং দুই জন আরেক দিকে অবস্থান নেয়, তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত করবে।"[৭১২]

উল্লিখিত ভাষ্যে আমরা সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাই যে, হযরত ওমর রাযি. সংখ্যাগরিষ্ঠের

---

[৭১০] হাকীমুল উম্মত থানভী কী সিয়াসী আফকার: আহকামে যিন্দেগী সূত্রে: ৫৬৮; দ্রষ্টব্য, আহসানুল ফাতাওয়া: ৬/১১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭১১] সূরা আন'আম: **১১৬**
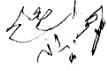
[৭১২] তাবাকাতে ইবনে সা'আদ: ৩/৬১, দারু সাদের, বৈরুত, লেবানন

মতামতের বিবেচনা করেছেন।
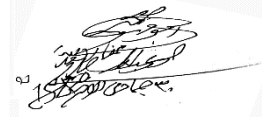
২. ইজতেহাদকৃত বিষয়াদিতেও (অর্থাৎ এমন সব বিষয় যেগুলোতে কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যায় মুজতাহিদগণের বক্তব্য ভিন্ন ভিন্ন সেগুলোতে) কখনো কখনো সংখ্যাগরিষ্ঠের রায় অগ্রাধিকার প্রদানের একটি কারণ হয়। অর্থাৎ যে দিকে বেশির ভাগ ফকীহ অভিমত দিয়েছেন সেটাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা হবে। এ হলো শরী'আতে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের অবস্থান। সুতরাং সরকার নিয়ে দুইজনের একজনকে প্রাধান্য দেয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে ফায়সালা দেয়া যেতে পারে। তবে কোন কুফুরী মতবাদের সাথে জড়িত হওয়া যাবে না।

সারকথা হলো, বিভিন্ন পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যেমন, শর'য়ী জিহাদ, কাফের সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের মাধ্যমে খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা। তবে শর্ত হলো রাজনীতি হতে হবে ইসলাম সমর্থিত। কোনভাবেই গণতন্ত্রের কুফরী মতবাদে বিশ্বাসী হওয়া যাবে না এবং ক্ষমতা গ্রহণের পর অতিদ্রুত গণতন্ত্র বিনাশ করে পূর্ণ ইসলামী খেলাফত কায়েম করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য সকলকে সাধ্য মোতাবেক মেহনত করার তাওফীক দান করুন এবং পৃথিবীতে পুনরায় ইসলামী খেলাফত কায়েম করে দিন। আমীন ॥

<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

ভোট ও তার শর'য়ী দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা আব্দুল্লাহ আল মামুন শেরপুরী

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ব্যক্তি হলেন খলীফা বা রাষ্ট্রপ্রধান। যেহেতু খলীফাই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, তাই তার নির্বাচন পদ্ধতিটিও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ইসলামে খলীফা নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামতের ভিত্তিতে খলীফা নির্বাচন করা। এ পদ্ধতিতে ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. নির্বাচিত হয়েছেন। এ নিয়মানুসারে দ্বিতীয় খলীফা হযরত ওমর রাযি. ও তাঁর পরবর্তী খলীফা নির্বাচনের লক্ষ্যে ছয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির একটি মজলিশে শুরা গঠন করেছিলেন।[৭১৩] তিনি উক্ত পদ্ধতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব প্রদান করতেন। এমনকি দীর্ঘ খুতবার একাংশে বলেছেন-

إنه لا خلافة إلا عن مشورة.

"খলীফা নির্বাচিত হবে মাশওয়ারার মাধ্যমেই।"[৭১৪]

খলীফা ও আমীর নির্বাচন পদ্ধতি যেহেতু সাহাবা যামানাতেই ছিল, আর তাঁরা হলেন সমগ্র মানব জাতির আদর্শ। তাই ভোট প্রদানের ক্ষেত্রেও তাঁরা আমাদের আদর্শ। তাঁদের আদর্শকে সামনে রেখে ভোট প্রদানকে বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়। যার প্রতিটি বিষয় স্বস্থানে গুরুত্ব ও তাৎপর্যের দাবীদার। বিষয়গুলি নিম্নরূপ-

১. শাহাদাত বা সাক্ষ্য প্রদান করা। ২. আমানত। ৩. ওকালাত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা।

শাহাদাতঃ শাহাদাত অর্থ হচ্ছে সাক্ষ্য প্রদান করা বা সত্যায়ন করা। কেননা একজন ভোটার যখন কোন ভোটপ্রার্থীকে ভোট প্রদান করে, তখন সে যেন ঐ ভোট প্রার্থীর ধার্মিকতা, ইলম, তাকওয়া, আমল এবং জনপ্রতিনিধিত্বের উপযুক্ততার সাক্ষ্য প্রদান করল এবং একথার সাক্ষ্য প্রদান করল যে, উক্ত কাজ সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য যে সকল শর্ত বা গুণের প্রয়োজন তা তার মাঝে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান রয়েছে। যেহেতু ভোট প্রদানের মাধ্যমে শাহাদাত প্রদান করা হয়, তাই শাহাদাতের কিছু নিয়ম নীতি, বিধিবিধান ভোট প্রদানকারীর জন্য পালনীয়। সুতরাং উক্ত প্রার্থী সৎ, নিষ্ঠাবান, দ্বীনদার ও ইসলামের হুকুম আহকামের পাবন্দ হওয়া

---

[৭১৩] ففي «البداية والنهاية»: كان عمر ﷺ قد جعل الأمر بعده شورى بين ستة نفر وهم عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب، وطلحة بن عبيد الله والزبير بن عوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف ﷺ ، وتحرج أن يجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين، وقال: لا أتحمل أمرهم حيا وميتا، وإن يرد الله خيرا يجمعكم على خير هؤلاء، كما جمعكم على خيركم بعد نبيكم ﷺ . ١٦٣/٧، دار إحياء التراث العربي، بيروت

[৭১৪] মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা: ২০/৫৭৩-৫৭৪; সুনানে কুবরা লিন-নাসায়ী: হাদীস নং ৭১৫১। শাইখ মুহাম্মাদ আওয়ামা হাফিযাহুল্লাহ হাদীসের সনদটি সহীহ বলেছেন। (قال محمد عوامة: الخبر إسناده صحيح)

আবশ্যক। যদি ভোটপ্রার্থী উল্লিখিত গুণে গুণান্বিত হয়, তাহলে ভোটারের সাক্ষ্য শরী'আতসম্মত হবে এবং সে সওয়াবের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি প্রার্থীর মাঝে উক্ত গুণাবলী না থাকে, তাহলে তাকে ভোট প্রদান করলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার গুনাহ হবে। ভোট একটি সাক্ষ্য বিশেষ, তাই উপযুক্ত পাত্রেই তা প্রদান করা উচিত। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তির ব্যাপারে অন্তর সাক্ষ্য প্রদান করবে যে, সে সংশ্লিষ্ট পদের যোগ্য নয়, অথবা অন্য ব্যক্তি তার চেয়ে অধিক যোগ্য তখন শুধু আত্মীয়তার কারণে বা পার্থিব স্বার্থের বিনিময়ে অযোগ্য পাত্রে ভোট প্রদান করা শর'য়ী বিধানানুযায়ী মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার সমপর্যায়ে, যা কবীরা গুনাহ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকে এত বড় অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন যে, মূর্তিপূজার পরেই তা উল্লেখ করেছেন (উভয়ের পাপকে সমপর্যায়ে রেখেছেন)। আল্লাহ পাক বলেন-

فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

"সুতরাং তোমরা মূর্তিদের অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে সরে থাক।"[৭১৫]

আল্লাহর রাসূল ﷺ মিথ্যা সাক্ষ্যকে কবীরা গুনাহ আখ্যায়িত করেছেন। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আবু বকরা রাহ. তার পিতা আবু বকরা রাযি. থেকে বর্ণনা করেন-

قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور وكان رسول الله ﷺ متكئا، فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

" হুজুর ﷺ বলেন যে, বড় বড় গুনাহ কোনগুলো তা কি তোমাদেরকে বলে দিবো? তিনবার এমন বললেন। সাহাবায়ে কেরাম উত্তর করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। ইরশাদ হলো, আল্লাহ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক করা, মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া অথবা বলেছেন মিথ্যা কথা বলা। হযরত আবু বকরা রাযি. বলেন হুজুর ﷺ হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, সোজা হয়ে বসে পড়লেন এবং বলে উঠলেন 'মিথ্যা থেকে বেঁচে থাকো' এভাবে কথাটির পুনরাবৃত্তি করতে থাকলেন। এমনকি আমরা (মনে মনে) কামনা করছিলাম, তিনি যদি ক্ষান্ত হতেন।"[৭১৬]

অন্য হাদীসে এসেছে, হযরত খুরাঈম ইবনে ফাতেক রাযি. বর্ণনা করেন -

قال: صلى رسول الله ﷺ صلاة الصبح، فلما انصرف قام قائما فقال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرار ثم قرأ فَٱجْتَنِبُوا۟ ٱلرِّجْسَ مِنَ ٱلْأَوْثَٰنِ وَٱجْتَنِبُوا۟ قَوْلَ ٱلزُّورِ ﴿٣٠﴾

---

[৭১৫] সূরা হজ্ব: ৩০

[৭১৬] সহীহ মুসলিম: ১/৬৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

"একদিন নবী করীম ﷺ ফজরের নামায পড়লেন। নামায শেষ হওয়ার পর দাঁড়িয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন যে, মিথ্যা শিরকের মতই। কথাটি হুজুর ﷺ তিন বার বললেন। অতঃপর এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'সুতরাং তোমরা মূর্তির অপবিত্রতা থেকে বেঁচে থাক এবং মিথ্যা কথা থেকে দূরে থাক।"[৭১৭]

আমানত: ভোট প্রদানের দায়িত্ব মূলত একটি শর'য়ী আমানত। এখানে আমানত বলতে একজন ব্যক্তির দায়িত্ব ও অধিকার বোঝানো উদ্দেশ্য। এ প্রেক্ষিতে ভোট প্রদান আমানত স্বরূপ। আর আমানত সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করেন-

إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে আদেশ দিচ্ছেন, যাবতীয় আমানত তার উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে অর্পণ করতে।"[৭১৮]

আরো ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُوٓاْ أَمَٰنَٰتِكُمۡ وَأَنتُمۡ تَعۡلَمُونَ ﴿٢٧﴾

"হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতে খেয়ানত করো না।"[৭১৯]

সুতরাং যে ব্যক্তি বা প্রার্থীকে নির্বাচিত করলে ইসলাম সমুন্নত হবে, ইসলামী মূল্যবোধ রক্ষা হবে, দেশের সকল মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে, তাকে ভোটের মাধ্যমে বিজয়ী করা সকল জ্ঞানবান ও বিবেকসম্পন্ন ঈমানদার মানুষের নৈতিক দায়িত্ব। শুধুমাত্র দলীয় দিক বিবেচনা করে কিংবা লোভ-লালসার বশবর্তী হয়ে অথবা প্রভাব প্রতিপত্তিতে ভীত হয়ে ভোট দেয়া যাবে না। কেননা ভোট দেয়া সাধারণ কোন ব্যাপার নয়। এটি একটি আমানত। তাই এ আমানতের সঠিক ব্যবহার করে দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন ও মহাবিপদ থেকে নিজেকে ও জাতিকে রক্ষা করতে হবে।

ওকালাত বা প্রতিনিধি নিযুক্ত করা: শর'য়ী দৃষ্টিতে ভোট দেয়ার অর্থ প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি বানানো। অর্থাৎ ভোটার প্রার্থীকে ভোট দিয়ে একথা বুঝাতে চাচ্ছে যে, ভোট প্রার্থী ভোটারের রাজনীতি ও ধর্মীয় বিষয়ের ওকীল বা প্রতিনিধি। আর এ কথা অনস্বীকার্য যে, প্রতিনিধি এমন ব্যক্তি হয়, যে প্রতিনিধিত্বের কাজ সুষ্ঠুভাবে আঞ্জাম দিতে পারবে। অনুরূপভাবে ভোটার তার ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে প্রার্থীকে নিজের প্রতিনিধি নিয়োগের সুপারিশ করে থাকে। আর সুপারিশের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[৭১৭] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫০৭, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৭১৮] সূরা নিসা: ৫৮
[৭১৯] সূরা আনফাল: ২৭

مَّن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَن يَشْفَعْ شَفَٰعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُۥ كِفْلٌ مِّنْهَا ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ مُّقِيتًا ﴿٨٥﴾

"যে লোক সৎকাজের জন্য কোন সুপারিশ করবে, তা থেকে সেও একটি অংশ পাবে। আর যে লোক সুপারিশ করবে মন্দ কাজের জন্য সেও তার বোঝার একটি অংশ পাবে। বস্তুত আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল।"[৭২০]

বলাবাহুল্য যে, নির্বাচিত প্রার্থী ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় ভাল-মন্দ যাই করবে প্রত্যেক ভোটার তার নির্বাচিত প্রার্থীর সাথে সওয়াব কিংবা গুনাহে সমান ভাগী হবে।

সারকথা: উল্লিখিত তিনটি বিষয় (শাহাদাত, ওকালাত ও আমানত) এর সমষ্টি হলো ভোট। তাই ভোট প্রদানে সকলকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। যেন অপাত্রে ভোট দিয়ে জাতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে না হয়।

ভোট প্রদান

মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে আদর্শবান, সৎ ও খোদাভীরু ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা অর্পণ করা কর্তব্য। যেহেতু ভোট দেয়া মানে সাক্ষ্য দেয়া তাই সত্য ও কল্যাণকে বিজয়ী করা আর মিথ্যাকে পরাভূত করার জন্য সাক্ষ্য দানে অংশগ্রহণ করতে হবে। কেননা সত্য সাক্ষ্য দান থেকে বিরত থাকা মানে মিথ্যাকে বিজয়ী হতে সুযোগ দেয়া, যা কোনক্রমেই কাম্য নয়।[৭২১]

সাক্ষ্য প্রদান সম্পর্কে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ لِلَّهِ شُهَدَآءَ بِٱلْقِسْطِ ۖ

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ন্যায় সাক্ষ্য দানের ব্যাপারে অবিচল থাকবে।"[৭২২]

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সত্য সাক্ষ্য এড়িয়ে না চলাকে মুসলমানদের উপর ফরয করেছেন। শুধু তাই নয় বরং সত্য সাক্ষ্য গোপন করাকে জুলুম সাব্যস্ত করে বলেছেন-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَٰدَةً عِندَهُۥ مِنَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَٰفِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿١٤٠﴾

"তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।"[৭২৩]

[৭২০] সূরা নিসা: ৮৫
[৭২১] দ্রষ্টব্য, জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া: ৩/৩৫৩ ইসলামিয়া কুতুবখানা, করাচী, পাকিস্তান
[৭২২] সূরা মায়েদা: ৮
[৭২৩] সূরা বাকারা: ১৪০

তিনি আরো ইরশাদ করেন-

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না। যে ব্যক্তি তা গোপন করে তার অন্তর পাপী। তোমরা যা কর আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ জ্ঞাত।"[৭২৪]

কুরআনের উল্লিখিত আয়াতসমূহ মুসলমানদের উপর এই বিধান অর্পণ করেছে যে, সত্য সাক্ষ্য প্রদান না করে সাক্ষ্য প্রদানকে এড়িয়ে যাওয়ার কোন অবকাশ নেই।

ভোট ক্রয়-বিক্রয়

বর্তমানে নির্বাচনের পূর্বে প্রার্থীরা ভোটারদের মাঝে যে টাকা-পয়সা, চা-নাস্তা, বিড়ি সিগারেট ইত্যাদি বিতরণ করে থাকে, তা ভোটারদেরকে নিজের স্বপক্ষে ভোট প্রদানের উদ্দেশ্যেই দিয়ে থাকে। আর সাক্ষীকে নিজের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য কোন কিছু দেয়া ঘুষের অন্তর্ভুক্ত। তাই ভোট ক্রয়-বিক্রয় নাজায়েয ও হারাম।

হাদীস শরীফে ঘুষের লেনদেনকারীদেরকে অভিসম্পাত করা হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে-

لعن الله الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما.

"ঘুষদাতা, গ্রহীতা, ও মধ্যস্থতাকারী সকলের উপর রয়েছে আল্লাহ তা'আলার লা'নত ও অভিশাপ।"[৭২৫]

অনুরূপভাবে ফুকাহায়ে কেরাম সাক্ষ্য প্রদান করে বিনিময় গ্রহণ করাকে নাজায়েয বলেছেন। আল্লামা ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

بخلاف الشهادة فإنها فرض يجب على الشاهد أداءها، فلا يجوز فيها التعاوض أصلا.

"সাক্ষীর উপর সত্য সাক্ষ্য প্রদান করা ফরয। সুতরাং সাক্ষ্য প্রদান করে কোনরূপ বিনিময় নেয়া জায়েয হবে না।"[৭২৬]

অতএব, ভোট প্রদানের ক্ষেত্রে এমন ধারণা করা উচিত নয় যে, এটা শুধু পার্থিব বিষয়, এর সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, প্রত্যেক ব্যক্তিকেই আল্লাহ তা'আলার আদালতে জবাবদিহী করতে হবে। সকল কর্মের হিসাবের সঙ্গে ভোট নামক সাক্ষ্যকে কোথায় কি অবস্থায় কতটুকু আমানতের সাথে ব্যবহার করেছে তারও হিসাব দিতে হবে।

মহিলাদের ভোট প্রদান

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভোট এক প্রকার সাক্ষ্য। ভোটের মাধ্যমে প্রার্থীর যোগ্যতার সাক্ষ্য প্রদান করা হয়। শরী'আত মহিলাদেরকেও ভোট প্রদানের অধিকার দিয়েছে। যেমন

---

[৭২৪] সূরা বাকারা: ২৮৩

[৭২৫] কানযুল উম্মাল: হাদীস নং ১৫০৮০, তিরমিযী: ১/২৪৮

[৭২৬] ফাতহুল কাদীর: ৭/২, কিতাবুল ওয়াকালা

তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান রাযি. এর নির্বাচনের সময় হযরত আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. মহিলাদের মতামতও নিয়েছেন।

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাসীর তাঁর অনবদ্য গ্রন্থ 'আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া'তে উল্লেখ করেন-

ثم نهض عبد الرحمن بن عوف ﷺ يستشير الناس فيها، ويجمع أي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى ومجتمعين سرا وجهرا حتى خلص إلى النساء المخدرات في حجابهن وحتى سأل الولدان في مكاتب وحتى سأل من يرد من الركبان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة أيام بلياليها.

"হযরত আব্দুর রাহমান ইবনে আউফ রাযি. হযরত উসমান রাযি. কে খলীফা নির্বাচনের বিষয়ে পরামর্শ ও মতামত গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হলেন। বড় বড় সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে (বিভিন্নভাবে) মতামত নিলেন। এক একজন থেকে, দুই দুইজন থেকে সম্মিলিতভাবে সবার থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে মতামত নিলেন। তিনি পর্দানশীন মহিলাদের থেকেও মতামত নিলেন। এমনকি মকতবের বাচ্চাদেরও মতামত নিলেন। (এখানেই ক্ষান্ত হননি) এরপর একাধারে তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত মদীনায় আগত মুসাফির ও গ্রামের লোকজন থেকেও মতামত গ্রহণ করেন।"[৭২৭]

উক্ত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনের ক্ষেত্রে মহিলাদের মতামত প্রকাশ বা ভোট প্রদান করা জায়েয আছে। কিন্তু মুসলমান নারীদের ভোট প্রদান করতে গিয়ে পর্দার অনুসরণ করা এবং ভোটের সঠিক ব্যবহার করা জরুরী। নচেৎ গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য ভোট দেয়া থেকে বিরত থাকাই উত্তম। হযরত মুফতী কেফায়াতুল্লাহ রাহ. বলেন, মহিলাদের ভোট প্রদান করা নিষেধ নয়। হ্যাঁ ভোট দেয়ার সময় শরী'আতের পর্দার দিকে খেয়াল রাখা ওয়াজিব।[৭২৮]

ডবল ভোট ও জাল ভোট প্রদানের হুকুম

ডবল ভোট ও জাল ভোট দেয়া শরী'আতের দৃষ্টিতে ধোঁকা ও মারাত্মক গুনাহ, এ থেকে বিরত থাকা প্রত্যেকের উপর অপরিহার্য। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ সমস্ত জালিয়াতি থেকে হেফাজত করুন।[৭২৯]

ভোট দেয়ার উপর অঙ্গীকারাবদ্ধ ব্যক্তির কসমের হুকুম

যদি কেউ কসম করে যে, আমি তাকে ভোট দেব না। এমতাবস্থায় ভোটারের কর্তব্য হলো, যদি সেই প্রার্থী যোগ্য হয়, তাহলে তাকে ভোট দিয়ে কসম ভঙ্গের কাফ্ফারা আদায় করে

---

[৭২৭] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ৭/১৬৪, দারু ইহইয়াইত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত

[৭২৮] কেফায়াতুল মুফতী: ৯/৩৭১, কিতাবুস সিয়াসাত, দারুল ইশা'আত, পাকিস্তান

[৭২৯] জাদীদ ফিকহী মাসায়েল: ৪৬২ খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী

দেয়া। হযরত আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরা রাযি. থেকে বর্ণিত-

قال لي رسول الله ﷺ : يا عبد الرحمن بن سمرة! وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير.

" নবী করীম ﷺ আমাকে বললেন, হে আব্দুর রহমান ইবনে ছামুরা! যদি তুমি কোন ব্যাপারে কসম করে ফেল আর যে ব্যাপারে কসম করেছ তা থেকে উত্তম কোন কাজ তুমি দেখতে পাও তখন উত্তম কাজটি করবে আর কসম ভঙ্গের জন্য কাফ্‌ফারা দিবে।"[৭৩০]

ইসলামের দৃষ্টিতে ভোট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এতে কোন অবহেলার অবকাশ নেই। এটা আমানত বিশেষ। ভোটের আমানতকে সঠিক পাত্রে অর্পণ করে সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা সকলের কর্তব্য। সেই সাথে ভোট যেহেতু একটি সাক্ষ্য ও সুপারিশ স্বরূপ তাই সৎ, দ্বীনদার ও যোগ্য প্রার্থীকে বিজয়ী করা উচিত। বর্তমানে যেহেতু কোন প্রার্থীর মাঝেই প্রয়োজনীয় গুণাবলী পূর্ণমাত্রায় নেই, তাই তুলনামূলকভাবে যে ভালো তাকেই ভোট প্রদান করা উচিত।

অন্যথায় তাতে আমানতের খেয়ানত ও মিথ্যা সাক্ষ্যদানের গুনাহ হবে। উপরন্তু তার সব ধরনের অন্যায় ও জুলুমের অংশীদারও হতে হবে।

শরী'আতের দৃষ্টিতে পদ প্রার্থনা

সরকারী বা বেসরকারী যে কোন পদ চেয়ে নেয়া বা পদের লোভ করা শরী'আতের দৃষ্টিতে জায়েয নেই। কারণ পদ বা শাসন ক্ষমতা হলো দায়িত্ব; অধিকার নয়। তাই স্বার্থসিদ্ধি বা নিছক নেতৃত্ব দেয়া অথবা শুধু পদ নেয়ার জন্য নির্বাচনে অংশ নেয়া বা এর জন্য প্রাণপণ তদবীর করা জায়েয নেই। কেননা যে ব্যক্তি নিজ ইচ্ছায় পদ গ্রহণ করে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার জন্য সাহায্যের দরজা রুদ্ধ হয়ে যায়। তার দ্বারা দেশ ও দশের মঙ্গল হয় না। রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আব্দুর রহমান ইবনে সামুরা রাযি. কে বলেছেন-

لا تسأل الإمارة فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها

"নেতৃত্বের জন্য আবেদন করো না। কেননা যদি আবেদনের কারণে তোমাকে নেতৃত্ব দেয়া হয় তাহলে তোমাকে তার দায়ভার বহন করতে হবে। আর যদি তোমাকে চাওয়া ছাড়াই নেতৃত প্রদান করা হয়, তাহলে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তোমাকে সাহায্য করা হবে।"[৭৩১]

একারণেই রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন পদের আবেদনকারীকে উক্ত পদের জন্য মনোনীত করতেন না। হযরত আবু মূসা আশ'আরী রাযি. বলেন, একবার আমার গোত্রের দু'জন লোক হুজুর ﷺ এর নিকট আবেদন জানালো, তাদেরকে যেন কোন পদে নিয়োগ দেয়া

---

[৭৩০] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৪২৭৩; সহীহ বুখারী: ২/১০৫৮, হামিদিয়া লাইব্রেরী

[৭৩১] সহীহ বুখারী: ২/৯৮০, হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা, হাদীস নং ৬৬২২

হয়। এ প্রসঙ্গে আবু মূসা রাযি. বলেন-

دخلت على النبي ﷺ أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحد الرجلين: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر مثل ذلك فقال: إنا والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه.

"আমি ও আমার দুই চাচাতো ভাই রাসূল ﷺ এর খেদমতে হাজির হলাম। তাদের একজন বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে কোন একটা দায়িত্ব দেন। অন্যজনও একই আবেদন করল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, আমরা এমন কাউকে এই দায়িত্ব অর্পণ করি না, যে এর আবেদন করে এবং এমন কাউকে নয় যে এর প্রতি লোভ করে।"[৭৩২]

উক্ত হাদীসের আলোকে সুস্পষ্ট, যে ব্যক্তি যোগ্যতার মাপকাঠিতে প্রার্থী হওয়ার উপযুক্ত নয় সে যদি দলীয়, বংশীয় বা আর্থিক প্রভাবের কারণে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জিতেও যায়, তার দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয় না বরং সে জাতির অকল্যাণ ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। একদিকে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পদ গ্রহণের কারণে সে গুনাহগার হয়, অপরদিকে আল্লাহর সাহায্য না থাকার কারণে জনগণের দায়িত্ব ও আমানত রক্ষায় অক্ষম হয়।

পক্ষান্তরে যদি কাউকে জনগণের পক্ষ থেকে জোরপূর্বক নেতৃত্বভার দেয়া হয় অথবা সবাই মিলে তাকে নির্বাচিত করে, তাহলে তার জন্য আল্লাহর উপর ভরসা করে দায়িত্ব গ্রহণ বৈধ। সেক্ষেত্রে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। নবীজী ﷺ এমন ব্যক্তিকে উত্তম বলে অভিহিত করেছেন। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-

إن النبي ﷺ قال: ...تجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه.

"নবী করীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা ভাল মানুষ হিসেবে ঐ লোকদেরকে পাবে যারা এই ব্যাপার (অর্থাৎ আমীর হওয়া) কে অত্যন্ত অপছন্দ করার পর তার মধ্যে ফেঁসে যায়।"[৭৩৩]

এখানে প্রণিধানযোগ্য যে, কেউ কেউ নেতৃত্বের আবেদন জায়েয হওয়ার উপর হযরত ইউসুফ আ. এর বক্তব্য দ্বারা দলীল পেশ করে থাকেন, যখন তিনি মিশরের বাদশাহকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন-

قَالَ ٱجۡعَلۡنِي عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلۡأَرۡضِۖ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٞ ﴿٥٥﴾

"আমাকে ভূভান্ডারের জন্য ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করুন। নিশ্চয় আমি সংরক্ষক এবং বিজ্ঞ।"[৭৩৪]

---

[৭৩২] সহীহ মুসলিম: ২/১২০, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, হাদীস নং ১৭৩৩
[৭৩৩] সহীহ বুখারী: ১/৪৯৬, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ, হাদীস নং ৩২৩৫
[৭৩৪] সূরা ইউসুফ: ৫৫

এমনকি কেউ কেউ উক্ত বক্তব্য দ্বারা নির্বাচনী প্রচারণায় নিজের চতুর্মূখী প্রশংসার পক্ষে বৈধতার দলীল দেয়ার প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু দুই কারণে হযরত ইউসুফ আ. এর উক্ত বাণী তাদের পক্ষে দলীল হবে না।

প্রথমত: মিশরের বাদশা তাঁর জ্ঞানগর্ভ সিদ্ধান্ত ও আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানসূলভ পরামর্শে মুগ্ধ হয়ে পূর্বেই এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন যে, তাকে মিশরের কোন একটি দায়িত্ব প্রদান করবেন। যেমনটি কুরআনে এসেছে-

وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴿٥٤﴾

"এবং বাদশাহ বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি তাকে নিজের একনিষ্ঠ বানাবো। সুতরাং যখন (ইউসুফ আ. বাদশাহর কাছে এলেন এবং) বাদশাহ তাঁর সাথে আলোচনা করে বললেন, নিশ্চয়ই আপনি আমার কাছে আজ থেকে বিশ্বস্ত হিসেবে মর্যাদার স্থান লাভ করেছেন।"[৭৩৫]

সুতরাং বাদশাহ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে পদ দেয়ার সিদ্ধান্ত নেননি বরং নিজের ইচ্ছাতেই এরূপ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। এছাড়া হযরত ইউসুফ আ. এরও এ ব্যাপারে পূর্ণ ধারণা হয়ে গিয়েছিলো যে, বাদশাহ তাঁকে কোন না কোন পদ দিবেন। বাকি ছিল শুধু এতটুকু যে, তাঁকে কোন ধরনের পদ দেয়া হবে এবং কী কাজ তাঁকে ন্যস্ত করা হবে। এঅবস্থায় হযরত ইউসুফ আ. বলেছেন যে, যখন আপনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেনই যে, আমাকে কোন না কোন দায়িত্ব দিবেন তাহলে আমাকে ভূভাণ্ডারের ব্যবস্থাপক নিযুক্ত করুন। বিষয়টি এ রকম ছিল না যে, জেলখানা থেকে তিনি কোন পদের জন্য দরখাস্ত করেছেন এবং সে মর্মে কোন সুপারিশ পেশ করেছেন। (বরং আগত দুর্ভিক্ষের বছরগুলিতে মিসরবাসীদের জন্য তাঁর মত একজন আমানতদার ও বিজ্ঞ ভূভান্ডার তত্ত্বাবধায়কের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল) অতএব উক্ত ঘটনা থেকে ক্ষমতা প্রার্থনার কোন বৈধতা প্রমাণিত হয় না।

দ্বিতীয়ত: পদপ্রার্থনা নাজায়েয, এটি শরী'আতের একটি মৌলিক বিধান। তবে কিছু কিছু পরিস্থিতি এর ব্যতিক্রমও হয়ে থাকে। হযরত ইউসুফ আ. এর ঘটনা সেই ব্যতিক্রমধর্মী অবস্থার অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।[৭৩৬]

যেমন কোন যোগ্য আমানতদার ব্যক্তি যদি একথা পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, যদি সে নির্দিষ্ট পদ তলব না করে, তাহলে সে পদে এমন লোক আসবে যার হাতে জনগণ ও দ্বীনের ক্ষতি হবে এবং বদদ্বীনি ছড়াতে থাকবে এ অবস্থায় তার জন্য পদের আবেদন করার অবকাশ রয়েছে। তবে শর্ত হচ্ছে উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজ সংশোধন, সম্মান হাসিলের উদ্দেশ্য হলে

---

[৭৩৫] সূরা ইউসুফ: ৫৪

[৭৩৬] ইসলাম আওর সিয়াসী নযরিয়াত, আল্লামা তকী উসমানী দা.বা.: ১৯৯, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ, ভারত

চলবে না।

হযরত আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

إن طلب الإمارة والقضاء من حيث الإمارة والحكومة لحب المال والرياسة والشرف منهي عنه مطلقا، سواء كان بالقلب وحده أو باللسان أيضا لكونه من ناحية الدنيا لا الدين، وأما طلبها لا من حيث الإمارة، بل إرادة الإصلاح بين الناس، وإقامة العدل فيهم والقضاء بالحق لما في العدل من الأجر الجزيل فليس بمنهي عنه لا بالقلب، ولا باللسان بدليل قوله ﷺ : لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. وآخر اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.

"ধন সম্পদ, নেতৃত্ব ও মর্যাদার মোহে পদপ্রার্থনা সর্বাবস্থায় নিষিদ্ধ। তা শুধু অন্তরে হোক অথবা মৌখিকভাবে হোক। কারণ তা দ্বীনের জন্য হয় না বরং দুনিয়ার জন্যই হয়ে থাকে। আর যদি পদপ্রার্থনা নেতৃত্ব লাভের উদ্দেশ্যে না হয়ে জনগণের কল্যাণার্থে, ন্যায়নিষ্ঠা ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয় বরং ন্যায়নিষ্ঠার কারণে তা হবে উত্তম প্রতিদানের মাধ্যম স্বরূপ। সুতরাং এক্ষেত্রে অন্তরে ও মৌখিকভাবে সর্বাবস্থায় পদপ্রার্থনা বৈধ হবে। যার দলীল নবীজী ﷺ এর একটি হাদীস, 'ঈর্ষা[৭৩৭] শুধু দুই ব্যক্তির উপর করা যায়। প্রথম ঐ ব্যক্তির উপর যাকে আল্লাহ তা'আলা সম্পদের প্রাচুর্য দান করে তা হকের পথে ব্যয় করার তাওফীক দিয়েছেন। দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা দান করেছেন এবং সে তা অনুযায়ী মানুষের মাঝে বিচার-মীমাংসা করে এবং অপরকে তা শিক্ষা দেয়।"[৭৩৮]

পরিশেষে যফর আহমদ উসমানী রাহ. বলেন-

فمن كان على قدم التواضع لله مع سؤاله الإمارة، كما هو شأن الأنبياء والكمل من الأولياء يجوز له سؤالها وطلبها، ومن لم يقدر على الجمع بينهما لم يجز له إرادتها ولا طلبها، ولا الحرص عليها فضلا عن سؤالها باللسان.

"সুতরাং কেউ যদি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে পদপ্রার্থী হয়, যা ছিল স্বয়ং নবী ও ওলীগণের গুণ, তাহলে তার জন্য পদপ্রার্থী হওয়া জায়েয। আর যে ব্যক্তি দু'টির (পদপ্রার্থনার সাথে বিনয় ও নম্রতার) মাঝে সমন্বয় সাধনে সক্ষম হবে না তার জন্য মৌখিকভাবে পদপ্রার্থনা বৈধ হওয়া তো দূরের কথা, আশা করাও বৈধ হবে না।"[৭৩৯]

---

[৭৩৭] ঈর্ষা বলে কারো নিয়ামতের অনুরূপ নিয়ামত লাভের আশা করা। নিয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি তা থেকে বঞ্চিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা ছাড়া। আর হিংসা বলে কোন নিয়ামত তার মালিকের হাতছাড়া হয়ে হিংসুকের হস্তগত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করা। ভাল কাজে ঈর্ষা জায়েয তবে হিংসা কোন ক্ষেত্রেই জায়েয নেই।

[৭৩৮] সহীহ বুখারী: ১/১৭, মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত
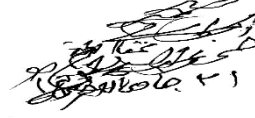
[৭৩৯] ই'লাউস সুনান: ১৫/৪৮, দারুল কিতাবিল ইলমিয়া,

মোটকথা, স্বাভাবিক অবস্থায় দুনিয়ার স্বার্থে পদ চেয়ে নেয়া থেকে বিরত থাকা মুমিনের কর্তব্য। হ্যাঁ, যদি কেউ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে এবং মুসলমানের মৌলিক হক প্রতিষ্ঠার জন্য পদ প্রার্থনা করে তাহলে তার জন্য অবকাশ আছে। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মুসলমানকে ভোটের শর'য়ী বিধান জেনে আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥
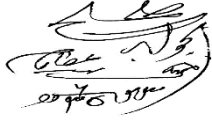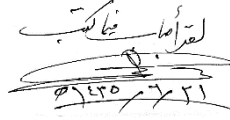
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
২১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
২১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

সরকারী আইনঃ আমাদের করণীয়

মাওলানা আলী আকবর সা'আদ টাঙ্গাইলী

আমরা এমন একটি রাষ্ট্রে বসবাস করি যার সংবিধান ও আইন-কানুন মানব রচিত। মানব রচিত আইন কখনো হয় শরয়ী বিধানের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ আবার কখনো হয় সাংঘর্ষিক, তাই এসব আইন মানার শরয়ী বিধান আমাদের কাছে পরিষ্কার থাকা উচিত। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

রাষ্ট্রপ্রধানকে মানার গুরুত্ব

রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা হয় নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা, ঐক্য ও একতাকে অটুট রাখার জন্য। এ বিষয়গুলো যেখানে যতটা প্রয়োজন, সেখানে নিয়ন্ত্রক ও তার অনুসরণের প্রয়োজনও ততখানি। আর একটা রাষ্ট্রে নিয়ন্ত্রণ ও অনুসরণের উপস্থিতি সর্বোচ্চ প্রয়োজন। সুতরাং রাষ্ট্র স্থিতিশীল সুশৃঙ্খল ও শক্তিশালী রাখার জন্য আমীর রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য অপরিহার্য। ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

فينبغي لهم أن يطيعوه لئلا يفشلوا ولا يتنازعوا، كما قال الله تعالى: وَلَا تَنَٰزَعُواْ فَتَفۡشَلُواْ

"মুসলমানদের জন্য আমীরের আনুগত্য করা কর্তব্য। যাতে করে তারা ব্যর্থ না হয় এবং ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত না হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হয়ো না। যদি তা করো, তাহলে তোমরা ব্যর্থ হবে।"[৭৪০]

তাই আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য আবশ্যক করে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, রাসূল ﷺ এবং তোমাদের মধ্যে যারা 'উলূল আমর' তাদের আনুগত্য কর।"[৭৪১]

হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর মতে (এক বর্ণনানুযায়ী) 'উলূল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো বাদশাহ বা সরকারপ্রধান। আর অন্য বর্ণনানুযায়ী 'উলূল আমর' দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ওলামা ও ফুকাহা।[৭৪২]

ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. উলূল আমরের ব্যাখ্যায় বলেন-

ويجوز أن يكونوا جميعا مرادين بالآية.

"আয়াতে উলূল আমর দ্বারা সরকারপ্রধান এবং ওলামা উভয়ই উদ্দেশ্য।"[৭৪৩]

---

[৭৪০] শরহু সিয়ারিল কাবীর: ১/১৬৮, হারাকাতুছ ছাওরাতিল ইসলামিয়্যা, আফগানিস্তান

[৭৪১] সূরা নিসা: ৫৭

[৭৪২] আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস: ৩/১৭৭, দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

[৭৪৩] আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস: ৩/১৭৭, দারু ইহ্ইয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

উল্লিখিত আয়াত দ্বারা সুস্পষ্ট যে, ইমাম বা সরকারপ্রধানের আনুগত্য করা ওয়াজিব, যেমন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ এর আনুগত্য করা ওয়াজিব।

হযরত আবু হুরায়রা রাযি.

নবীজী ﷺ থেকে বর্ণনা করেন-

من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني.

"যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো, সে আল্লাহরই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করলো, সে আল্লাহরই অবাধ্যতা করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমীরের অবাধ্যতা করলো, সে আমারই অবাধ্যতা করলো।"[৭৪৪]

হাদীস থেকে এ কথা পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমীরের আনুগত্য আল্লাহ ও রাসূল ﷺ এর আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। খলীফা বা রাষ্ট্রনায়কের আনুগত্য নিজের পছন্দনীয় বিষয়ে করা যেমন জরুরী, তেমনি নিজের অপছন্দনীয় কাজেও করা জরুরী, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শরী'আত পরিপন্থী কোনো কাজের আদেশ না করেন। হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, নবীজী ﷺ বলেন-

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة.

"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আমীর বা রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করা অপরিহার্য, নির্দেশটি তার মনঃপূত হোক বা না হোক। তবে যদি আমীর কোন গুনাহের নির্দেশ দেন, তাহলে তা শোনা ও মানা যাবে না।"[৭৪৫]

মোটকথা, একটা দেশের মাঝে সর্বোচ্চ প্রয়োজন হলো নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা। খলীফার আনুগত্য ছাড়া তা সম্ভব নয়। তাই খলীফার আনুগত্য আবশ্যক। এরপরও কেউ আনুগত্য স্বীকার না করলে বা অমান্য করলে শাস্তি দিতে পারেন।

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ার্দী রাহ. বলেন-

أن يسارعوا إلى امتثال الأمر والوقوف عند نهيه وزجره، لأنهما من لوازم طاعته. فإن توقفوا عما أمرهم به وأقدموا على ما نهاهم عنه، فله تأديبهم على المخالفة بحسب أحوالهم ولا يغلظ.

"যখন সরকারপ্রধান রাষ্ট্রের স্বার্থে শরী'আতসম্মত নীতিমালা প্রণয়ন করেন বা কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন, তখন জনগণের কর্তব্য হলো, সরকারী নির্দেশনা গুরুত্বের সাথে পালন করা, আর নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বিরত থাকা। কারণ উভয়টিই সরকারের

---

[৭৪৪] সহীহ মুসলিম: ২/১২৪, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৭৪৫] সহীহ মুসলিম: ২/১২৫, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

আনুগত্যের অন্তর্ভুক্ত। তবে জনগণ যদি নির্দেশ পালন না করে এবং নিষেধাজ্ঞা থেকে বিরত না থাকে, তাহলে আইন ভঙ্গের কারণে সরকার অবস্থাভেদে তাদের শাস্তি দিতে পারবে।"[৭৪৬]

মুফতী শফী রাহ. বলেন, 'যখন কোনো মুসলিম রাষ্ট্রে সর্বসম্মতিক্রমে কোনো ব্যক্তি খলীফা বা রাষ্ট্রনায়ক নির্বাচিত হন, আর তিনি দেশকে শর'য়ী আইন মোতাবেক পরিচালনা করেন এবং এমন কোনো আইন প্রণয়ন না করেন, যা শরী'আত পরিপন্থী, তাহলে সে সরকারের আনুগত্য করা জনগণের জন্য অপরিহার্য। তার ব্যক্তিগত আমল শরী'আতসম্মত হোক বা না হোক।'[৭৪৭]

রাষ্ট্রপ্রধানের ন্যায় জিহাদের ময়দানে আমীরের আনুগত্য অত্যাবশ্যকীয়। কারণ সেখানে নিয়ন্ত্রণ, শৃঙ্খলা ও সুষ্ঠু পরিচালনা অতিপ্রয়োজন। আর যেখানে নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা এতটা প্রয়োজন নয়, সেখানে আনুগত্যের বিধানও শিথিল।

যদি কোন ব্যক্তি জোরপূর্বক শাসন ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে অবস্থান গেড়ে বসে, তাহলে শৃঙ্খলা রক্ষার্থে তার আনুগত্যও করতে হবে, যদি তিনি শরী'আত পরিপন্থী কোন কাজের নির্দেশ না দেন।

وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب، والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه، لما في ذلك من حقن الدماء، وتسكين الدهماء.

"ফুকাহায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত যে, জোরপূর্বক ক্ষমতা দখলকারী সরকারের আনুগত্য করা এবং তার সাথে মিলে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ওয়াজিব। তার আনুগত্য করা উত্তম তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার চেয়ে। কারণ এতে রক্তপাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় এবং জনগণকে শান্ত রাখা যায়।"[৭৪৮]

সরকারের আনুগত্যের সীমারেখা

ইসলামী শরী'আত সর্বদা মধ্যমপন্থা পছন্দ করে। বাড়াবাড়ি বা ছাড়াছাড়িকে সমর্থন করে না। তাই সব বিধানের নির্দিষ্ট সীমারেখা রয়েছে। এর মাঝে থেকেই আনুগত্যের আদেশ আর সীমালঙ্ঘনকে নিষেধ করা হয়েছে। তাই আমীরের আনুগত্যেরও সীমা আছে, যার লঙ্ঘন গুনাহের কাজ।

এক্ষেত্রে মূলনীতি হলো আনুগত্য হবে ভাল কাজে। আর দুই ধরনের কাজে আনুগত্য করা যাবে না। **ক.** গুনাহের কাজে ও নিজের ধ্বংসাত্মক কাজে। **খ.** কোন সিদ্ধান্ত অকাট্যভাবে ভুল প্রমাণিত হলে।

প্রথম বিষয়: গুনাহর কাজ বলতে শরী'আত পরিপন্থী কাজকেই বুঝায়। আর ধ্বংসাত্মক কাজে আনুগত্য না করার জন্য শর্ত হলো কাজটার ধ্বংসাত্মক হওয়া অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

---

[৭৪৬] আহকামুস সুলতানিয়া: ৮৬, দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর

[৭৪৭] জাওয়াহিরুল ফিকহ: ৫/৪৫৪, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৭৪৮] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৩/৩২৭, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

إلا أن يأمرهم بأمر ظاهر لا يكاد يخفى على أحد أنه هلكة، أو أمرهم بمعصية، فحينئذ لا طاعة عليهم في ذلك.

হ্যাঁ, আমীর বা শাসক জনসাধারণকে কোন সুস্পষ্ট ধ্বংসাত্মক কাজ বা গুনাহের কাজের নির্দেশ দেন, তখন এ ব্যাপারে আমীরের আনুগত্য করা যাবে না।"[৭৪৯]

এমনকি অধিকাংশ ব্যক্তির রায় যদি এমন হয় যে, কাজটি ধ্বংসাত্মক, তাহলেও আনুগত্য করা যাবে না। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

كان عليهم الطاعة ما لم يأمرهم بأمر يخافون فيه الهلكة، وعلى ذلك أكثر رأي جماعتهم، لا يشكون في ذلك فإذا كان هكذا فلا طاعة له عليهم.

"আমীরের আনুগত্য করা জনসাধারণের জন্য ততক্ষণ জরুরী, যতক্ষণ পর্যন্ত আমীর তাদের অধিকাংশের ধারণা অনুযায়ী কোন ধ্বংসাত্মক কাজের নির্দেশ না দিবেন। যখন এমন কোন কাজের নির্দেশ দিবেন, তখন তার আনুগত্য করা যাবে না।"[৭৫০]

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ بعث جيشا وأمر عليهم رجلا، فأوقد نارا، فقال: ادخلوها، فأراد ناس أن يدخلوها، وقال الآخرون: إنما فررنا منها، فذكروا ذلك لرسول الله ﷺ فقال: للذين أرادوا أن يدخلوها، لو دخلتموها، لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة.

وفي رواية البخاري: لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি সেনাদল প্রেরণ করলেন এবং একজন সাহাবীকে তাদের আমীর বানালেন। আমীর সাহেব আগুন জ্বালিয়ে বললেন, তোমরা আগুনে ঝাঁপ দাও। কিছু সাহাবী আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছা করলেন। আর কিছু সাহাবী বললেন, আমরা এ থেকে বিরত থাকছি। সাহাবায়ে কেরাম পরবর্তী সময়ে এ ঘটনা নবীজী ﷺ কে জানালেন। যারা আগুনে ঝাঁপ দেয়ার ইচ্ছা করেছিল তাদেরকে লক্ষ্য করে নবীজী ﷺ বললেন, 'যদি তোমরা আগুনে ঝাঁপ দিতে, তাহলে কিয়ামত পর্যন্ত সেখানেই থাকতে।"[৭৫১]

সহীহ বুখারীর এক রেওয়ায়েতে আছে, যদি তোমরা সেখানে ঝাঁপ দিতে তাহলে কখনোই সেখান থেকে বের হতে পারতে না। আনুগত্য হবে শুধু ভাল কাজে।"[৭৫২]

হযরত আলী রাযি. থেকে এ বিষয়ে আরো একটি হাদীস বর্ণিত আছে-

قال رسول الله ﷺ : لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, 'গুনাহের কাজে কারো আনুগত্য করা যাবে না। শুধু ভাল

[৭৪৯] আস সিয়ারুল কাবীর: ১/১৬৭, হারাকাতুছ ছাওরিল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান
[৭৫০] আস সিয়ারুল কাবীর: ১/১৬৫, হারাকাতুছ ছাওরিল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান
[৭৫১] সুনানে নাসায়ী: ২/১৬৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৭৫২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৬৬১২

কাজেই আনুগত্য করা যাবে।"[৭৫৩]

لا طاعة في معصية إنما الطاعة في المعروف এই হাদীসের ব্যাখ্যায় মুফতী তকী উসমানী দা.বা. দু'টি মূলনীতির আলোচনা করেছেন। তন্মধ্যে প্রথমটি হলো-

مبدأ طاعة الأمير، وأن المسلم يجب عليه أن يطيع أميره في الأمور المباحة، فإن أمر الأمير بفعل مباح، وجبت مباشرته، وإن نهى عن أمر مباح، حرم ارتكابه ... ولكن هذه الطاعة كما أنها مشروطة بكون أمر الحاكم غير معصية، فإنها مشروطة أيضا بكون الأمر صادرا عن مصلحة لا عن هوى أو ظلم، لأن الحاكم لا يطاع لذاته، وإنما يطاع من حيث أنه متول لمصالح العامة.

"আমীর বা সরকারের আনুগত্যের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো, মুসলিম জনগণের উপর অপরিহার্য যে, তারা যেন বৈধ কাজে তাদের আমীর বা সরকারের অনুগত্য করে। সুতরাং সরকার যদি মুবাহ কাজের আদেশ দেন, তাহলে জনগণের জন্য তা পালন করা অপরিহার্য। আর যদি সরকার কোন বৈধ কাজ থেকে নিষেধ করেন, তাহলে তা বর্জন করা জনগণের জন্য জরুরী। কিন্তু এই আনুগত্যের জন্য শর্ত হলো, আমীর বা সরকারের আদেশ কোন বৈধ কাজে হতে হবে। অন্যায় কাজে হতে পারবে না। তেমনি তার আদেশ জনগণের কল্যাণের স্বার্থে হতে হবে, নিজের খেয়াল খুশি বা জুলুম-অত্যাচারের আদেশ হতে পারবে না। কারণ, আমীরের আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত অধিকার হিসেবে নয়; বরং তিনি জনগণের কল্যাণের জিম্মাদার এই হিসেবে।"[৭৫৪]

সুতরাং তিনি যদি নিজের খেয়াল-খুশিতে কোন আদেশ দেন, যার মধ্যে জনগণের কল্যাণ নেই, তাহলে সে হুকুম মানা জনসাধারণের জন্য জরুরী নয়। অন্য স্থানে তিনি বলেন-

إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك، بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها.

"যখন সরকার থেকে স্পষ্ট কুফরী পাওয়া যায়, তখন সে ব্যাপারে তার আনুগত্য করা জায়েয নেই। বরং সামর্থ্য থাকলে তাকে অপসারণ করা ওয়াজিব।"[৭৫৫]

আর জিহাদের সর্বনিম্ন পরিমাণ হলো শরী'আতের খেলাফ হুকুম আহকামকে নিজের মাঝে বাস্তবায়িত না করা ও শরী'আতের নাফরমানী না করা। আর যতদূর সম্ভব তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া প্রত্যেক জনগণের সামর্থ্য অনুসারে কর্তব্য।"[৭৫৬]

তবে সরকার যদি এমন আইন পাশ করে যা শরী'আত পরিপন্থী, যেমন হজ্ব সহ আরো অনেক ক্ষেত্রেই ছবির আবশ্যকতা। অথচ ছবি উঠানো অবৈধ। এ সকল ক্ষেত্রে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে অবৈধ কাজ থেকে নিজেকে বাঁচানোর, যতটুকু সম্ভব বিকল্প পন্থা অবলম্বন করার। তবে উপায় না থাকলে নিতান্তই যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু গ্রহণ করা যেতে পারে।

---

[৭৫৩] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৩৪২৪

[৭৫৪] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৩/৩২৩-৩২৪, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৭৫৫] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৩/৩২৭, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

[৭৫৬] জামেউল ফাতাওয়া ৮/৩৪৪, এদারাতু তালীফাতি আশরাফিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

দ্বিতীয় বিষয় হলোঃ কোন সিদ্ধান্ত যদি অকাট্যভাবে ভুল প্রমাণিত হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে আনুগত্য করা যাবে না। ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

إنه لا طاعة للأمير على جنده فيما هو معصية، ولا فيما كان وجه الخطأ فيه بينا.

"কোন গুনাহের কাজে সেনাসদস্যগণ (অধীনস্তগণ) সেনাপতির (দায়িত্বশীলের) আনুগত্য করবে না। অনুরূপ সুস্পষ্ট কোন ভুল কাজেও আনুগত্য করবে না।"[৭৫৭]

সরকারী আইন মানার রূপরেখা

রাষ্ট্রীয় আইন শরী'আতের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ার দু'টি রূপ রয়েছে। যথাঃ

১. মুবাহ, উত্তম বা মতবিরোধপূর্ণ কোনো বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

২. অকাট্য কোন বিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হবে।

দ্বিতীয় প্রকারের বিধান সরকারী আইন মানার সীমারেখা অংশে আলোচনা হয়েছে। এখানে শুধু প্রথম প্রকারের আলোচনা করা হচ্ছে।

প্রথম প্রকারের হুকুমঃ সরকার যখন রাষ্ট্র সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য বা জনগণের কল্যাণের স্বার্থে এমন কোনো আইন প্রণয়ন করে, যে ব্যাপারে শরী'আত নীরব, অথবা কোন উত্তম কাজের বিরোধ হয়, যেমন রমযান মাসে যাকাত আদায় করা উত্তম, তবে সরকার জনগণের কল্যাণার্থে যদি রমযানের পূর্বে বা পরে যাকাত আদায় করার আইন করে, তাহলে জনগণের জন্য সে আইন মানা জরুরী। আল্লামা শামী রাহ.বলেন-

اذا أمر الإمام بالصيام في غير أيام المنهية، وجب.

"নিষিদ্ধ দিনগুলো ব্যতীত অন্য কোন দিনে আমীর যদি রোযা রাখার নির্দেশ দেন, তাহলে রোযা রাখা ওয়াজিব।"[৭৫৮]

অথচ এ দিনগুলোতে রোযা রাখা মুস্তাহাব। কিন্তু আমীর আদেশ জারি করার কারণে ওয়াজিব হবে। এমনিভাবে আল্লামা আলাউদ্দীন আফিন্দী রাহ. বলেন-

وقد أخذ البيري من مجموع هذه النقول أنه لو أمر أهل بلدة بصيام أيام بسبب الغلاء أو الوباء وجب امتثال أمره، والله تعالى أعلم.

"ইমাম বি'রী রাহ. পূর্বোল্লিখিত বক্তব্যসমূহ থেকে এ রায় গ্রহণ করেছেন যে, আমীর বা সরকার যদি দেশবাসীকে চড়া দ্রব্যমূল্য বা দুর্ভিক্ষের কারণে কিছু দিন রোযা রাখার নির্দেশ দেন, তাহলে সে আদেশ মেনে নেওয়া জনগণের জন্য অপরিহার্য।"[৭৫৯]

তবে সরকারী আইন তখনই মেনে নেওয়া জরুরী, যখন তা জনগণ বা রাষ্ট্রের কল্যাণে করা হবে। শাসকের খেয়াল-খুশি ও জুলুম নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হবে না।

কোন সরকারী আইনের ব্যাপারে যদি সঠিকভাবে জানা না থাকে যে, সে আইন উপকারী না

---

[৭৫৭] শরহুস সিয়ারিল কাবীর: ১/১৬৮, হারাকাতুছ ছাওরিল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান

[৭৫৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৭৯২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৭৫৯] কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার (ফাতাওয়ায়ে শামী ১২): ২/৫৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

ক্ষতিকর বা বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ হয়, তাহলে এমন আইনের ব্যাপারে শরী'আতের নির্দেশ হলো, সে আইন মানাও জনগণের জন্যে অপরিহার্য। এছাড়া স্বতঃসিদ্ধ কথা হলো ইখতেলাফী কোন বিষয়ে যদি আমীর বা সরকার এক দিক গ্রহণ করে জনসাধারণের জন্য মানার নির্দেশ জারি করে, তাহলে ইখতেলাফী বিষয় হওয়ার কারণে ভিন্ন মতের উপর আমল করার সুযোগ থাকে না। বরং সরকার কর্তৃক গৃহীত মতই আমলযোগ্য হবে। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন-

وإن كان الناس في ذلك الأمر مختلفين، فمنهم من يقول فيه الهلكة، ومنهم من يقول فيه النجاة، فليطيعوا الأمير في ذلك.

"যদি কোন কাজের ব্যাপারে জনগণ দুই দলে বিভক্ত হয়ে যায়, কারো মতে কাজটি ধ্বংসাত্মক, কারো মতে কাজটিতে মুক্তি রয়েছে, তাহলে এমন কাজে আমীরের আনুগত্য করতে হবে।"[৭৬০]
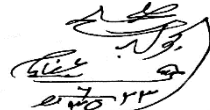
ইমাম সারাখসী রাহ. বলেন-

أن الأمير إذا أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا؟ فعليهم أن يطيعوه، لأن فرضية الطاعة ثابتة بنص مقطوع به.

"আমীর বা শাসক যখন এমন কোন কাজের নির্দেশ দেন, যে কাজ দ্বারা উপকার হবে, না ক্ষতি হবে জানা যায় না, এমন নির্দেশ মান্য করা জনসাধারণের জন্য ওয়াজিব। কেননা, তাদের আনুগত্য করা অপরিহার্য প্রমাণিত হয়েছে অকাট্য দলীল দ্বারা।"[৭৬১]
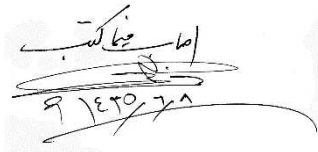
সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তাজ, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৭৬০] আস সিয়ারুল কাবীর: ১/১৬৬, হারাকাতুছ ছাওরিল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান
[৭৬১] আস সিয়ারুল কাবীর: ১/১৬৫, হারাকাতুছ ছাওরিল ইসলামিয়া, আফগানিস্তান

আত্মোৎসর্গ হামলার শর'য়ী বিধান

মাওলানা আব্দুর রহীম নওগাঁ

ইসলাম শান্তির ধর্ম। শান্তি ও শৃঙ্খলা অটুট রাখার জন্যে কখনো কখনো জিহাদের প্রয়োজন হয়। এই জিহাদ হতে হবে শরী'আত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মনীতির আলোকে। বলাবাহুল্য, জিহাদের পদ্ধতি পরিবর্তনশীল। যুগের পরিবর্তনের সাথে জিহাদের কৌশল পরিবর্তন হতে থাকে। জিহাদের বহুল প্রচলিত একটি কৌশল হলো 'আত্মোৎসর্গ হামলা'। এ কৌশলের হুবহু নজীর পূর্ববর্তী কিতাবে বিস্তারিত না থাকায় শর'য়ী ব্যাখ্যার দিক থেকে কিছুটা জটিলতার রূপ নিয়েছে। নিম্নে সংক্ষেপে শরী'আতের আলোকে ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ইসলাম একজন মানুষকে সম্মান করে। একজন মানুষের জীবনকে পূর্ণ মর্যাদা দেয়। বরং শরী'আতের মৌলিক উদ্দেশ্যের মাঝে মানুষের জান সংরক্ষণের বিশেষ গুরুত্ব ও ভূমিকা রয়েছে। তাই কোন ব্যক্তি নিজের জান বাঁচানোর জন্যে অন্যের সাথে যুদ্ধ করতে পারে। এই যুদ্ধ করে করে নিহত হলে ইসলাম তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দিয়েছে। সর্বোপরি ইসলাম চায় না একজনের জান বিনষ্ট হয়ে যাক। তাই ইসলাম কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছে, যেন কোন ব্যক্তি নিজের জান নিজেই ধ্বংস না করে। আত্মহত্যা ও আত্মহত্যাকারীর ব্যাপারে অনেক নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة.

"যদি কেউ কোন জিনিস দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহলে কিয়ামতের দিন ঐ জিনিস দ্বারাই তাকে আযাব দেয়া হবে।"[৭৬২]

শরী'আতে আত্মহত্যার কোন স্থান নেই। পক্ষান্তরে জিহাদে নিজের জান ব্যবহার করার উৎসাহ ও হুকুম দেয়া হয়েছে এবং এ কথাও বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তা'আলা জান্নাতের পরিবর্তে মুমিনের জান মাল ক্রয় করেছেন। ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ ٱللَّهَ ٱشْتَرَىٰ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَٰتِلُونَ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ

"আল্লাহ তা'আলা ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাঁদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাঁদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তাঁরা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে; অতঃপর হত্যা করে ও নিহত হয়।"[৭৬৩]

অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই ঘোষণা দিয়েছেন যে, মুমিনদের জান-মাল দ্বীনের স্বার্থে ব্যবহার হবে।

---

[৭৬২] সহীহ মুসলিম: ১/৭২

[৭৬৩] সূরা তাওবা: ১১১

জান-মাল ব্যবহারের বিভিন্ন ক্ষেত্র রয়েছে, যার চূড়ান্ত পর্যায় হলো জিহাদে অংশগ্রহণ । জিহাদে অংশগ্রহণ করে জান-মাল ব্যবহারের দু'টি রূপ হতে পারে।

১. এমনভাবে জিহাদে অংশ নেয়া যার পর কাফেরের সাথে যুদ্ধ করতে করতে এক পর্যায়ে নিরাপদে ফিরে আসার সম্ভাবনা হলেও থাকে। যেমন নববী যুগ থেকে এখন পর্যন্ত সাধারণত যে পদ্ধতি চালু আছে তাতে এক পর্যায়ে ফিরে আসার সম্ভাবনা ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কেউ ফিরে আসত কেউ আল্লাহর কাছে চলে যেত।

এ পদ্ধতি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। বরং অবস্থাভেদে কখনো ওয়াজিব বা ফরয হয়ে থাকে।

২. কাফেরের ক্ষতি ও ধ্বংস করার জন্য এমনভাবে নিজেকে পেশ করা যার পর পুনরায় প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন বর্তমানে বহুল প্রচলিত একটি রূপ 'আত্মোৎসর্গ' হামলা।

এ পদ্ধতিতে দু'টি দিক রয়েছে। **এক.** যেহেতু নিরাপদে ফিরে আসার কোন সম্ভাবনা নেই, যেমনটি প্রথম পদ্ধতির মাঝে ছিল সেহেতু এটা বাহ্যত এক পর্যায়ে আত্মহত্যার আওতায় পড়ে, যা সর্বাবস্থায় নিষেধ। **দুই.** ইসলাম জিহাদে নিজেকে পেশ করার ব্যাপক উৎসাহ দিয়েছে। এ ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্ট কোন সীমারেখা বলে দেয়া হয়নি। বরং আয়াত ও হাদীসের ব্যাপকতা এবং কিছু সাহাবীর আমল থেকে অনুমতি বুঝে আসে। তাই এ পদ্ধতিও কুরআন হাদীসের ব্যাপকতার মাঝে পড়ে, যার সারসংক্ষেপ নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কুরআনের আলোকে আত্মোৎসর্গ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"মানুষদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।"[৭৬৪]

অর্থাৎ যারা জিহাদের ময়দানে জীবন বিলিয়ে নিজেকে বিক্রয় করে থাকে।[৭৬৫]

আল্লামা কুরতুবী রাহ. স্বীয় তাফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, কোন কোন মুফাস্সির বলেন, আয়াতটি ব্যাপক অর্থবোধক। আল্লাহর রাস্তার প্রত্যেক মুজাহিদ, শহীদ হওয়ার জন্য নিজেকে উৎসর্গকারী এবং খারাপ কাজে বাধাদানকারী সকলেই এ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত।[৭৬৬]

---

[৭৬৪] সূরা বাকারা: ২০৭

[৭৬৫] রুহুল মা'আনী: ২/৯৬, মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান

[৭৬৬] তাফসীরে কুরতুবী: ৩/১৬, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

ইবনে কাসীর রাহ. এ মতটিকে অধিকাংশ মুফাসসীরের মত বলেছেন।[৭৬৭]

ইবনে কাসীর রাহ. এ আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নকল করেন, একবার হিশাম ইবনে আমের রাযি. শত্রু বাহিনীর দুই কাতারের মাঝে হামলা করলে কিছু লোক এর বিরোধিতা করে। তখন হযরত ওমর[৭৬৮] রাযি. হযরত আবু হুরায়রা[৭৬৯] রাযি. সহ অন্যান্যরা আপত্তিকারী ব্যক্তিদের মত প্রত্যাখ্যান করে এই আয়াত তেলাওয়াত করেন-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ رَءُوفٌۢ بِٱلْعِبَادِ ﴿٢٠٧﴾

"মানুষদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিক্রয় করে থাকে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান।"[৭৭০]

আল্লাহ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেন-

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ

"সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের সম্পর্কে দায়ী করা হবে।"[৭৭১]

তাবে'য়ী আবু ইসহাক রাহ. বলেন, একবার আমি হযরত বারা ইবনে আযেব রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কোন ব্যক্তি একাই মুশরিকদের উপর আক্রমণ করে, তবে সে কি ঐ ব্যক্তির বিধানে অর্ন্তভুক্ত হবে, যে নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়? উত্তরে তিনি বলেন, না। কেননা আল্লাহ তা'আলা তার রাসূল ﷺ কে প্রেরণ করেছেন এবং বলেছেন-

فَقَٰتِلْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ

---

[৭৬৭] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩৬৯, দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো

[৭৬৮] হযরত ওমর রাযি. এর ডাক নাম ছিলো আবু হাফস। আর প্রকৃত নাম ছিলো ওমর ইবনুল খাত্তাব। উপাধি ছিলো আল ফারুক। নবুওয়্যাতের ৫ম বা ৬ষ্ঠ বছরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন যখন মুসলমানদের সংখ্যা মাত্র চল্লিশ থেকে পঞ্চাশজন ছিলো। প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর রাযি. এর ইন্তেকালের পর তিনি ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা নিযুক্ত হন। দীর্ঘ সাড়ে দশ বছর অত্যন্ত দক্ষতার সাথে খেলাফত পরিচালনা করেন। ২৩ হিজরীর ২৬ যিলহজ্ব বুধবার দিন মদীনায় মুগীরা ইবনে শু'বা রাযি. এর গোলাম আবু লু'লু এর বর্শার আঘাতে গুরুতর আহত হন। অবশেষে ৬৩ বছর বয়সে ২৪ হিজরীর ১০ মুহাররম রবিবারে শাহাদাত বরণ করেন। -আল ইকমাল: ৬২২

[৭৬৯] হযরত আবু হুরায়রা রাযি. এর নামের ব্যাপারে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ইসলাম পূর্বজীবনে তাঁর নাম ছিলো আবদে শাম্‌স বা আবদে আমর আর ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর নাম রাখা হয় আব্দুল্লাহ বা আব্দুর রহমান। তাঁর পিতার নাম ছিলো ছখর। খাইবার যুদ্ধের বছর তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। অতিশয় ক্ষুধার্ত অবস্থায়ও তিনি ইলম অন্বেষণের আগ্রহে নবীজীর দরবারে পড়ে থাকতেন। তাই তো তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন। ইসলামের বরেণ্য এই সাহাবী ৭৮ বছর বয়সে ৫৭ বা ৫৮ অথবা ৫৯ হিজরী সনে মদীনায় ইন্তেকাল করেন। -আল ইকমাল: ৬২২

[৭৭০] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ১/৩৬৯, দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো

[৭৭১] সূরা নিসা: ৮৪

"সুতরাং আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর; তোমাকে শুধু তোমার নিজের জন্য দায়ী করা হবে।"[৭৭২]

হাদীসের আলোকে আত্মোৎসর্গ

উহুদের দিন অনেক সাহাবায়ে কেরাম একা শত্রুর মাঝে ঢুকে আক্রমণ করেন এবং শাহাদাত বরণ করেন, যেখানে নিশ্চিত মৃত্যুর আশঙ্কা ছিল। রাসূল ﷺ তাঁদের প্রশংসাও করেছেন। আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ أفرد يوم أحد فى سبعة من الأنصار ورجلين من قريش فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه أيضا فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة.

"উহুদের দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে সাতজন আনসারী ও দুইজন কুরাইশী সাহাবী ছিলেন। এক সময় মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কাছে চলে আসল, তখন তিনি বললেন, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে তাদের প্রতিহত করবে? তার জন্য জান্নাত রয়েছে, অথবা সে জান্নাতে আমার সাথী হবে। তখন এক আনসারী সাহাবী সামনে এগিয়ে লড়াই করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন অতঃপর আবার তারা রাসূল ﷺ এর কাছে চলে আসলে একে একে সাতজনই শহীদ হয়ে গেলেন।"[৭৭৩]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رجل للنبي ﷺ يوم أحد: أرأيت إن قتلت فأين أنا؟ قال: في الجنة فألقى تمرات في يده ثم قاتل حتى قتل.

"উহুদের দিন এক সাহাবী রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন, আমি যদি নিহত হই, তবে আমি কোথায় যাব? রাসূল ﷺ বললেন, জান্নাতে। তখন তিনি তাঁর হাতের খেজুরগুলো নিক্ষেপ করে প্রচন্ড বেগে হামলা করলেন এবং শহীদ হয়ে গেলেন।"[৭৭৪]

وبلغنا أن البراء يوم حرب مسيلمة الكذاب أمر أصحابه أن يحتملوه على ترس، على أسنة رماحهم، ويلقوه في الحديقة. فاقتحم إليهم، وشد عليهم، وقاتل حتى افتتح باب الحديقة.[٧٧٥]

"হযরত বারা ইবনে মালেক রাযি. মুসায়লামা কাযযাবের সাথে যুদ্ধের দিন সাথীদেরকে বর্শার আগায় ঢাল রেখে তাঁকে তার উপর বসিয়ে বাগানের মধ্যে ছুঁড়ে দিতে বললেন। অতঃপর তিনি তাদের মাঝে ঢুকে প্রচন্ড বেগে আক্রমণ করলেন এবং তাদের হত্যা করে

---

[৭৭২] তাফসীরে ইবনে কাসীর: ২/২৩৮, দারু ইবনুল জাওযী, কায়রো

[৭৭৩] সহীহ মুসলিম: ২/১০৭

[৭৭৪] সহীহ বুখারী: ২/৫৭৯

[٧٧٥] رواه البيهقي في «السنن الكبرى» عن محمد بن سيرين.

বাগানের দরজা খুলে দিলেন।"[৭৭৬]

আত্মোৎসর্গ ও ফুকাহায়ে কেরাম

আত্মোৎসর্গ হামলার একটি রূপ হলো বিপুল সংখ্যক কাফেরের মাঝে ঢুকে পড়া। এভাবে হামলা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেছেন, যদি কোনভাবে মুসলমানদের উপকার ও কাফেরের ক্ষতি হয় তাহলে এরকম হামলা করা যাবে। যেমন ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মত এভাবে উল্লেখ করেন-

فإن محمد بن الحسن الشيباني ذكر في السير الكبير أن رجلا لو حمل على ألف رجل و هو وحده، لم يكن بذلك بأس إذا كان يطمع في نجاة أو نكاية، فإن كان لا يطمع في نجاة و لا نكاية فإني أكره له ذلك، لأنه عرض نفسه للتلف من غير منفعة للمسلمين.

و إنما ينبغي للرجل أن يفعل هذا إذا كان يطمع في نجاة أو منفعة للمسلمين، فإن كان لا يطمع في نجاة و لا نكاية و لكنه يجرّيء المسلمين بذلك حتى يفعلوا مثل ما فعل، فيقتلون و ينكون في العدو فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأنه لو كان على طمع من النكاية في العدو و لا يطمع في النجاة لم أر بأسا أن يحمل عليهم... و أرجو أن يكون فيه مأجورا.

و إنما يكره له ذلك إذا كان لا منفعة فيه على وجه من الوجوه ، و إن كان لا يطمع في نجاة و لا نكاية و لكنه مما يرهب العدو، فلا بأس بذلك لأن هذا أفضل النكاية و فيه منفعة للمسلمين.

"মুহাম্মদ ইবনুল হাসান আশ শায়বানী রাহ. সিয়ারে কাবীরে উল্লেখ করেন, একজন লোক যদি এক হাজার লোকের উপর হামলা করে এতে কোন অসুবিধা নেই যদি সে নিজের মুক্তির আশা রাখে কিংবা শত্রুদের আহত করার আশাবাদী হয়। আর যদি সে নিজের মুক্তি বা শত্রুদের ক্ষতি করার আশাবাদী না হয়, তাহলে আমি তার জন্য এ কাজটিকে অপছন্দ করি। কেননা এতে মুসলমানদের কোন ফায়দা ছাড়া নিজেকে ধ্বংসের জন্য পেশ করা হয়।

একজন ব্যক্তির জন্য এ ধরনের হামলা তখনই সমীচীন হবে যখন সে তার হামলা দ্বারা নিজে নিরাপদে ফিরে আসা ও মুসলমানদের উপকার হওয়ার আশা রাখবে। যদি এমন আশা না থাকে, কিন্তু শত্রুদের ক্ষতি সাধনের জন্য তার মত হামলা করার প্রতি অন্যদেরকে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে হয় তাহলে শর'য়ী কোন সমস্যা নেই। কেননা যদি শত্রুদের ক্ষতি করার আশা থাকে, কিন্তু নিজেকে মুক্ত করার আশা না থাকে, তাহলেও আমি তাদের উপর হামলা করতে কোন অসুবিধা মনে করি না এবং আমি আশা করি এই হামলার কারণে সে প্রতিদান পাবে। আর যখন হামলার দ্বারা কোন ফায়দা না হয়, তখন আক্রমণ করা মাকরূহ। যদি নিজের মুক্তির বা তাদের ক্ষতির কোন আশা না থাকে কিন্তু এর দ্বারা শত্রুদের ভীতি প্রদর্শন করা যায় তাহলে এ হামলাতেও কোন অসুবিধা নেই। কেননা এটাই তো সবচেয়ে

[৭৭৬] সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৩/১২৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

বেশি ক্ষতি এবং এতে মুসলমানদের উপকারও নিহিত।"[৭৭৭]

ইমাম জাস্সাস রাহ. ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মত সমর্থন করে বলেন-

والذي قال محمد من هذه الوجوه صحيح لا يجوز غيره، و على هذه المعاني يحمل تأويل من تأوّل في حديث أبي أيوب: أنه ألقى بيده إلى التهلكة، بحمله على العدو إذ لم يكن عندهم في ذلك منفعة، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن يتلف نفسه، من غير منفعة عائدة على الدين و لا على المسلمين، فأما إذا كان في تلف نفسه من منفعة عائدة على الدين فهذا مقام شريف مدح الله به... ﴿عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾﴾وقال: ﴿وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِى نَفْسَهُ ٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ﴾ في نظائر ذلك من الآي التي مدح الله فيها من بذل نفسه لله .اهـ

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ. যে সকল সূরত বর্ণনা করেছেন এগুলো সহীহ। এগুলো ব্যতীত ভিন্ন সূরত জায়েয নেই। আর উল্লিখিত বিবরণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা হবে ঐ ব্যক্তির কথাকে, যিনি আবু আইয়ূব রাযি. এর বরাতে বর্ণিত হাদীসে وَلَا تُلْقُوا۟ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلتَّهْلُكَةِ আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন যে, শত্রুদের উপর হামলা করে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে । যেহেতু কোন উপকারশূন্য হলে তাদের মতে এতে কোন ফায়দা নেই। যখন বিষয়টি এমনই তখন দ্বীন ও মুসলমানদের কোন ফায়দা ছাড়া নিজের জীবনকে ধ্বংস করা উচিৎ নয়। আর যখন নিজেকে ধ্বংস করার মধ্যে দ্বীনের ফায়দা থাকে, তখন এটা হবে এমন এক মর্যাদাপূর্ণ কাজ, যার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা করেছেন। (আল্লাহ তা'আলা বলেন) তারা (যারা দ্বীনের ফায়দার জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছে) তাদের প্রতিপালকের নিকট রিযিকপ্রাপ্ত হবে।[৭৭৮]

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'কিছু মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিক্রি করে দিয়েছে।'[৭৭৯]

এ ধরনের আরো অনেক আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রশংসা করেছেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেদের জীবন বিসর্জন দিয়েছে।"[৭৮০]

আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. ই'লাউস সুনানে এ সম্পর্কে স্বতন্ত্র একটি অধ্যায় করে বলেন-

وأما مسألة حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن ومتى

---

[৭৭৭] আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ১/৩২৭, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

[৭৭৮] সূরা আল ইমরান: ১৬৯

[৭৭৯] সূরা বাকারা: ২০৭

[৭৮০] আহকামুল কুরআন লিল জাস্সাস: ১/৩২৭-৩২৮, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين والله أعلم.

“বিশাল বাহিনীর উপর একা আক্রমণ করার মাসআলা সম্পর্কে জমহুর ফুকাহায়ে কেরাম রাহ. এর মত হলো, যদি তার বীরত্বের কারণে তার মাঝে প্রবল ধারণা হয় যে, সে দুশমনের মাঝে ভীতি সৃষ্টি করতে পারবে, এ ধরনের সৎ উদ্দেশ্যে হলে, তা জায়েয আছে। আর যদি শুধু ধ্বংসমূলক হামলা হয় তাহলে জায়েয হবে না। বিশেষ করে যদি তার কারণে মুসলমানদের মাঝে দুর্বলতা চলে আসে।”[৭৮১]

আল্লামা শামী রাহ. শরহুস সিয়ারের উদ্ধৃতিতে বলেন-

ذكر في شرح السير أنه لا بأس أن يحمل الرجل وحده وإن ظن أنه يقتل إذا كان يصنع شيئا بقتل أو بجرح أو بهزم، فقد فعل ذلك جماعة من الصحابة بين يدي رسول الله ﷺ يوم أحد ومدحهم على ذلك، فأما إذا علم أنه لا ينكي فيهم فإنه لا يحل له أن يحمل عليهم، لانه لا يحصل بحملته شيء من إعزاز الدين.

“নিহত হওয়ার প্রবল ধারণা থাকা সত্ত্বেও একা এক ব্যক্তি শত্রুর উপর হামলা করতে পারবে, যদি সে দুশমনকে হত্যা, আহত অথবা পরাস্ত করার মাধ্যমে কোন ক্ষতি করতে পারে। কেননা অনেক সাহাবী রাযি. উহুদের দিন রাসূল ﷺ এর সামনে এ ধরনের হামলা করেছেন এবং হুজুর ﷺ তাদের প্রশংসা করেছেন। আর যদি এ ধারণা হয় যে, সে তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না, তবে তার জন্য তাদের উপর হামলা করা জায়েয হবে না। কেননা তার এই হামলার দ্বারা দ্বীনের কোন ফায়দা হবে না।”[৭৮২]

আত্মোৎসর্গের শর্তসমূহ

কুরআন, হাদীস ও ফুকাহায়ে কেরামের উপরোল্লিখিত বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আত্মোৎসর্গ হামলা জায়েয, তবে কিছু শর্তের সাথে।

১. নিয়ত সহীহ হওয়া। তথা ই'লায়ে কালিমাতুল্লাহ, দ্বীনের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি লক্ষ্য হতে হবে। যদি দুনিয়াবী কোন ফায়দা হাসিলের জন্য হয়, তাহলে জায়েয হবে না।

২. আক্রমণকারীর প্রবল ধারণা থাকা যে, তার এই হামলার দ্বারা শত্রুর ক্ষতি সাধিত হবে।

৩. যে কোনভাবে তার হামলা দ্বারা মুসলামানদের উপকার হতে হবে।

একটি সংশয় ও তার নিরসন

কেউ কেউ একটি আয়াতের বাহ্যিক অর্থ থেকে আত্মোৎসর্গ হামলাকে আত্মঘাতী বলে থাকেন। অথচ উভয়টির মাঝে পার্থক্য রয়েছে। এ বিষয়ে সংশয় ও তার নিরসন নিম্নে তুলে ধরা হলো।

---

[৭৮১] ই'লাউস সুনান: ১২/২৮-২৯, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৭৮২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/২০৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন-

وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ

"তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং নিজেদের হাতে নিজেদেরকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না।"[৭৮৩]

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা অনেকে আত্মোৎসর্গ হামলা নাজায়েয হওয়ার দলীল পেশ করে বলেন, আত্মোৎসর্গ হামলা আত্মহত্যার অন্তর্ভুক্ত। অনেক সাহাবী এ ধরনের ব্যাখ্যার আপত্তি করে অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবু ইমরান আসলাম রাযি. থেকে বর্ণিত তিনি বলেন-

غزونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال الناس : مه مه لا إله إلا الله يلقي بيديه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب : إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا : هلم نقيم فى أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالى ﴿وَأَنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾ فالإلقاء بالأيدى إلى التهلكة أن نقيم فى أموالنا ونصلحها وندع الجهاد.

"আমরা মদীনা থেকে কুসতুনতিনিয়ার উদ্দেশ্যে যুদ্ধযাত্রা করলাম। রোমানরা তখন শহরের প্রাচীর ঘেঁষে অবস্থান নিয়েছে। আব্দুর রহমান ইবনে খালেদ ইবনে ওয়ালীদ রাযি. ছিলেন দলের সেনাপতি। এক ব্যক্তি শত্রুদের উপর হামলা করলো, তখন লোকেরা বলতে লাগলো, থাম! থাম! লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ! এ ব্যক্তি তো নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়েছে। তখন হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রাযি. বললেন, এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছে আমরা আনসারী সাহাবীদের ক্ষেত্রে, যখন আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবীকে সাহায্য করলেন এবং ইসলামকে প্রকাশ করলেন তখন আমরা বললাম, এখন আমরা আমাদের সম্পদের মাঝে থাকবো এবং সেগুলো দেখাশোনা করবো। তখন আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত অবতীর্ণ করেন 'তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর এবং নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না।' সুতরাং ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়া হলো নিজেদের সম্পদ নিয়ে ব্যস্ত থাকা, তা দেখাশোনা করা এবং জিহাদ ছেড়ে দেয়া।"[৭৮৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম জাসসাস রাহ. বলেন-

فأخبر أبو أيوب أن الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله وأن الآية في ذلك نزلت وروي مثله عن ابن عباس وحذيفة والحسن وقتادة ومجاهد والضحاك وروي عن البراء بن عازب وعبيدة السلماني الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة هو اليأس من المغفرة بارتكاب المعاصي.

---
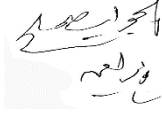
[৭৮৩] সূরা বাকারা: ১৯৫

[৭৮৪] সুনানে আবু দাউদ: ১/৩৪০, হাদীস নং ২৫১৪, হাদীসটি সহীহ
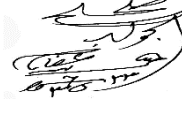
"হযরত আবু আইয়ূব রাযি. সংবাদ দিলেন যে, নিজেকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়ার অর্থ হলো আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করা। আয়াতটি এ ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। অনুরূপ ব্যাখ্যা হযরত ইবনে আব্বাস, হুযাইফা রাযি. হাসান, কাতাদা, মুজাহিদ ও যাহ্হাক রাহ. থেকেও বর্ণিত আছে। হযরত বারা ইবনে আযিব ও আবীদা সালমানী রা. বলেছেন যে, নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়া হলো গুনাহে লিপ্ত হওয়ার কারণে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হওয়া।"[৭৮৫]

সুতরাং এ আয়াত দিয়ে আত্মোৎসর্গ হামলা অবৈধ হওয়ার দলীল পেশ করার সুযোগ নেই। স্বয়ং সাহাবীরাও এ আয়াতের বাহ্যিক অর্থকে আত্মোৎসর্গের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করেননি। তাই কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং দ্বীনের মর্যাদা সমুন্নত করার লক্ষ্যে ইসলামের শত্রুদের উপর এমনভাবে আক্রমণ করে যে, তার মধ্যে শতভাগ মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে, তবুও সে আত্মহত্যাকারী বলে গণ্য হবে না। বরং সে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করবে, যেমন পূর্বে প্রমাণাদিসহ আলোচিত হয়েছে।

সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১২ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[৭৮৫] আহকামুল কুরআন লিল জাসসাস: ১/৩২৭, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

অধ্যায়ঃ বিবিধ

ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে প্রাণী হত্যার বিধান

মাওলানা শামছুল ইসলাম মৌলভীবাজার

ইসলাম সকল ক্ষেত্রেই পরিমিতি, সৌন্দর্য ও সুচারুতা পছন্দ করে এবং এর নির্দেশও দিয়ে থাকে। যেমন প্রাণী জবেহ ও মারার ক্ষেত্রে সুন্দর ও সহজতর পদ্ধতি গ্রহণ করতে ইসলাম নির্দেশ দিয়েছে । বর্তমানে ইলেকট্রিকের ব্যবহার ব্যাপক হওয়ায় এর মাধ্যমে প্রাণী হত্যার প্রচলনও শুরু হয়েছে। তাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এ সংক্রান্ত কিছু বিধান তুলে ধরবো ইন্‌শাআল্লাহ।

ইলেকট্রিক আগুনের কাছাকাছি হওয়ায় নিম্নে উভয়ের পরিচয় ও পরস্পরের মধ্যকার সম্পর্ক আলোচনা করা হলো।

ইলেকট্রিক ও আগুন

আগুন হলো রাসায়নিক বিক্রিয়া (যৌগিক পদার্থ বিশেষ) এর ফল। রাসায়নিক বিক্রিয়া যেখানে থাকে, সেখানে আলো ও তাপ উৎপন্ন হয়। সাধারণত সকল রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তাপ ও আলো উৎপন্ন হয়। তবে কিছু বিক্রিয়ায় তাপ আর কিছু বিক্রিয়ায় শুধু আলো উৎপন্ন হয়।

বিদ্যুৎ হলো চার্জীয় কলার গতি (অর্থাৎ ইলেকট্রন ও প্রোটন যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতগুলো পদার্থ) এর ফল। এগুলোর গতিতেই বিদ্যুৎ তৈরি হয়। আর ইলেকট্রন সব সময় প্রোটনের তুলনায় মাইনাস থাকে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তি তাপ উৎপন্ন করে এবং এতে যদি মাত্রাতিরিক্ত তাপ উৎপন্ন হয়, তখন জায়ন বিক্রিয়া (অক্সিজেন) শুরু হয় এবং আগুন উৎপন্ন হয়।[৭৮৬]

অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে যখন বিদ্যুৎ চলে, তখন বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে আগুন থাকে না। কিন্তু যখনই শক (Shock) হয় দুই তারে বা নেগেটিভ-পজেটিভ একত্রিত হয় তখন বিদ্যুতের যে গতি থাকে তা অনেক স্লো হয়ে তাপমাত্রা প্রচুর পরিমাণে বেড়ে আগুন ধরে যায়। তখন সেই আগুন আর সাধারণ আগুনে কোন পার্থক্য থাকে না।

প্রাণী হত্যার পদ্ধতি ও বিধান

কোন প্রাণী (যেমন বিড়াল, কুকুর, পিঁপড়া, জমিনে বিচরণশীল কীট-প্রতঙ্গ ও হিংস্র প্রাণী এবং বিভিন্ন ধরনের পোকা-মাকড়) যদি ক্ষতিকারক বা কষ্টদায়ক হয়, এগুলোকে মারা

[৭৮৬] সূত্র, www.physlink.com; electricity and fire

জায়েয আছে। হযরত আয়েশা রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفارة، والكلب العقور، والحديا. وفي رواية: الحدأة.

"পাঁচটি দূরাচারী (দুষ্কৃতি) প্রাণী রয়েছে যেগুলোকে হিল (হারাম শরীফের নির্দিষ্ট সীমা) ও হারামে মারা যাবে। সাপ, নানান রঙবিশিষ্ট কাক, ইঁদুর, পাগলা কুকুর ও চিল।"[৭৮৭]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় ইমাম নববী রাহ. বলেন-

اتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام.

"জুমহুর (সংখ্যাগরিষ্ঠ) ওলামায়ে কেরাম হিল ও হারামে এবং ইহরাম অবস্থায় উল্লিখিত প্রাণীগুলো হত্যার বৈধতার ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করেছেন।"[৭৮৮]

কারণ এ পাঁচ প্রকার প্রাণী যে কোন সময় মানুষকে ক্ষতি করতে পারে। তাই হারাম শরীফের ব্যাপক নিরাপত্তার বিধান সত্ত্বেও নবীজী এগুলোকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করার সুযোগ আছে।

আল্লামা ইবনু নুজাইম রাহ. বলেন-

وجاز قتل ما يضر من البهائم كالكلب العقور والهرة إذا كانت تأكل الحمام والدجاج لإزالة الضرر. (البحر الرائق: ٣٠٩/٨ زكريا)

একই ভাষ্য ব্যক্ত করেছেন আল্লামা শামী রাহ.-

جاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة تضر كما إذا كانت تأكل الحمام والدجاج.

"কষ্টদায়ক ও ক্ষতিকর চতুষ্পদ প্রাণী নিধন ও নির্মূল করা জায়েয। যেমন, পাগলা কুকুর, কবুতর ও মুরগি খেয়ে ফেলে এমন বিড়াল।"[৭৮৯]

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করা এবং প্রাণী জবেহ করার বিষয়টি একেবারেই উন্মুক্ত করে দেয়নি। বরং সুন্দর ও অনুপম পদ্ধতি গ্রহণের প্রতি তাগিদ দিয়েছে। হযরত শাদ্দাদ ইবনে আওস রাযি. বর্ণনা করেন-

---

৭৮৭ সহীহ মুসলিম: ১/৩৮১

৭৮৮ শরহে নববী: ১/৩৮১

৭৮৯ ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৪৮২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله ﷺ إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে 'ইহসান' (নিপুনতা ও পূর্ণতা) আবশ্যক করেছেন। (তিনি নির্দেশ দিয়েছেন) যখন তোমরা হত্যা কর, তখন উত্তম পন্থায় হত্যা কর। আর যখন তোমরা জবেহ কর, তখন উত্তম পন্থায় জবেহ কর এবং ছুরি ভালভাবে ধার দিয়ে নাও, যাতে জবেহ করা পশুটি অতিরিক্ত কষ্ট না পায়।"[৭৯০]

সুতরাং হত্যার সময় সহজ ও তুলনামূলক আরামদায়ক পদ্ধতিই গ্রহণ করা উচিত। বেপরোয়া হয়ে যে কোনভাবে হত্যা করাকে ইসলাম সমর্থন করে না।

হাফেজ ইবনে রজব হাম্বলী রাহ. উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب : إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب ، فإنه إيلام لا حاجة إليه ... والمعنى : أحسنوا هيئة الذبح ، وهيئة القتل . وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه.

"যখন বৈধভাবে কোন মানুষ বা প্রাণী হত্যার প্রয়োজন হবে, তখন হত্যার ক্ষেত্রে 'ইহসান' হলো হত্যার কাজটি এমন পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যেন অতিরিক্ত কোন কষ্ট ছাড়া দ্রুত ও সহজে প্রাণ বের হয়ে যায়। অন্যথায় তা হবে অপ্রয়োজনীয় কষ্ট দান। সুতরাং হাদীসের অর্থ হলো- তোমরা জবেহ এবং হত্যার ক্ষেত্রে সুন্দর ও সুচারু পদ্ধতি অবলম্বন কর। আর তা এ বিষয়ের প্রতি স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করছে যে, বৈধ কোন হত্যা বা জবেহের ক্ষেত্রে প্রাণ দ্রুত ও সহজে বের হওয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করা ওয়াজিব।"[৭৯১]

আগুনে পোড়ানোর হুকুম

ইলেকট্রিসিটি থেকে যেহেতু আগুন তৈরি হয় এবং তা থেকে লব্ধ আগুন দিয়ে প্রাণী হত্যার নযীরও কম নয়, তাই এ পদ্ধতিতে হত্যা করার বিধান উল্লেখ করার পূর্বে আগুনের বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া আবশ্যক।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন-

كنا مع رسول الله ﷺ في سفر، فانطلق لحاجته، فجاء النبي ﷺ ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: من

---

[৭৯০] সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ৫৮৮৩; সহীহ মুসলিম: ২/১৫২, হাদীস নং ৫০১৭

[৭৯১] জামিউল উলূমি ওয়াল হিকাম: ১৫১, হাদীস নং ১৭, মুআস্‌সাতুল কুতুবিছ ছাকাফিয়্যা, বৈরুত

حرق هذه؟ قلنا: نحن، قال: إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار.[৭৯২]

"আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সাথে এক সফরে ছিলাম। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গেলেন। কিছুক্ষণ পর ফিরে এসে দেখলেন, আমরা একদল পিঁপড়ার বাসা পুড়িয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, কে এগুলো পুড়িয়েছে? উত্তরে বললাম, আমরা। তিনি বললেন, আগুনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ ছাড়া কারো জন্য আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া সমীচীন নয়।"[৭৯৩]
হযরত ইকরিমা রাহ. বর্ণনা করেন-

أن عليا أخذ ناسا ارتدوا عن الإسلام، فحرقهم بالنار، فبلغ ذلك ابن عباس، فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. أحدا وقال رسول الله ﷺ : من بدل دينه، فاقتلوه، فبلغ عليا ما قال ابن عباس فقال ويح ابن أم ابن عباس.

"হযরত আলী রাযি. কিছু মুরতাদকে আগুনে পুড়িয়ে মারলেন। এ খবর হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর কাছে পৌঁছলে তিনি বলেন, যদি (তাঁর স্থানে) আমি হতাম, তাহলে তাদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিতাম না। কেননা রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আল্লাহ যা দিয়ে (আগুন) শাস্তি দেন, তা দিয়ে তোমরা কাউকে শাস্তি দিও না। রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, যে ব্যক্তি তার দ্বীনকে পরিবর্তন করে তোমরা তাকে হত্যা কর। অতঃপর আলী রাযি. এর নিকট ইবনে আব্বাস রাযি. এর বক্তব্য পৌঁছলে তিনি বলেন, আফসোস ইবনে আব্বাসের জন্য।"[৭৯৪]

এখান থেকে বুঝা যায় যে, আগুন দ্বারা পুড়িয়ে মারা হারাম নয়। তাই হযরত আলী রাযি. এর ঘটনাসহ অনুরূপ সাহাবা যুগের আরো কিছু ঘটনা পাওয়া যায়, যেগুলোর সারসংক্ষেপ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী[৭৯৫] রাহ. উমদাতুল কারীতে উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. এর আপত্তি হযরত আলী রাযি. এর কাছে পৌঁছলে তিনি তা গ্রহণ করেননি।

উপরোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যায় আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. বলেন-

---

[৭৯২] قال الإمام النووي في «رياض الصالحين» (باب تحريم التعذيب بالنار...) : رواه أبو داود بإسناد صحيح.

[৭৯৩] সুনানে আবু দাউদ: ২/৩৬৩, আশরাফী বুক ডিপো, দেওবন্দ

[৭৯৪] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ২৫৫২; সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩০১৭

[৭৯৫] মাহমুদ ইবনে আহমাদ ইবনে মূসা ইবনে আহমাদ ইবনে হুসাইন ইবনে ইউসুফ ইবনে মাহমুদ বদরুদ্দীন আইনী রাহ.। ৭৬২ হিজরী সনে মিসরে জন্মগ্রহণ করেন এবং ৮৫৫ হিজরীর যিলহজ্ব মাসে ইন্তেকাল করেন। তিনি কাযিল কুযাত (প্রধান বিচারপতি) ছিলেন। তাঁর জগত বিখ্যাত কয়েকটি রচনা হলো উমদাতুল কারী, নুখাবুল আফকার, বিনায়া শরহুল হিদায়া ও শরহুল কানয ইত্যাদি। -আল ফাওয়ায়েদুল বাহিয়্যা: ২০৭

وقال المهلب: ليس نهيه عن التحريق على التحريم، وإنما هو على سبيل التواضع لله، والدليل على أنه ليس بحرام سمل الشارع أعين الرعاة بالنار وتحريق الصديق رضي الله تعالى عنه الفجاءة بالنار في مصلى المدينة بحضرة الصحابة وتحريق علي رضي الله تعالى عنه الخوارج بالنار، وأكثر علماء المدينة يجيزون تحريق الحصون على أهلها بالنار وقول أكثرهم بتحريق المراكب وهذا كله يدل على أن معنى الحديث على الندب.

"আগুনে জ্বালানোর ব্যাপারে হাদীসে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, তা হারাম হিসেবে নয়। বরং তা মহান আল্লাহর শানের প্রতি লক্ষ্য করে বিনয় প্রকাশার্থে বলা হয়েছে। এটা যে হারাম নয় এর দলীল হলো, রাসূল ﷺ আগুন দ্বারা রাখালদের চক্ষুগুলো উপড়ে ফেলে শাস্তি দিয়েছেন এবং আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সাহাবায়ে কেরামের উপস্থিতিতে মদীনার ঈদগাহে ফুজাআ আস সুলামি'কে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেন। এমনিভাবে আলী রাযি. খারেজীদেরকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিয়েছেন। এছাড়া মদীনার অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম কেল্লাকে বাসিন্দাসহ জ্বালিয়ে দেয়ার বৈধতার ব্যাপারে মত দিয়েছেন। তাদের অধিকাংশদের মত হলো বাহনগুলো জ্বালিয়ে দেয়া। এ সকল ঘটনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে,হাদীসের নিষেধাজ্ঞাটি হারাম হিসেবে নয় বরং হাদিসটি মুস্তাহাবের অর্থে প্রযোজ্য।"[৭৯৬]

উভয় দিকের হাদীসের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وفي المبتغى يكره إحراق جراد وقمل وعقرب، ولا بأس بإحراق حطب فيها نمل.

"পঙ্গপাল, ক্ষুদ্রকীট ও বিচ্ছু জ্বালানো মাকরূহে তাহরীমী। তবে যে কাঠখড়িতে পিঁপিলিকা আছে তা জ্বালাতে কোন অসুবিধা নেই।"[৭৯৭]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

(قوله يكره إحراق جراد) أي تحريما ومثل القمل البرغوث ومثل العقرب والحية.

"পঙ্গপাল আগুনে জ্বালানো মাকরূহে তাহরীমী। অনুরূপভাবে ক্ষুদ্রকীট, উকুন, সাপ ও বিচ্ছু আগুনে জ্বালানো মাকরূহে তাহরীমী।"[৭৯৮]

উপরোক্ত হাদীস ও ফিকহী বক্তব্য দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কোন প্রাণীকে পুড়িয়ে এবং অতিরিক্ত কষ্ট দিয়ে হত্যা করা বৈধ নয়। কারণ এখানে দু'টি আপত্তিকর জিনিস একত্রিত

---

[৭৯৬] উমদাতুল কারী: ১০/৩৩৪
[৭৯৭] আদ্দুররুল মুখতার: ১০/৪৮২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৭৯৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৭৫২, এইচ.এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

হয়েছে। প্রথম আগুন, যা দিয়ে কেবল আল্লাহ তা'আলাই কোন প্রাণীকে শাস্তি দিতে পারেন, অন্য কেউ নয়। দ্বিতীয় জবেহ বা হত্যার ক্ষেত্রে ইসলামের অনুপম আদর্শের পরিপন্থী হওয়া।

ইলেকট্রিক পদ্ধতিতে প্রাণী হত্যা

প্রাণী হত্যার ইলেকট্রিক পদ্ধতি অনেক হতে পারে। যেমন শক দেয়া বা পুড়িয়ে ফেলা। শক বা এ জাতীয় কোন পদ্ধতিই শরী'আত সিদ্ধ নয়। কারণ তা শরী'আতের নীতি পরিপন্থী। হত্যার ক্ষেত্রে শরী'আত তুলনামূলক সহজ পদ্ধতি গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন, যা ইলেকট্রিক শকের মাঝে অনুপস্থিত। বরং এতে যন্ত্রণা বেড়ে যায় এবং প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হয়। সুতরাং এ পদ্ধতি অবলম্বন করা শরী'আতসম্মত নয়।

কখনো ইলেকট্রিক আগুন দ্বারা পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। পূর্বের আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পেরেছি যে, আগুনে কোন প্রাণী হত্যা করা মাকরূহে তাহরীমী। একথাও আমরা বুঝে এসেছি যে, সাধারণ আগুন ও ইলেকট্রিসিটিলব্ধ আগুন এক। তাই ইলেকট্রিক আগুন দিয়ে হত্যা করাও মাকরূহে তাহরীমী হবে।

মশা মারার ইলেকট্রিক ব্যাট ব্যবহার

আমাদের দেশে মশা মারার এক ধরনের ইলেকট্রিক ব্যাট রয়েছে। সে ব্যাট দিয়ে যেহেতু মশা বিদ্যুতের আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়; তাই মশা মারার ঐ ব্যাট ব্যবহার করা জায়েয হবে না। তবে মশা থেকে বেঁচে থাকার অন্য কোন মাধ্যম না থাকলে একান্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বর্তমান মুফতীয়ানে কেরাম ইলেকট্রিক ব্যাট ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে থাকেন। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

لكن جواز التحريق والتغريق مقيد كما في شرح السير بما إذا لم يتمكنوا من الظفر بهم بدون ذلك بلا مشقة عظيمة فإن تمكنوا بدونها فلا يجوز.

"কিন্তু কষ্টদায়ক প্রাণী আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে ও পানিতে ডুবিয়ে মারার বৈধতা ঐ ক্ষেত্রের সাথে সম্পৃক্ত যখন (এ সকল ক্ষতিকর প্রাণী থেকে) অনেক কষ্ট ও ভোগান্তি ছাড়া বাঁচার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা না থাকবে। হ্যাঁ, যদি বিকল্প ব্যবস্থা থাকে, তাহলে জ্বালানো জায়েয নেই।"[৭৯৯]
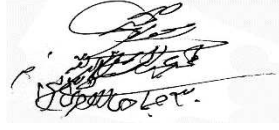
এখানে উল্লেখ্য যে, কোন কোন সময় বিদ্যুৎ দিয়ে হত্যা না করলেও মুরগি বা গরু জবেহের পূর্বে বিদ্যুৎ শক দিয়ে বেহুঁশ করা হয়, যা একটি বাড়তি যন্ত্রণা। সাময়িক সুবিধার প্রতি

[৭৯৯] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৪/১২৯, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান
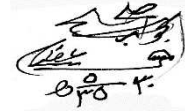
অতিশয় প্রলুব্ধ হয়ে কোন প্রাণীকে এভাবে কষ্ট দেয়া শরী'আত সমর্থন করে না।

অনেক সময় তো বৈদ্যুতিক শক দিতে গিয়ে মাত্রা এত বেড়ে যায় যে প্রাণী তাদের অজান্তে মারা যায়। আর মৃত অবস্থাই জবেহ করে বাজারে সাপ্লাই করা হয়। হ্যাঁ, যদি অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয় যে, বৈদ্যুতিক শক দিলে প্রাণীর তুলনামূলক কষ্ট কম হবে তখন সর্তকতার সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় শক দেয়া যেতে পারে। মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন, 'একথা সর্বজন স্বীকৃত যে, ইসলামী শরী'আত পশু জবেহের যে পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে, সেটাই পশুর প্রাণ বের হওয়ার জন্য অনেক উত্তম ও সহজ পদ্ধতি। সুতরাং বিদ্যুতের শকের মাধ্যমে পশুকে অচেতন করে জবাই করা কষ্টমুক্ত নয়। অতএব যদি এটা অকাট্যভাবে সাব্যস্ত হয় যে, এতে পশুর কষ্ট কম হয় এবং এর কারণে মৃত্যু হয় না, তাহলে উক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয হবে না।"[৮০০]

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্‌তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[৮০০] ফিকহী মাকালাত: ৪/২৮২, যমযম বুক ডিপো, দেওবন্দ

আধুনিক অপারেশনঃ সমস্যা ও সমাধান

মাওলানা শরীফুদ্দীন সিলেটী

মুমিনের জীবন মরণ সুস্থতা-অসুস্থতা সবকিছুই আল্লাহ তা'আলার জন্য সমর্পিত। জীবন চলার পথে যখন যে অবস্থার সম্মুখীন হবে সর্বাবস্থায় সে আল্লাহ তা'আলার বিধান জানতে চেষ্টা করবে এবং সে মোতাবেক আমল করবে। চিকিৎসা বিজ্ঞান দিন দিন উন্নতি লাভ করছে। আবিষ্কার হয়েছে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি। রোগ নির্ণয় থেকে রোগ নিরাময়ের অনেক ব্যবস্থাপনা রয়েছে যা পূর্বযুগে কল্পনাও করা যেত না। আমরা বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা ও তার বিধান আলোচনা করবো ইনশাআল্লাহ।

অপারেশন সংক্রান্ত আলোচনা

মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। কখনো স্বাভাবিক ঔষধের মাধ্যমে নিরাময় হয়, কখনো অপারেশন বা অস্ত্রোপচার করা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কোন সময় কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় অথবা সংযোজন করতে হয়। আধুনিক যুগে সফল অপারেশনের স্বার্থে অনেক অস্ত্র আবিষ্কার করা হয়েছে যা ব্যবহার করলে খুব সহজেই আক্রান্ত অঙ্গের সুস্থতার আশা করা যায়। বর্তমান যুগের অপারেশন পদ্ধতি ও অস্ত্রপাতি পূর্বযুগে না থাকলেও অস্ত্রোপচার করে আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলার বিভিন্ন প্রমাণ মেলে। যেমন-

১. হযরত জাবের রাযি. বর্ণনা করেন-

أن رسول الله ﷺ قال: إذا كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, তোমাদের চিকিৎসা পদ্ধতির মধ্যে শিঙ্গা লাগানো উত্তম চিকিৎসা।"[৮০১]

হিজামাত বা শিঙ্গা লাগানো বলতে বুঝায় , শরীরের কোন অংশে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কেটে শিঙ্গা বসিয়ে পঁচা রক্ত বের করা। এভাবে চামড়া কেটে শিঙ্গা লাগানো অপারেশনের মত। এখান থেকে বর্তমান কালের অপারেশনের বৈধতা প্রমাণিত হয়।

২. জাবের রাযি. বর্ণনা করেন-

بعث رسول الله ﷺ إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه .

"রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত উবাই ইবনে কা'আব রাযি. এর নিকট একজন ডাক্তার পাঠালেন। অতঃপর ডাক্তার তার একটি রগ কেটে তার উপর দাগ লাগিয়ে দিল।"[৮০২]

---

[৮০১] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৩৯ হাদীস নং ৩৮৫৮; জামে তিরমিযী: হাদীস নং ১৩২৫, ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[৮০২] সহীহ মুসলিম: ২/২২৫ হাদীস নং ২২০৭

এ হাদীসেও অপারেশন করে রগ কাটার প্রমাণ মেলে।

৩. ফিকহ শাস্ত্রের বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবে অপারেশন জায়েয বলে উল্লেখ রয়েছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

لا بأس بقطع العضو إن وقعت فيه الآكلة لئلا تسرى، كذا في السراجية، لا بأس بقطع اليد من الآكلة وشق البطن لما فيه، كذا في الملتقط.

“কোন অঙ্গে যদি কর্কট রোগ দুষ্টক্ষত ও ক্যান্সার ইত্যাদি হয়, তাহলে অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় উক্ত আক্রান্ত অঙ্গ কেটে ফেলা নাজায়েয নয়। (সিরাজিয়া) তেমনিভাবে অন্য অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে ক্যান্সারে আক্রান্ত হাত অথবা পেট কাটা অবৈধ নয়। (মুলতাকাত)।”[৮০৩]

অপারেশনের পূর্বাপর কিছু লক্ষণীয় বিষয়

অপারেশন করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, পুরুষ রোগীর অপারেশন পুরুষ ডাক্তার করবে। আর মহিলা রোগীর অপারেশন মহিলা ডাক্তার করবে। একান্ত প্রয়োজনে কোনো পুরুষ ডাক্তারকে মহিলা রোগীর অপারেশন করতে হলে, অপারেশনের পূর্বের প্রস্তুতিমূলক কাজ যেমন শরীরের প্রয়োজনীয় অংশ উন্মুক্ত করা, শরীরের বাকি অংশ ঢেকে দেয়া, সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতি উপস্থিত করা, প্রসাবের রাস্তায় নল লাগানো ইত্যাদি যা মহিলা ডাক্তার বা সেবিকা দ্বারা সম্ভব, তা পুরুষ ডাক্তারের জন্য সম্পাদন করা জায়েয নয়।

পুরুষ ডাক্তার একাকী অপারেশন থিয়েটারে (O.T) মহিলা রোগীর সাথে অবস্থান করতে পারবে না। ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

أنه سمع النبي ﷺ يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومعها محرم.

“আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, কোন ব্যক্তি যেন বেগানা মহিলার সাথে একাকি অবস্থান না করে এবং সফরও না করে। হ্যাঁ, যদি তার সাথে মাহরাম থাকে।”[৮০৪]

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ : ألا لا يبيتن رجل عند امرأة ثيب إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم.

“রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, সাবধান! কখনো কোন পুরুষ যেন কোন বিবাহিতা মহিলার নিকট রাত্রি যাপন না করে। কিন্তু যদি সে তার স্বামী হয় অথবা মাহরাম আত্মীয় হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।”[৮০৫]

উল্লিখিত হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কোন পুরুষের জন্য বেগানা মহিলার সাথে একান্তে

---

[৮০৩] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৪১৬ দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন
[৮০৪] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৩০০৬; সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৩৪১
[৮০৫] সহীহ মুসলিম: ২/২১৫

অবস্থান করার অনুমতি নেই।

সতরের অন্তর্ভুক্ত কোন অঙ্গের অপারেশন করতে হলে শুধু প্রয়োজনীয় অংশ খুলতে ও দেখতে পারবে। অতিরিক্ত কোন অঙ্গ খোলা ও দেখা নাজায়েয। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وقال في الجوهرة: إذا كان المرض في سائر بدنها غير الفرج، يجوز النظر إليه عند الدواء، لأنه موضع ضرورة، وإن كان في موضع الفرج، فينبغى أن يعلم امرأة تداويها، فإن لم توجد، وخافوا عليها أن تهلك أو يصيبها وجع لا تحتمله، يستروا منها كل شيء إلا موضع العلة، ثم يداويها الرجل ويغض بصره ما استطاع إلا عن موضع الجرح.

“জাওহারা নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে, যদি কোন মহিলার লজ্জাস্থান ব্যতীত পুরো শরীরে রোগ হয় তাহলে চিকিৎসা করার সময় ডাক্তারের জন্য তার পুরো শরীর দেখা বৈধ আছে। কেননা এসময় দেখা প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত। আর যদি মহিলার লজ্জাস্থানে রোগ হয়, তাহলে উচিত হলো, অন্য একজন মহিলাকে এর চিকিৎসা শিখিয়ে দিবে। সে মহিলা ঐ রোগীর চিকিৎসা করবে। যদি শেখানোর মত কোন মহিলা না পাওয়া যায় এবং রোগী মারা যাওয়ার আশঙ্কা হয় অথবা এতবেশি ব্যথা হয় যা তার জন্য সহ্য করা অসম্ভব, তাহলে উক্ত মহিলার রোগের স্থান ব্যতীত পুরো শরীর ঢেকে নিবে, তারপর কোন পুরুষ ডাক্তার তার চিকিৎসা করবে এবং ডাক্তার নিজের চক্ষুকে যথাসম্ভব হেফাজত করবে। হ্যাঁ তার জন্য শুধু জখমের স্থান দেখার অনুমতি রয়েছে।”[৮০৬]

রোগীকে অপারেশনের স্বার্থে অজ্ঞান করতে হলে পূর্বেই রোগীকে বলে দিতে হবে যে অপ্রয়োজনীয় কোন অংশ খোলা হবে না এবং সতরের হেফাজতের প্রতি লক্ষ রাখা হবে। অপারেশনের পূর্বে রোগী বা রোগীর অভিভাবকের কাছ থেকে যথাযথ অনুমতি নিতে হবে। অনুমতি ছাড়া অপারেশন করা জায়েয হবে না। তবে যদি এমন অবস্থা হয় যে, অনুমতি নেয়ার মতো সুযোগ নেই, অথবা রোগীর অবস্থা এমন আশঙ্কাজনক যে, বিলম্ব করলে মারা যেতে পারে, এমতাবস্থায় বিনা অনুমতিতে অপারেশন করা জায়েয। ইমাম ইবনে কুদামা রাহ. বলেন-

وإن ختن صبيا بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن، لأنه قطع غير مأذون فيه وإن فعل ذلك الحاكم أو من له ولايته عليه أو فعله من إذن له،لم يضمن، لأنه مأذون فيه شرعا.

“যদি কোন শিশুকে তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত খতনা করানো হয় অতঃপর শিশুর যখম ছড়িয়ে পড়ে, তাহলে বিনা অনুমতিতে খতনা করানোর কারণে উক্ত ব্যক্তি থেকে এর ক্ষতিপূরণ নেয়া হবে। আর যদি উক্ত কাজটি শাসক কিংবা ঐ ব্যক্তি করে যে ঐ শিশুর অভিভাবক হিসেবে রয়েছে অথবা অভিভাবকের অনুমতিক্রমে অন্য কেউ করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কেননা শরী‘আতের দৃষ্টিতে তার জন্য উক্ত কাজ করার অনুমতি

---

[৮০৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩৭১, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

রয়েছে।"[৮০৭]

নার্সের সেবা গ্রহণের হুকুম

পুরুষ এবং মহিলা রোগীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে স্বাভাবিক অবস্থায় ইসলামী শরী'আতের হুকুম হলো, পুরুষ রোগীর চিকিৎসা পুরুষ ডাক্তার করবে । মহিলা রোগীর চিকিৎসা মহিলা ডাক্তার করবে। অনরূপভাবে পুরুষ রোগীর সেবা পুরুষ সেবকরা করবে, আর মহিলা রোগীর সেবা নার্স বা সেবিকারা করবে। স্বাভাবিক অবস্থায় পুরুষ রোগীর জন্য নার্স থেকে সেবা গ্রহণ করা বৈধ নয়। অনুরূপভাবে মহিলা রোগীর জন্য পুরুষ সেবক থেকে সেবা গ্রহণ করা বৈধ নয়। একান্ত প্রয়োজনে কারো সেবা করতে হলে পর্দা ও সতর হেফাজতের প্রতি যথেষ্ট যত্নবান থাকার শর্তে বৈধ আছে। হযরত রুবাইয়ে বিনতে মুআওয়াজ রাযি. বলেন-

كنا مع النبي ﷺ نسقي ونداوي الجرحى ونرد القتلى إلى المدينة.

"আমরা যুদ্ধে আহতদের পানি পান করাতাম ও চিকিৎসা করতাম এবং নিহতদেরকে মদীনায় নিয়ে আসতাম।"[৮০৮]

এ হাদীস থেকে মহিলাদের রোগীর সেবা করার অনুমতি বুঝা যায়। আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রাহ. এ হাদীসের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করেন-

جاز ذلك للمتجالات منهن.

"বয়স্কাদের জন্য প্রয়োজনে পুরুষদের সেবা করা জায়েয আছে।"[৮০৯]

এ কথার সমর্থন পাওয়া যায় ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর 'আস্ সিয়ারুল কাবীর' এর আলোচনা থেকেও।[৮১০]

নার্স বা সেবিকার জন্যও পুরুষ ডাক্তার অথবা পুরুষ রোগীর সাথে একাকি অপারেশন থিয়েটারে (O.T) অবস্থান করা বৈধ নয়। অনুরূপ সেবকের জন্যও মহিলা ডাক্তারের সাথে অথবা মহিলা রোগীর সাথে একাকি অপারেশন থিয়েটারে (O.T) অবস্থান করা বৈধ নয়।

সিরিঞ্জে রক্ত আসলে অযুর হুকুম

ইনজেকশন দেয়ার সময় সিরিঞ্জে এবং স্যালাইন পুশ করার সময় স্যালাইনের নলে যে রক্ত আসে তার পরিমাণ যদি এতটুকু হয় যে, তা নিজে নিজে গড়িয়ে পড়তে পারে তাহলে অযু নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তার পরিমাণ এতটুকু না হয়, তাহলে অযু নষ্ট হবে না। অনুরূপ ইনজেকশন পুশ করার সময় যে রক্ত বের হয় অথবা রক্ত পরীক্ষা করার জন্য যে রক্ত বের করা হয় তার পরিমাণও যদি এতটুকু হয় যে তা নিজে নিজে গড়িয়ে পড়তে পারে, তাহলে

---

[৮০৭] আল মুগনী: ৫/৩১৩
[৮০৮] সহীহ বুখারী: ১/৪০৩
[৮০৯] উমদাতুল কারী: ১০/২০৩ দারুল ফিকর
[৮১০] আস সিয়ারুল কাবীর: ১/১৮৫, আল হারাকাতুহ ছাওরিয়্যা, আফগানিস্তান

অযু নষ্ট হয়ে যাবে। এতটুকু না হলে অযু নষ্ট হবে না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

القراد إذا مص عضو إنسان فامتلأ دما إن كان صغيرا لا ينقض وضوءه، كما لو مصت الذباب أو البعوض، وإن كان كبيرا ينقض، وكذا العلقة إذا مصت عضو إنسان حتى امتلأت من دمه، انتقض وضوءه.

"আঁটালি যদি কোন লোকের অঙ্গ চোষে রক্তে পূর্ণ হয়ে যায় তবে যদি তা ছোট হয় তখন অযু ভঙ্গ হবে না। যেমন মশা, মাছি ইত্যাদি অঙ্গ চোষলে অযু ভঙ্গ হয় না। আর যদি বড় হয়, তবে অযু ভেঙ্গে যাবে। তেমনিভাবে জোক যখন কোন মানুষের অঙ্গ থেকে রক্ত চোষে রক্তে পূর্ণ হয়ে যায়, তবে অযু ভেঙ্গে যাবে।"[৮১১]

ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আরো উল্লেখ আছে-

إذا خرج من الجرح دم قليل فمسحه، ثم خرج أيضا ومسحه فإن كان الدم بحال، لو ترك ما قد مسح منه سال انتقض وضوءه وإن كان لا يسيل لا ينتقض وضوءه.

"যখন ক্ষতস্থান থেকে সামান্য পরিমাণ রক্ত বের হয়, অতঃপর তা মুছে দেয়া হয়, পুনরায় বের হয় এবং তা মুছে দেয়া হয়, যদি সম্মিলিত রক্তের পরিমাণ এতটুকু হয় যে, রক্ত নিজ অবস্থায় ছেড়ে দিলে তা গড়িয়ে পড়ত তবে অযু ভেঙ্গে যাবে, নতুবা ভঙ্গ হবে না।"[৮১২]

ইনডোয়েলিং ক্যাথেটার লাগানো অবস্থায় অযু

বিশেষ কোন কারণে প্রস্রাবের থলির সাথে নল লাগিয়ে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্রাবের ব্যবস্থা করা হয়, তাকে ইনডোয়েলিং ক্যাথেটার বলা হয়। পরিপূর্ণ এক ওয়াক্ত নামাযের মধ্যে যদি ক্যাথেটার লাগানো থাকে যার ফলে সার্বক্ষণিক প্রস্রাব আসতে থাকে এবং অযু করে নামায পড়া যায় এতটুকু সময়ও পাওয়া না যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি মাযুরের অন্তর্ভুক্ত হবে। অতএব প্রতি নামাযের সময় অযু করবে এবং নামায আদায় করবে। যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্ত বাকি থাকবে উক্ত অযু দ্বারা ফরয নফল সব নামায আদায় করতে পারবে, যদি অযু ভঙ্গের নির্দিষ্ট ওজর ছাড়া অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়। উল্লেখ্য, ক্যাথেটারের সাথে যে থলি থাকে যদি সম্ভব হয় তাহলে নামাযের পূর্বে উক্ত থলিটি খালি করে নিবে। আর যদি খালি করা সম্ভব না হয়, অথবা খালি করার পর পুনরায় প্রস্রাব জমে যায়, তাহলে ওজরের কারণে তা নিয়েই নামায পড়া যাবে।

إذا كان به جرح سائل، وقد شد عليه خرقة، فأصابها الدم أكثر من قدر الدرهم أو أصاب ثوبه، إن كان بحال لو غسله يتنجس ثانيا قبل الفراغ من الصلاة، جاز أن لا يغسله وصلى قبل أن يغسله وإلا فلا. هذا هو المختار.

---

[৮১১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮১২] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

"যদি কোন ব্যক্তি জখমের স্থানে পট্টি বাঁধে অতঃপর ঐ পট্টিতে এক দিরহামের বেশি রক্ত লাগে অথবা এর সমপরিমাণ রক্ত কাপড়ে লাগে, যদি উক্ত ব্যক্তির অবস্থা এমন হয় যে, সেটা ধুয়ে নামায পড়ে অবসর হওয়ার পূর্বেই দ্বিতীয়বার নাপাক হয়ে যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তির জন্য সেটা ধোয়া জরুরী নয়। ধোয়া ছাড়াই সে এ অবস্থায় নামায পড়তে পারবে। আর যদি সে পবিত্র হওয়ার পর নামায পড়া পরিমাণ সময় দ্বিতীয়বার নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে তার জন্য নাপাক অবস্থায় নামায পড়া বৈধ হবে না।"[৮১৩]

সিজারের হুকুম

মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করাকে সিজার বলে। বিভিন্ন কারণে সিজার শরী'আতের পছন্দনীয় পদ্ধতি না হলেও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হওয়ায় নিম্নে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

মায়ের পেটে বাচ্চা থাকাকালীন মা ও বাচ্চার চারটি অবস্থা হতে পারে-

১. মা ও বাচ্চা উভয়ে মৃত। এ অবস্থার হুকুম হলো, উভয়ে মৃত হওয়ায় মায়ের পেট কাটা ব্যতীত মা ও বাচ্চাকে একসাথে দাফন করে দিতে হবে।

২. মা মৃত, বাচ্চা জীবিত। এ অবস্থার হুকুম হলো, মায়ের পেট কেটে বাচ্চা বের করা হবে। এমন করা যদিও মায়ের সম্মানের পরিপন্থী, কিন্তু মৃত মায়ের সম্মানের চেয়ে জীবিত বাচ্চার জীবন রক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত। এ প্রসঙ্গে ফাতাওয়া আবুল লাইছে বর্ণিত আছে-

في فتاوى أبي الليث رحمه الله في امرأة حامل ماتت وعلم أن ما في بطنها حي، فإنه يشق بطنها من الشق الأيسر، وكذلك إذا كان أكبر رأيهم أنه حي يشق بطنها.

"যদি গর্ভাবস্থায় কোন মহিলা মারা যায় আর সেই মহিলার পেটে যে বাচ্চা আছে তা জীবিত বলে জানা যায়, তাহলে মৃত মহিলার পেট অল্প কাটা হবে। তেমনি পেটের বাচ্চা জীবিত হওয়ার প্রবল ধারণা হলেও পেট কাটা হবে।"[৮১৪]

৩. বাচ্চা মৃত, মা জীবিত। এ অবস্থার হুকুম হলো, যদি মায়ের পেট কাটা ব্যতীত অন্য কোন পন্থায় পূর্ণ বাচ্চা বের করা সম্ভব হয়, তাহলে সেই পন্থা অবলম্বন করবে। অন্যথায় যোনিদ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বের করবে। আর যদি যোনিদ্বার দিয়ে হাত ঢুকিয়ে বাচ্চা বের করার চেয়ে সিজারের পন্থাটি সহজ হয়, তাহলে সহজ পন্থাটি অবলম্বন করবে। আর বাচ্চা জীবিত হলে স্বাভাবিকভাবে জীবিত বের করা সম্ভব না হলে সিজার করার অনুমতি আছে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

وإذا اعترض الولد في بطن الحامل ولم يجدوا سبيلا لاستخراج الولد إلا بقطع الولد إربا إربا ولو لم يفعلوا ذلك يخاف على الأم قالوا: إن كان الولد ميتا في البطن لا بأس به وإن كان حيا لم نر جواز قطع الولد

[৮১৩] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৪১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৮১৪] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩৬০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

إربا إربا.

"যদি মায়ের পেটে সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে মাকে বাঁচানোর জন্য সন্তানকে মেরে ফেলা এবং কেটে বের করা কোনভাবেই সমীচীন নয়। বরং অপারেশন করে সন্তান বের করবে।"[৮১৫]

৪. মা ও বাচ্চা উভয়ে জীবিত। এক্ষেত্রে বাচ্চা স্বাভাবিকভাবে জীবিত ভূমিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা না থাকলে সিজারের মাধ্যমে বের করার অনুমতি আছে। কারণ বর্তমান যুগে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে সিজার করে বাচ্চাকে নিরাপদে বের করা যায় এবং বাচ্চা ও মা উভয় জীবিত থাকার সম্ভাবনাও বেশি থাকে। তাই পূর্ব যুগের ওলামাদের মতানুযায়ী মা ও বাচ্চা উভয়কে আপন আপন অবস্থায় ছেড়ে না দিয়ে সিজারের অনুমতি দেয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত।

ফাতাওয়ায়ে ইবাদুর রহমানে উল্লেখ আছে-

ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ ہو تو ماں کی جان بچانے کیلئے بچے کو قتل کرنے ٹکڑے کرنے کی ہرگز گنجائش نہیں ہے، آپریشن کے ذریعے نکالے۔

"যদি মায়ের পেটে সন্তান জীবিত থাকে, তাহলে মাকে বাঁচানার জন্য সন্তানকে হত্যা করা এবং কেটে বের করা কোনভাবেই সমীচীন নয়; বরং অপারেশন করে সন্তানকে বের করবে।"[৮১৬]

সিজারের মাধ্যমে সন্তান হলে নেফাসের বিধান

সন্তান প্রসবের পর স্ত্রী লোকের যোনিপথ দিয়ে যে রক্ত নির্গত হয়, তাকে নেফাস বলে। স্বাভাবিকভাবে সন্তান প্রসব হোক বা সিজারের মাধ্যমে সন্তান প্রসব হোক। সুতরাং সিজারের মাধ্যমে সন্তান প্রসবের পর যদি স্ত্রীলোকের যোনিপথ দিয়ে রক্ত নির্গত হয়, তাহলে নেফাসগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে। কেননা, নেফাসগ্রস্ত হতে হলে স্ত্রীলোকের যোনিপথ দিয়ে রক্ত নির্গত হওয়া জরুরী। আর যদি সিজারের পর যোনিপথ দিয়ে রক্ত বের না হয়, বরং শুধু কর্তিত পেট বা পাঁজর দিয়ে রক্ত বের হয়, তাহলে নেফাসগ্রস্ত হিসেবে গণ্য হবে না। বরং অপারেশনের রোগী বলে গণ্য হবে। সুতরাং অপারেশনের রোগীর মতো নামায রোযা ইত্যাদি আদায় করতে হবে। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

ولو ولدت من قبل سرتها، بأن كان ببطنها جرح فانشقت وخرج الولد منها، تكون صاحبة جرح سائل لا نفساء، هكذا في «الظهيرية» و«التبيين». إلا إذا خرج من الفرج دم عقيب خروج الولد من السرة، فإنه حينئذ يكون نفاسا، هكذا في «التبيين».

"যদি নাভি দিয়ে কোন মহিলা সন্তান প্রসব করে, এভাবে যে মহিলার পেটে কোন জখম

---

[৮১৫] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩৬০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮১৬] ফাতাওয়ায়ে ইবাদুর রহমান: ৫/২১২, দারুল ইফতা ওয়াত তাহকীক, করাচী, পাকিস্তান
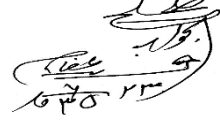
ছিলো আর সে জখমটা কেটে ফেলায় সেখান দিয়ে সন্তান বের হয়ে আসলে ঐ জখমওয়ালী মহিলাকে রক্ত প্রবাহিতা ধরা হবে, নেফাসগ্রস্ত ধরা হবে না। কিন্তু নাভি দিয়ে সন্তান বের হওয়ার পর যদি লজ্জাস্থান দিয়ে রক্ত বের হয়, তাহলে ঐ রক্তকে নেফাসের রক্ত ধরা হবে।"[৮১৭]

সত্যায়নে
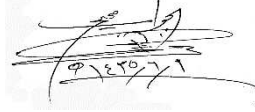
মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
০১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৮১৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৩৭, মাকতাবায়ে রশীদিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান; ১/৯১, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

ব্যান্ডেজ ও অপারেশনের রোগীর পবিত্রতার বিধান

মাওলানা আবু বকর মানিকগঞ্জী

মানব জীবন বৈচিত্রময়। কখনো সুস্থতা কখনো অসুস্থতা। ইসলামে সুস্থ অবস্থার বিধিবিধান যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অসুস্থ ব্যক্তির জন্যও যথাযথ বিধি নিষেধ। নিম্নে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পবিত্রতা সম্পর্কে কিছু জটিলতা ও তার শর'য়ী সমাধান আলোচনা করা হলো।

ব্যান্ডেজ প্রসঙ্গ

জীবন চলার পথে বিভিন্ন দুর্ঘটনার মুখোমুখি হতে হয়। ফলে কখনো আক্রান্ত হয় মানব অঙ্গ। আর তার চিকিৎসার জন্য কখনো প্রয়োজন পড়ে ব্যান্ডেজের। যেহেতু ব্যান্ডেজ অবস্থায়ও নামায আদায় করতে হয় তাই ব্যান্ডেজ অবস্থায় পবিত্রতা অর্জন সংক্রান্ত কিছু মাসআলা তুলে ধরা হলো।

ব্যান্ডেজের পরিচয় ও প্রকার

ফিকহের কিতাবসমূহ অধ্যয়নের পর ব্যান্ডেজের ব্যাপারে মোট তিন ধরনের শব্দ পাওয়া যায়।

১. الجبيرة (জাবীরা): ভাঙ্গা হাড় যথাস্থানে বসানোর জন্য যে কাষ্ঠফলক বেঁধে রাখা হয়।[৮১৮]

২. العصاب والعصابة (ইসাব, ইসাবাহ): এমন রুমাল বা কাপড়ের টুকরা অথবা বাঁশের বাতা যা ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগানোর জন্য বা ক্ষতস্থান ভাল করার জন্য বাঁধা হয়।[৮১৯]

৩. اللصوق واللزوق (লুসূক, লুযূক): আক্রান্ত অঙ্গের চিকিৎসার জন্য তুলা বা কাপড়ের টুকরো দ্বারা যে বাঁধন দেয়া হয়।[৮২০]

উল্লিখিত তিন প্রকার অনেকটা কাছাকাছি। বর্তমানে এগুলোকে ব্যান্ডেজ বলা হয়।

ব্যান্ডেজ অবস্থায় অযু

যদি অযুর কোন অঙ্গে ব্যান্ডেজ থাকে তাহলে অযুর সময় ব্যান্ডেজ খোলা সম্ভব হলে তা খুলে অঙ্গটি যতটুকু সম্ভব ধুয়ে নিবে। আর ধোয়াও সম্ভব না হলে সরাসরি জখমের উপর মাসেহ করতে হবে এবং তার আশপাশ ধুয়ে নিতে হবে।

হযরত ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন

قلت لعطاء : أرأيت إن كان على دملٍ في ذراع رجلٍ عصابٌ، أو قرحة يسيرة أيمسح على العصاب أو

[৮১৮] আল কামুসুল ফিকহী: ৫৮, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান

[৮১৯] আল কামুসুল ফিকহী: ২৫১, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান

[৮২০] আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ: ১৫/১০৬

ينزعه؟ قال : إذا كانت يسيرة فأحب أن ينزع العصائب.

"আমি হযরত আতা রাহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, যে ব্যক্তির বাহুতে ক্ষত রয়েছে এবং তার উপর পট্টি বাঁধা রয়েছে অথবা তার সামান্য জখম রয়েছে এমন ব্যক্তির পবিত্রতা অর্জনের পদ্ধতির ব্যাপারে আপনার মত কী? সে কি পট্টির উপর মাসেহ করবে না পট্টি খুলে ফেলবে? তিনি বললেন, যদি জখম হালকা হয় তাহলে পট্টি খুলে ধুয়ে নেয়াটাই আমি পছন্দ করি।"[৮২১]

সরাসরি জখমের উপর মাসেহ করা সম্ভব না হলে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করবে। এ বিষয়ে ইমাম বায়হাকী রাহ. নাফে' রাহ. সূত্রে ইবনে ওমর রাযি. এর আমল বর্ণনা করেন-

أنه توضأ وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك.[৮২২]

"ইবনে ওমর রাযি. এর হাতের কব্জিতে ব্যান্ডেজ থাকায় অযুর সময় ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করেছেন এবং বাকি অংশ ধুয়ে নিয়েছেন।"[৮২৩]

হযরত ইবনে জুরাইজ রাহ. বলেন,

قلت لعطاء : رجل مكسور اليد معصوب عليها ، قال : يمسح العصابة وحده، وحسبه، إنما عصاب يده بمنزلة يده.

"আমি হযরত আতা রাহ. কে জিজ্ঞাসা করলাম, হাত ভাঙ্গার কারণে ব্যান্ডেজকৃত ব্যক্তির (অযু গোসলের) হুকুম কী? তিনি বললেন, শুধু ব্যান্ডেজের স্থান (ভেজা হাত দ্বারা) মাসেহ করবে। এক্ষেত্রে হাতের উপর বাঁধা পট্টি হাতের স্থলাভিষিক্ত।"[৮২৪]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

ثم المسح عليها (أي الجبائر) إنما يجوز إذا ضره الغسل أو المسح على نفس القرحة أو الجراحة.

"ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করা ঐ সময় জায়েয যখন ক্ষতস্থান ধোয়া বা সরাসরি তার উপর মাসেহ করা রোগীর জন্য ক্ষতিকর।"[৮২৫]

তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে উক্ত অঙ্গ বাদ দিয়েই অযু সম্পন্ন করতে হবে। উল্লেখ্য, যদি অযুর অধিকাংশ অঙ্গে ব্যান্ডেজ থাকে, তাহলে অযুর পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায আদায় করবে। আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

إذا كان على أعضاء الوضوء كلها أو على أكثرها جراحة يتيمم.

---

[৮২১] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ১/১৬০ হাদীস নং ৬১৮, সনদটি সহীহ।

[৮২২] رواه البيهقي في «السنن الكبرى» وقال: هو عن ابن عمر صحيح.

[৮২৩] সুনানে বায়হাকী: হাদীস নং ১০৮০

[৮২৪] মুসান্নাফে আব্দুর রায্যাক: ১/১৬১ হাদীস নং ৬১৯, সনদটি সহীহ।

[৮২৫] ফাতহুল কাদীর: ১/১৬১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

"অযুর সকল অঙ্গে বা অধিকাংশ অঙ্গে জখম হলে, তায়াম্মুম করবে।"[৮২৬]

ব্যান্ডেজ অবস্থায় গোসল

ব্যান্ডেজ অবস্থায় গোসলের হুকুম প্রায় অযুর মতই। অর্থাৎ ব্যান্ডেজ অবস্থায় গোসল ফরয হলে ব্যান্ডেজ খুলে গোসল করতে হবে। তবে যদি ব্যান্ডেজ খোলা সম্ভব না হয় বা জখমের স্থানে পানি পৌঁছলে ক্ষতির আশঙ্কা হয়, তাহলে ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করে বাকি অঙ্গে পানি পৌঁছালেই পবিত্রতা অর্জন হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য যে, শরীরের অধিকাংশ স্থানে যদি ব্যান্ডেজ বা জখম থাকে এবং এতে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর হয়, অথবা নির্দিষ্ট স্থানে জখম হওয়ায় কোন কারণে পানি ব্যবহার সম্ভব না হয়, তাহলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করে নামায পড়তে পারবে।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ ...فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءً فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا

"যদি তোমরা রুগ্ন হও বা সফরে থাক... অতঃপর পানি না পাও তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও।"[৮২৭]

ইমাম আবু বকর জাসসাস রাহ. আয়াতটি উল্লেখ করে বলেন-

فسوى بين المرض وبين عدم الماء في جواز التيمم، وترك استعمال الماء.

"পানি ব্যবহারের পরিবর্তে তায়াম্মুম বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে পানি না পাওয়া ও অসুস্থার ওজর এক পর্যায়ের।"[৮২৮]

হযরত জাবের রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبى ﷺ أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العى السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو «يعصب». شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده.[৮২৯]

"কোন এক সফরে আমাদের এক সাথীর মাথায় পাথরের প্রচণ্ড আঘাত লাগে। এরপর তার স্বপ্নদোষ হলে সাথীদের নিকট জিজ্ঞাসা করল, (এ অবস্থায়) আমার তায়াম্মুম করার সুযোগ

---

[৮২৬] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ৫৭, দারুল কিতাব, দেওবন্দ

[৮২৭] সূরা মায়েদাহ: ৬

[৮২৮] শরহু মুখতাসারিত তাহাবী: ১/৪২৪, মাকতাবাতুল কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

[৮২৯] أخرجه أبو داود في «سننه» وسكت عنه ، وصححه ابن السكن، كما في «التلخيص الحبير» كتاب التيمم.

আছে কি? সাথীরা বলল, তুমি পানি ব্যবহার করতে সক্ষম হওয়ায় তায়াম্মুম করার কোন সুযোগ নাই। অতঃপর সে গোসল করার ফলে মারা গেলো। রাসূল ﷺ এর নিকট এ বিষয়টি জানানো হলে তিনি বললেন, তারা তো তাকে হত্যা করে ফেলেছে। বিষয়টি যখন তাদের জানা ছিলো না তারা কেন জিজ্ঞাসা করলো না? কেননা অজ্ঞতার নিরাময় হলো জিজ্ঞাসা করা। তার জন্য তো এটাই যথেষ্ট ছিলো যে, সে তায়াম্মুম করবে অথবা জখমে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসেহ করবে ও পূর্ণ শরীর ধুয়ে নিবে।"[৮৩০]

আল্লামা ইবরাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

جنب على جميع جسده جراحة أو على أكثره أي أكثر جسده جراحة أو به جدري فإنه يتيمم .... وإن كان على أقله أي أقل بدنه أو أعضاء وضوئه جراحة وأكثره أي أكثر البدن أو أعضاء الوضوء صحيح ... فإنه يغسل الموضع الصحيح ويمسح على المجروح إلخ.

"নাপাক ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা অধিকাংশ শরীরে যদি ক্ষত বা জলবসন্ত হয়, তাহলে সে তায়াম্মুম করবে। আর শরীরে বা অযুর অঙ্গের অল্প জায়গা ক্ষত ও বেশি জায়গা ভাল হলে, ভাল স্থানটুকু ধুয়ে নিবে এবং ক্ষতস্থানে মাসেহ করবে।"[৮৩১]

বর্তমানে ভাঙ্গা হাড় জোড়া দেয়ার জন্য প্লাস্টার করা হয়। এর পবিত্রতার বিধানও ব্যান্ডেজের মতই। মুফতী রশীদ আহমাদ লুধিয়ানভী রাহ. বলেন-

پلستر جبیرہ کے حکم میں ہے۔

"প্লাস্টার ব্যান্ডেজের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।"[৮৩২]

ব্যান্ডেজের উপর মাসেহের পদ্ধতি

মাসআলা: ব্যান্ডেজ ও পট্টি ইত্যাদির ক্ষেত্রে উত্তম হলো সম্পূর্ণ ব্যান্ডেজ ও পট্টির উপর মাসেহ করা। তবে অর্ধেকের বেশি অংশের উপর মাসেহ করলেও অযু হয়ে যাবে। কিন্তু সমান অর্ধেক বা অর্ধেকের চেয়ে কম অংশের উপর মাসেহ করলে অযু হবে না। আল্লামা ইবরাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

إن مسح على أكثرها أجزأه وإن مسح على النصف أو أقل لا يجوز.

"ব্যান্ডেজের অধিকাংশ স্থানের উপর মাসেহ করা যথেষ্ট হবে। (পুরো ব্যান্ডেজ মাসেহ করা আবশ্যক নয়) তবে অর্ধেক বা তার থেকে কম ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ করলে, মাসেহ সহীহ হবে না।"[৮৩৩]

---

[৮৩০] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৩৩৬

[৮৩১] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ৫৭, দারুল কিতাব দেওবন্দ; দ্রষ্টব্য, শরহু মুখতাসারিত তাহাবী

[৮৩২] আহসানুল ফাতাওয়া: ২/৬৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৩৩] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ১০২, দারুল কিতাব দেওবন্দ

মাসআলা: যদি কোন ব্যক্তি অপবিত্র বা অযু ছাড়া অবস্থায় ব্যান্ডেজ বা পট্টি বাঁধে, তাহলে তার জন্য ঐ ব্যান্ডেজ বা পট্টির উপর মাসেহ করা জায়েয। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

(ويجوز) أي يصح مسحها (ولو شدت بلا وضوء) وغسلٍ.

"অপবিত্র অবস্থায় ব্যান্ডেজ পরিধান করলেও তার উপর মাসেহ করা জায়েয।"[৮৩৪]

মাসেহ কখন ভঙ্গ হবে?

মাসআলা: যদি জখম ভালো হওয়ার পূর্বেই হঠাৎ ব্যান্ডেজ বা পট্টি খুলে যায়, তাহলে পূর্বের মাসেহ নষ্ট হবে না। বরং মাসেহ বাকি থাকবে। সে পুনরায় পট্টি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে নিবে। আর যদি জখম ভালো হওয়ার পর খোলে এবং পট্টি বা ব্যান্ডেজ বাঁধার প্রয়োজন না হয়, তাহলে মাসেহ ভেঙ্গে যাবে। তবে অযু থাকলে পুনরায় অযু না করে শুধু ঐ স্থানটি ধুয়ে নামায পড়তে পারবে।

إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا يلزمه الغسل ولا يبطل المسح، وإن سقطت عن برء بطل المسح ويجب غسل ذلك الموضع خاصة.

"ক্ষতস্থান ভাল হওয়ার পূর্বেই যদি পট্টি খুলে যায় তাহলে (পট্টির নিচে) ধোয়া আবশ্যক নয় এবং এতে মাসেহও বাতিল হবে না। আর যদি ক্ষতস্থান পরিপূর্ণ ভাল হওয়ার কারণে পট্টি খুলে যায়, তাহলে মাসেহ বাতিল হওয়ায় বিশেষভাবে ঐ স্থানটি ধুয়ে নেয়া ওয়াজিব।"[৮৩৫]

মাসআলা: কোন ব্যক্তি ক্ষতস্থানে একাধিক পট্টি বা ব্যান্ডেজ বেঁধে উপরের পট্টি বা ব্যান্ডেজে মাসেহ করে নামায ইত্যাদি আদায় করল, হঠাৎ তার উপরের ব্যান্ডেজটি খুলে গেলো বা প্রয়োজন না থাকার কারণে খুলে ফেলল। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তির পূর্বের মাসেহ অবশিষ্ট থাকবে। তবে পুনরায় মাসেহ করা উত্তম। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ولو بدلها بأخرى أو سقطت العليا لم يجب إعادة المسح بل يندب.

"আর বাঁধাইকৃত ব্যান্ডেজ পরিবর্তন করা হলে বা উপরের পট্টি পড়ে গেলে (শুধু নিচেরটি বাঁধা থাকলে) পুনরায় মাসেহ করা ওয়াজিব নয় বরং মুস্তাহাব।"[৮৩৬]

কর্তিত অঙ্গের পবিত্রতা

কখনো রোগাক্রান্ত হাত-পা অপারেশন করে কেটে ফেলার প্রয়োজন হয়। এমতাবস্থায় রোগীর অযু গোসলের বিধান কী হবে সে বিষয়ে কিছু আলোচনা তুলে ধরা হলো।

---

[৮৩৪] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৪৭০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৮৩৫] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৯, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

[৮৩৬] আদ্দুররুল মুখতার: ১/৪৭০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

মাসআলা: যদি হাতের কনুইসহ বা পায়ের টাখনু গিরাসহ অপারেশন করে কেটে ফেলা হয়, তখন অযুতে ধোয়ার হুকুম মাফ হয়ে যাবে। তবে উক্ত অঙ্গের কিছু অংশ বাকি থাকলে তা ধোয়া ওয়াজিব।

ولو قطعت يده أو رجله فلم يبق من المرفق والكعب شيء، سقط الغسل، ولو بقي وجب.

"যদি কারো হাত-পা কনুই বা টাখনুসহ কেটে ফেলা হয়, তাহলে হাত-পা ধোয়ার হুকুম মাফ হয়ে যাবে। আর কনুই ও টাখনুর কিছু অংশ বাকি থাকলে তা ধুতে হবে।"[৮৩৭]

সংযোজিত অঙ্গের অযু গোসলের বিধান

কৃত্রিম হাত-পা যদি এমনভাবে সংযোজন করা হয়, যার ফলে তা শরীরের অংশে পরিণত হয়ে যায় এবং অপারেশন ইত্যাদি ছাড়া সহজে বিচ্ছিন্ন করা না যায়, তাহলে স্বাভাবিক হাত-পায়ের মতো অযু গোসলের সময় তা ধোয়া জরুরী। আর যদি এমন না হয়; বরং সহজেই খুলে রাখা যায়, তাহলে অযু গোসলের সময় তা খুলে মূল অঙ্গ ধুতে হবে।

ويجب غسل ما كان مركبا من أعضاء الوضوء من الإصبع الزائدة والكف الزائدة، وما خلق على العضو غسل ما كان يحاذي محل الفرض، ولا يلزم غسل ما فوقه.

"জন্মগতভাবে সৃষ্ট অযুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে যুক্ত অতিরিক্ত আঙ্গুল ও অতিরিক্ত হাতের কব্জি থাকলে তা ধোয়া আবশ্যক। তবে অতিরিক্ত সৃষ্ট অঙ্গ অযুর অঙ্গের বাইরে হলে যতটুকু অযুর অঙ্গের বরাবর হবে ততোটুকু ধোয়া জরুরী; উপরের অংশ ধোয়া আবশ্যক নয়।"[৮৩৮]

চোখ অপারেশনের পর অযু গোসলের হুকুম

মাসআলা: চোখ অপারেশনের পর যদি অভিজ্ঞ কোন ডাক্তার চোখে পানি লাগাতে নিষেধ করেন, তাহলে সুস্থ হওয়া পর্যন্ত অযুর সময় চোখ মাসেহ করে যথানিয়মে অযু করতে হবে। অর্থাৎ চোখ ছাড়া চেহারার বাকি অংশ এবং হাত-পা টাখনুসহ ধুয়ে নিবে ও মাথা মাসেহ করবে। গোসলের ক্ষেত্রে শরীরের যে অংশে পানি পৌঁছালে চোখে পানি লাগার আশঙ্কা থাকে সে অংশও মাসেহ করবে। আর বাকি অংশে পানি ঢেলে গোসল সম্পন্ন করবে। আল্লামা ইবরাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

فتحققت الضرورة إلى جواز المسح على الزائد على الجراحة أيضا إذا كان يضره حلها لغسل غير موضع الجراحة، وإن كان لا يضره ذلك مسح على ما فوق الجراحة وغسل ما حولها.

"প্রয়োজনে জখমের স্থানের সাথে এ পরিমাণ ভাল স্থানও মাসেহ করবে যা ধোয়া জখমের জন্য ক্ষতিকর। তবে ভাল স্থান ধোয়া ক্ষতিকর না হলে শুধু জখমের উপর মাসেহ

---

[৮৩৭] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৫৪, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৮৩৮] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ১/২০০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; জাদীদ ফিক্হী মাসাইল: ১/৮৮

করবে।"[৮৩৯]

উল্লেখ্য, যদি ভেজা হাতে চোখ মাসেহ করা না যায়, তাহলে চোখের উপর কোন কাপড় রেখে তার উপর মাসেহ করবে। এভাবেও যদি মাসেহ করা সম্ভব না হয়, তাহলে চোখ মাসেহ ছাড়াই অযু/গোসল করে নামায পড়বে। আল্লামা ইব্রাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

وإن كان يضره المسح على نفس الجراحة يشدها بعصابة ويمسح فوق العصابة.

"জখমে মাসেহ করা ক্ষতিকর হলে ব্যান্ডেজ বেঁধে তার উপর মাসেহ করবে।"[৮৪০]

আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

فاعلم أنه لا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبيرة يضره أنه يسقط عنه المسح.

"ব্যান্ডেজের উপর মাসেহ ক্ষতিকর হলে মাসেহের হুকুমও রহিত হয়ে যাবে।"[৮৪১]

মাসআলা: যদি চোখের ভেতরে কোন ব্রণ বা গোটা গলে যায় বা অপারেশন করে গলিয়ে দেয়া হয়, ফলে এর পানি চোখের ভেতর ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু চোখের বাইরে বের হলো না, তাহলে অযু নষ্ট হবে না। আর যদি সে পানি গড়িয়ে চোখের বাইরে পড়ে, তাহলে ভাংবে।

حتى لو قشرت نفطة داخل العين، وسال ما فيها، ولم يخرج منها لم ينقض الخ.

"চোখের ভেতরে সৃষ্ট গোটা ফেটে গিয়ে তার পানি বের হয়ে চোখের সীমা অতিক্রম না করলে অযু ভঙ্গ হবে না।"[৮৪২]

মাসআলা: চোখে ছানী পড়া জখমের মতো। চোখে ছানী পড়ার কারণে যদি চোখ থেকে কোন কিছু গড়িয়ে পড়ে, তাহলে অযু নষ্ট হবে।

والغرب في العين بمنزلة الجرح، فما يسيل منه ينقض الوضوء.

"চোখের ছানি জখমের ন্যায়। তাই সেখান থেকে পানি গড়িয়ে চোখের বাইরে পড়লে তা দ্বারা অযু ভেঙ্গে যাবে।"[৮৪৩]

মাসআলা: স্বাভাবিক অবস্থায় চোখ থেকে যে পানি বের হয়, তা সম্পূর্ণ পাক। এতে অযু নষ্ট হবে না। তেমনি সাধারণ অসুস্থতার কারণে চোখ থেকে যে স্বচ্ছ পানি বের হয়, তাও পাক। তবে চোখজনিত রোগের কারণে চোখ থেকে যদি ঘোলা পানি বের হয় এবং কোন অভিজ্ঞ ডাক্তার তাকে পুজ বলেন বা রোগীর প্রবল ধারণা মতে তা পুঁজ, তাহলে তা নাপাক এবং বের হওয়ার কারণে অযু নষ্ট হয়ে যাবে।

---

[৮৩৯] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ১০৩, দারুল কিতাব দেওবন্দ
[৮৪০] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ৫৮, দারুল কিতাব দেওবন্দ
[৮৪১] আল বাহরুর রায়েক: ১/৩২১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৮৪২] গুনইয়াতুল মুতামাল্লী: ১১৫, দারুল কিতাব দেওবন্দ
[৮৪৩] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৬২ দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন
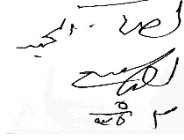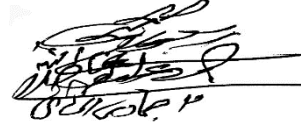
في عينه رمد يسيل دمها يؤمر بالوضوء لكل وقت لاحتمال كونه صديدا. إلخ

"প্রদাহের কারণে চোখ থেকে পানি বের হলে, প্রত্যেক নামাযের ওয়াক্তে অযু করতে হবে। কেননা, এ পানি পুঁজ হওয়ার সম্ভাবনা রাখে।"[৮৪৪]

সত্যায়নে
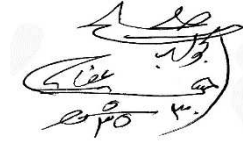
শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ
আহমদ শফি হাফিযাহুমুল্লাহ
মুহতামিম ও শাইখুল হাদীস, দারুল উলূম হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
০২ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

[৮৪৪] ফাতহুল কাদীর: ১/১৮৭, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন

টিভি দেখার শর'য়ী বিধান

মাওলানা শিবলী সাদেক ঢাকা

যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে আবিষ্কৃত হচ্ছে নিত্য প্রয়োজনীয় হাজারো যন্ত্রপাতি। যোগাযোগ এবং প্রচার মাধ্যমও দিন দিন উন্নত হচ্ছে। এসব প্রচার মাধ্যমগুলোর অন্যতম হলো টিভি, যার প্রচলন ঘটেছে ব্যাপকভাবে। মানুষ শুধু টিভির সাময়িক উপকারিতা দেখে শর'য়ী দিক বিবেচনা না করে নির্দ্বিধায় এর ব্যাপক ব্যবহার শুরু করেছে। তাই এখানে টিভির লাভ ক্ষতির দিক তুলে ধরে শর'য়ী সমাধান পেশ করা হলো।

কয়েকটি শর'য়ী মূলনীতি

টিভি দেখার শর'য়ী বিধান কী? এ বিষয়ে আলোচনার পূর্বে কতিপয় শর'য়ী মূলনীতির আলোচনা অতীব জরুরী। যে মূলনীতিসমূহের আলোকে অধুনা এ যন্ত্রে যে কোন প্রোগ্রাম প্রচার ও দেখার বিধান নির্ণয় করা যাবে। শর'য়ী মূলনীতিগুলো হচ্ছে-

১ম মূলনীতি: শরী'আতে যে কোন বস্তুর হুকুম নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কার্যত তার লাভ-ক্ষতির তুলনামূলক বিচারটিও সবিশেষ লক্ষণীয় হয়ে থাকে। যেমন, কোন একটি কাজে কিছু উপকার হয়, আবার ক্ষতিও হয়। এক্ষেত্রে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি হলো, 'বৃহত্তম ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ক্ষুদ্রতম লাভ পরিত্যাগ করা।'

শর'য়ী এ মূলনীতিটি কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত থেকে সুস্পষ্ট-

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ

"তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, উভয়ের মধ্যে আছে মহাপাপ এবং মানুষের উপকারও; তবে এগুলোর পাপ উপকার অপেক্ষা অনেক বড়।"[৮৪৫]

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফতী শফী রাহ. বলেন, 'কুরআনুল কারীমের এ আয়াতটিতে মদ ও জুয়ার কিছু উপকারের কথা স্বীকার করা হলেও বস্তুত তা থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। কারণ, মদ ও জুয়ায় যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে কিছু উপকারিতা পরিলক্ষিত হয়। তবে দু'টির মাধ্যমেই অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত হয়, যা এর উপকারিতার তুলনায় অনেক বেশি ক্ষতিকর। অতএব, উক্ত আয়াতে কারীমা থেকে একটি মূলনীতি বা উসূল বোঝা গেল, তা হলো কোন বস্তু বা কাজে সাময়িক উপকার বা লাভ থাকলে শরী'আত একে হারাম করতে পারেনা, এমন নয়। কেননা, যে খাদ্য বা ঔষধে উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি, কোন অবস্থাতেই তা প্রকৃত উপকারী বলে স্বীকার করা যায় না। অন্যথায় পৃথিবীর সবচেয়ে খারাপ বস্তুতেও কিছু না কিছু উপকার থাকা মোটেও বিচিত্র নয়। প্রাণ সংহারক বিষ, সাপ-বিচ্ছু বা হিংস্র প্রাণীর মধ্যেও কিছু না কিছু উপকারিতার দিক অবশ্যই খুঁজে পাওয়া যায়।

---

[৮৪৫] সূরা বাকারা: ২১৯

কিন্তু সামগ্রিকভাবে অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে যেসব বস্তুর উপকারের তুলনায় ক্ষতিই বেশি, শরী'আত সেগুলোকেও হারাম সাব্যস্ত করেছে। চুরি-ডাকাতি, যিনা-ব্যাভিচার, প্রতারণা ইত্যাদি এমন কী আছে, যাতে কোন উপকার নেই? কিছু না কিছু উপকার না থাকলে কোন মানুষই এর ধারে কাছে যেত না। তবে যেহেতু এসবের উপকারের চেয়ে ক্ষতিই বেশি এজন্য কোন বুদ্ধিমান লোক এগুলোকে উপকারী বা বৈধ বলবে না। ইসলামী শরী'আহ এই মূলনীতির ভিত্তিতেই মদ-জুয়াকে হারাম করেছে। এভাবে অন্যান্য জিনিস যেগুলোতে সাময়িক উপকার হয় বটে, কিন্তু তাতে ক্ষতিও রয়েছে সেগুলোকেও হারাম করেছে। যার কিছু উপমা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।'[৮৪৬]

২য় মূলনীতি: ভূমিকায় উল্লিখিত সূরা আল বাকারার আয়াতে কারীমা থেকে একথা প্রতীয়মান হয়, যা একটি ফিকহী মূলনীতিও বটে। তা হলো, 'উপকার হাসিল করার তুলনায় ক্ষতিরোধ করাকে অগ্রাধিকার দেয়া বিধেয়।'

৩য় মূলনীতি: শরী'আতে অনেক বিষয় এমন আছে যা মৌলিকভাবে মুবাহ হলেও কোন না কোনভাবে গুনাহর মাধ্যম হওয়ায় পর্যায়ক্রমে তা নিষিদ্ধ করা হয়ে থাকে।

ইমাম কারাফী রাহ. বলেন-

كما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة.

"যেভাবে হারামের মাধ্যম হারাম তেমনি ওয়াজিবের মাধ্যমও ওয়াজিব।"[৮৪৭]

মূল বিষয় সম্পর্কে পর্যালোচনা

টেলিভিশন বিংশ শতাব্দীতে (১৯২৫ খ্রি.) আবিস্কৃত একটি যন্ত্র বিশেষ। প্রযুক্তির উন্নতির ফলে এতে অনেক আধুনিকায়ন সাধিত হয়েছে। পূর্বোল্লিখিত মূলনীতি অনুযায়ী টেলিভিশনের পরিচয় ও তার লাভ-ক্ষতির দিক নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ আবশ্যকীয়, যাতে তার সঠিক হুকুম নির্ণয় করা যায়।

প্রথমেই একটা প্রশ্ন জাগে, টেলিভিশনের অবস্থান কী? তাতে প্রদর্শিত দৃশ্যগুলো ছবি না প্রতিচ্ছবি?

এ প্রশ্নের জবাবের জন্য প্রথমে টেলিভিশনের পরিচয় জানা দরকার। টেলিভিশন হচ্ছে, বিদ্যুৎ তরঙ্গের মাধ্যমে প্রেরিত ছবি ও ধ্বনির গ্রহণকারী যন্ত্রবিশেষ।[৮৪৮] পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, টেলিভিশনে প্রদর্শিত চিত্রগুলো ছবি। এজন্য উলামায়ে কেরামের বড় একটি দলের মত হলো, টেলিভিশন ছবি প্রদর্শিত হওয়ার কারণেও নিষেধ। কারণ এতে ছবি প্রদর্শিত হয়।

টিভির মাধ্যমে যে ক্ষতিগুলো হয় তার অন্যতম হলো 'গুনাহ্' যা রূহানী বা আধ্যাত্মিক ক্ষতি। তাও আবার দু-একটা নয় বরং অগণিত। নিম্নে তা থেকে কিছু তুলে ধরা হলো।

---

[৮৪৬] মা'আরেফুল কুরআন: ১/৫৩৬

[৮৪৭] আল-ফুরূক: ২/৩৩

[৮৪৮] টেলিভিশন (Television) ব্যবহারিক বাংলা অভিধান: ৫০৫, বাংলা একাডেমী ঢাকা, বাংলাদেশ

শর‘য়ী ও আধ্যাত্মিক ক্ষতি

এক. টিভিতে আসলের পরিবর্তে সাধারণত ফিল্ম দেখানো হয়, যা ছবি হওয়ার কারণে হারাম। আর ছবি তোলা, সংরক্ষণ করা ও দেখা সম্পর্কে হাদীসে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। কারণ, ছবি হচ্ছে আকৃতি দান করা আর তা কেবল আল্লাহ তা‘আলার গুণ। এতে অন্য কেউ শরীক নেই। আল্লাহ তা‘আলা যে একমাত্র আকৃতি দানকারী তা কুরআনে ইরশাদ হয়েছে।

هُوَ ٱلَّذِى يُصَوِّرُكُمْ فِى ٱلْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَآءُ

"তিনিই মাতৃগর্ভে যেভাবে ইচ্ছা তোমাদের আকৃতি দান করেন।"[৮৪৯]

এ আয়াতে আকৃতি বা সূরত দান করা কেবল আল্লাহর গুণ সাব্যস্ত করা হয়েছে, যাতে অন্য কেউ শরীক নেই। যেমন কোন মানুষকে خَالِقٌ অর্থাৎ সৃষ্টিকর্তা বলা যায় না, তেমনই কাউকে مُصَوِّرٌ অর্থাৎ আকৃতিদাতা বলা যায় না।

এবার ছবির নিষিদ্ধতার ব্যাপারে যে সমস্ত হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা থেকে নিম্নে কিছু হাদীস পেশ করা হলো।

১. হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, যারা কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করে পরকালে তাদেরকে আযাব দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা (দুনিয়াতে) যেসব আকৃতি বানিয়েছ ঐ সবের মধ্যে প্রাণদান করো।"[৮৫০]

২. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত-

سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন ছবি তৈরিকারীদেরকে সর্বাধিক কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।"[৮৫১]

৩. হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

حشوت للنبي ﷺ وسادة فيها تماثيل كأنها نمرقة فجاء فقام بين البابين، وجعل يتغير وجهه فقلت: ما لنا يا رسول الله! قال: ما بال هذه الوسادة؟ قلت : وسادة جعلتها لك لتضجع عليها. قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وأن من صنع يعذب يوم القيامة فيقول: أحيوا ما خلقتم.

"আমি রাসূল ﷺ এর জন্য ছবিযুক্ত কাপড় দিয়ে একটি বালিশ বানিয়েছিলাম, যা দেখতে

---

[৮৪৯] সূরা আলে-ইমরান: ৬

[৮৫০] সহীহ বুখারী: কিতাবুল লিবাস, (باب عذاب المصورين); সহীহ মুসলিম : ২/২০১

[৮৫১] সহীহ বুখারী: কিতাবুল লিবাস, (باب عذاب المصورين) ; সহীহ মুসলিম : ২/২০১

একটি তাকিয়ার মত মনে হতো। রাসূল ﷺ ঘরের দরজায় এসে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন ক্রোধে তাঁর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগলো। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কী ভুল করেছি? উত্তরে তিনি বললেন, কেন এই তাকিয়াটি বানানো হয়েছে? আমি বললাম, আপনার জন্য এটা তৈরি করেছি যেন এর উপর টেক লাগিয়ে আপনি আরাম করতে পারেন। তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি কি জানো না, ফেরেশতারা ঐ ঘরে প্রবেশ করে না, যে ঘরে ছবি থাকে? আর যারা ছবি বানাবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিবেন, তোমরা যেগুলো বানিয়েছ সেগুলোতে প্রাণ দাও।"[৮৫২]

দুই. টিভির আরো একটি ক্ষতির দিক হলো, এতে প্রোগ্রামকারী সাধারণত মহিলা হয়ে থাকে। আর পরনারীকে দেখা যেরূপ হারাম তদ্রূপ তার ছবি ও প্রতিচ্ছবি দেখাও হারাম। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের উপস্থাপনা ছাড়াও অনেক মহিলার আগমন ঘটে টিভির পর্দায়, যাদেরকে পুরুষরা দেখতে থাকে। অনুরূপভাবে পুরুষদেরকেও মহিলারা দেখতে থাকে। অথচ গাইরে মাহরাম নারী-পুরুষ একান্ত প্রয়োজন ছাড়া একে অপরকে দেখা সম্পূর্ণ নিষেধ। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। পবিত্র কুরআনে পুরুষদেরকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন-

قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا۟ مِنْ أَبْصَـٰرِهِمْ وَيَحْفَظُوا۟ فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌۢ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾

"মুমিন পুরুষদেরকে বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে; এটাই তাদের জন্য উত্তম। তারা যা করে নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবগত।"[৮৫৩]

অনুরূপভাবে নারীদের সম্বোধন করে ইরশাদ করেন-

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَـٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَـٰرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

"আর মুমিন নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থানকে হিফাযত করে।"[৮৫৪]

তিন. টিভির আরো একটি ক্ষতির দিক হলো, এতে যেসব খেলাধুলা প্রদর্শিত হয়, যেমন কুস্তি, সাঁতার, ফুটবল ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারীরা সতর খোলা অবস্থায় থাকে, অথচ কারো সামনে সতর খোলা বা অন্য কারো সতর দেখা হারাম।

হাদীস শরীফে কারো সতর দেখতে কিংবা নিজের সতর খুলতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু সাঈদ রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ : لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, এক পুরুষ অন্য পুরুষের সতর দেখবে না এবং এক

---

[৮৫২] সহীহ বুখারী: ১/৪৫৮
[৮৫৩] সূরা নূর: ৩০
[৮৫৪] সূরা নুর: ৩১

মহিলা অন্য মহিলার সতর দেখবে না।”[৮৫৫]

হযরত আলী রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ قال له: يا علي! لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت.

“রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, হে আলী! তুমি তোমার সতর (কারো সামনে) খুলবে না এবং কোন জীবিত বা মৃতের সতরের দিকে তাকাবে না।”[৮৫৬]

চার. টিভির আরো একটি ক্ষতি হচ্ছে, এতে গান-বাজনা সহ অনেক অশ্লীল নির্লজ্জ প্রোগ্রাম প্রদর্শিত হয়ে থাকে যা দেখা ও শোনা হারাম। কুরআন ও হাদীসে গান-বাজনা শোনা এবং বাদ্যযন্ত্র কেনার ব্যাপারে কঠিন শাস্তির কথা এসেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشۡتَرِي لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيۡرِ عِلۡمٖ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًاۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ عَذَابٞ مُّهِينٞ ٦

“মানুষের মধ্যে কেউ অজ্ঞতাবশত আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করার জন্য অবান্তর কথাবার্তা সংগ্রহ করে এবং আল্লাহ প্রদর্শিত পথ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।”[৮৫৭]

لَهۡوَ ٱلۡحَدِيثِ বাক্যটির ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ ইহা দ্বারা গান-বাজনা উদ্দেশ্য।[৮৫৮] হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন, এই আয়াত নাযিল হয়েছে গান ও বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপারে। হাদীসে পাকে গান-বাজনার ব্যাপারে বলা হয়েছে-

الغناء ينبت النفاق في القلب.[৮৫৯]

“গান বাজনা অন্তরে নেফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি করে।”[৮৬০]

হযরত ফুযাইল ইবনে ইয়ায রাহ. বলেন-

الغناء رقية الزنا.

“গান-বাজনা ব্যভিচারের মন্ত্র।”[৮৬১]

এগুলো হলো এমন ক্ষতি যা কেবল টিভি দর্শকের নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এবার এমন

---

[৮৫৫] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ৩৩৮, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

[৮৫৬] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১২৪৯০, হাদীসটি সহীহ; সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৩১৪২, দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন

[৮৫৭] সূরা লুকমান: ৬

[৮৫৮] তাফসীরে ইবনে কাসীর: সূরা লুকমান: ৬

[৮৫৯] رواه أبو داود في «سننه» (باب كراهية الغنا والزمر) وسكت عنه فهو عنده صالح.

[৮৬০] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৪৯২৯

[৮৬১] ইহয়াউ উলূমিদ্ দ্বীন: ২/২৪৭, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন (كتاب آداب السماع والوجد)

ক্ষতির দিক আলোচনা করা হবে যা শুধু দর্শকের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পাঁচ. অনেক সময় এই টিভি-ভিসিয়ার অন্যদের ক্ষতির কারণ হয়। দেখা যায়, যাদের ঘরে টিভি থাকে তারা গান-বাজনা এত জোরে চালু করে যে, আশপাশের লোকজনের কান স্তব্ধ হয়ে যায়। তাদের কাজ-কারবারে ব্যাঘাত ঘটে। ঘুম হারাম হয়ে যায়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, মসজিদের সাথে মিলিত বাড়ি কিংবা দোকানে এত জোরে গান-বাজনা ও টিভি চালু থাকে, যার কারণে মুসল্লিদের নামায পড়তে কষ্ট হয়। অথচ হাদীস শরীফে প্রতিবেশীকে (যদিও সে কাফের হোক না কেন) কষ্ট দেয়ার অশুভ পরিণতির কথা বারংবার উল্লেখ করা হয়েছে। আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন-

والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! والله لا يؤمن! قالوا: ومن ذاك يا رسول الله! قال: جار لا يأمن جاره بوائقه، قيل: وما بوائقه؟ قال: شره.[৮৬২]

"আল্লাহর শপথ, সে মুমিন হতে পারে না! আল্লাহর শপথ, সে মুমিন হতে পারে না! আল্লাহর শপথ, সে মুমিন হতে পারে না! সাহাবাগণ আরজ করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে কে? নবীজী ইরশাদ করলেন, সে ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হলো, তার অনিষ্ট কী? উত্তরে বললেন, তার ক্ষতি।"[৮৬৩]

আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত-

قال رسول الله ﷺ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়।"[৮৬৪]

টিভির এসব মন্দ দিকগুলোর কারণে সমাজে খুন, ধর্ষণ, চুরি-ডাকাতিসহ অনেক অপরাধ ছড়িয়ে পড়ছে। অতএব টিভি শুধু বিনোদন কিংবা আনন্দ দানের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা এখন সমাজে প্রতিনিয়ত সংঘটিত আলোচিত অনেক বড় বড় অপরাধের 'ট্রেনিং সেন্টারে' পরিণত হয়েছে। অনেক সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীকে সাজা ভোগের পর জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, এই অপরাধ প্রবণতা তার কোথা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল? জবাবে তারা বলেছে, টিভির অমুক ফিল্ম দেখে। নিম্নোক্ত ঘটনাটি এর জলন্ত প্রমাণ।

একটি বাস্তব ঘটনা: দক্ষিণ আফ্রিকার 'মজলিসে ওলামা'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'ইসলাম এন্ড টেলিভিশন' বইয়ে লেখা হয়েছে। একবার জনৈক মহিলার ইজ্জত হরণের দৃশ্য টিভিতে প্রদর্শিত হয়। পরবর্তী সময়ে বাস্তবেই এমন ঘটনা ঘটে। এক লম্পট হুবহু টিভিতে দেখা স্টাইলে এক মহিলার ঘরে ঢুকে তার ইজ্জত হরণ করে এবং অর্থকড়ি নিয়ে পালিয়ে যায়। অনুসন্ধানের জন্য সে ঘরে পুলিশের টিম গেলে পুলিশ অফিসার ঘটনা শুনে তৎক্ষণাৎ বলে

[৮৬২] أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» (٥١٨٥) بإسناده صحيح.

[৮৬৩] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৮৪৩২

[৮৬৪] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব: ২/৮৮৯

উঠে, 'অপরাধী অবশ্যই টিভির অমুক ফিল্ম দেখে এ ঘটনা ঘটিয়েছে, যাতে এই দৃশ্য প্রদর্শিত হয়েছিল।'[৮৬৫]

ছয়. টিভির ক্ষতিসমূহের অন্যতম হচ্ছে, এর মাধ্যমে লজ্জা-শরমের দাফন হচ্ছে। এমনকি আপন ভাই-বোন, বাবা-মেয়ের মধ্যে অবৈধ সম্পর্কের কথা পর্যন্ত আজকাল পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হচ্ছে। অথচ লজ্জা শরমকে মনুষ্যত্বের মূল বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত রাসূল ﷺ বলেন-

إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.

"যখন তোমার লজ্জা-শরম নেই, তখন তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।"[৮৬৬]

অর্থাৎ যখন মানুষ থেকে লজ্জা শরম চলে যায় তখন সে পশুর মত যা ইচ্ছা তাই করতে থাকে। এ জন্য লজ্জা-শরম হলো বাগডোর যা মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে, যাতে সে মনুষ্যত্ব খুইয়ে পশুর স্তরে নেমে না আসে। হাদীস শরীফে লজ্জাকে ঈমানের অঙ্গ বলা হয়েছে। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন-

الحياء شعبة من الإيمان.

"লজ্জা-শরম ঈমানের অঙ্গ।"[৮৬৭]

টিভি দেখার আরো কিছু ক্ষতি

শারীরিক একটি ক্ষতির ব্যাপারে অভিজ্ঞ ডাক্তারগণ একমত যে, টিভি দেখা এমনকি টিভির নিকটে বসা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এটা তো ক্ষতির একদিক। এছাড়াও উঠতি বয়সের ছেলে-মেয়েদের সামনে টিভির মাধ্যমে অশ্লীল ও নগ্ন ছবি উপস্থাপন করে অপরিণত বয়সেই তাদের মাঝে নারী-পরুষের দৈহিক সম্পর্ক সম্বন্ধে উত্তেজনা ক্রমান্বয়ে বাড়িয়ে দিচ্ছে। যার অনিবার্য পরিণতি এই দাঁড়াচ্ছে যে, নিজের অজান্তেই এই নতুন প্রজন্ম প্রাপ্তবয়সে উপনীত হওয়ার পূর্বেই সাবালক হয়ে যাচ্ছে। অতঃপর পূর্ণ উত্তেজনায় দিশেহারা হয়ে এবং নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে প্রশান্তির জন্য অস্বাভাবিক ও অবৈধ পথ অবলম্বন করছে। পরিণতিতে তারা নিজেদেরকে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

মানুষের জীবনে মূল্যবান সম্পদ বা পুঁজি হচ্ছে সময়। এই সময় অনর্থক ব্যয় হচ্ছে। কারণ টিভির অধিকাংশ প্রোগ্রামই এমন, যাতে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন লাভ হয় না। আর অনর্থক কাজ-কর্ম যাতে কোন লাভ নেই তা করা নিষেধ। হাদীস শরীফে এসেছে, হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন-

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.

---

[৮৬৫] আহসানুল ফাতাওয়া: ৮/২৯৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৮৬৬] সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব: ২/৯০৪
[৮৬৭] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ঈমান: ১/৬

"দ্বীনের সৌন্দর্য হলো অনর্থক কাজ কর্ম পরিত্যাগ করা।"[৮৬৮]

এগুলো হলো টিভির মাধ্যমে ঘটে চলা ধর্মীয়, আধ্যাত্মিক, শারীরিক ও পার্থিব ক্ষতি। এত বড় বড় ক্ষতির দিক থাকার পরও শরী'আত একে বৈধতা দিবে? তা কোনভাবেই হতে পারে না। অনেক মুফতিয়ানে কেরাম এ বিষয়ে স্পষ্ট ফাত্ওয়া দিয়েছেন।

আল্লামা মুফতী তকী উসমানী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

أما التلفزيون والفديو، فلا شك في حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق.

"টেলিভিশন ও ভিডিও সম্পর্কে কথা হলো, এগুলোর ব্যবহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। কারণ এগুলোতে বিভিন্ন ধরনের অশালীন বিষয় প্রদর্শিত হয়। যেমন চরিত্রহীনতা, উম্মাদনা, সুসজ্জিতা-নগ্ন নারীর চিত্র প্রদর্শন। এছাড়া অন্যান্য শরী'আত বহির্ভূত কাজ।"[৮৬৯]

টিভিতে ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচার

ইসলামের প্রচার প্রসার প্রত্যেক মুমিনের দায়িত্ব। তবে মনে রাখতে হবে, ইসলাম যেমন দ্বীন প্রচার করার নির্দেশ দিয়েছে তেমনই এ বিষয়েও সতর্ক থাকতে বলেছে যে, প্রচারমাধ্যম যেন শরী'আত সমর্থিত হয়। ইসলাম প্রচার ভাল বলেই যে কোনভাবে তা প্রচার করার অনুমতি নেই। সুতরাং কোন প্রচার মাধ্যমে যদি শরী'আতের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কোন কিছু থাকে তাহলে ঐ মাধ্যম পরিহার করা কর্তব্য।

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে আবিষ্কার হয়েছে নানা ধরনের যোগাযোগ মাধ্যম। প্রথম যুগে তো শুধু মৌখিকভাবে বা চিঠির মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করার সুযোগ ছিলো। বর্তমানে আবিষ্কৃত হয়েছে আরো মাধ্যম যেমন প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেকট্রিক মিডিয়া। প্রতিটির নানাবিধ প্রকার ও ধরন রয়েছে। একজন মানুষের কাছে দ্রুত দ্বীন পৌঁছানোর জন্য টিভিই একমাত্র মাধ্যম নয়। ইদানিং তো ঘরে ঘরে নেট চালানো হয়। আর নেটের মাধ্যমে লিখিতভাবে ও অডিওর মাধ্যমে দ্বীন প্রচার করার বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে এবং এভাবে অনেকেই কাজ করে যাচ্ছে। জরিপ চালালে দেখা যাবে, যাদের ঘরে টিভি আছে তারাও নেট চালায়। তাই সর্বক্ষেত্রে দ্রুত দ্বীন প্রচারের জন্য টিভি একক মাধ্যম নয়।

টিভির আপত্তিকর দিকগুলো এড়িয়ে নেটের মাধ্যমে কাজ করা যায়। আর টিভির নানা প্রকার ক্ষতিকর দিক থাকা সত্ত্বেও ইসলামী প্রোগ্রাম ফলপ্রসূ হওয়ার তুলনায় অনেকের তা খারাপ প্রোগ্রাম দেখার বাহানা হওয়ার আশংকা থেকে যায়। তাই ওলামায়ে কেরাম টিভিতে অন্যান্য প্রোগ্রামের ন্যায় ইসলামী প্রোগ্রাম প্রচারের অনুমতি দেন না।

উল্লেখ্য যে, টিভি নিষেধ হওয়াটা এ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল নয় যে, তাতে প্রদর্শিত দৃশ্য ছবি হলে নিষেধ হবে আর প্রতিচ্ছবি হলে নিষেধ হবে না। বরং তা বর্তমানে অশ্লীলতাপূর্ণ

---

[৮৬৮] মুআত্তা মুহাম্মাদ: (باب فضل الحياء); তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ: ২/৫৮

[৮৬৯] তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ৪/১৬৪, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান

হওয়ার কারণে সর্বাবস্থায় নিষেধ, প্রর্দশিত বস্তু ছবি হোক কিংবা প্রতিচ্ছবি।

যদি প্রতিচ্ছবি ধরে নেয়া হয় তথাপি পরপুরুষ পরনারী একে অপরকে দেখার অনুমতি শরী'আত দেয়নি। সুতরাং এই প্রতিচ্ছবি ধ্বংসাত্মক, বিপদজনক ও হারাম হওয়ার বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

হ্যাঁ, যদি টিভি শরী'আত কর্তৃক সব আপত্তিকর দিক থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় ও শরী'আতের নির্দেশনা মাফিক পরিচালনা করা হয় এবং প্রোগ্রামগুলোও সরাসরি প্রচার করা হয়, তাহলে টিভির মাধ্যমে ইসলাম প্রচার করার অবকাশ রয়েছে। (তবে বর্তমানে এমন পরিস্থিতি তৈরী করা প্রায় অসম্ভব।)

যেহেতু বর্তমানে শরী'আত নিষিদ্ধ কার্যাদি থেকে মুক্ত করা বাহ্যত সম্ভব না, আর প্রিন্ট মিডিয়ার সাথে সাথে ইলেকট্রিক মিডিয়ার মাধ্যমে বৈধ পন্থায় দ্বীন প্রচারের বিপুল সুযোগ রয়েছে। তাই ইসলাম প্রচারের নামে মানুষকে টিভিমুখী না করাই আলেম, দ্বীনদার ও সর্ব শ্রেণীর দায়িত্ব।
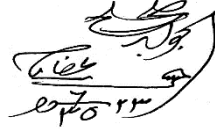
সর্বশেষ কথা

বর্তমান যামানায় মুসলমানদের ধর্মীয় অবক্ষয় দিন দিন বেড়েই চলছে। এমন পরিস্থিতিতে টেলিভিশন (যা ব্যাপকভাবে আনন্দ-বিনোদন ও খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত হয়েছে, নিছক জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে সীমাবদ্ধ থাকেনি) দেখার কোন সুযোগ নেই। বরং গুনাহ ও হারাম। তাই ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকার জন্য এবং ঈমান ও আমলকে তরতাজা ও ত্রুটিমুক্ত রাখার জন্য টিভি ত্যাগ করা আবশ্যক।

সত্যায়নে

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
১৪ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

পোশাক সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি

মাওলানা আব্দুস সাত্তার সিলেটী

পোশাক মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্যতম মাধ্যম। তাই মানুষের জীবনে পোশাকের গুরুত্ব অপরিসীম। এর মাধ্যমে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। ইসলাম পোশাক-পরিচ্ছদের বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে মানুষের ইখতিয়ারে ছেড়ে দেয়নি, সে যা ইচ্ছা তাই পরবে। আবার এত সংকীর্ণও করে রাখেনি যে, নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকই পরতে হবে। হ্যাঁ, ইসলাম স্বভাবজাত ধর্ম হিসেবে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রেই এমন বিধান আরোপ করেছে, যা মানব স্বভাবের সম্পূর্ণ অনুকূলে। তাই মানুষের স্বাভাবিক রুচি প্রকৃতিকে পূর্ণ সমর্থন করত শরী'আত নির্দিষ্ট কোন পোশাক নির্ধারণ করে দেয়নি; এবং কোন নির্দিষ্ট রং বা ধরন আবশ্যক করেনি। বরং অবস্থা ও ঋতুর পার্থক্য এবং মানুষের মেজায ও অভ্যাসের দিকে লক্ষ্য রেখে ইসলামী শরী'আহ কিছু মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। উক্ত মূলনীতির আলোকে পোশাক সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে তুলে ধরা হলো।

রাসূল ﷺ এর পোশাকের বিবরণ

এ প্রসঙ্গে মুফ্তী শফী রাহ. বলেছেন, রাসূল ﷺ এর পোশাক সবসময় এক রকম ছিল না। বিভিন্ন পরিস্থিতি, শীত-গ্রীষ্ম, সফর-হযর ও স্বভাবগত চাহিদার কারণে বিভিন্ন রং ও বিভিন্ন ধরনের পোশাক পরেছেন। যার বিশদ বিবরণ শামায়েলের কিতাবাদিতে বিশেষভাবে 'যাদুল মা'আদ' কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। তবে তাঁর পোশাকের দিকে সামগ্রিকভাবে দৃষ্টিপাত করলে তাতে তিনটি গুণ খুঁজে পাওয়া যায়। (যা প্রতিটি মুমিন মুসলমানের পোশাকে থাকা চাই।) গুণ তিনটি হলো-

১. পোশাক সাদাসিধে হওয়া। বেশি জাঁকজমকপূর্ণ না হওয়া।

২. রেশমি ইত্যাদি না হওয়া, যা পুরুষের জন্য হারাম।

৩. পোশাকের ধরন এমন হওয়া, যা মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র বজায় রাখে এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের সাদৃশ্য না হয়।

এ বিষয়গুলো রাসূল ﷺ এর পোশাকে সাধারণভাবে পাওয়া যেত। প্রয়োজনের সময় তিনি যে ধরনের পোশাক কাছে পেতেন, তাই পরিধান করতেন। চাই তা উন্নতমানের পোশাক হোক বা সাধারণ পোশাক হোক।[৮৭০]

শরী'আত কর্তৃক পোশাক সংক্রান্ত নীতিমালা

ইসলাম পোশাকের ক্ষেত্রে কতিপয় মূলনীতি নির্ধারণ করে দিয়েছে যেগুলোর অনুসরণ করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। বাকি শাখাগত বিষয়ে প্রত্যেক মুমিনের স্বাধীনতা রয়েছে নিজেদের রুচি ও যুগের চাহিদা অনুযায়ী যা খুশি পরতে পারবে।

---

[৮৭০] ইমদাদুল মুফ্তিয়ীন কামেল: ২/৯৭৬-৯৭৭, দারুল ইশাআত, করাচী, পাকিস্তান

১ম মূলনীতি: পোশাক অবশ্যই সতর ঢাকার উপযোগী হতে হবে।

প্রতিটি মানুষের উপর সতর ঢাকা ফরয। পোশাকের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সতর আবৃত করে রাখা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

يَٰبَنِيٓ ءَادَمَ قَدۡ أَنزَلۡنَا عَلَيۡكُمۡ لِبَاسٗا يُوَٰرِي سَوۡءَٰتِكُمۡ وَرِيشٗاۖ

"হে বনী আদম! আমি তোমাদের জন্য পোশাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের সতর ঢেকে রাখে এবং সৌন্দর্যেরও উপকরণ।"[৮৭১]

সুতরাং যদি কোনো পোশাক সতরকে আবৃত করে না রাখে বরং সতরের কোন অংশ খোলা থাকে তাহলে এমন পোশাক পরিধান করা শরী'আতের দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

সতর ঢাকার ফরয আদায়ের জন্য নিম্নের বিষয়গুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

ক. পোশাক পুরু হতে হবে। অতি মিহি বা পাতলা কাপড়ের না হতে হবে, যা শরীরের জন্য আবরণ হলেও পাতলা হওয়ার দরুন পোশাকের উপর দিয়ে শরীরের রং স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন-

عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أنها قالت: دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي ﷺ ، وعلى حفصة خمار رقيق ، فشقته عائشة ، وكستها خمارا كثيفا .

"হযরত আলকামা ইবনে আবি আলকামা তার মা থেকে বর্ণনা করেন, একবার হাফসা বিনতে আব্দুর রহমান তার ফুফু আয়েশা রাযি. এর নিকটে এলেন। তখন হাফসার পরনে একটি মিহি ওড়না ছিলো। আয়েশা রাযি. সেটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং একটি মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।"[৮৭২]

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ বলেন-

إن الرجل ليلبس وهو عار يعني الثياب الرقاق.[৮৭৩]

"মানুষ এমন পোশাক পরিধান করে যা তার জন্য লজ্জাজনক। অর্থাৎ পাতলা কাপড়।"[৮৭৪]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

قال رسول الله ﷺ : صنفان من أهل النار ... ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤسهن كأسنمة البخت الملائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها إلخ.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, দুই শ্রেণীর ব্যক্তি দোযখী... দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে ঐ সকল নারী যারা কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকবে, নিজেরা অন্যদের প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং অন্যদেরকে

---

[৮৭১] সূরা আ'রাফ: ২৬

[৮৭২] মুআত্তা মালেক: ৩৬৬

[৮৭৩] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (باب في الثياب الرقاق) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» ورجاله رجال الصحيح.

[৮৭৪] তাবারানী: হাদীস নং ২১৭০

নিজেদের প্রতি আকৃষ্ট করবে; তাদের মাথা হবে উটের হেলানো কুঁজের মতো। এরা জান্নাতে যাবে না এবং জান্নাতের খুশবুও পাবে না।"[৮৭৫]

২. পোশাক ঢিলেঢালা হতে হবে, আঁটসাঁট বা এত সংকীর্ণ হতে পারবে না, যা পরিধান করলে শরীরের সাথে লেপ্টে যায়। ফলে শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গের আকার আকৃতি ফুটে উঠে।

হযরত আবু ইয়াযিদ রাহ. বর্ণনা করেন,

كان عمر ﷺ ينهى النساء عن لبس القباطي فقالوا: إنه لا يشفّ فقال: إلا يشفّ فإنه يصف.[৮৭৬]

"হযরত উমর রাযি. মহিলাদের কাবাতী (তৎকালীন মিশরে প্রস্তুতকৃত এক ধরনের সাদা কাপড়) পরতে নিষেধ করতেন। লোকেরা বললো, এ কাপড়ে তো ত্বক দেখা যায় না। তিনি বললেন, ত্বক দেখা না গেলেও (আঁটসাঁট হওয়ার কারণে) অঙ্গ-প্রতঙ্গের আকার-আকৃতি ফুটে ওঠে।"[৮৭৭]

২য় মূলনীতি: নারী-পুরুষের পোশাক একে অন্যের সাদৃশ্য না হতে হবে।

নারী ও পুরুষের প্রকৃতির দিক থেকেই নিজস্ব স্বকীয়তা রয়েছে, যা বজায় রাখা সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য। উভয়ের স্বকীয়তা ও সম্মান সমুন্নত রাখার জন্যে ইসলাম একে অন্যের সাদৃশ্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছে। তাই বেশভূষা ও পোশাক-পরিচ্ছদে নারীরা পুরুষের এবং পুরুষরা নারীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। হাদীসে পাকে এ ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারী এসেছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

لعن رسول الله ﷺ المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال.

"রাসূল ﷺ ঐ পুরুষদের উপর লা'নত করেছেন যারা মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে এবং ঐ মহিলাদের উপর যারা পুরুষদের সাদৃশ্য গ্রহণ করে।"[৮৭৮]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

لعن رسول الله ﷺ الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.[৮৭৯]

"রাসূল ﷺ মহিলাদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোশাক পরিধানকারী মহিলার উপর লা'নত করেছেন।"[৮৮০]

৩য় মূলনীতি: পোশাক কাফের ও ফাসেক তথা বিজাতীয় সম্প্রদায়ের সদৃশ না হতে হবে।

মুসলমানগণ অভিজাত ও শ্রেষ্ঠ জাতি। লেবাস-পোশাকসহ সর্বক্ষেত্রেই মুসলমানরা

---

[৮৭৫] সহীহ মুসলিম: ২/২০৫

[৮৭৬] أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» بإسناد رجاله رجال الصحيح، ويشهد له ما عند أبي داود في «سننه»، (باب في لبس القباطي للنساء.)

[৮৭৭] মুসান্নাফু ইবনি আবী শাইবা: ১২/৪৮৯-৪৯০

[৮৭৮] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৮৮৫

[৮৭৯] قال الإمام النووي في «رياض الصالحين» (باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال) : رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الحاكم في «المستدرك» (كتاب اللباس).

[৮৮০] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৬৬, হাদীস নং ৪১০০

নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখবে। অন্যদের সাথে মিশে একাকার হওয়া আদৌ তাদের জন্য সমীচীন নয়। তারা কোন কাফের-মুশরিক বা ফাসেক ও পাপাচারী সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে না। কেননা তাদের অনুসরণ,অনুকরণ এবং সাদৃশ্য গ্রহণের উদ্দেশ্যে তাদের কোন পোশাক পরিধান করা নাজায়েয ও হারাম। হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস রাযি. বলেন-

رأى رسول الله ﷺ عليّ ثوبين معصفرين فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها.

"রাসূল ﷺ আমার পরনে উসফূর (হলুদ) রঙ্গে রাঙ্গানো দু'টি কাপড় দেখে বললেন, এগুলো কাফেরদের পোশাক। অতএব এগুলো পরিধান করো না।"[৮৮১]

হযরত আবু উসমান রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

كتب إلينا عمر ﷺ ونحن بأذربيجان ... وإياكم والتنعّم وزيّ أهل الشرك.

"আমরা যখন আযারবাইজানে ছিলাম তখন হযরত ওমর রাযি. আমাদের নিকট এই মর্মে চিঠি লিখে পাঠালেন, ...তোমরা বিলাসিতা ও মুশরিকদের পোশাক পরা থেকে বেঁচে থাকো।"[৮৮২]

সাদৃশ্য ও তার শর'য়ী বিধান

তাশাব্বুহ তথা সাদৃশ্যের অর্থ হলো, স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রেরণায় কাফের ও ফাসেকদের কোন বস্তুকে গ্রহণ করা বা এমন বেশভূষা ধারণ করা যাতে নিজেকে দেখতে তাদের মত মনে হয় অর্থাৎ তাদের মতো হওয়ার চেষ্টা করা। এ ধরনের সাদৃশ্য অবলম্বন করা সম্পূর্ণ হারাম ও নাজায়েয। এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু হাদীস পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এমনকি যদি তাদের মতো হওয়ার উদ্দেশ্য ছাড়া অনিচ্ছাবশত কোন কিছু তাদের মত হয়ে যায়, তাহলে যথাসম্ভব তা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : ...وخالفوا أولياء الشيطان بكل ما استطعتم.[৮৮৩]

"রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, ...তোমরা যথাসম্ভব শয়তানের বন্ধুদের বিরোধিতা কর।"[৮৮৪]

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. বলেন-

---

[৮৮১] সহীহ মুসলিম: ২/১৯৩

[৮৮২] সহীহ মুসলিম: ২/১৯১

[৮৮৩] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (باب مخالفة أهل الكتاب في اللباس وغيره) وقال: رواه الطبراني في «الأوسط»، عن شيخه علي بن سعيد الرازي وهو ضعيف. انتهى. وأما معناه فصحيح يشهد له جمع من الآيات والأحاديث.

[৮৮৪] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৫/২৩১

قال رسول الله ﷺ : من تشبه بقوم فهو منهم.[৮৮৫]

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাথে সাদৃশ্য রাখবে, সে তাদের মধ্য হতে গণ্য হবে।"[৮৮৬]

মোটকথা, জায়েয-নাজায়েয সকল ক্ষেত্রে বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুসরণ-অনুকরণ হারাম। নাজায়েয কাজের ব্যাপারে সাদৃশ্যের বিধান তো সুস্পষ্ট। আর বৈধ কাজেও এ উদ্দেশ্যে অনুকরণ করা, যেন তাদের মতো দেখা যায় বা দেখতে তাদের মতো মনে হয় এটি ইসলামী মূলনীতির পরিপন্থী।

৪র্থ মূলনীতি: পোশাক পরিধানের মাধ্যমে অহঙ্কার, আত্মগরিমা ও মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি উদ্দেশ্য হতে পারবে না।

মানুষকে দেখানোর নিয়তে বা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে কোন ব্যতিক্রমধর্মী পোশাক পরিধান করা অথবা কোন পোশাক পরিধান করে দম্ভভরে হাঁটা অত্যন্ত নিন্দনীয় কাজ। এ ব্যাপারে হাদীসে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : من لبس ثوب شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة.

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে পোশাক পরিধান করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা তাকে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন।"[৮৮৭]

হাদীসটির ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রাহ. বলেন-

(ثوب شهرة) أي: ثوب تكبر وتفاخر وتجبر، أو ما يتخذه المتزهد ليشهر نفسه بالزهد، أو ما يشعر به المتسيد من علامة السيادة كالثوب الأخضر، أو ما يلبسه المتفقه من لبس الفقهاء، والحال أنه من جملة السفهاء.

"প্রসিদ্ধির কাপড় পরিধানকারী বলতে উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি, যে অহমিকা, গর্ব ও অহঙ্কারের পোশাক পরিধান করে বা এমন ব্যক্তি, যে দুনিয়াত্যাগী হিসেবে খ্যাতি অর্জনের জন্য দরবেশী পোশাক পরিধান করে বা রঙ্গিন জাতীয় পোশাক পরে নেতা হওয়ার বেশ ধরে কিংবা ফকীহদের বেশ ধরে, প্রকৃতপক্ষে তার অবস্থা হলো, সে নির্বোধদের অন্তর্ভুক্ত।"[৮৮৮] (আল্লাহ তা'আলা তাকে পরকালে লাঞ্ছনার পোশাক পরিধান করাবেন।)

হযরত ইবনে ওমর রাযি. বর্ণনা করেন-

---

[৮৮৫] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» وقال : رواه الطبراني في «الاوسط» وفيه علي بن غراب وقد وثقه غير واحد وضعفه بعضهم، وبقية رجاله ثقات.

[৮৮৬] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: হাদীস নং ১৭৯৫৯

[৮৮৭] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ৫৬৬৪, হাদীসটি হাসান।

[৮৮৮] মিরকাতুল মাফাতীহ: ৮/২২১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

أن رسول الله ﷺ نهى عن لبستين: المشهورة في حسنها والمشهورة في قبحها.[৮৮৯]

রাসূল ﷺ দু'ধরনের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। উন্নতমানের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ও নিম্নমানের হওয়ার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ।"[৮৯০]

হ্যাঁ, অপব্যয় এবং লৌকিকতা ছাড়া শুধু নিজের অন্তরকে প্রফুল্ল রাখার জন্য অথবা নিজের আরামের বা সৌন্দর্যের জন্য মূল্যবান এবং দামী পোশাক পরিধান করা জায়েয আছে। এতে কোন অসুবিধা নেই।

৫ম মূলনীতি: অপচয় ও অপব্যয় না হতে হবে।

অন্যান্য জিনিসের ন্যায় পোশাক পরিচ্ছদের ক্ষেত্রেও অপচয়-অপব্যয় নিন্দনীয়। এ বিষয়ে ইমাম নাসায়ী রাহ. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف أو مخيلة.

"রাসূল ﷺ বলেন, তোমরা খাও, পান করো, সদকা করো এবং পরিধান করো, যতক্ষণ পর্যন্ত তা অপব্যয় ও অহঙ্কার মিশ্রিত না হয়।"[৮৯১]

৬ষ্ঠ মূলনীতি: পুরুষের পরিধেয় বস্ত্র টাখনুর উপরে থাকতে হবে।

পুরুষের পরিধানের বস্ত্র তথা লুঙ্গি, পায়জামা, জুব্বা, আবা ইত্যাদি যেসব পোশাক শরীরের নিচের দিকে ঝুলে থাকে সেসবের ক্ষেত্রে পুরুষের জন্য বিধান হচ্ছে, টাখনুর নিচ পর্যন্ত ঝুলিয়ে পরতে পারবে না। বরং টাখনুর উপরে রাখতে হবে। কেননা হাদীসে টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা ব্যক্তিকে জাহান্নামের 'ও'য়ীদ' শোনানো হয়েছে। যেমন হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار.

"রাসূল ﷺ বলেন, লুঙ্গির যে অংশ টাখনুর নিচে যাবে তা জাহান্নামে জ্বলবে।"[৮৯২]

একটি ভুল ধারণার নিরসন

পুরুষের জন্য টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা কবীরা গুনাহ। কিন্তু অনেকের ধারণা যে, অহঙ্কারবশত পরলেই কেবল গুনাহ হবে। সুতরাং কেউ যদি অহঙ্কার ব্যতীত শুধু রেওয়াজ বা অভ্যাসের কারণে পরে, তাহলে কোন সমস্যা নেই। তাদের এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। সঠিক কথা হলো, অহঙ্কারবশত না হলেও তা না জায়েয এবং গুনাহ। আর অহঙ্কারবশত হলে তো আরো মারাত্মক গুনাহ। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان

---

[৮৮৯] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (باب في ثوب الشهرة) وقال: رواه الطبراني، وفيه بزيع، وهو ضعيف.انتهى. وقوى بعض أمره.

[৮৯০] মাজমাউয যাওয়ায়েদ: ৫/২৩৮

[৮৯১] সুনানে নাসায়ী: ২/২৬৫ হাদীস নং ২৫৫৯; হাদীসটি হাসান।

[৮৯২] সহীহ বুখারী: ২/৮৬১

أسفل من الكعبين فهو في النار، من جر إزاره بطرا لم ينظر الله إليه.[৮৯৩]

"রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, মুসলমানের লুঙ্গি থাকবে পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত। এ স্থান থেকে টাখনুর উপর পর্যন্ত নামাতে কোন সমস্যা নেই। কিন্তু তা থেকেও যা নিচে নামবে সেটা জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত লুঙ্গি নিচে নামাবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না।"[৮৯৪]

এ হাদীস থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি অহঙ্কার ব্যতীত কাপড় টাখনুর নিচে নামাবে সে জাহান্নামে যাবে। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত নামাবে সে তো জাহান্নামে যাবেই, সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি সরিয়ে নিবেন। এ জাতীয় ব্যক্তির পরিণাম কী হবে তা সহজেই অনুমেয়।

টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানোই অহঙ্কারের আলামত

রাসূলুল্লাহ ﷺ টাখনুর নিচে কাপড় ঝুলানোকেই অহঙ্কারের আলামত সাব্যস্ত করেছেন। যেমন হযরত আবু জুরাই জাবের ইবনে সুলাইম রাযি. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন-

... وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة.[৮৯৫]

"... তোমরা পায়ের নলার অর্ধেক পর্যন্ত লুঙ্গি উঠিয়ে নাও। যদি তা মানতে না পার, তাহলে টাখনুর উপর পর্যন্ত নামাতে পারবে। তবে টাখনুর নিচে নামানো থেকে সাবধান! কেননা তা অহঙ্কারের কারণেই হয়ে থাকে। আর আল্লাহ তা'আলা অহঙ্কার পছন্দ করেন না।"[৮৯৬]

হযরত আবু বকর রাযি. এর হাদীস ও তার ব্যাখ্যা

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. এর কাপড় মাঝে মাঝে বেখেয়ালে টাখনুর নিচে চলে যেত। তিনি রাসূল ﷺ এর নিকট এ কথা পেশ করেন এবং রাসূল ﷺ তার সমাধান দেন, যা ইমাম বুখারী রাহ. নিম্নের হাদীসে বর্ণনা করেন-

قال النبي ﷺ : من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله! إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهد ذلك منه، فقال النبي ﷺ : لست ممن يصنعه خيلاء.

"রাসূল ﷺ বললেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কারবশত নিজের কাপড় টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার দিকে (রহমতের দৃষ্টিতে) তাকাবেন না। হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার নিজের ইচ্ছা ছাড়াই কখনো

---

[৮৯৩] قال الإمام النووي في «رياض الصالحين»(باب استحباب القميص) : رواه أبو داود بإسناد صحيح.

[৮৯৪] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৬৬, হাদীস নং ৪০৯৫

[৮৯৫] قال الإمام النووي في «رياض الصالحين» (باب استحباب القميص) : رواه الترمذي بإسناد صحيح.

[৮৯৬] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৬৪, হাদীস নং ৪০৮৬

লুঙ্গির এক পার্শ্ব ঝুলে পড়ে (তাহলে আমার কী হবে?)। রাসূল ﷺ বললেন, তুমি অহঙ্কারীদের অন্তর্ভুক্ত নও।"[৮৯৭]

এই হাদীসের দু'টি ব্যাখ্যা। ১. হযরত আবু বকর রাযি. এর ব্যাপারটি ভিন্ন। এটা শুধু তাঁকে বিশেষভাবে অনুমতি দেয়া হয়েছিল একটি বিশেষ কারণে। তা হলো, তার শরীরের গঠনাকৃতি এমন ছিল যে, কোন প্রকার ইচ্ছা ছাড়াই বার বার লুঙ্গি টাখনুর নিচে নেমে যেতো। তিনি স্বেচ্ছায় তা ঝুলাতেন না। ২. হযরত আবু বকর রাযি.কে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ সনদ প্রদান করেছেন যে, তাঁর মধ্যে অহঙ্কার নেই। কিন্তু আমাদের অন্তর যে অহঙ্কারমুক্ত এর সনদ দিবে কে? কোন অহঙ্কারী এ কথা স্বীকার করে না যে, তার মধ্যে অহঙ্কার আছে। তাছাড়া অহঙ্কার অন্তরের একটি গোপন ব্যাধি। তাই অনেক সময় সে নিজেও উপলব্ধি করতে পারে না যে, তার মধ্যে অহঙ্কার আছে। এ কারণেই আলামতের উপর ভিত্তি করে শরী'আত বিধান জারি করেছে।

৭ম মূলনীতি: লেবাস পোশাক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পরিপাটি হওয়া চাই।

ইসলামে নোংরামির কোন স্থান নেই। অপবিত্রতা ও অপরিচ্ছন্নতা আল্লাহ তা'আলার কাছে খুব অপছন্দনীয়। ময়লা নোংরা পোশাক পরিধান করা, পরিধেয় বস্ত্র দুর্গন্ধযুক্ত, অসুন্দর ও অগোছালো করে পরা ইসলাম মোটেই সমর্থন করে না।

হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বলেন-

أتانا رسول الله ﷺ زائرا، فرآى رجلا شعثا قد تفرق شعره، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره، ورآى رجلا آخر عليه ثياب وسخة، فقال: أما كان هذا يجد ما يغسل به ثوبه.

"একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে আসলেন। তারপর এক ব্যক্তির মাথার চুল এলোমেলো দেখে বললেন,এই লোকের কি এমন কিছু নেই যা দিয়ে সে তার মাথা পরিপাটি করে রাখবে? অতঃপর এক ব্যক্তিকে ময়লা কাপড় পরিহিত দেখে বললেন, এর কাছে কি এমন কিছু নেই, যা দিয়ে সে তার কাপড় ধোবে?"[৮৯৮]

৮ম মূলনীতি: কুরআন হাদীসে যে পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করা হয়েছে তা পরিহার করা যেমন রেশমী পোশাক। হযরত হুযাইফা রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سمعت النبي ﷺ يقول: لا تلبسوا الحرير، ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة.

"আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, তোমরা রেশমী ও দীবাজ (এক প্রকারের রেশমী পোশাক) কাপড় পরিধান করো না এবং সোনা-রূপার পাত্রে পান করো না। সেগুলোর থালায় পানাহার করো না। নিশ্চয় সেগুলো দুনিয়াতে কাফেরদের জন্য এবং আখেরাতে আমাদের

---

[৮৯৭] সহীহ বুখারী: ২/৮৬০
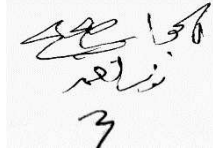
[৮৯৮] মুসনাদে আহমদ: হাদীস নং ১৪৮৫০; সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৬২; সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ৫৪৮৩, মুআস্সাসাতুর রিসালা

জন্য।"[৮৯৯]

সর্বোপরি একজন মুমিন সর্বক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর অনুসরণ-অনুকরণ করার চেষ্টা করবে এটাই স্বাভাবিক। আর রাসূল ﷺ কে ব্যাপকভাবে অনুসরণ করার আদেশ কুরআনে অসংখ্যবার উল্লেখ হয়েছে।

তাই দুনিয়ার চাকচিক্যের দিকে না তাকিয়ে রাসূল ﷺ এর আদর্শ তথা শরী'আতের মূলনীতির অনুকরণ করে পোশাক পরিধান করার মাঝেই কল্যাণ নিহিত। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে শরী'আতসম্মত পোশাক পরিধান করার তাওফীক দান করুন। আমীন॥
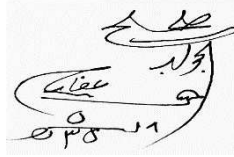
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

---

[৮৯৯] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৪২৬

আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী আনিল মুনকার: তাৎপর্য ও রূপরেখা

মাওলানা বিন ইয়ামিন বগুড়াবী

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ হতে নিষেধ দ্বীনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। এর জন্য আল্লাহ তা‘আলা অবতীর্ণ করেছেন আসমানী গ্রন্থসমূহ এবং প্রেরণ করেছেন রাসূলগণকে। শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ এর উম্মতকেও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। নবীজী ﷺ এর যামানা থেকে অদ্যবধি মুসলমানগণ এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। অবস্থার পরিবর্তনে তার রূপরেখায় বিভিন্ন পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু মূল বিষয় রয়েছে অপরিবর্তনীয়। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে মূল বিষয় ও রূপরেখার আলোচনা করা হবে ইন্শাআল্লাহ।

আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের অর্থ ও উদ্দেশ্য

معروف (মা‘রূফ) শব্দের আভিধানিক অর্থ কল্যাণ, মঙ্গল, দয়া, অনুগ্রহ। منكر (মুনকার) শব্দের অর্থ খারাপ, নিকৃষ্ট, জঘন্য। এখানে কল্যাণ ও খারাপ উভয়টি নির্ণয় হবে শরী‘আতের আলোকে।

কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রাহ. وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ أي ما عرف من الشرع حسنه واجبا أو مندوبا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ يعني ما أنكره الشرع من المحرمات والمكروهات.

“যে কাজকে ইসলাম সুন্দর ও সৎ বলেছে তা মা‘রূফ আর যে কাজকে ইসলাম বর্জন করার নির্দেশ দিয়েছে তা মুনকারের অন্তর্ভুক্ত।”[৯০০]

কুরআন হাদীসের আলোকে আমর বিল মা‘রূফ ও নাহী আনিল মুনকার

আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ ۚ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“আর তোমাদের মধ্যে এমন একটা দল থাকা উচিত, যারা আহ্বান জানাবে সৎ কাজের প্রতি, নির্দেশ দিবে ভাল কাজের এবং বারণ করবে অন্যায় কাজ থেকে আর তারাই সফলকাম।”[৯০১]

আরো ইরশাদ করেন-

[৯০০] তাফসীরে মাযহারী: ২/১১৪, মাকতাবায়ে রশীদিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান

[৯০১] সূরা আল-ইমরান: ১০৪

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

"তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত। মানবজাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা প্রদান করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে।"[৯০২]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে-

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ

"আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা সৎ কাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে।"[৯০৩]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

سمعت رسول الله ﷺ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان.

"আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি কোন অন্যায় কাজ হতে দেখে, যদি হাত দ্বারা বন্ধ করার শক্তি থাকে তবে তাকে হাত দ্বারা বন্ধ করে দিবে। যদি ঐ পরিমাণ শক্তি না রাখে তবে যবান দ্বারা তার প্রতিবাদ করবে। যদি এই ক্ষমতাও না থাকে তবে অন্তর দ্বারা কাজটিকে খারাপ মনে করবে, আর তা ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর।"[৯০৪]

হযরত হুযাইফা ইবনে ইয়ামান রাযি. থেকে বর্ণিত-

عن النبي ﷺ قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف، ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم.

"নবীজী ﷺ থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "ঐ জাতের কসম যার হাতে আমার মৃত্যু অবশ্যই তোমরা সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে। নতুবা অতি শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর শাস্তি প্রেরণ করবেন। অতঃপর তোমরা দু'আ করবে, কিন্তু তোমাদের দু'আ কবুল করা হবে না।"[৯০৫]

হযরত জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন-

سمعت رسول الله ﷺ : يقول ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن يغيروا عليه، ولا يغيروا عليه، ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا.

"আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যদি কোন গোত্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি গুনাহের

[৯০২] সূরা আল-ইমরান: ১১০
[৯০৩] সূরা তাওবা: ৭১
[৯০৪] সহীহ মুসলিম: ১/৫১
[৯০৫] জামে তিরমিযী: ২/৪০, ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

মধ্যে লিপ্ত হয় আর ঐ গোত্রের প্রতিরোধ করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও প্রতিরোধ না করে, তাহলে তাদের উপর মৃত্যুর পূর্বেই আযাব আসবে।"[৯০৬]

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের তাৎপর্য

ইমাম গাজালী রাহ. বলেন, "সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা দ্বীনের একটি শক্তিশালী স্তম্ভ। এ কাজ এত গুরুত্বপূর্ণ যে, এ কাজকে আঞ্জাম দেয়ার জন্য সমস্ত নবীকে প্রেরণ করা হয়েছে। যদি এ কাজ ছেড়ে দেয়া হয় এবং এর ইলম ও আমলকে পরিত্যাগ করা হয়, তাহলে (নাউযুবিল্লাহ) নবুওয়াত বেকার সাব্যস্ত হবে। অলসতা ব্যাপক হবে। গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার প্রশস্ত রাস্তাসমূহ খুলে যাবে। সারা দুনিয়া অজ্ঞতায় ডুবে যাবে। সমস্ত কাজে খারাবী এসে যাবে। পারস্পরিক দ্বন্দ ও মতবিরোধ শুরু হবে। সমাজে খারাবী আরম্ভ হবে। মাখলূক ধ্বংস ও বরবাদ হয়ে যাবে।"[৯০৭]

মুফতী শফী রাহ. বলেছেন, "মুসলিম জাতির কল্যাণ দু'টি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল। ১. খোদাভীতি ও আল্লাহর রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করার মাধ্যমে আত্মসংশোধন। ২. প্রচার বা তাবলীগের মাধ্যমে অপরের সংশোধন। যদি সমস্ত মুসলমান সম্মিলিতভাবে তা বাস্তবায়ন করে, তাহলে অনিবার্য ফলস্বরূপ তারা পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল জাতিতে পরিণত হবে। সূরা ইয়াসিন ১০৩ ও ১০৪ নম্বর আয়াতের সারমর্ম হল, নিজের চরিত্র ও কার্যক্রম আল্লাহর দেয়া আইন অনুযায়ী সংশোধন করা এবং অন্যান্য ভাইয়ের কাজকর্ম সংশোধনের চিন্তা করা। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلصَّبْرِ ۝٣

"পরকালের ক্ষতি হতে তারা মুক্ত যারা নিজেরা ঈমান আনে ও সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং একে অপরকে হক ও সৎকর্মে অটল থাকার নির্দেশ দেয়।"[৯০৮]

জাতীয় ও সমষ্টিগত জীবনের জন্য একটি শক্তিশালী ঐক্য থাকা যেমন অপরিহার্য, এমনই সে ঐক্য স্থিতিশীল রাখার জন্য আমর বিল 'মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার'ও অপরিহার্য। আলোচ্য আয়াতে তাই বলা হয়েছে, প্রত্যেকেই নিজের ঈমান আমলের সাথে সাথে অপর ভাইকেও ভাল কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করাকে আপন কর্তব্য মনে করবে, যাতে আল্লাহর রজ্জু তার হাত থেকে ফসকে না যায়। আল্লামা শাব্বীর আহমদ ওসমানী রাহ. বলতেন, "আল্লাহর এ রজ্জু ছিঁড়ে যেতে পারে না। অবশ্য হাত থেকে ফসকে যেতে পারে- তাই এ রজ্জুকে ফসকে যাবার আশঙ্কার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন পাক নির্দেশ জারি করেছে যে, প্রত্যেক মুসলমান যেমন নিজে সৎকর্ম করা ও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকাকে জরুরী মনে করবে তেমনি অপরকে সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করাকে একটি কর্তব্য মনে করবে।"[৯০৯]

---

[৯০৬] সুনানে আবু দাউদ: ২/৫৯৬, সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ৩০২

[৯০৭] ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন: ২/২৬৫, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

[৯০৮] সূরা আস্‌র: ৩

[৯০৯] সংক্ষিপ্ত মা'আরিফুল কুরআন বাংলা: ১৯২-১৯৩, (সৌদী নুসখা)

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের হুকুম

সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের হুকুম দু'ভাবে উল্লেখ করা যায়। ১. সৎ কাজের আদেশ আল্লাহর পক্ষ হতে এমন হুকুম, যা অনির্দিষ্টভাবে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করে। তবে কোন একজন আদায় করলে সবার পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়। আর কেউ আদায় না করলে সবাই গুনাহগার হবে। যাকে শরী'আতের পরিভাষায় 'ফরযে কিফায়া' বলা হয়। কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী রাহ. ولتكن منكم...الآية আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

ولتكن منكم من للتبعيض «لأن الأمر بالمعروف» و«النهي عن المنكر» من فروض الكفاية، ولأنه لا يصلح له كل أحد حيث يشترط له شروط من العلم، والتمكن على الاحتساب، وطلب من الجميع، خاطب الجميع وطلب فعل البعض ليدل على أنه واجب على الكل حتى لو ترك الكل أثموا جميعا، ولكن يسقط بفعل بعضهم، وهذا شأن فروض الكفاية. وجاز أن يكون من للتبيين.

"ولتكن منكم এই আয়াতে من শব্দটি تبعيض এর (কিছু বোঝানোর) জন্য। কেননা আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার ফরযে কিফায়া। কারণ, যেহেতু এর জন্য ইলম ও অন্যের মুহাসাবা করার ক্ষমতা থাকা শর্ত। তাই প্রত্যেক ব্যক্তি এ কাজের যোগ্যতা রাখে না। আল্লাহ তা'আলা সকলকে সম্বোধন করে সমষ্টিগতভাবে সকলের নিকট কাজটি তলব করেছেন, তবে কিছু মানুষ থেকে কাজটি সংগঠিত হওয়া চেয়েছেন। (সকলকে সম্বোধন করে কিছু লোক থেকে কাজটি চেয়েছেন) এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, কাজটি সকলের উপর ওয়াজিব। সুতরাং কেউ যদি না করে, তাহলে সকলেই গুনাহগার হবে। কিন্তু কিছু মানুষ কাজটি করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। আর এটাই ফরযে কিফায়ার অর্থ।"[৯১০]

সুতরাং সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা স্বাভাবিক অবস্থায় নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তির উপর বর্তাবে না, বরং ফরযে কিফায়া।

২. কারো সামনে যদি কোন খারাপ কাজ সংগঠিত হয় বা সংগঠিত হওয়ার উপক্রম হয় বা কোন সৎ কাজের আদেশের প্রয়োজন দেখা দেয়, এ পরিস্থিতিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের হুকুম সবার জন্য এক পর্যায়ের নয়। যেমনটি আবু সাঈদ খুদরী রাযি. এর হাদীস থেকে বোঝা যায়। ফিকহের কিতাবেও এর আলোচনা পাওয়া যায়।

إن كان يعلم بأكبر رأيه أنه لو أمر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمتنعون عن المنكر، فالأمر واجب عليه، ولا يسعه تركه. ولو علم بأكبر رأيه أنه لو أمرهم بذلك قذفوه وشتموه، فتركه أفضل. وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبر على ذلك، ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولو علم أنه لو ضربوه صبر على ذلك، ولا يشكو إلى أحد فلا بأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد، ولو علم أنه لا يقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر أفضل... ويقال: الأمر بالمعروف باليد على الأمراء وباللسان

[৯১০] তাফসীরে মাযহারী: ২/১১৩-১১৪, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

على العلماء وبالقلب لعوام الناس.

"সৎ কাজে আদেশ অসৎ কাজে নিষেধ প্রদানকারীর যদি প্রবল ধারণা হয় যে,অন্যরা তার কথা গ্রহণ করবে, তাহলে অন্যদেরকে তার আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার করা ওয়াজিব। আর যদি প্রবলভাবে এ ধারণা হয় যে, সে বললে তাকে কষ্ট দিবে, গালি দিবে, তাহলে পরিত্যাগ করা উত্তম। অনুরূপ যদি সে বুঝতে পারে যে, তারা তাকে মারধর করবে আর সে ধৈর্যধারণ করতে পারবে না, পরস্পরের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টি হবে, এর ফলে মারামারি-কাটাকাটি শুরু হবে, তাহলে পরিত্যাগ করা উত্তম। আর যদি মার খেয়ে অভিযোগ না করে ধৈর্যধারণ করতে পারবে, তাহলে মন্দকাজ থেকে বাধা দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। এ অবস্থায় সে মুজাহিদ হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি তার ধারণা হয় যে তারা গ্রহণ না করলেও কোন কষ্ট দিবে না, তাহলে দাওয়াত দেয়া তার ইচ্ছাধীন। দিতে পারে,নাও দিতে পারে। তবে আদেশ করাই উত্তম... কারো কারো মতে, হাত দ্বারা প্রতিহত করবে একমাত্র বাদশা। আর যবান দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এবং অন্তর দ্বারা সাধারণ জনগণ।"[৯১১]

হযরত হুযাইফা রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا : وكيف يذل نفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق.[৯১২]

" রাসূল সা. ইরশাদ করেন,কোন মুমিনের জন্য নিজেকে অপদস্থ করা উচিত নয়। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, নিজেকে কীভাবে অপদস্থ করা হয়? তিনি জবাবে বললেন, নিজেকে এমন কোন মুসীবতের মুখোমুখি করা, যা সহ্য করার শক্তি নেই।"[৯১৩]

তাই সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করতে গিয়ে যদি এমন কষ্টের সম্মুখীন হতে হয় যা সহ্য করা সম্ভব নয়, তাহলে এ পরিস্থিতিতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজ নিষেধ করা থেকে বিরত থাকার অবকাশ রয়েছে।

অর্থাৎ সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের হুকুম সর্বাবস্থায় এক নয়। স্থান, পরিবেশ ও আদেশ ও নিষেধকারীর অবস্থা সর্বোপরি সব কিছুর সমন্বয়ে হুকুম স্থির হবে। এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকার শুধু দাওয়াতের মাঝে সীমাবদ্ধ নয় বরং যে কোন বৈধ পন্থায় করার সুযোগ আছে এবং করা উচিত।

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের রূপরেখা

আমর বিল মারূপ ও নাহী আনিল মুনকারের তাৎপর্য জানার পর এর রূপরেখা কী? কী পদ্ধতিতে তা প্রদান করা হলে পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ দ্বীন ইসলামের দিকে ধাবিত হবে, তা জানা দরকার। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

---

[৯১১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী ৫/৪০৭, দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন

[৯১২] أخرجه الإمام الترمذي في «جامعه» وقال: هذا حديث حسن غريب.

[৯১৩] জামে তিরমিযীঃ হাদীস নং ২৪২০, ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِۖ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ

"আপন পালনকর্তার পথের দিকে আহ্বান করুন জ্ঞানের কথা বুঝিয়ে ও উত্তমরূপে উপদেশ শুনিয়ে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন পছন্দনীয় পন্থায়।"[৯১৪]

উল্লিখিত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে রূহুল মা'আনীর গ্রন্থকার বলেন, 'আয়াতের বর্ণনাপদ্ধতি থেকে জানা যায়, আসলে দু'টি বিষয়ই দাওয়াতের মূলনীতি- হিকমত ও উপদেশ। তৃতীয় বিষয় অর্থাৎ বিতর্ক, মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে দাওয়াতের ক্ষেত্রে কোন কোন সময় এরও প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, দাওয়াতের মূলনীতি দু'টি- হিকমত ও উপদেশ। এগুলো থেকে কোন দাওয়াত শূণ্য হওয়া উচিত নয়। আলেম ও বিশেষ শ্রেণীর লোকদেরকে দাওয়াত দেয়া হোক কিংবা সর্বসাধারণকে দাওয়াত দেয়া হোক। তবে দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন লোকদেরও সম্মুখীন হতে হয়, যারা সন্দেহ ও দ্বিধাদ্বন্দ্বে থাকে এবং দাওয়াত প্রদানকারীর সাথে তর্ক-বিতর্ক করতে উদ্যত হয়। এমতাবস্থায় বিতর্কের শিক্ষা দান করা হয়েছে। কিন্তু সাথে সাথে بالتي هي أحسن (উত্তমপন্থা অবলম্বন) কে শর্ত হিসেবে উল্লেখ করে বলা হয়েছে, যে বিতর্ক এ শর্তের সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়, শরী'আতে তার কোন মর্যাদা নেই।[৯১৫]

হিকমাত

হিকমতের বিভিন্ন তাফসীর আছে। তবে তাফসীরে রুহুল বয়ানের ব্যাখ্যাটি খুব সুন্দর। 'হিকমত বলে সে অন্তরদৃষ্টিকে বোঝানো হয়েছে, যার সাহায্যে মানুষ অবস্থার চাহিদা জেনে নিয়ে তদনুযায়ী কথা বলে। এমন সময় ও সুযোগ খুঁজে নেয়, যা প্রতিপক্ষের উপর বোঝা মনে না হয়। নম্রতার স্থলে নম্রতা ও কঠোরতার স্থলে কঠোরতা অবলম্বন করে। যেখানে মনে করে যে, স্পষ্টভাবে বললে প্রতিপক্ষ লজ্জিত হবে সেখানে ইঙ্গিতে বলে। কিংবা এমন ভঙ্গি অবলম্বন করে, যদ্দরুন প্রতিপক্ষ লজ্জার সম্মুখীন হয় না এবং তার মনে একগুঁয়েমিভাবও সৃষ্টি হয় না।[৯১৬]

মাওইযাহ

موعظة এর অর্থ হলো, শুভেচ্ছামূলক কথা এমনভাবে বলা, যাতে প্রতিপক্ষের মন তা কবুল করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। যেমন তার কাছে কবুল করার সাওয়াব ও উপকারিতা এবং কবুল না করার শাস্তি ও অপকারিতা বর্ণনা করা।[৯১৭]

الحسنة এর অর্থ হলো, বর্ণনা (ও শিরোনাম) এমন হওয়া যে, প্রতিপক্ষ যেন এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয় যে, এতে আপনার কোন স্বার্থ নেই, শুধু তার কল্যাণের খাতিরে বলছেন। অনেক সময় শুভেচ্ছামূলক কথাও এমন ভঙ্গিতে বলা হয়, যার ফলে প্রতিপক্ষ অপমান বোধ করে,

---

[৯১৪] সূরা নাহাল: ১২৫
[৯১৫] সংক্ষিপ্ত বাংলা মা'আরেফুল কুরআন: ৭৬২, (সৌদী নুসখা)
[৯১৬] সংক্ষিপ্ত বাংলা মা'আরিফুল কুরআন: ৭৬১, (সৌদী নুসখা)
[৯১৭] কামূস, মুফরাদাতে রাগিব, দ্রষ্টব্য, সংক্ষিপ্ত বাংলা মা'আরিফুল কুরআন: ৭৬১, (সৌদী নুসখা)

এ পন্থা পরিত্যাগ করার জন্য حسنة শব্দটি বাড়ানো হয়েছে।

উত্তম পন্থায় তর্ক-বিতর্ক

দাওয়াতের কাজে কোথাও যদি তর্ক-বিতর্কের প্রয়োজন দেখা দেয়, তাহলে তা উত্তম পন্থায় হওয়া দরকার। তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে বলা হয়েছে, উত্তম পন্থার মানে এই যে, কথাবার্তায় নম্রতা ও নমনীয়তা অবলম্বন করা হবে। এমন যুক্তি-প্রমাণ পেশ করতে হবে, যা প্রতিপক্ষ বুঝতে সক্ষম হয়। বহুল প্রচলিত, প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত বাক্যাবলির মাধ্যমে প্রমাণ দিতে হবে, যাতে প্রতিপক্ষের সন্দেহ দূরীভূত হয় এবং সে হটকারিতার পথ পরিহার করে।[৯১৮]

রাসূল ﷺ এর কর্মধারা থেকে পরিষ্কার যে, তিনি দাওয়াতের ক্ষেত্রে তর্ক বিতর্ককে মৌলিকভাবে গ্রহণ করেননি। বরং তাঁর দাওয়াতের মাঝে প্রথম দু'টিই প্রাধান্য পেত। তাই প্রতি পক্ষকে (স্বধর্মী হোক বা বিধর্মী) দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে তর্ক-বিতর্ককে মিশন বানানো সুন্নাহ পরিপন্থী। মাওলানা মুহাম্মদ রাবে হাসানী নাদাভী হাফিযাহুল্লাহ বলেন-

ولكن الدين الإسلامي الذي يقدمه بعضنا اليوم هو دين الجدل والضرب أكثر من أن يكون دين الفضيلة والبر، وما دمنا نظهر للغرب وجه العنف والجدل للإسلام، فلن نجد من الغرب ردا إلا بالإعراض والمقت.

"বর্তমানে কোন কোন ভাই ইসলামকে এমনভাবে উপস্থাপন করছেন যার ফলে, মনে হচ্ছে, ইসলামে তর্ক-বিতর্কের অবস্থান বেশি উন্নত আখলাক ও ভ্রাতৃত্ববোধের চেয়ে। যতদিন বিধর্মীদের কাছে কঠোরতা ও বিতর্কের মাধ্যমে আমরা ইসলামকে উপস্থাপন করবো, ততদিন তাদের থেকে শুধু বিমুখতা ও ঘৃণাই আমরা পাবো।"[৯১৯]

আমর বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুনকারের কতিপয় নীতিমালা

ইমাম গাযালী রাহ. লিখেছেন এবং মুফতী শফী রাহ. বারবার বলতেন- কথাটি স্মরণ রাখার যোগ্য, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে أمر بالمعروف ونهي عن المنكر (সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা দান) এর দায়িত্ব অর্পিত হয় না। দ্বীনের সর্বস্বীকৃত ও সর্বজন গৃহীত বিষয়াদির ক্ষেত্রেই শুধু সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধের দায়িত্ব অর্পিত হয়। অতএব, যদি কোন ব্যক্তি মতবিরোধপূর্ণ মাসআলায় ভিন্ন মতাবলম্বী হন, তাকে ভর্ৎসনা করা আদৌ তাবলীগ তথা দ্বীনের প্রতি মানুষকে ডাকার দাবী নয়।[৯২০]

যারা দ্বীনের বিভিন্ন শাখায় দাওয়াতী কাজে মগ্ন আছেন তাদের জন্য এ বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছু ভাই আছেন, যারা নিজেকে সালাফী বলে পরিচয় দেন, তারা মিশন বানিয়েছেন যে, তাদের মতের বিপরীত কেউ আমল করলেই (যদিও তার পক্ষে দলীল বিদ্যমান) তাকে নিজের মতের দিকে দাওয়াত দিতে থাকে এবং অন্যের দলীলযুক্ত মতটিকে

---

[৯১৮] প্রাগুক্ত

[৯১৯] মাসিক আর রায়েদ, লক্ষ্মৌ, ভারত: মুহাররাম: ১৪৩৫হি.

[৯২০] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ. -এর মিশন: ৩১, মাকতাবাতুল ইহসান, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

বাতিল বলতে থাকে। এ পন্থাটি সালাফের আমল ও সুন্নাহ পরিপন্থী।

নিম্নে আরো কিছু মূলনীতি উল্লেখ করা হচ্ছে, দাওয়াতের ক্ষেত্রে যেগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়-

১. শ্রোতার মন-মানসিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখা, নতুবা অনেক সময় দাওয়াত ফলদায়ক হয় না।

২. জড়তামুক্ত, বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় দাওয়াত দেয়া। এ জন্য হযরত মূসা আ. আল্লাহর নিকটে জড়তা থেকে মুক্তি ও বিশুদ্ধ ভাষার জন্য দু'আ করেন-

وَٱحۡلُلۡ عُقۡدَةٗ مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفۡقَهُواْ قَوۡلِي ﴿٢٨﴾

"আমার জিহ্বা থেকে জড়তা দূর করে দিন। যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে।"[৯২১]

وَأَخِي هَٰرُونُ هُوَ أَفۡصَحُ مِنِّي لِسَانٗا فَأَرۡسِلۡهُ مَعِيَ رِدۡءٗا يُصَدِّقُنِيٓ

"আমার ভাই হারুন আমার চেয়ে প্রাঞ্জলভাষী। অতএব, তাকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন। সে আমাকে সমর্থন করবে।"[৯২২]

৩. দাওয়াতের বিষয়বস্তু ও উপাদানে ভিন্নতা থাকা। দাওয়াতে সুসংবাদ থাকবে, দুঃসংবাদও থাকবে। জান্নাতের নেয়ামতের বর্ণনা থাকবে, জাহান্নামের আযাবের কথাও থাকবে। কখনো উৎসাহের কথা বলা, কখনো ভীতির কথা বলা। শুধু এক ধরনের কথা না বলা। এতে শ্রোতার মাঝে একগুঁয়েমী সৃষ্টি হবে।

৪. মাঝে মাঝে বিরতি দেয়া। যদি লাগাতার দাওয়াত দেয়া হয়, তাহলে শ্রোতা বিরক্ত হতে পারে। তাই বিরতি দিয়ে দাওয়াত দেয়া উচিত। হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. কে কোন ব্যক্তি প্রতিদিন নসীহত করার আবেদন করলে তিনি বলেন-

أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أخولكم بالموعظة كما كان النبي ﷺ يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.

"শুনে রাখ! প্রতিদিন ওয়াজ করায় আমার বাধা আছে। আমি তোমাদের বিরক্ত করতে চাই না। আমি ওয়াজের মাঝে বিরতি প্রদান করে থাকি। যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বিরক্তির আশঙ্কায় মাঝে মাঝে বিরতি প্রদান করতেন। "[৯২৩]

৫. নম্রভাবে কথা বলা। রুক্ষতা পরিহার করা। যাকে দাওয়াত দেয়া হবে সে যতই অবাধ্য ও উদ্ধত হোক না কেন। ফেরাউনকে দাওয়াত দেয়ার সময় মূসা ও হারুন আ. কে আল্লাহ তা'আলা বলেন-

---

[৯২১] সূরা তোয়া-হা: ২৭-২৮

[৯২২] সূরা কাসাস: ৩৪

[৯২৩] সহীহ বুখারী: ১/১৬

اذْهَبَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿٤٤﴾

"তোমরা উভয়ে ফেরাউনের কাছে যাও, সে খুব উদ্ধত হয়ে গেছে। অতঃপর তোমরা নম্রভাবে কথা বল, হয়ত সে চিন্তা-ভাবনা করবে অথবা ভীত হবে।"[৯২৪]

৬. কল্যাণ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে অন্যায়কে সহ্য করা। অনেক সময় শ্রোতাকে গোনাহে লিপ্ত দেখেও তাকে নসীহত বা উক্ত অন্যায় থেকে বিরত হওয়ার উপদেশ দেওয়া যাবে না যদি তখন উপদেশ গ্রহণ করার মানসিকতা তার না থাকে, বরং আশংকা হয় উপদেশে চটে গিয়ে গুনাহে হটকারিতা করে বসবে। কেননা, এমন হলে আশংকা রয়েছে,ভবিষ্যতে আর কখনও উপদেশ দেয়ার সুযোগ আসবে না।[৯২৫]

দাওয়াত ফলপ্রসূ হওয়ার জন্য তিনটি আবশ্যকীয় শর্ত

(মুফতী তকী উসমানী দা.বা. বলেন) শাইখুল ইসলাম মাওলানা শাব্বীর আহমদ উসমানী রাহ. (আল্লাহ পাক জান্নাতে তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করুন) এর একটি অতি ফলদায়ক ও কার্যকরী বাণী আমার স্মরণ হলো। আমি তো তা দ্বারা খুব উপকৃত হয়েছি। তিনি বলতেন, হক কথা, হক পন্থায়, হক নিয়তে বললে কখনো বিশৃংখলা সৃষ্টি হয় না। তবে শর্ত ঐ তিনটিই।

১. কথা হক হতে হবে।

২. নিয়ত হক হতে হবে।

৩. বলার পন্থাও হক হতে হবে।

যদি কোথাও হক কথা বলার পরিণতিতে গোলযোগ দেখা দেয় ও কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হয়, তাহলে বুঝতে হবে উল্লিখিত তিন শর্তের কোন একটি শর্ত অনুপস্থিত ছিল। হয়তো কথা হক ছিল না, অথবা কথা তো হক ছিল, কিন্তু নিয়ত হক ছিল না। অর্থাৎ কোন অসৎ উদ্দেশ্যে কথাটা বলা হয়েছিল। যেমন স্বীয় বড়ত্ব প্রকাশ ও অন্যকে অপদস্থ করার মানসে কথাটা বলা হয়েছিল। তাহলে তো নিয়ত সঠিক হলো না। অথবা নিয়ত সঠিক ছিল বটে; কিন্তু পন্থা সঠিক ছিল না। যদি হক কথা, হক পন্থা, হক নিয়ত- এ তিনের সমন্বয় ঘটতো, তাহলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো না। তৎক্ষণাৎ কিংবা বিলম্বে এক সময় প্রভাব সৃষ্টি করতই।[৯২৬]

উপসংহার

পূর্বোল্লিখিত নীতিমালা অনুযায়ী যদি সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করা হয়, এর দ্বারা শুধু ইসলামী ভ্রাতৃত্বের পরিসর বিস্তৃত হবে তাই নয়, বরং দীনদারীর পরিবেশও সৃষ্টি হবে। মুসলমানদের শক্তি ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নিগুঢ় তত্ত্ব সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের তাবলীগ ও দ্বীনকে সমুন্নত করার মাঝে নিহিত। এর দ্বারা ইত্তেফাক, ইত্তেহাদ, ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি হবে। মু'আমালা ও মু'আশারার ক্ষেত্রে মমতার বন্ধন সৃষ্টি

---
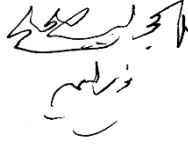
[৯২৪] সূরা তোয়া-হা: ৪৩-৪৪

[৯২৫] দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি: ৫৮-৬৪, সংক্ষেপিত

[৯২৬] সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী রাহ. -এর মিশন: ২৩, মাকতাবাতুল ইহসান, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম

হবে। তবে আমাদের এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে, দাওয়াতী কাজ হতে হবে রাসূল ﷺ এর সীরাত ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতির আলোকে। দাওয়াতী কজের জন্য নিজেকে ব্যাপকভাবে প্রস্তুত করতে হবে, যেন নিজের সার্বিক অবস্থা দীনের সফল প্রতিনিধিত্ব করে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সাধ্যানুযায়ী সৎ কাজে আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধ করার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥
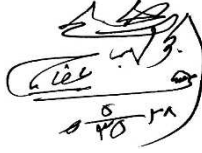
_সত্যায়নে_

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
২৮ জুমাদাল উলা ১৪৩৫হি.

মোবাইল: আদাব ও মাসাইল

মাওলানা নূরুল আজীম কক্সবাজারী

মোবাইল-ফোন, বিজ্ঞানের বিস্ময়কর এক আবিষ্কার। মানব জীবনের প্রতিমুহূর্তের সঙ্গী এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ব্যবহৃত যোগাযোগ মাধ্যম। কিন্তু আজ এর সেবা শুধু যোগাযোগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এতে যুক্ত হয়েছে আরো বহু আয়োজন। বিভিন্ন ধরনের উপকারের পাশাপাশি এর ক্ষতির দিকগুলোও কম নয়। এগুলো ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের অবকাঠামোকে গ্রাস করে নিচ্ছে। তাই এ প্রযুক্তির সুফল ভোগ করতে হলে একটি নীতির মধ্যে থেকে ব্যবহার অপরিহার্য। এ ব্যাপারে ইসলামে রয়েছে সুন্দর নীতিমালা, যা মানুষকে ইহকালীন ও পরকালীন উভয় জীবনের ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করে।

আলাপনীর আদবসমূহ

কারো সাথে দেখা সাক্ষাত করার ক্ষেত্রে ইসলাম কিছু নিয়ম পালন করার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছে। যেহেতু মোবাইলে কথাবার্তাও এক প্রকার সাক্ষাত ন্যায় তাই মোবাইলে কথা বলার সময়ও সে আদবগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে কিছু আদব উল্লেখ করা হলো-

১. মোবাইল করার পূর্বে নিশ্চিত হওয়া যে, এখন ফোন করলে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাজে ব্যাঘাত ঘটবে না। রাত গভীর হলে কারো কাছে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কল না দেয়া। কারণ, এ সময় মানুষ ঘুমে ও বিশ্রামে থাকে। আর ঘুম ভেঙ্গে কথা বলা কষ্টকর। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন-

المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده إلخ.

"প্রকৃত মুসলমান ঐ ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে।"[৯২৭]

২. সর্বপ্রথম সালাম দিয়ে কথা শুরু করা। হযরত জাবের রাযি. বর্ণনা করেন-

قال رسول الله ﷺ : السلام قبل الكلام.[৯২৮]

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেছেন, কথাবার্তার আগে সালাম দিবে।"[৯২৯]

৩. রিসিভ করার পর প্রথমে নিজের নাম ঠিকানা বলে পরিচয় দেয়া। হ্যাঁ, যদি পূর্ব থেকে জানা থাকে যে, তার নাম ঠিকানা রিসিভকারীর মোবাইলে সেভ করা আছে, তাহলে পরিচয় দেয়া জরুরী নয়। হযরত জাবের রাযি. বলেন-

---

[৯২৭] সহীহ বুখারী: ১/৬, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৯২৮] قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في «التلخيص الحبير»: وله طريقان أحدهما في الترمذي عن جابر، وقال : منكر، وثانيهما عن ابن عمر أخرجه ابن عدي في «الكامل» ، بإسناده لا بأس به.

[৯২৯] মেশকাতুল মাসাবীহ: ২/৩৯৯

أتيت رسول الله ﷺ في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ فقلت: أنا، فقال: أنا أنا! فكأنه كرهها.

“আমার পিতার ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে একবার আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নিকট হাজির হলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি বললেন কে? বললাম, আমি। তখন তিনি বলেন, আমি, আমি! যেন তিনি আমার এরূপ উত্তর অপছন্দ করলেন।”[৯৩০]

উক্ত হাদীসে পরিচয় না দেয়ার কারণে আল্লাহর রাসূল ﷺ কষ্ট অনুভব করেছেন। সুতরাং স্পষ্ট করে নাম বলা ও পরিচয় দেয়া উচিত।

৪. কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ মোবাইল রিসিভ করলে তাকে অবগত করা যে, আমার অমুকের সাথে কথা বলা প্রয়োজন।

৫. কারো কাছে তিনবার কল করার পরও সে রিসিভ না করলে চতুর্থবার কল না দেয়া। কেননা হতে পারে সে কোন প্রয়োজনীয় কাজে ব্যস্ত, কিংবা সে এমন জায়গায় আছে যেখানে রিসিভ করা সম্ভব নয়। হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাযি. বলেন-

كنت في مجلس من مجالس الأنصار، إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور، فقال: استاذنت على عمر ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال: ما منعك؟ قلت: استاذنت ثلاثا، فلم يؤذن لي، فرجعت، وقال رسول الله ﷺ إذا استأذن أحدكم ثلاثا، فلم يؤذن له فليرجع...

“আমি আনসারদের এক বৈঠকে ছিলাম, হঠাৎ সেখানে আবু মূসা রাযি. উপস্থিত হলেন। যেন তাকে ভীতসন্ত্রস্ত মনে হচ্ছিল। অতঃপর তিনি বলেন, আমি ওমর রাযি. এর সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনবার অনুমতি চেয়েছি কিন্তু আমাকে অনুমতি প্রদান করা হয়নি। তখন আমি ফিরে এসেছি। ওমর রাযি. বললেন, কেন প্রবেশ করলে না? তদুত্তরে আমি বললাম, তিনবার অনুমতি চেয়েছি, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি, তখন আমি ফিরে এসেছি (এর কারণ হলো) রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তোমাদের কেউ যদি কারো সাথে সাক্ষাতের জন্য তিনবার অনুমতি চায় অতঃপর অনুমতি না দেয়া হয়, তাহলে তার জন্য উচিত সে যেন ফিরে যায়।”[৯৩১]

এখানে মনে রাখতে হবে, তিনবার চেষ্টা করতেই হবে তা নয়। বরং সর্বোচ্চ তিনবার চেষ্টা করবে এরপর বিরত থাকবে। অর্থাৎ প্রথম বারেই যদি বোঝা যায় যে, ব্যস্ত আছে এখন রিসিভ করবে না, তাহলে দ্বিতীয়বার চেষ্টা না করাই উত্তম আখলাকের পরিচয় হবে।

৬. মোবাইলে কোন মিথ্যা কথা না বলা। মিথ্যা পরিচয় দেয়া বা নিজের অবস্থান সম্পর্কে কেউ জানতে চাইলে অন্য স্থানের নাম বলা। মোটকথা এজাতীয় যে কোন মিথ্যার আশ্রয় না নেয়া। কেননা, মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ ও মুনাফিকের আলামতের মধ্যে একটি। তাই

---

[৯৩০] সহীহ বুখারী: ২/৯২৩ মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৯৩১] সহীহ বুখারী: ২/৯২৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

তা পরিহার করা আবশ্যক। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বলেন-

قال رسول الله ﷺ : آية المنافق ثلث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি। যখন সে কথা বলে মিথ্যা বলে। যখন প্রতিজ্ঞা করে তা ভঙ্গ করে এবং আমানত রাখলে খেয়ানত করে।"[৯৩২]

৭. উদ্দেশ্যহীনভাবে কল না দেয়া। কেননা তা অপচয়ের মধ্যে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

"নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। শয়তান স্বীয় পালনকর্তার প্রতি অতিশয় অকৃতজ্ঞ।"[৯৩৩]

মসজিদে মোবাইলের ব্যবহার

১. রিংটোন খোলা রেখে মসজিদে প্রবেশ করা মসজিদের আদব বহির্ভূত কাজ। কেননা, হঠাৎ মোবাইলে রিংটোন বেজে উঠলে মসজিদের ভেতর শোরগোল হওয়ার আশঙ্কা থাকে, যা মসজিদের আদব পরিপন্থী হওয়ায় নিষেধ।

والسادس أن لا يرفع فيه الصوت من غير ذكر الله تعالى.

"মসজিদে আল্লাহর যিকির ব্যতীত কোন ধরনের আওয়াজ তথা দুনিয়াবী কথা না বলা।"[৯৩৪]

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন-

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿١﴾ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٢﴾

"মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের নামাযে বিনয়ী ও নম্র থাকে।"[৯৩৫]

২. নামায চলাকালে রিংটোন বাজলে হাতের মাধ্যমে এক চাপে বন্ধ করা। যদি একবার বন্ধ করার পর দ্বিতীয়বার বেজে উঠে, তাহলে 'আমলে কলীল' এর মাধ্যমে বন্ধ করা যাবে। তবে শর্ত হলো, আমলে কাছীর যেন না হয়। যদি 'আমলে কাছীর' হয়, তাহলে নামায ফাসেদ হয়ে যাবে।

العمل الكثير، وهو كل عمل لا يشك الناظر في فاعله أنه ليس في الصلاة عند عامة المشايخ، وهو المختار.

---

[৯৩২] সহীহ বুখারী: ১/১০, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৯৩৩] সূরা বনী ইসরাঈল: ২৭
[৯৩৪] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩২১, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৩৫] সূরা মু'মিনুন: ১-২

"আমলে কাছীর এমন কাজকে বলে, যা দেখে দর্শক মনে করে যে, সে নামাযে নেই।"[৯৩৬]

কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, মোবাইল বন্ধ করার উক্ত কাজটি যেন তিনবার سبحان ربي الأعلى পড়ার সমপরিমাণ সময়ের ভিতরে লাগাতার তিনবার না হয়। কেননা, এভাবে যদি লাগাতার এত অল্প সময়ের মধ্যে তিনবার মোবাইল বন্ধ করা হয়, তবে এটাও এক বর্ণনানুযায়ী 'আমলে কাছীর' এর মধ্যে গণ্য হবে এবং এর দ্বারা নামায ভেঙ্গে যাবে। আর পকেট থেকে বের করে মোবাইল দেখে বন্ধ করলে তাও 'আমলে কাছীর' এর অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নামায নষ্ট হয়ে যাবে।

وقيل: ما يكون ثلاثا متواليا حتى لو روح على نفسه بمروحة ثلاثا، أو حك موضعا من جسده ثلاثا، تفسدان على الولاء.

"কেউ কেউ বলেছেন, আমলে কাছীর বলা হয় এমন কাজকে যা লাগাতার তিনবার করা হয়। যেমন, কেউ তিনবার লাগাতার পাখা দ্বারা নিজেকে বাতাস করলো কিংবা শরীরের কোন এক স্থানে তিনবার লাগাতার চুলকালো, তাহলে তার নামায ভেঙ্গে যাবে।"[৯৩৭]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

الثالث: الحركات الثلاث المتوالية كثير وإلا فقليل.

"নামাযে একাধারে তিনবার হাত ব্যবহার করলে আমলে কাছীরের মধ্যে গণ্য হয়ে নামায নষ্ট হয়ে যাবে। তবে যদি লাগাতার তিনবার না হয় তাহলে আমলে কলীল হিসেবে গণ্য হবে, নামায ভঙ্গ হবে না।"[৯৩৮]

৩. নামাযে রিংটোন বাজলে 'আমলে কলীল' এর মাধ্যমে তা বন্ধ করা সম্ভব না হলে, নামায ভেঙ্গে রিংটোন বন্ধ করা জায়েয। কেননা, নামাযে খুশু-খুযুর গুরুত্ব অনেক। খুশু-খুযু ক্ষুণ্ন হয় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে। যেমন প্রস্রাব-পায়খানার বেগ থাকার কারণে খুশু-খুযুর সমস্যা হলে নামায ছেড়ে দেয়ার অনুমতি আছে, বরং কেউ কেউ উত্তমও বলেছেন।[৯৩৯]

৪. যদি নামায অবস্থায় কোন মুসল্লির রিংটোন বেজে উঠে, তাহলে অপর ব্যক্তির জন্য নামাযী ব্যক্তির রিংটোন বন্ধ করা বৈধ । এটি অন্যের মালিকানাধীন বস্তুর উপর হস্তক্ষেপ করার অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তা হবে উক্ত ব্যক্তির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন এবং তাকে সাহায্য করার নামান্তর। কেননা রিংটোন বাজার কারণে সকল মুসল্লীর নামাযের একাগ্রতা নষ্ট হয়।[৯৪০]

---

[৯৩৬] আদ্দুররুল মুনতাকা (মাজমাউল আনহুর এর সঙ্গের নুসখা): ১/১৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৯৩৭] মাজমাউল আনহুর: ১/১৮২, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন

[৯৩৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ২/৩৮৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৩৯] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৬৫৪, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

[৯৪০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৪৭৮ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

৫. কুরআনের আয়াত, হাদীস ও আযান এগুলো মোবাইলের রিংটোন হিসেবে সেট করা জায়েয নেই। কারণ রিংটোনের উদ্দেশ্য হলো, কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে কথা বলতে আগ্রহী হওয়ার বিষয়ে অবগত করা। এটা দরজার উপর হাতের দ্বারা খটখট আওয়াজ করার মত। এই অবগতিমূলক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য কুরআন পাকের আয়াত অথবা আযানের ধ্বনি ব্যবহার করা অসঙ্গতিপূর্ণ। একদিকে এতে আয়াত, আযান ইত্যাদির ন্যায় পুতঃপবিত্র শব্দসমূহের অপব্যবহার হয়। অন্যদিকে কোন কোন সময় এমনও হয় যে, টয়লেটে থাকা অবস্থায় কল আসে আর কুরআনের আয়াত বেজে উঠে যা কুরআনের মারাত্মক অসম্মান। ফকীহগণ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে আল্লাহর যিকির জাতীয় শব্দ ব্যবহার নাজায়েয বলেছেন। তাই এমন কর্মকান্ড থেকে বেঁচে থাকা অপরিহার্য। মোবাইলে সর্বদা স্বাভাবিক ও সাধারণ রিংটোন সেট করা উচিত। ইমাম কাযীখান রাহ. বলেন-

الفقاعي إذا قال عند فتح الفقاعي للمشتري: صل على محمد، قالوا: يكون آثما.

وكذا الحارس إذا قال في الحراسة: لا إله إلا الله يعني لأجل الإعلام بأنه مستيقظ.

رجل جاء إلى البزاز ليشتري منه ثوبا، فلما فتح المتاع، قال: سبحان الله، أو قال: اللهم صل على محمد إن أراد بذلك إعلام المشتري جودة ثيابه ومتاعه كره. اه

"দোকানদার যদি দোকান খোলার সময় ক্রেতাকে অবহিত করার জন্য বলে, 'সল্লি আলা মুহাম্মদ'। এই সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরাম বলেন যে, সে গুনাহগার হবে।

এমনিভাবে কোন প্রহরী পাহারা অবস্থায় জাগ্রত বুঝানোর জন্য 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, তাহলে সেও গুনাহগার হবে।

কোন ব্যক্তি কাপড় ব্যবসায়ীর কাছে কাপড় ক্রয় করার জন্য আসলে বিক্রেতা কাপড়ের গাঁইট খোলার সময় বলল, 'সুবহানাল্লাহ' অথবা 'আল্লাহুম্মা সল্লি আলা মুহাম্মদ' এগুলো বলে যদি তার উদ্দেশ্য হয় কাপড় উন্নতমানের এ কথা প্রকাশ করা, তাহলে সে গুনাহগার হবে।"[৯৪১]

يكره أن يقرأ القرآن في الحمام، لأنه موضع النجاسات، ولا يقرأ في بيت الخلاء، كذا في فتاوى قاضيخان.

لا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالأعمال. ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو كذا في القنية.

"গোসলখানা এবং টয়লেটে কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ। কারণ, এটা নাপাকির জায়গা। কাজে ব্যস্ত মানুষের নিকট জোরে কুরআন পড়া যাবে না। কুরআনের আরেকটি সম্মান হলো, তা বাজার ঘাটে না পড়া। অনুরূপভাবে অনর্থক কথাবার্তা হয় এমন জায়গায়

---

[৯৪১] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/১০৪, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া করাচী, পাকিস্তান

কুরআনের মর্যাদা রক্ষার্থে কুরআন তেলাওয়াত করা মাকরূহ।"[৯৪২]
এমনিভাবে কুরআনের কোন আয়াতকে ওয়েলকাম টিউনে ব্যবহার করাও নিষেধ।

৭. যে মোবাইলের স্ক্রীণে কোন প্রাণীর ছবি দৃশ্যমান, এমন মোবাইল সামনে রেখে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী, যদিও নামায হয়ে যাবে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ولبس ثوب فيه ثماثيل ذي روح، وأن يكون فوق رأسه، أو بين يديه أو بحذائه يمنة أويسرة، أو محل سجوده تمثال، ولو في وسادة منصوبة لا مفروشة.

"এমন কাপড় পরিধান করা যাতে কোন প্রাণীর ছবি থাকে বা কোন প্রাণীর ছবি মাথার উপর, সামনের দিকে ডানে বা বামে কিংবা সেজদার স্থানে এমনিভাবে কোন খাড়া বালিশে যদি থাকে, বিছানো বালিশে নয়।"[৯৪৩]

তবে পকেটে বা কোন কাপড় দ্বারা ঢাকা থাকলে মাকরূহ হবে না।

ওয়েলকাম টিউনে গানের ব্যবহার

মাসআলা: মোবাইলে এমন প্রোগ্রাম সেট করা যার ফলে সংযোগ স্থাপনকারী রিংটোনের স্বাভাবিক আওয়াজের স্থলে গান শুনতে পায়, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয। এটা শুধু গুনাহ নয় বরং গুনাহের প্রচার প্রসার এবং এর প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করাও বটে। এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনে কল করলে, কলকারী ব্যক্তি অনিচ্ছাকৃত এবং অপারগতাবশত গানের আওয়াজ শোনার কারণে গোনাহগার হবে না। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. বর্ণনা করেন-

عن أبي أمامة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ : إن الله عز وجل بعثنى رحمة للعالمين، وهدى للعالمين، وأمرني ربي عز وجل بمحق المعازف والمزامير والأوثان والصليب وأمر الجاهلية.[৯৪৪]

"হযরত আবু উমামা রাযি. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা আমাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য রহমত ও হিদায়াত স্বরূপ প্রেরণ করেছেন আর আমার রব আমাকে গান ও বাদ্যযন্ত্র বিনাশ সাধনের এবং মূর্তিপ্রথা, ক্রুশপ্রথা ও জাহেলী যুগের রীতিনীতি নির্মূল করার হুকুম করেছেন।"[৯৪৫]
অন্য হাদীসে গান-বাজনার ব্যাপারে বলা হয়েছে-

الغناء ينبت النفاق في القلب.[৯৪৬]

---

[৯৪২] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩১৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৪৩] আদ্দুররুল মুখতার: ২/৪১৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৪৪] أورده الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨١٧٩) وقال: رواه كله أحمد والطبراني وفيه علي بن يزيد، وهو ضعيف. انتهى. قلت: أما لفظ «إنما بعثني رحمة للعالمين» فقد ورد عند أبي داود (٤٦٦٠) بإسناد صحيح.

[৯৪৫] মুসনাদে আহমদ: ৫/২৫৭

[৯৪৬] رواه أبو داود في «سننه» (باب كراهية الغنا والزمر) وسكت عنه فهو عنده صالح.

"গান বাজনা অন্তরে নেফাক (মুনাফেকী) সৃষ্টি করে।"[৯৪৭]

ওয়েলকাম টিউনের মত রিংটোন হিসেবে গানের ব্যবহারও গুনাহ।

অপরিচিত মহিলার সাথে কথা বলা

গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে সরাসরি বা মোবাইলে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কথা বলা নিষেধ। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان النطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه.

"রাসূল ﷺ বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আদম সন্তানের উপর যিনার একটা অংশ লিখে দিয়েছেন, সে তার মুখোমুখি হবেই। সুতরাং চোখের যিনা হলো অবৈধ দৃষ্টিপাত, মুখের যিনা হলো অবৈধ কথা বলা। আর দৃষ্টিপাত ও কথা বলার পরেই অন্তরে কামনা বাসনা সৃষ্টি হয়। এরপর লজ্জাস্থান হয়তো সেটাকে বাস্তবায়ন করে সত্য প্রমাণিত করে অথবা বিরত থেকে ভুল প্রমাণিত করে।"[৯৪৮]

আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

وكذلك زنا اللسان النطق فيما يلتذ به من محادثة ما لا يحل له ذلك منه.

"তদ্রূপভাবে একজন অপরজনের সাথে এমন কথা বলাও মুখের যিনার অন্তর্ভুক্ত, যে কথা বলে তারা আনন্দ পায়, অথচ তা তাদের জন্য বৈধ নয়।"[৯৪৯]

প্রয়োজন ছাড়া গাইরে মাহরাম মহিলার সাথে কথা বলতে শরী'আত কঠোর ভাষায় নিষেধ করেছে। মহিলাদেরকেও নির্দেশ দিয়েছে তারা যেন গাইরে মাহরাম পুরুষের সাথে নরম আওয়াজে কথা না বলে এবং এমনভাবে কথা না বলে যাতে কোন পরপুরুষ অসৎ আচরণের সুযোগ পেয়ে বসে।

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল ক্রয়-বিক্রয়

ক্যামেরাযুক্ত মোবাইল সম্পর্কে শরী'আতের সিদ্ধান্ত হলো তা ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে, যেহেতু তা দ্বারা শুধু প্রাণীর ছবি তোলা হয় না বরং নিষ্প্রাণ জড়বস্তুর ছবিও তোলা হয়। তবে তার অপব্যবহার নাজায়েয অর্থাৎ মোবাইল দ্বারা প্রাণীর প্রতিকৃতি তোলা নাজায়েয। হযরত ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত-

أن رسول الله ﷺ قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.

"রাসূলুলাহ ﷺ বলেছেন, যারা কোন প্রাণীর ছবি তৈরি করে পরকালে তাদেরকে আযাব

---

[৯৪৭] সুনানে আবু দাউদ: হাদীস নং ৪৯২৯

[৯৪৮] সহীহ বুখারী: ২/৯২২-৯২৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৯৪৯] টিকা নং-১; সহীহ বুখারী: ২/৯২৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা (দুনিয়াতে) যেসব আকৃতি বানিয়েছ ঐ সবের মধ্যে প্রাণদান কর।"[৯৫০]

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত-

سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون.

"আমি রাসূলুলাহ ﷺ কে বলতে শুনেছি, নিশ্চয় কেয়ামতের দিন ছবি তৈরিকারীদেরকে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।"[৯৫১]

আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

لا تمثال إنسان أو طير لحرمة تصوير ذي الروح لو كان على خاتم فضة ثماثيل لا يكره.

"যেহেতু প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। তাই মানুষ এবং পাখির ছবি তোলা জায়েয নেই। আর যদি আংটির মধ্যে হয় তখন মাকরূহ হবে না।"[৯৫২]

এয়ারপোর্ট ইত্যাদি স্থানে মোবাইল চার্জ প্রসঙ্গ

এয়ারপোর্ট, রেলস্টেশন অথবা বাসস্ট্যান্ডের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল চার্জ দেয়াতে কোন দোষ নেই। যে কেউ সেখানের বিদ্যুৎ দ্বারা উপকৃত হতে পারবে। কারণ, কর্তৃপক্ষ তা সবার জন্যই উন্মুক্ত করে দিয়ে থাকে। তবে এক্ষেত্রে যদি কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা থাকে, তাহলে মোবাইল চার্জ দেয়া বৈধ হবে না। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

ولكل سقي أرضه من بحر أو نهر عظيم، كدجلة والفرات ونحوهما، لأن الملك بالإحراز، ولا إحراز.

"সাগর এবং বড় নদী থেকে নিজ জমিনে পানি সিঞ্চন করা সবার জন্য বৈধ হবে। যেমন দজলা, ফুরাত এবং এধরনের নদী। কেননা ব্যক্তি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় সংরক্ষণের মাধ্যমে। আর এখানে কারো কোন প্রকার সংরক্ষণ পাওয়া যায় না।"[৯৫৩]

অর্থাৎ সর্বসাধারণের জন্য উম্মুক্ত সম্পদ বা ব্যবস্থাপনা থেকে যে কেউ উপকৃত হতে পারে। তবে নিশ্চিত হতে হবে যে, কর্তৃপক্ষ সর্বসাধারণের জন্য অনুমতি দিয়েছে কি না। অনুমতি থাকলে ব্যবহার করা যাবে, অন্যথায় ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

মহল্লাবাসী ও মুসাফিরগণের মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল চার্জ দেয়া জায়েয হবে না। ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে উল্লেখ আছে-

ولا يحمل الرجل بسراج المسجد إلى بيته ويحمل من بيته إلى المسجد كذا في الخلاصة.

"মসজিদের বাতি ঘরে নিয়ে যাওয়া জায়েয হবে না। তবে ঘরের বাতি মসজিদে নিতে

---

[৯৫০] সহীহ বুখারী: কিতাবুল লিবাস, (باب عذاب المصورين); সহীহ মুসলিম : ২/২০১

[৯৫১] প্রাগুক্ত

[৯৫২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৫১৯, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৫৩] আদ্দুররুল মুখতার: ১০/১৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

পারবে।"[৯৫৪]

যেভাবে মসজিদের বাতি বা লাইটকে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা নিষেধ তেমনি মসজিদের অন্য কোন সম্পদ যেমন বিদ্যুৎ, ফ্যান ইত্যাদিও নিছক ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। সুতরাং মসজিদের বিদ্যুৎ দ্বারা মোবাইল ইত্যাদির চার্জ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। হ্যাঁ, যদি কেউ মসজিদে এ'তেকাফ করে, তাহলে প্রয়োজন অনুপাতে ব্যবহার করার অবকাশ রয়েছে।

এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে মোবাইলে কথা বলা

এতেকাফ অবস্থায় মসজিদে মোবাইলে দুনিয়াবী কথা বলা জায়েয নেই। হ্যাঁ, প্রয়োজনীয় কথা হলে প্রয়োজন অনুপাতে বলার অবকাশ রয়েছে। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

وكره (تحريما) ... وتكلم إلا بخير وما لا إثم فيه ومنه المباح عند الحاجة إليه لا عند عدمها.

"আর এতেকাফ অবস্থায় কথা বলা মাকরূহে তাহরীমী। তবে কোন কল্যাণকর কথা বলাতে কোন অসুবিধা নেই। অর্থাৎ যে কথায় গুনাহ নেই তা বলা যাবে। আর প্রয়োজনের সময় মুবাহ কথা বলার হুকুমও এটাই। তবে প্রয়োজন না হলে জায়েয হবে না।"[৯৫৫]

মোবাইলে সংরক্ষিত কুরআন শরীফ অযু ছাড়া স্পর্শ করা

মোবাইলে মূলত লেখা ডিসপ্লেতে প্রকাশিত হয়। ডিসপ্লের উপর আরো একটি গ্লাস (স্কিন) বসানো থাকে। ডিসপ্লে ও স্কিন এক নয়। তাই স্কিন ভিন্ন গ্লাস হওয়ায় অযু ছাড়া হাত রাখার অবকাশ রয়েছে। তবে কুরআনের আদাবের দাবি হলো, এভাবে হাত না রাখা। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

يجوز للمحدث الذي يقرأ القرآن من المصحف تقليب الأوراق بقلم أو عود أو سكين.

"অযুবিহীন ব্যক্তির জন্য কলম, কাঠ কিংবা ছুরির মাধ্যমে পৃষ্ঠা উল্টিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করা বৈধ।"[৯৫৬]

মোবাইলে সিজদার আয়াত শোনা

উসমান আলীর সাথে মোবাইলের মাধ্যমে কথা বলছে এমন সময় আলীর পাশে এক ব্যক্তি সিজদার আয়াত তেলাওয়াত করল, যা মোবাইলের মাধ্যমে উসমান শুনে ফেলল। এ অবস্থায় উসমানের উপর তেলাওয়াতে সেজদা ওয়াজিব হবে। আর যদি মোবাইলে রেকর্ড করা আয়াত শোনে তাহলে সেজদা ওয়াজিব হবে না। আল্লামা ইবরাহীম হালাবী রাহ. বলেন-

---

[৯৫৪] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১১৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৫৫] আদ্দুররুল মুখতার: ৩/৪৪১-৪৪২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৫৬] আল বাহরুর রায়েক: ১/২০১-২০২, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান

ولو سمعها من الطائر أو الصدى لا تجب لأنه محاكاة وليس بقراءة.

"যদি কোন ব্যক্তি পাখি কিংবা প্রতিধ্বনি থেকে আয়াতে সেজদা শোনে, তাহলে তার উপর সেজদায়ে তেলাওয়াত ওয়াজিব হবে না। কেননা, এটি একটি নকল আওয়াজ, প্রকৃত তেলাওয়াত নয়।"[৯৫৭]

অনুমতি ছাড়া কারো কথা রেকর্ড করা

সাধারণভাবে মোবাইলে কারো কথা তার অনুমতি ব্যতীত রেকর্ড করা জায়েয নেই। কেননা নবী কারীম ﷺ বলেছেন, মজলিসে যে কথা বলা হয় তা আমানত। অনুমতি ছাড়া রেকর্ড করার দ্বারা আমানতের খেয়ানত হতে পারে। কারণ এক্ষেত্রে এসব কথা অন্যের কাছে পৌঁছে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তবে ওয়াজ নসীহত ইত্যাদি অনুমতি ছাড়া রেকর্ড করতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা এগুলোর মূল উদ্দেশ্যই থাকে ব্যাপক প্রচার-প্রসার। সুতরাং এই মাসআলাটি আমাদের বর্ণিত মাসআলার আওতাধীন নয়। হযরত জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রাযি. বর্ণনা করেন-

عن النبي ﷺ قال: إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة، وقال محشيه ثم التفت: يعني إذا حدث أحد عندك حديثا ثم غاب، صار حديثه أمانة عندك، ولا يجوز إضاعتها والخيانة فيها بإفشائها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'যখন কোন ব্যক্তি ডানে বামে তাকিয়ে গোপনে কথা বলে তখন তা আমানত হয়ে যায়। টীকাকার (এ হাদীসের ব্যাখায়) বলেন, যখন কেউ তোমার নিকট কোন একটি কথা বলে অতঃপর সে দূরে চলে যায়, তখন ঐ কথাটি তোমার নিকট আমানত হিসেবে থাকবে। তা অন্যের নিকট বলার মাধ্যমে খেয়ানত করা বৈধ হবে না।"[৯৫৮]

রিচার্জ ভুল হলে

যার টাকা ভুলে অন্যের মোবাইলে চলে গেছে সে টাকা ফেরত চাইতে পারবে। এ পরিস্থিতিতে টাকা উদ্ধার করা সম্ভব না হলে যার ভুল হয়েছে ক্ষতিপূরণ তার উপর বর্তাবে। আর নিজের মোবাইলে ভুলবশত চলে এলে মূল মালিককে ফিরে দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। তবে যদি সাধ্যমত চেষ্টা করেও মালিকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব না হয়, তাহলে সে পরিমাণ অর্থ সদকা করে দিবে।[৯৫৯]

স্ক্র্যাচ কার্ডের ক্রয়-বিক্রয়

নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে কম-বেশিতে স্ক্র্যাচ কার্ড ক্রয়-বিক্রয় করা বা বেশি টাকা দিয়ে কম টাকা রিচার্জ করা জায়েয। যেমন ১০০ টাকার কার্ড ৯৮ টাকা কিংবা ১০২ টাকায় ক্রয়-বিক্রয় করা বা ১০ টাকা লোডের জন্য ১১ টাকা দেয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কেননা, কার্ড

---

[৯৫৭] গুনয়াতুল মুতামাল্লী: ৫০০, সুহাইল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান; আদ্দুররুল মুখতার: ২/৫৮৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৫৮] জামে তিরমযী: ২/১৭, হাদীস নং ২০৮৬, ইমাম তিরমিযী রাহ. হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।

[৯৫৯] বাদায়েউস সানায়ে: ৫/২৯৮, যাকারিয়া

বা রিচার্জের মাধ্যমে আমরা টেলিযোগাযোগ সুবিধা পাই, যা একটি সেবা। আর অংক যা দেখানো হয় তা শুধু হিসাব রক্ষার্থে। যেহেতু টাকার বিনিময়ে সেবা কেনাবেচা হচ্ছে, সুতরাং তাতে কমবেশি জায়েয হবে, সুদ হবে না।[৯৬০]

মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় ও ডাউনলোডিং

মোবাইল ক্রয়-বিক্রয় ও মেরামত করা জায়েয। অনুরূপ তার মধ্যে এমন প্রোগ্রাম সেট করা, যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং যার মধ্যে শরী'আত পরিপন্থী কিছু থাকে না, তা জায়েয। কিন্তু গান, অশ্লীল ছবি ডাউনলোড করা কোন অবস্থাতেই জায়েয নেই। এমনিভাবে নাজায়েয প্রোগ্রাম ডাউনলোড করে বিনিময় নেয়া জায়েয নেই।
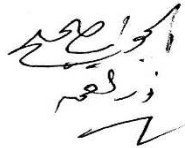
لا تصح الإجارة... لأجل المعاصي مثل الغنا والنوح والملاهي.

"কোন গুনাহের কাজের জন্য ভাড়া নেয়া বা দেয়া বৈধ নয়। যেমন গান গাওয়া, বিলাপ করা, বিনোদনের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি।"[৯৬১]

ولا يجوز الاستيجار على الغنا والنوح، وكذا سائر الملاهي، لأنه استيجار على المعصية، والمعصية لا تستحق بالعقد.

"গান, বিলাপ অনুরূপভাবে অন্যান্য বিনোদনের বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদির ভাড়া নেয়া জায়েয হবে না। কেননা, এটা হলো গুনাহের জন্য ভাড়া নেয়া আর গুনাহ লেনদেনের উপযুক্ত নয়।"[৯৬২]
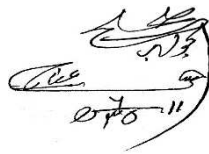
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম
হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১১ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৯৬০] ফাতহুল কাদীর: ৬/১৫৯; তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম: ১/৪০০
[৯৬১] আদ্দুররুল মুখতার: ৯/৭৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৬২] হেদায়া: ৩/৩০৩, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

এলকোহল মিশ্রিত ঔষধ ও সেন্টের বিধান

মাওলানা শিহাবুদ্দীন কুষ্টিয়া

ঔষধ মানুষের অন্যতম প্রয়োজনীয় বস্তু। আর বর্তমানে সেন্ট মানুষের বহুল ব্যবহৃত একটি সামগ্রী। কিছু ঔষধ ও সেন্টে এলকোহল ব্যবহার করা হয়। এলকোহল একটি নেশা সৃষ্টিকারী তরল পদার্থ। নেশা সৃষ্টিকারী তরল বস্তু সাধারণত হারাম ও নাপাক হয়ে থাকে। তাই এলকোহল মিশ্রিত ঔষধ ও সেন্টের ব্যাপারে এই প্রশ্ন জাগে যে, তা কি হারাম ও নাপাক হবে? বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে এলকোহল মিশ্রিত ঔষধ ও সেন্টের শর'য়ী বিধান আলোচনা করা হবে। প্রথমে এলকোহলের পরিচয়, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যাতে মূল বিষয়ের হুকুম বুঝতে সুবিধা হয়।

এলকোহলের পরিচয় ও প্রকারভেদ

এলকোহল হলো রঙহীন এমন তরল পদার্থ যা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। আর তা গঠিত হয় তিন প্রকারের গ্যাস তথা কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সমন্বয়ে।[৯৬৩]

এলকোহলের বহু প্রকার আছে। তবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয় দুই প্রকার: মিথাইল ও ইথাইল।

১. মিথাইল এলকোহল অন্যান্য প্রকারের তুলনায় বিষাক্ত ও নেশা সৃষ্টিকারী। যদি এই এলকোহল পান করা হয়, তাহলে এর দ্বারা অন্ধত্ব সৃষ্টি হতে পারে, এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। পেইন্ট ও কাঠের পলিশকে গলানোর জন্য এটি ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন আতর এবং ঔষধ গলানোর ধাতু হিসেবেও এর ব্যবহার রয়েছে।

২. ইথাইল এলকোহলও নেশাসৃষ্টিকারী। খুব দ্রুতগতিতে তা বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। এটা শরাবের মাঝে নেশা সৃষ্টির মূল উপাদান। সাধারণ এলকোহল পানি থেকে হালকা হয় এবং পানির মধ্যে মিশে যায়।

বর্তমানে এলকোহল বিভিন্নভাবে ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে পেইন্ট, ঔষধ, রঙ, সাবান ইত্যাদি বানানোর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ইথাইল জীবাণু দূর করা ক্ষতস্থান পরিষ্কার ও সিরিঞ্জ পরিষ্কার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন যৌগিক পদার্থকে (বিভিন্ন বস্তু দিয়ে যা তৈরি হয়) তরল রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়। হোমিওপ্যাথিক ঔষধে দ্রুত ক্রিয়া সৃষ্টির জন্যে এবং এলোপ্যাথিক ঔষধে চেতনাবোধ হ্রাস করার জন্য ইথাইল ব্যবহার করা হয়।

এলকোহলের বৈশিষ্ট্য

উল্লিখিত আলোচনার মাধ্যমে এলকোহল সম্পর্কে যেসব ফলাফল বের হয়, তা নিম্নরূপ-

১. এলকোহল একটি নেশা সৃষ্টিকারী বস্তু।

২. তরল পদার্থে ঝাঁজ সৃষ্টিকারী।

---

[৯৬৩] জাদীদ ফিকহী তাহকীকাত: ১০/৪৫, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ

৩. যৌগিক পদার্থ তরলকারী বা তরল পদার্থের তরলতা দীর্ঘায়িতকারী।[৯৬৪]

এলকোহল মিশ্রিত ঔষধ ও সেন্টের বিধান

এলকোহলের মূল জটিলতা হলো, এটা নেশা সৃষ্টিকারক উপাদান। আর নেশা সৃষ্টিকারী যে কোন জিনিসের প্রতি শরী'আত সবিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করে থাকে। আর এলকোহল নেশা সৃষ্টিকারী হওয়ায় এর শর'য়ী বিধান স্থির হবে মদ ও শরাবের সাথে মিল রেখে অর্থাৎ শর'য়ী হুকুম স্থির হওয়া নির্ভর করবে এলকোহল তৈরির উপাদানের উপর।

আর উপাদানের দিক থেকে এলকোহল দু'ধরনের।

প্রথম প্রকার : আঙ্গুরের কাচা রস বা জ্বাল দিয়ে ঘনকৃত রস, খেজুর ও কিশমিশ দ্বারা তৈরি এলকোহল।

উল্লিখিত উপাদান দিয়ে তৈরি পানীয় সকল ফিকাহবিদের মতে মদের অন্তর্ভুক্ত এবং হারাম। সুতরাং মদের ক্ষেত্রে যে সমস্ত বিধান রয়েছে তা এখানেও প্রযোজ্য। যেমন নাপাক হওয়া, হারাম হওয়া, লেনদেন অবৈধ হওয়া ইত্যাদি। হাদীস শরীফে উল্লেখ আছে-

قال رسول الله ﷺ : الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'দুই প্রকার বৃক্ষ থেকে মদ তৈরী হয়। তা হলো খেজুর ও আঙ্গুর।"[৯৬৫]

মদের লেনদেন হারাম হওয়ার ব্যাপারে হাদীস শরীফে এসেছে, ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত-

قال رسول الله ﷺ ان الذي حرم شرابها حرم بيعها.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে যিনি (আল্লাহ তা'আলা) মদ পানকে হারাম করেছেন, তিনি মদ বিক্রিকেও হারাম করেছেন।"[৯৬৬]

আল্লামা আলী আল মারগীনানী রাহ. মদের প্রকার ও হুকুম সম্পর্কে বলেন-

الأشربة المحرمة أربعة: الخمر وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، والعصير إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثيه وهو الطلاء... ونقيع التمر وهو السكر، ونقيع الزبيب.

وكل الثلاثة المذكورة حرام بالإجماع إذا غلى واشتد.

"হারাম পানীয় চার প্রকার। ১. খমর অর্থাৎ আঙ্গুরের রস যখন ঘন হয়ে ফেনাযুক্ত অবস্থায় পৌঁছায়, তখন তা খমর বা মদ বলে গণ্য হয়। ২. তিলা অর্থাৎ আঙ্গুরের রস যখন জ্বাল দেয়ার দ্বারা দুই তৃতীয়াংশের কম শুকিয়ে যায়। ৩. সুক্র অর্থাৎ খেজুর ভিজিয়ে রেখে তৈরি শরবত। ৪. কিশমিশ ভিজিয়ে রেখে তৈরি শরবত।[৯৬৭] (প্রথম প্রকার সর্বাবস্থায়

---

[৯৬৪] দ্রষ্টব্য, জাদীদ ফিকহী তাহকীকাত: ১০/৪৫-৪৭, কুতুবখানা নাঈমিয়া, দেওবন্দ

[৯৬৫] সহীহ মুসলিম: হাদীস নং ১৯৮৫

[৯৬৬] সহীহ মুসলিম: ২/২২

[৯৬৭] হেদায়া: ৪/৪৯২, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

হারাম।)আর শেষোক্ত তিন প্রকার যখন ঘন হবে তখন তা সর্বসম্মতিক্রমে হারাম হবে।"[৯৬৮]
মদ নাপাক হওয়ার ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

هي نجسة غليظة كالبول والدم.

"মদ, পেশাব ও রক্তের ন্যায় অত্যাধিক নাপাক।"[৯৬৯]

সুতরাং প্রথম প্রকার আঙ্গুরের রস দিয়ে তৈরি এলকোহল মিশ্রিত সেন্ট হারাম ও নাপাক, যা ব্যবহার করা নাজায়েয। যেমনটি ফাতাওয়ায়ে আলমগীরীতে আছে-

إذا طرح في الخمر ريحان، يقال له: سوسن حتى توجد رائحته، فلا ينبغي أن يدهن أو يتطيب بها، ولا يجوز بيعها.

"যখন মদের সুবাস অনুভব করার জন্য সুগন্ধিযুক্ত ফুল ঢেলে দেয়া হয় যাকে সাওসান (এক প্রকার ফুলের গাছ) বলা হয় তখন তা থেকে তেল লাগানো কিংবা সুগন্ধি হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয নেই এবং তা বিক্রি করাও নাজায়েয।"[৯৭০]

তবে উল্লিখিত উপাদান দ্বারা তৈরী এলকোহল মিশ্রিত সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয হবে যদি উক্ত উপাদান থেকে নেশা সৃষ্টিকারী শক্তিকে লবণ ইত্যাদি দ্বারা বিনষ্ট করা হয়।

أما إذا خلله بعلاج بالملح أو بغيره يحل عندنا.

"যদি লবণ বা অন্য কিছু ব্যবহার করে মদকে সিরকা বানানো হয়, তাহলে হানাফী ফকীহগণের মতে তা হালাল বলে গণ্য হবে।"[৯৭১]

এক্ষেত্রে আমরা অভিজ্ঞদের শরণাপন্ন হতে পারি যে, কোন কোন বস্তু দ্বারা নেশা সৃষ্টিকারী শক্তি বিনষ্ট করা হয় এবং সেন্ট বা ঔষধের ক্ষেত্রে তা ব্যবহার করা হয় কি না? এমনিভাবে যদি এলকোহলের প্রকৃত অবস্থা বহাল না থাকে, বরং তার সাথে অন্য কোন বস্তু মিশ্রণের ফলে প্রকৃত অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তাহলে এমন এলকোহল মিশ্রিত সেন্টও ব্যবহার করা যাবে। কেননা, তখন এলকোহলের হাকীকত (মূল অবস্থা) পরিবর্তিত হয়ে যায়। আর নাপাক বস্তুর মূল অবস্থা পরিবর্তন হয়ে গেলে তা আর নাপাক থাকে না। যেমন ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে-

حمار وقع في مملحة فصار ملحا... فإن ذلك... انقلاب حقيقة إلى حقيقة أخرى.

"গাধা লবণের খনির মধ্যে পড়ে গিয়ে লবণ হয়ে গেলে সে লবণ পাক বলে গণ্য হবে। কারণ গাধার রূপ পরিবর্তন হয়ে লবণে পরিণত হয়েছে।"[৯৭২]

দ্বিতীয় প্রকারঃ জব, মধু, বরই, আলু, আঁখ ও আপেল ইত্যাদি উপাদান দিয়ে যে এলকোহল

---

[৯৬৮] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৩২, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৬৯] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৪১০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৭০] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৪১০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৭১] ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৪১০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; মাজমাউল আনহুর: ৪/২৫১, দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন
[৯৭২] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১/৫২০, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

বা যেসব নেশা জাতীয় দ্রব্য তৈরী করা হয় সেগুলোও অধিকাংশ ফকীহের মতে মদের অন্তর্ভুক্ত এবং তা হারাম ও নাপাক। হানাফী ফকীহদের মধ্যে ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মতেও মদের অন্তর্ভুক্ত ও হারাম, পরিমাণে তা কম হোক বা বেশি হোক। যেমন আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

حرمها محمد أي الأشربة المتخذة من العسل والتين ونحوهما... مطلقا، قليلها وكثيرها وبه يفتى وفي الشامي: وهو قول الأئمة الثلاثة.

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ. ডুমুর, মধু ইত্যাদি দ্বারা তৈরি পানীয়কে হারাম বলেছেন। তার পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক (বর্তমানে ফেতনা-ফাসাদ বৃদ্ধি পাওয়ায়) ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মতের উপর ফাতওয়া দেয়া হয়। ফাতাওয়ায়ে শামীতে আছে, ইমাম শাফে'য়ী, আহমদ ও মালেক রাহ. ইমামত্রয়ের মতও এটি।"[৯৭৩]

আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. আরো বলেন-

وقال محمد: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وهو نجس أيضا وفي الشامي: أن نجاستها غليظة.

"ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেছেন, যেসব মাদকদ্রব্য অধিক পরিমাণ পান করলে নেশা সৃষ্টি করে সেসব মাদকদ্রব্য অল্প পরিমাণ পান করাও হারাম এবং নাপাকে গালিযা যা ব্যবহার করা নাজায়েয।"[৯৭৪]

তবে ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর মতে দ্বিতীয় প্রকার (অর্থাৎ তিলা উপাদান দ্বারা তৈরি পানীয়) তখনই মদের অন্তর্ভুক্ত হবে, যখন তা নেশা সৃষ্টি হওয়ার পরিমাণে পৌঁছে। আর যদি নেশা সৃষ্টির পরিমাণে না পৌঁছে, তাহলে তা পান করা হারাম হবে না।

যেমন তাতারখানিয়াতে উল্লেখ আছে-

وإن اتخذ نبيذ من الشعير أو الذرة أو التفاح أو العسل واشتد وهو مطبوخ، أو غير مطبوخ، فإنه يجوز شربه ما دون السكر عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى.

"যদি জব, ভুট্টা, আপেল ও মধু দ্বারা মাদকদ্রব্য তৈরি করা হয়, তাহলে ঘন অবস্থায় তা সামান্য পরিমাণ অর্থাৎ যে পরিমাণ নেশা সৃষ্টি করে না সে পরিমাণ পান করা ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর মতে জায়েয, জ্বাল দেয়া হোক বা না হোক।"[৯৭৫]

সুতরাং দ্বিতীয় প্রকার উপাদান দ্বারা তৈরী এলকোহল মিশ্রিত সেন্ট সামান্য পরিমাণ ব্যবহার করা জায়েয এবং লেনদেন করাও বৈধ। যেমন আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

وصح بيع غير الخمر أي عنده... الفتوى على قوله في البيع.

"খমর ব্যতীত অন্য মাদক দ্রব্য বিক্রি করা আবু হানীফা রাহ. এর মতে জায়েয। আর

---

[৯৭৩] আদ্দুররুল মুখতার: ১০/৩৬, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৭৪] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৩৮ মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[৯৭৫] ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ১৮/৪৩৩, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

বেচাকেনার মাসআলায় আবু হানীফা রাহ. এর মতের উপর ফাত্ওয়া।"[৯৭৬]
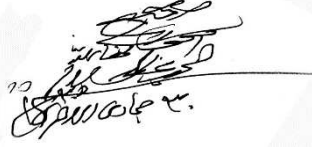
বর্তমানে ঔষধ ও সেন্টে যে এলকোহল ব্যবহার করা হয়, তা দ্বিতীয় প্রকারভুক্ত। এজন্য ইমাম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ রাহ. এর বর্ণনানুযায়ী অল্প পরিমাণ (যা নেশা সৃষ্টি করে না) ব্যবহার করে কোন জিনিস প্রস্তুত করলে তা হারাম ও নাপাক হবে না।

বর্তমান যুগে সেন্ট, স্প্রে, ঔষধ ইত্যাদিতে عموم البلوى অর্থাৎ ব্যাপকভাবে এলকোহল ব্যবহার হয়। আর অধিকাংশ এলকোহল দ্বিতীয় প্রকার উপাদান দিয়ে প্রস্তুত করা হয়। সাধারণত সেন্টে যে পরিমাণ এলকোহল ব্যবহার করা হয় তা অল্প হওয়ায় ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম আবু ইউসুফ রাহ. এর মতের উপর ফতোয়া প্রদান করা শ্রেয়।[৯৭৭]
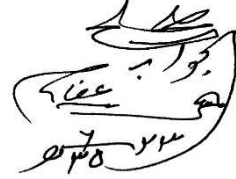
ইসলামিক ফিকহ একাডেমী ইন্ডিয়া এক সেমিনারে এলকোহল সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে তা নিম্নরূপ:

১. কিছু ঔষধে 'ইথাইল' এলকোহল ব্যবহার করা হয়। এই এলকোহল নেশা সৃষ্টিকারী এবং ঔষধে ব্যবহার হওয়ার পরেও তার হাকীকত পরিবর্তিত হয় না। চিকিৎসার ক্ষেত্রে শরী'আত যে ছাড় দিয়েছে, সে হিসেবে একান্ত প্রয়োজনে এলকোহল মিশ্রিত ঔষধ ব্যবহার করা বৈধ।

২. আতরে যে এলকোহল ব্যবহার করা হয়, বিশেষজ্ঞদের গবেষণা অনুযায়ী তা নেশা সৃষ্টিকারী নয়। এ জন্য তা নাপাক নয়।[৯৭৮]
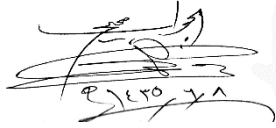
<u>সত্যায়নে</u>

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও মুহাদ্দিস, দারুল উলূম হাটহাজারী
২৩ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী ফরিদুল হক হাফিযাহুল্লাহ
মুফতী ও উস্তায, দারুল উলূম হাটহাজারী
০৮ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

[৯৭৬] ফাতাওয়ায়ে শামী: ১০/৩৫, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৭৭] আহসানুল ফাতাওয়া: ৮/৪৮৪, ৪৮৮, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ; ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়া: ১০/১৫৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

[৯৭৮] জাদীদ ফিকহি তাহকীকাত: ১০/৩৮, মাকতাবা নাঈমিয়া, দেওবন্দ

দাড়ি ও চুলের বিধান

মাওলানা বেলাল উদ্দীন রামুভী

প্রত্যেক জাতি ও ধর্মের বিশেষ কিছু নিদর্শন থাকে, যা উক্ত ধর্মের প্রতীক হিসেবে পরিচিত। ইসলামের অন্যতম নিদর্শন হলো দাড়ি, যা হযরত মুহাম্মদ ﷺ সহ সকল নবীর আদর্শ ও সুন্নাত। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল যেমন ছিলো, তেমনিভাবে চুল রাখা আমাদের কর্তব্য। সর্বোপরি জীবনের সকল ক্ষেত্রে চুল, দাড়িসহ তাঁর সুন্নত ও আদর্শ খুঁজে বের করা এবং সে সকল আদর্শে আদর্শবান হওয়া আমাদের জন্য অপরিহার্য। তাই দাড়ি ও চুলের ব্যাপারে নববী আদর্শ এবং ইসলামের নীতিমালা ও বিধানাবলী কুরআন-সুন্নাহর আলোকে বিস্তারিতভাবে নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

কুরআনের আলোকে দাড়ি

পূর্বযুগের নবীদের দাড়ি ছিলো এবং তা লম্বাও ছিলো। এ কথার প্রমাণ কুরআনে কারীমে পাওয়া যায়। যেমন হযরত হারুন আ. হযরত মূসা আ. কে সম্বোধন করে বলেছেন-

لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي

"তুমি আমার দাড়ি ধরো না।"[৯৭৯]

হযরত হারুন আ. এর দাড়ি এত লম্বা ছিল যা ধরার উপযুক্ত অর্থাৎ এক মুষ্টি পরিমাণ ছিল।

তাফসীর বিশারদগণ দাড়ি মুন্ডানোকে আল্লাহর সৃষ্টির মাঝে হস্তক্ষেপ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আর সৃষ্টির মাঝে পরিবর্তন করা অভিশপ্ত শয়তানের কাজ। কুরআনে কারীমে শয়তানের কতিপয় প্রতিশ্রুতি উল্লেখ করে বলা হয়েছে-

وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ ٱللَّهِ

"অবশ্যই আমি (শয়তান) তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করবো,তারা যেন আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতিকে পরিবর্তন করে।"[৯৮০]

উক্ত আয়াতের তাফসীরে হাকীমুল উম্মত হযরত আশরাফ আলী থানভী রাহ. 'বয়ানুল কুরআনে' লিখেন-

اور یہ اعمال فسقیہ سے ہے جیسے داڑھی منڈانا، بدن گدانا وغیرہ ۔

"আল্লাহর সৃষ্ট আকৃতির পরিবর্তন সাধন ফাসেকী কাজসমূহের অন্তর্ভুক্ত। যেমন দাড়ি মুণ্ডন

---

[৯৭৯] সূরা তুহা: ৯৪
[৯৮০] সূরা নিসা: ১১৯

করা, শরীর কেটে বা খোদাই করে কিছু অংকন করা প্রভৃতি।"[৯৮১]

একবার এক ব্যক্তি হযরত থানভী রাহ. কে জিজ্ঞাসা করলো যে, পুরো কুরআন শরীফের কোন জায়গায় দাড়ি রাখা বা মুন্ডানো সম্পর্কে কোন আলোচনা নেই। তার জবাবে তিনি কুরআনের উক্ত আয়াত পড়ে বললেন, আয়াত থেকে বোঝা যায় যে, দাড়ি মুন্ডানো গুনাহ ও শয়তানী কাজ সমূহের অন্তর্ভুক্ত। মোটকথা, দাড়ি মুন্ডানো হারাম হওয়ার বিষয়টি কুরআন থেকেও প্রমাণিত।

হাদীসের আলোকে দাড়ি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ خالفوا المشركين ووفروا اللحى، واحفوا الشوارب.

"নবী কারীম ﷺ ইরশাদ করেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধাচরণ কর। (আর তা এভাবে যে) দাড়ি লম্বা কর এবং গোঁফ কর্তন কর।"[৯৮২]

অনুরূপভাবে ইবনে ওমর রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

قال رسول الله ﷺ : أنهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন, গোঁফ ভালভাবে খাটো কর আর দাড়ি বাড়াও।"[৯৮৩]

হযরত আবু হুরায়রা রাযি. থেকে বর্ণিত, আরেকটি হাদীসে আছে-

أن رسول الله ﷺ قال: إن فطرة الإسلام الغسل يوم الجمعة، والاستنان، وأخذ الشارب، وإعفاء اللحى، فإن المجوس تعفي شواربها وتحفي لحاها، فخالفوهم، حدوا شواربكم وأعفوا لحاكم.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, নিশ্চয় ইসলামের স্বভাব হলো শুক্রবারে গোসল করা, মিসওয়াক করা, মোচ কাটা, দাড়ি লম্বা রাখা। কেননা অগ্নিপূজকরা মোচ লম্বা রাখে আর দাড়ি খাটো করে। সুতরাং তোমরা তোমাদের মোচ খাটো করে এবং দাড়ি লম্বা রেখে তাদের বিরোধিতা কর।"[৯৮৪]

উক্ত হাদীসসমূহের মর্মার্থ হলো, মোচ ছোট করা ও দাড়িকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। এছাড়া উসূলে ফিক্হের কিতাবে আছে যে, জুমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে আমরের সীগা (আদেশসূচক ক্রিয়া) ওয়াজিবের জন্য ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ যতক্ষণ পর্যন্ত ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার আলামত পাওয়া না যাবে, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াজিবই উদ্দেশ্য হবে। আর যদি ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহারের আলামত থাকে, তাহলে তো ওয়াজিবের অর্থই নির্ধারিত হবে।

---

[৯৮১] বয়ানুল কুরআন: ১/৪০৫, মাকতাবাতুল ইত্তেহাদ, দেওবন্দ
[৯৮২] সহীহ বুখারী: হাদীস নং ৫৮৯২
[৯৮৩] সহীহ বুখারী: ২/৮৭৫
[৯৮৪] সহীহ ইবনে হিব্বান: হাদীস নং ১২২১

প্রকাশ থাকে যে, উক্ত হাদীসসমূহে আদেশসূচক ক্রিয়া ওয়াজিবের অর্থে ব্যবহৃত হওয়ার আলামত হলো, হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর নিম্নোক্ত উক্তি-

أمرنا بإعفاء الشوارب وإعفاء اللحى.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে গোঁফ কর্তন করার ও দাড়ি বৃদ্ধি করার নির্দেশ দিয়েছেন।"[৯৮৫]

ইমাম নববী রাহ. বলেন-

وأما (إعفاء اللحية) فمعناه توفيرها وهو معنى (أوفوا اللحى) في الرواية الأخرى، وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك... فحصل خمس روايات : أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ، ومعناها كلها : تركها على حالها. هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه.

"إعفاء اللحية এর অর্থ হলো, দাড়ি বৃদ্ধি করা। অন্য রেওয়ায়েতে أوفوا اللحى এর অর্থও এটাই। পারস্যবাসীদের অভ্যাস ছিলো, দাড়ি ছাঁটা। শরী'আত এ থেকে নিষেধ করেছে।... দাড়ি সম্পর্কে মোট পাঁচটি রেওয়ায়েত পাওয়া গেলো, أعفوا، أوفوا، وأرخوا، وأرجوا ووفروا। সবগুলো রেওয়ায়েতের অর্থ একই, দাড়িকে নিজ অবস্থায় ছেড়ে দেয়া। হাদীসের শব্দ থেকে এ অর্থই সুস্পষ্ট।"[৯৮৬]

ইজমায়ে উম্মত ও দাড়ি মুন্ডানো

চার মাযহাবের ইমামগণ এ ব্যাপারে একমত যে, দাড়ি রাখা ও বৃদ্ধি করা ওয়াজিব আর মুন্ডানো হারাম। শায়খুল হাদীস যাকারিয়া রাহ. বলেন-

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على وجوب توفير اللحية وحرمة حلقها.

"চার মাযহাবের ইমামগণ দাড়ি বৃদ্ধি করা ওয়াজিব ও দাড়ি মুন্ডানো হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত।"[৯৮৭]

হাফেজ ইবনে কাছির রাহ. এর রচিত 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থের একটি শিরোনাম এরূপ-

«الأمر بإلزام القلندرية بترك لحاهم وحواجبهم وشوارحهم، وذلك محرم بالإجماع».

"কালান্দারিয়া গোত্রের লোকজনের উপর দাড়ি, ভ্রু ও গোঁফ না মুন্ডানোর নির্দেশ, যা উম্মতের ইজমার ভিত্তিতে হারাম।"[৯৮৮]

---

[৯৮৫] সহীহ মুসলিম: ১/১২৯
[৯৮৬] শরহু মুসলিম, নববী: ১/১২৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ
[৯৮৭] দাড়হী কা উজুব: ২
[৯৮৮] আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া: ১৪/৩১৪

এ ব্যাপারে আল্লামা মাহমুদ খাত্তাবী রাহ. বলেন-

فلذا كان حلق اللحية محرما عند أئمة المسلمين المجتهدين، أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم.

"মুসলমানদের মুজতাহিদ ইমামগণ তথা ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফে'য়ী ও ইমাম আহমদ রাহিমাহুমুল্লাহ প্রমুখের মতে দাড়ি মুন্ডানো হারাম।"[৯৮৯]

ইমাম ইবনুল হুমাম রাহ. বলেন-

وأما الأخذ منها وهي دون ذلك، كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال، فلم يبحه أحد.

"একমুষ্টির ভেতরে দাড়ি কর্তন করা কারো মতেই জায়েয নেই। যেমনটি করত কতিপয় পাশ্চাত্যবাদী ও মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী পুরুষ।"[৯৯০]

অতএব এক মুষ্টির ভেতরে দাড়ি কাটা যখন কারো মতে জায়েয নেই, সেখানে দাড়ি মুন্ডানো যে সবার মতেই হারাম হবে তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট। একারণেই হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রাহ. বলেছেন-

قلت قوله (لم يبحه أحد) نص في الإجماع فقط.

"আল্লামা ইবনুল হুমাম ও আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. এর বাণী لم يبحه أحد (তথা কারো মতেই বৈধ নয়) দাড়ি মুন্ডানো হারাম হওয়ার উপর সবাই যে একমত, এ কথার প্রমাণ বহন করে।"[৯৯১]

মুফ্তী শফী রাহ. এক প্রশ্নের উত্তরে লিখেন-

باجماع امت داڑھی منڈانا حرام ہے ۔

"উম্মতের ইজমা তথা ঐক্যমতের ভিত্তিতে দাড়ি মুন্ডানো হারাম।"[৯৯২]

ইবনে হাযম যাহেরী রাহ. লিখেন-

واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة، لا تجوز.

"সবাই একথার উপর একমত যে, সম্পূর্ণ দাড়ি মুন্ডানো মুছলা তথা 'আকৃতির বিকৃতিসাধন' যা বৈধ নয়।"[৯৯৩]

---

[৯৮৯] আল্ মানহাল শরহু সুনানি আবী দাউদ: ১/২৮৬
[৯৯০] ফাতহুল কাদীর: ২/২৭০, মাকতাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান
[৯৯১] বাওয়াদিরুন নাওয়াদির: ২/ ৪৪৩, কুতুবখানা রহীমিয়া, দেওবন্দ
[৯৯২] জাওয়াহিরুল ফিক্হ: ৭/১৫৯, মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান
[৯৯৩] মারাতিবুল ইজমা: ১/১১৯

দাড়ির পরিমাণ

আমরা দাড়ি সম্পর্কীয় হাদীস দ্বারা পূর্বেই অবগত হয়েছি যে, রাসূল ﷺ থেকে দাড়ি লম্বা করা ও ছেড়ে দেয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়, কিন্তু এক মুষ্টির পর দাড়ি কাটার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে সরাসরি কোন গ্রহণযোগ্য বর্ণনা পাওয়া যায় না।[৯৯৪] তবে প্রসিদ্ধ সাহাবী ইবনে ওমর রাযি. এক মুষ্টির পরে দাড়ি কাটলে রাসূল ﷺ তাকে নিষেধ করেননি। আর নিষেধ না করাটাই ইলমে হাদীসের পরিভাষা অনুযায়ী 'তাকরীর' তথা মৌন সমর্থন হিসেবে গণ্য হবে। কোন কোন কাজের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ এর সমর্থনও হাদীস হিসেবে গণ্য হয়। সুতরাং এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটাও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

উল্লেখ্য যে, কেউ যদি এক মুষ্টির উপর দাড়ি লম্বা করতে অনিচ্ছুক হয়, তাহলে তার জন্য দাড়ি কাটার সুযোগ আছে। ইমাম আবু হানীফা রাহ. ও ইমাম মুহাম্মদ রাহ. এর মতামতও তাই। যেমনটি ইমাম মুহাম্মদ রাহ. ইমাম আবু হানীফা রাহ. এর সূত্রে হযরত ইবনে ওমর রাযি. এর কর্মগত হাদীসটি বর্ণনা করে মন্তব্য করেন-

عن ابن عمر ﷺ أنه كان يقبض على لحيته ثم يقص ما تحت القبضة، قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة رحمه الله.

"ইবনে ওমর রাযি. স্বীয় দাড়ি হাতের মুঠোতে ধরতেন এবং মুঠোর বাইরের অংশ কর্তন করতেন। ইমাম মুহাম্মদ রাহ. বলেন, আমরা এই মতটিই গ্রহণ করেছি আর এটা আবু হানীফা রাহ. এরও মত।"[৯৯৫]

ইমাম আলী আল-মারগীনানী রাহ. সুন্নাত পরিমাণ দাড়ির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এক মুষ্টির দ্বারা। যেমনটি তিনি স্বীয় কিতাব হেদায়া'তে লিখেন-

ولا يفعل لتطويل اللحية، إذا كانت بقدر المسنون وهو القبضة.

"যদি দাড়ি সুন্নত পরিমাণ হয়, তাহলে দাড়ি লম্বা করার উদ্দেশ্যে কোন ঔষধ ব্যবহার করবে

---

[৯৯৪] أخرج الإمام الترمذي في ذلك حديثا عن عمر بن هارون عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها. وقال: هذا حديث غريب، وسمعت محمد بن إسمعيل يقول: عمر بن هارون مقارب الحديث لا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث: «كان النبي ﷺ يأخذ من لحيته من عرضها وطولها» لا نعرفه إلا من حديث عمر بن هارون. اهـ

قال الإمام النووي في «المجموع شرح المهذب» (٢٩٠/١): وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «أن النبي ﷺ كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها.» فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به.

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في «فتح الباري» (رقم الحديث ٥٨٩٢): وهذا أخرجه الترمذي ونقل عن البخاري أنه قال في رواية عمر بن هارون: لا أعلم له حديثا منكرا إلا هذا اهـ. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة. اهـ

وقال العلامة الشوكاني في «نيل الأوطار» (١٣٨/١) بعدما ذكر ما نقله الترمذي عن البخاري: فعلى هذا أنها لا تقوم بالحديث حجة.

[৯৯৫] কিতাবুল আছার: **১১২**, দারুল হাদীস, মুলতান, পাকিস্তান

না। আর সুন্নত পরিমাণ হলো এক মুষ্টি।"[৯৯৬]

ইমাম নববী রাহ. এক মুষ্টি দাড়ির ব্যাপারে ফুকাহায়ে কেরামের মতামত বর্ণনা করতে গিয়ে ইমাম গাযালী রাহ.[৯৯৭] এর উক্তি এভাবে নকল করেন-

اختلف السلف فيما طال من اللحية، فقيل: لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة، فعله ابن عمر، ثم جماعة من التابعين، واستحسنه الشعبي وابن سيرين.

"দাড়ির লম্বা অংশটুকুর ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেছেন, দাড়িগুলো মুঠে নিয়ে মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করায় কোন অসুবিধা নেই। ইবনে ওমর রাযি. এবং তাবিয়ীনদের এক জামা'আত তাই করেছেন। ইমাম শা'বী ও ইবনে সীরীন রাহ.ও এটাকে পছন্দ করেছেন।"[৯৯৮]

পুরুষের চুলের বিধান

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের চুল রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন হযরত আনাস ইবনে মালেক রাযি. বর্ণনা করেন-

كان شعر رسول الله ﷺ إلى نصف أذنيه.

"রাসূল ﷺ এর চুল মুবারক দুই কানের মধ্যভাগ পর্যন্ত লম্বা ছিলো।"[৯৯৯]

অন্য বর্ণনাতে এসেছে-

عن قتادة ﷺ قال : قلت لأنس : كيف كان شعر رسول الله ﷺ ؟ قال : لم يكن بالجعد، ولا بالسبط، كان يبلغ شعره شحمة أذنيه.

"হযরত কাতাদা রাযি. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হযরত আনাস রাযি. কে জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল মুবারক কেমন ছিলো? তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ এর চুল মুবারক অত্যাধিক কোকড়াঁনোও ছিলো না আবার একেবারে সোজাও ছিলো না; বরং তার চুল মুবারক কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত।"[১০০০]

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন-

---

[৯৯৬] হেদায়াঃ ১/২২১, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

[৯৯৭] মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ আবু হামেদ আল গাযালী আশ শাফে'য়ী রাহ.। তিনি ৪৫০ হিজরীতে খোরাসানের অন্তর্গত তূস অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪ই জুমাদাস সানী ৫০৫ হিজরী সনে জন্মস্থান তূস নগরে ইন্তেকাল করেন। তার উস্তাযদের মধ্যে ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আল জুআইনী রাহ. ও ইমাম আবু নসর ইসমাঈল রাহ. সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রচনাবলীর মধ্যে ইহয়াউ উলুমিদ্দীন, আল খুলাসা, আল ওয়াজীয, আল ওয়াসীত ও আল বাসীত অন্যতম। -হাদিয়াতুল আরেফীনঃ ২/৭৯

[৯৯৮] আল মাজমুঃ ১/২৯০, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন

[৯৯৯] শামায়েলে তিরমিযীঃ ৩; সুনানে নাসায়ীঃ হাদীস নং ৫২৩৪, হাদীসটি সহীহ।

[১০০০] শামায়েলে তিরমিযীঃ ৩; সহীহ ইবনে হিব্বানঃ হাদীস নং ৬২৯১

كنت أغتسل أنا ورسول الله ﷺ من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة.

"আমি এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ একই পাত্র থেকে (অর্থাৎ একই পাত্রের পানি দিয়ে) গোসল করতাম, তার চুল মুবারক জুম্মা থেকে কম ও ওয়াফ্‌রা থেকে বেশি ছিলো।"[১০০১]

বি.দ্র. জুম্মা: মাথার চুল কাঁধ পর্যন্ত রাখাকে জুম্মা বলা হয়।

ওফরা: মাথার চুল কানের লতি পর্যন্ত রাখাকে ওফরা বলা হয়।

লিম্মা: মাথার চুল কানের লতি ও কাঁধের মাঝ বরাবর রাখাকে লিম্মা বলা হয়।

উল্লিখিত হাদীসসমূহ দ্বারা রাসূল ﷺ এর তিন প্রকারের চুল রাখার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাই ফুকাহায়ে কেরাম এ তিন প্রকারের চুল রাখাকে সুন্নাত অভিহিত করেছেন।

চুল রাখার আরেকটি পদ্ধতি হলো (কছর) অর্থাৎ মাথার চুল চতুর্দিকে সমানভাবে ছেটে রাখা। সুতরাং সামনে লম্বা পিছনে খাটো করে বিদেশী ফ্যাশনে চুল রাখা থেকে বেঁচে থাকা উচিত।

হলকের বিধান

রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে হজ্ব-ওমরা ব্যতীত মাথার চুল হলক করার রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। যেমন ইমাম মুহিউদ্দীন নববী রাহ. লিখেন-

فلم يصح ان النبي ﷺ حلق إلا في الحج والعمرة.

"নবী কারীম ﷺ হজ্ব-ওমরা ছাড়া হলক করেছেন এমন কোন সঠিক প্রমাণ নেই।"[১০০২]

তাছাড়া খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্য হতে তিন খলীফা- হযরত আবু বকর, হযরত ওমর ও হযরত উসমান রাযি. থেকেও হজ্ব-ওমরা ব্যতীত মাথা মুন্ডানোর কোনো রেওয়ায়েত পাওয়া যায় না। যেমন হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ মোল্লা আলী কারী রাহ. احلقوا كله واتركوا كله হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন-

(احلقوا كله) أي: كل الرأس أي شعره... فيه إشارة إلى أن الحلق في غير الحج والعمرة جائز، وأن الرجل مخير بين الحلق وتركه، لكن الأفضل أن لا يحلق إلا في أحد النسكين، كما كان عليه السلام مع أصحابه ﷺ، وانفرد منهم علي كرم الله وجهه.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বাণী احلقوا كله واتركوا كله -তে হজ্ব-ওমরা ছাড়া মাথা মুন্ডানো জায়েয হওয়ার ইঙ্গিত রয়েছে। আর পুরুষদের জন্য চুল রাখা ও হলক করা উভয়েরই সুযোগ রয়েছে। তবে হজ্ব এবং ওমরা ব্যতীত অন্য সময় মাথা না মুন্ডানো উত্তম। যেমনটি ছিলো

[১০০১] শামায়েলে তিরমিযী: ৩
[১০০২] শামায়েলে তিরমিযী: ৩

নবী কারীম ﷺ ও সাহাবায়ে কেরামের আমল। শুধু হযরত আলী রাযি. এর ব্যতিক্রম ছিলেন। তিনি হজ্ব-ওমরা ছাড়া অন্য সময়ও হলক করতেন।"[১০০৩]

সুতরাং 'হলক' এবং 'কছর' সম্পর্কে উল্লিখিত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পুরুষের জন্য 'হলক' আর 'কছর' এর মধ্যে ইখতিয়ার রয়েছে। তবে আল্লামা শামী রাহ. হলক সুন্নত হওয়ার পক্ষে একটি বক্তব্য এভাবে উল্লেখ করেন-

وفي الروضة: للزندويستي أن السنة في شعر الرأس، إما الفرَق أو الحلق.

"যানদাবীস্তী রাহ. এর রচিত কিতাব রওজাতুল ওলামাতে উল্লেখ আছে, মাথার চুলের ব্যাপারে সুন্নাত হলো সমানভাবে চুল ছাঁটা বা মুন্ডানো।"[১০০৪]

'কছর' এর ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হলো, চতুর্দিকে সমানভাবে চুল কাটাবে। অন্যথায় হাদীস দ্বারা প্রমাণিত তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতিতে রাখবে। মনে রাখতে হবে 'হলক' করতে গিয়ে قزع (অর্ধ মুণ্ডন) যেন না হয়। অর্থাৎ এমন যেন না হয় মাথার কিছু অংশ মুন্ডানো হলো আর কিছু অংশ রেখে দেয়া হলো। কেননা ফুকাহায়ে কেরাম এভাবে চুল মুন্ডানো মাকরূহে তাহরীমী বলেছেন। যেমন আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع.

"কুযা মাকরূহে তাহরীমী। আর 'কুযা' বলা হয় মাথার কিছু চুল রেখে বাকি চুল মুন্ডানো।"[১০০৫]

মহিলাদের চুলের বিধান

মহিলাদের চুলের ক্ষেত্রে মৌলিক নীতিমালা হলো তারা চুল রাখবে, মুন্ডাবে না। কেননা মহিলাদের সৌন্দর্য হলো লম্বা চুল। অতি প্রয়োজনে যদি কাটতে হয়, তাহলে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখতে হবে।

এক. অমুসলিম নারীদের অনুসরণের উদ্দেশ্যে মাথার চুল ছেটে খাটো করতে পারবে না। কেননা হাদীস শরীফে ভিন্ন ধর্মীয় নারীদের অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

দুই. চুল কাটতে গিয়ে এ পরিমাণ খাটো করবে না যে, তা পুরুষের বাবরী চুলের মত হয়ে যায়। কারণ হাদীস শরীফে পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করতেও নিষেধ করা হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. বর্ণনা করেন-

لعن رسول الله ﷺ المتشبهات بالرجال من النساء والمتشبهين بالنساء من الرجال.

"রাসূলুল্লাহ ﷺ পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য গ্রহণকারী মহিলা ও মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য

[১০০৩] মিরকাত: ৮/২১৬, আল মাকতাবাতুল হাবীবিয়্যা, পাকিস্তান
[১০০৪] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৯/৫৮৪, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ
[১০০৫] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৫/২৮৯; ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী: ৫/৩৫৭, মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ

গ্রহণকারী পুরুষদের উপর অভিশাপ করেছেন।"[১০০৬]

উল্লিখিত দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নারীরা প্রয়োজনে মাথার চুল কিছু পরিমাণ কাটতে বা মুন্ডাতে পারবে। যেমন কোন জটিল রোগের কারণে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শে চিকিৎসা হিসেবে মাথা মুন্ডানো তাদের জন্য জায়েয। আল্লামা ইবনে নুজাইম রাহ. বলেন-

الضرورات تبيح المحذورات.

"একান্ত প্রয়োজন (অপারগতায়) অবৈধ কাজও বৈধ হয়ে যায়।"[১০০৭]

কর্তিত চুল বিক্রির বিধান

বর্তমানে কিছু মুসলিম নারী বিজাতীয় নারীদের কৃষ্টি-কালচারে প্রভাবিত হয়ে মাথার চুল বিক্রি করে থাকে, যা সম্পূর্ণরূপে নিষেধ। সুতরাং সামান্য পয়সার জন্য এমনটি করা মারাত্মক গুনাহ। ফিকহ শাস্ত্র তথা ইসলামী আইনের আলোকে মানুষ ও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অত্যন্ত মর্যাদাসম্পন্ন হওয়ায় তা ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। আল্লামা আলাউদ্দীন হাসকাফী রাহ. বলেন-

بطل بيع... وشعر الإنسان لكرامة الآدمي ولو كافرا.

"মানবজাতির সম্মানের কারণে তাদের চুল বিক্রি সহীহ হবে না, যদিও চুল কাফেরের হোক না কেন।"[১০০৮]

অনুরূপভাবে ইমাম আলী আল মারগীনানী রাহ. বলেন-

لا يجوز بيع شعور الإنسان ولا الانتفاع به، لأن الآدمي مكرم، لا مبتذل، فلا يجوز أن يكون شيء من أجزائه مهانا مبتذلا، قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الواصلة والمستوصلة.

"মানুষের চুল ক্রয়-বিক্রয় ও তা থেকে উপকৃত হওয়া উভয়টি নাজায়েয। কেননা মানবজাতি সম্মানের পাত্র; ব্যবহারের পাত্র নয়। তাই তার কোন একটি অঙ্গও অসম্মানিত ও ব্যবহারযোগ্য হতে পারে না। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন, অন্যের চুল সংযোজনকারী ও তার সহযোগী উভয়ের উপরই আল্লাহর অভিসম্পাত।"[১০০৯]

মহিলাদের দাড়ি-গোঁফের বিধান

মহিলাদের দাড়ি-মোচ গজালে তা মুণ্ডিয়ে ফেলা শুধু জায়েযই নয় বরং তা মুস্তাহাব। আল্লামা শামী রাহ. বলেন-

---

[১০০৬] জামে তিরমিযী: ২/১০৬

[১০০৭] আল আশবাহ ওয়ান নাযায়ের: ১/২৫১, ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়া, করাচী, পাকিস্তান
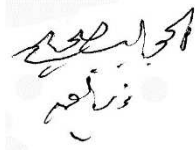
[১০০৮] আদ্দুররুল মুখতার: ৫/৫৮, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

[১০০৯] হেদায়া: ৩/৩৯, মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ

وفي تبيين المحارم: إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهـ.

"চেহারা থেকে দাড়ি মুন্ডানো হারাম, কিন্তু যখন মহিলার মুখে দাড়ি বা মোচ গজায় তখন তা মুন্ডানো জায়েয বরং মুস্তাহাব।"[১০১০]
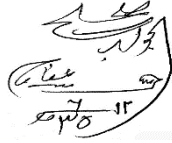
সত্যায়নে

মুফতী নূর আহমদ হাফিযাহুল্লাহ
প্রধান মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী

মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী হাফিযাহুমুল্লাহ
মুফতী আযম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস দারুল উলূম, হাটহাজারী
৩০ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

মুফতী জসীমুদ্দীন হাফিযাহুল্লাহ
মুফ্তী ও মুহাদ্দিস দারুল উলূম হাটহাজারী
১২ জুমাদাল উখরা ১৪৩৫হি.

সমাপ্ত

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين

[১০১০] ফাতাওয়ায়ে শামী: ৬/৩৭৩, এইচ. এম. সাঈদ, করাচী, পাকিস্তান

গ্রন্থপঞ্জি

০১	**আল কুরআনুল কারীম**	القرآن الكريم
০২	**রুহুল মা'আনী** আল্লামা আবুল ফযল শিহাবুদ্দীন সাইয়েদ মাহমুদ আল আলুসী আল বাগদাদী রাহ. (১২৭০হি.) মাকতাবায়ে এমদাদিয়া, মুলতান, পাকিস্তান	روح المعاني
০৩	**আল-জামে' লি-আহকামিল কুরআন (তাফসীরে কুরতুবী)** আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আল কুরতুবী রাহ. (৬৭১হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, লেবানন	الجامع لأحكام القرآن
০৪	**তাফসীরে তাবারী** আবু জা'ফর মুহাম্মদ ইবনে জারীর ইবনে ইয়াযিদ আত তাবারী রাহ. (৩১০হি.) আল মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, কায়রো, মিসর	تفسير الطبري
০৫	**তাফসীরে ইবনে কাছীর** হাফেয ইমামুদ্দীন আবুল ফিদা ইসমাঈল ইবনে কাছীর আদ্দিমাশকী রাহ. (৭৭৪হি.) দারুল কুরআনিল কারীম, বৈরুত, লেবানন	تفسير القرآن العظيم
০৬	**তাফসীরে মাযহারী** কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপতী রাহ. (১২২৫হি.) মাকতাবাযে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	التفسير المظهري
০৭	**আহকামুল কুরআন (১-২)** যফর আহমদ ইবনে লতীফ আল উসমানী আত-থানভী রাহ. (১৩৯৪হি.) ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল: **১৪১৩**হি.	أحكام القرآن
০৮	**আহকামুল কুরআন (৩-৪)** মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬হি.)	أحكام القرآن

	ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান প্রথম প্রকাশ ১৪১৩হি.	
০৯	**আহকামুল কুরআন (৫)** শাইখুত তাফসীর মুহাম্মদ ইদ্রিস কান্ধলবী রাহ. (১৩৯৪ হি.) ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান প্রথম প্রকাশ ১৪১৩হি.	أحكام القرآن
১০	**মা'আরিফুল কুরআন** মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬হি.) ফরীদ বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত	معارف القرآن
১১	**মা'আরিফুল কুরআন** শাইখুত তাফসীর মাওলানা ইদ্রিস কান্ধলবী রাহ. ফরীদ বুক ডিপো, দিল্লী, ভারত প্রকাশকাল: ১৪২১হি. ২০০০ইং	معارف القرآن
১২	**সহীহ বুখারী** ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল রাহ. (২৫৬হি.) কুতুবখানা রশিদিয়া দিল্লী; আশরাফিয়া বুক ডিপো হাদীস নম্বর ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে	صحيح البخاري
১৩	**সহীহ মুসলিম** ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জায ইবনে মুসলিম কুরাইশী রাহ. (২৬১হি.) আশরাফিয়া বুক ডিপো দেওবন্দ, ভারত হাদীস নম্বর ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে	صحيح مسلم
১৪	**সুনানে আবু দাউদ** সুলাইমান ইবনে আশ'আস আবু দাউদ রাহ. আশরাফী বুক ডিপো দেওবন্দ, ভারত হাদীস নম্বর ফুআদ আব্দুল বাকী রাহ. এর সংখ্যানুক্রমে	سنن أبي داود
১৫	**জামে তিরমিযী**	جامع الترمذي

	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী রাহ. আল মাকতাবাতুল আশরাফিয়া, দেওবন্দ, ভারত	
১৬	**সহীহ ইবনে খুযাইমাহ** আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক ইবনে খুযাইমাহ আস সালামী নিশাপুরী রাহ. (২২৩-৩১১হি.) আল মাকতাবাতুল ইসলামিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন দ্বিতীয় সংস্করণ ১৪১২হি. ১৯৯২ইং	صحيح ابن خزيمة
১৭	**মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক** হাফেয আবু বকর আব্দুর রাজ্জাক ইবনে হাম্মাম সানআনী রাহ. (২১১হি.) মজলিসে ইলমী করাচী, পাকিস্তান দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪১৬হি. ১৯৯৬ইং	مصنف عبد الرزاق
১৮	**মাজমাউয যাওয়ায়েদ** আলী ইবনে আবী বকর হাইতামী রাহ. (৮০৭ হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন ১৪১৪হি. ১৯৯৪ ইং	مجمع الزوائد
১৯	**আস সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী** আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন বাইহাকী রাহ.	السنن الكبرى للبيهقي
২০	**আল মুসতাদরাক** ইমাম হাফেয আবু আব্দুল্লাহ হাকেম নিশাপুরী রাহ. দারুল মা'রেফাহ, বৈরুত, লেবানন	المستدرك
২১	**মুসনাদে আহমদ** ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহ. (২৪১হি.) মুআস্সাসাতুর রিসালাহ	مسند أحمد
২২	**সহীহ ইবনে হিব্বান** ইমাম আবু হাতেম মুহাম্মদ ইবনে হিব্বান খোরাসানী রাহ. (৩৫৪ হি.) দারুল মা'আরিফাহ, বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪২৫হি. ২০০৪ইং	صحيح ابن حبان

২৩	**ফাতহুল বারী শরহু সহীহিল বুখারী** হাফেয শিহাবুদ্দীন আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী রাহ. (৮৫২হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪১০হি. ১৯৮৯ইং	فتح الباري بشرح صحيح البخاري
২৪	**ফাতহুল মুলহিম শরহে মুসলিম** আল্লামা মুহাদ্দিস শায়েখ শাব্বির আহমদ উসমানী রাহ. মাকতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল ১৪১৯ হি.	فتح الملهم بشرح صحيح مسلم
২৫	**ই'লাউস সুনান** আল্লামা যফর আহমদ উসমানী রাহ. (১৩৯৪ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪১৮হি. ১৯৯৭ইং ও ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী, পাকিস্তান	إعلاء السنن
২৬	**আওজাযুল মাসালিক** শাইখুল হাদীস আল্লামা যাকারিয়া কান্ধলবী রাহ. দারুল ফিকর বৈরুত,লেবানন প্রকাশকাল ১৪১ হি. ১৯৮৯ ইং	أوجز المسالك
২৭	**লামিউদ দারারী** মূল তাকরীর: রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী রাহ. সংকলক: আল্লামা ইয়াহইয়া কান্ধলবী রাহ. এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি করাচী, পাকিস্তান	لامع الدراري
২৮	**আল মু'জামুল আওসাত** ইমাম হাফেয আবুল কাসেম সোলাইমান ইবনে আহমদ ইবনে আইয়ূব তাবারানী রাহ. (৩৬০ হি.) প্রকাশকাল: ১৪২০ হি. ১৯৯৯ইং, দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন	المعجم الأوسط
২৯	**আত তাহকীক ফী আহাদীসিল খেলাফ** আল্লামা আবু ফারজ ইবনুল জাওযী রাহ. দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন	التحقيق في أحاديث الخلاف
৩০	**শরহে বেকায়া**	شرح الوقاية

	সদরুশ শরী'আহ উবাইদল্লাহ ইবনে মাসউদ ইবনে তাজুশ শরী'আহ মাহমুদ রাহ. মাকতাবায়ে আশরাফিয়া, দেওবন্দ	
৩১	**আন নাহরুল ফায়েক** সিরাজুদ্দীন ওমর ইবনে ইবরাহীম ইবনে নুজাইম আল হানাফী রাহ. (১০০৫হি.) কদিমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান	النهر الفائق شرح كنز الدقائق
৩২	**আল বিনায়াহ** মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে মুসা ইবনে আহমদ ইবনে হুসাইন বদরুদ্দীন আইনী রাহ. (৮৫৫হি.) মাকতাবায়ে নাঈমিয়া, দেওবন্দ প্রকাশকাল: ১৪২৭হি. ২০০৬ইং	البناية شرح الهداية
৩৩	**আস সিয়ারুল কাবীর** মুহাম্মদ ইবনে হাসান আশ শাইবানী রাহ. (১৮৯হি.) আল মাকতাব লিল হারাকাতিস সাওরাতিল ইসলামিয়্যাহ, আফগানিস্তান	السير الكبير
৩৪	**বাদায়েউস সানায়ে** ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী রাহ. (৫৮৭হি.) দারুল হাদীস কায়রো, মিসর প্রকাশকাল: ১৪২৬হি. ২০০৫ইং	بدائع الصنائع
৩৫	**বাদায়েউস সানায়ে** ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী রাহ. (৫৮৭হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ ১৪১৯হি. ১৯৯৮ইং	بدائع الصنائع
৩৬	**বাদায়েউস সানায়ে** ইমাম আলাউদ্দীন আবু বকর ইবনে মাসউদ কাসানী রাহ. (৫৮৭ হি.) এইচ. এম. সাঈদ করাচী, পাকিস্তান	بدائع الصنائع
৩৭	**মাজমাউল আনহুর** আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল কালয়ুবী রাহ. (১০৭৮হি.)	مجمع الأنهر

	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪১৯হি. ১৯৯৮ইং	
৩৮	**আল বাহরুর রায়েক** যাইনুদ্দীন ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে নুজাইম আল মিসরী রাহ. (৯৭০হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ: ১৪১৯হি. ১৯৯৮ইং	البحر الرائق
৩৯	**ফাতহুল কাদীর** কামালুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহেদ আস-সিওয়াসী রাহ. (৮৬১হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ: ১৪২১হি. ২০০০ইং	فتح القدير
৪০	**তাবঈনুল হাকায়েক** ইমাম ফখরুদ্দীন উসমান ইবনে আলী যায়লায়ী রাহ. (৭৪৩ হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল: ১৪২১হি. ২০০১ইং	تبيين الحقائق
৪১	**শরহু মুখতাসারিত তাহাবী** আবু বকর রাজী আল জাসসাস রাহ. (৩৭০ হি.) মাকতাবাতুল কারীমিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	شرح مختصر الطحاوي
৪২	**আল মুহীতুল বুরহানী** মাহমুদ ইবনে আহমদ ইবনে আব্দুল আযীয ইবনে ওমর ইবনে মাজাহ বুখারী রাহ. (৫৫১-৬১৬হি.) দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪হি. ২০০৩ইং	المحيط البرهاني
৪৩	**আল মাবসূত** শামসুল আইম্মাহ আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমদ আস সারাখসী রাহ. (৪৮৩হি.) দারু ইহ্য়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪২২হি. ২০০১ইং	المبسوط للسرخسي

৪৪	**মিনহাতুল খালেক** মুহাম্মদ আমিন ইবনে ওমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রকাশকাল: ১৪১৯হি. ১৯৯৮ইং	منحة الخالق (حاشية البحر الرائق)
৪৫	**ফাতাওয়ায়ে ওয়ালওয়ালিজিয়্যাহ** আবুল ফাত্‌হ জহীরুদ্দীন আব্দুর রশীদ ইবনে আবু হানীফা আল ওয়ালওয়ালিজী রাহ. (৫৪০হি.) মাকতাবায়ে দারুল ঈমান, মুবারক শাহ, উর্দু বাজার, সাহারানপুর, ভারত প্রকাশকাল: ১৪২৭হি. ২০০৬ইং	الفتاوى الولوالجية
৪৬	**গুনয়াতুল মুতামাল্লী** ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হালাবী রাহ. (৯৫৬হি.) প্রকাশকাল: ২০০২ ইং দারুল কিতাব দেওবন্দ	غنية المتملي
৪৭	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত প্রথম প্রকাশ: ১৪১৭ হি. ১৯৯৬ইং	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৪৮	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২হি.) মাকাবায়ে রশীদিয়া, কোয়েটা, পাকিস্তান	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৪৯	**রদ্দুল মুহতার (ফাতাওয়ায়ে শামী)** মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবেদীন রাহ. (১২৫২হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি, করাচী, পাকিস্তান	رد المحتار (الفتاوى الشامية)
৫০	**ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)** আল্লামা শায়েখ নিজাম কর্তৃক লিখিত দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪২৯-১৪৩০হি. ২০০৯ইং	الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمگيرية)

৫১	**ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়া (ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী)** আল্লাম শায়েখ নিজাম কর্তৃক লিখিত মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى الهندية (الفتاوى العالمگيرية)
৫২	**ফাতাওয়ায়ে কাযীখান** হাসান মানসূর ইবনে আবুল কাসেম আল আওযাজান্দী রাহ. (৫৯২হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১-১৪৩২হি. ২০১০ইং	الفتاوى الخانية (فتاوى قاضيخان)
৫৩	**ফাতাওয়ায়ে কাযীখান** হাসান ইবনে মানসূর ইবনে আবুল কাসেম আল আওযাজান্দী রাহ. (৫৯২হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى الخانية (فتاوى قاضيخان)
৫৪	**ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়্যাহ** মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনে ইউসুফ আল কারদারী রাহ. (৮২৭হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম প্রকাশ: ১৪৩১-১৪৩২হি. ২০১০ইং	الجامع الوجيز (الفتاوى البزازية)
৫৫	**ফাতাওয়ায়ে বায্যাযিয়্যাহ** মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে শিহাব ইবনে ইউসুফ আল কারদারী রাহ. (৮২৭হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الجامع الوجيز (الفتاوى البزازية)
৫৬	**ফাতাওয়ায়ে তাতারখানিয়্যাহ** ফরীদুদ্দীন আলম ইবনে আলা আদ্ দেহলবী রাহ. (৭৮৬হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	الفتاوى التاتارخانية
৫৭	**কুররাতু উয়ূনিল আখয়ার** আলাউদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীন ইবনে ওমর ইবনে আবেদীন আল আফিন্দী রাহ. (১২৯০হি.) মাকতাবায়ে যাকারিয়া, দেওবন্দ, সাহারানপুর, ভারত	قرة عيون الأخيار (تكملة رد المحتار)

৫৮	**আন নুতাফ ফিল ফাতাওয়া** কাযিউল কুযাত আবুল হাসান আলী ইবনুল হুসাইন সুগদী রাহ. (৪৬১ হি.) এইচ. এম. সাঈদ কোম্পানি করাচী, পাকিস্তান	النتف في الفتاوى
৫৯	**খোলাসাতুল ফাতাওয়া** ইমাম ফকীহ তাহের ইবনে আব্দুর রশীদ আল বুখারী রাহ. মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া	خلاصة الفتاوى
৬০	**মাজমু'আতুল ফাতাওয়া** তকিউদ্দীন আহমদ ইবনে তাইমিয়া আল হাররানী রাহ. (৭২৮হি.) দারুল ওফা প্রকাশকাল: ১৪২১হি. ২০০১ইং	مجموعة الفتاوى لابن تيمية
৬১	**আল-ফিক্হুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু** ড. ওয়াহবাযুহাইলী মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যা	الفقه الإسلامي وأدلته
৬২	**আল-মুগনী** ইমাম মুওয়াফ্ফাকুদ্দীন ইবনে কুদামা রাহ. (৬২০হি.) দারুল কিতাবিল আরাবী বৈরুত, লেবানন	المغني
৬৩	**আল মুগনী** মুওয়াফফাকুদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে কুদামা রাহ. (৬২০হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪০৪হি. ১৯৮৪ইং	المغني
৬৪	**আল-মাজমু শরহুল মুহাজ্জাব** ইমাম আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন বিন শরফ আন-নববী রাহ. (৬৭৬হি.) দারুল ফিকর বৈরুত, লেবানন	المجموع شرح المهذب
৬৫	**তানকীহুল ফাতওয়াল হামিদিয়্যাহ** আল্লামা সাইয়েদ মুহাম্মদ আমীন (আল্লামা ইবনে আবেদীন রাহ.) মাকতাবায়ে হাক্কানিয়্যাহ, কিস্সা মহল্লা, পেশোয়ার, পাকিস্তান ও মাকতায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান	تنقيح الفتاوى الحامدية

৬৬	**আল আহকামুস সুলতানিয়্যা** আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবিব বসরী আল মাওয়ারদী রাহ. (৪৫০হি.) দারুল হাদীস, কায়রো প্রকাশকাল ১৪২৭হি. ২০০৬ইং	الأحكام السلطانية
৬৭	**কিতাবুল ফিক্হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ** আব্দুর রহমান আল জাযারী রাহ. দারু ইহ্ইয়াইত্ তুরাসিল আরাবী, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪০৬হি. ১৯৮৬ইং	كتاب الفقه على المذاهب الأربعة
৬৮	**তাকরিরাতে রাফে'য়ী** শাইখ আব্দুল কাদির ইবনে মুস্তফা ইবনে আব্দুল কাদের রাফে'য়ী হানাফী রাহ. (১৩১২হি.) যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত প্রকাশকাল: ১৪১৭হি. ১৯৯৬ইং মাকতাবায়ে রশীদিয়া কোয়েটা, পাকিস্তান	تقريرات رافعي
৬৯	**বাওয়াদিরুন নাওয়াদির** হাকিমুল উম্মত আশরাফ আলী থানবী রাহ. (১৩৬২হি.) কুতুবখানায়ে রহিমিয়্যাহ, দেওবন্দ	بوادر النوادر
৭০	**হাশিয়ায়ে তাহতাবী আলা মারাকিল ফালাহ** আহমদ ইবনে ইসমাঈল আত তাহতাবী আল হানাফী রাহ. (১২৩১হি.) মাকতাবায়ে রশীদিয়া, পাকিস্তান	حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح
৭১	**বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যাহ মুআসারাহ** শাইখুল ইসলাম তকী উসমানী দা.বা. প্রকাশকাল: ১৪৩০ হি. দারুল উলূম করাচী	بحوث في قضايا فقهية معاصرة
৭২	**আল মাউসূআতুল ফিকহিয়্যাহ** পঞ্চম প্রকাশ ১৪২৪হি. ২০০৪ইং	الموسوعة الفقهية
৭৩	**ফিকহুয যাকাত** ড. ইউসুফ আল কারযাবী মাকতাবায়ে ওয়াহবা, কায়রো, মিসর ২৫তম প্রকাশ: ১৪২৭হি. ২০০৬ইং	فقه الزكاة
৭৪	**মাওয়াহিবুল জালীল**	مواهب الجليل

	আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান আল মাগরিবী রাহ. (৯৫৪ হি.) দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ বৈরুত, লেবানন প্রথম সংস্করণ: ১৪১৬হি. ১৯৯৫ইং	
৭৫	**আল মাজমু** ইমাম আবু যাকারিয়া মহিউদ্দীন ইবনে শরফ নববী রাহ. (৬৭৬ হি.) দারুল ফিকর বৈরুত লেবানন	المجموع
৭৬	**মানহুল জালীল শরহু মুখতাসারুল খলীল** আল্লামা আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইল্লীশ রাহ. মাকতাবায়ে দারে সাদের	منح الجليل شرح مختصر الخليل
৭৭	**আশরাফুল ফাতাওয়া** মুফতী নূর আহমদ দা.বা. মাকতাবায়ে সামাদিয়্যাহ, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম প্রকাশকাল: জুমাদাল উলা ১৪৩৩হি. মার্চ ২০১২ইং	اشرف الفتاوى
৭৮	**জাদীদ ফিকহী মাবাহেছ** মাওলানা মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী ইদারাতুল কুরআন ওয়াল উলূমিল ইসলামিয়্যাহ, করাচী	جدید فقہی مباحث
৭৯	**ফিক্‌হী মাকালাত** মুফতী তকী উসমানী দা.বা. জমজম বুক ডিপো প্রকাশকাল: ১৯৯৭ইং ও নভেম্বর ২০০৪ইং	فقہی مقالات
৮০	**ফাতাওয়া ইবাদুর রহমান** মুফতী আব্দুর রহমান মোল্লা খিল সাহেব দা.বা. দারুল ইফতা ওয়াত তাহকীক, করাচী, পাকিস্তান	فتاوی عباد الرحمن
৮১	**ফাতাওয়ায়ে হাক্কানিয়্যাহ** শাইখুল হাদীস মাওলানা আব্দুল হক রাহ. জামেয়া দারুল উলূম হাক্কানিয়্যাহ ৬ষ্ঠ প্রকাশ: ১৪৩০হি. ২০০৯ইং	فتاوی حقانیہ
৮২	**ফাতাওয়ায়ে রহীমিয়্যাহ** হযরত মাওলানা হাফেজ কারী মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রাহ. যাকারিয়া বুক ডিপো, দেওবন্দ, ভারত	فتاوی رحیمیہ

৮৩	**জাওয়াহিরুল ফিক্‌হ** হযরত মাওলানা মুফতী শফী রাহ. (১৩৯৬হি.) মাকাতাবায়ে দারুল উলূম করাচী, পাকিস্তান প্রকাশকাল: সফর ১৪৩৩হি. জানুয়ারি ২০১২ইং	جواہر الفقہ
৮৪	**জাদীদ ফিক্‌হী তাহকীকাত** হযরত মাওলানা কাযী মুজাহিদুল ইসলাম কাসেমী দা.বা. কুতুবখানা নাঈমিয়্যাহ, দেওবন্দ, ভারত প্রকাশকাল: অক্টোবর ২০০৬ইং	جدید فقہی تحقیقات
৮৫	**জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া** মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. ইসলামী কুতুবখানা, আল্লামা বিন্নুরী টাউন, করাচী প্রকাশকাল: ১৪০৮হি.	جواہر الفتاوی
৮৬	**জাওয়াহিরুল ফাতাওয়া** মুফতী আব্দুস সালাম চাটগামী দা.বা. বুখারী একাডেমি, হাটহাজারী, চট্টগ্রাম ৪র্থ প্রকাশ ১৪১৯হি.	جواہر الفتاوی
৮৭	**মালাবুদ্দা মিনহু** কাযী মুহাম্মদ ছানাউল্লাহ পানিপতী রাহ. (১২২৫হি.)	مالا بد منہ
৮৮	**ইসলাম আওর জাদীদ মা'আশী মাসায়েল** মুফতী তকী উসমানী দা.বা. ফয়সাল ইন্টারন্যাশনাল, দিল্লী, ভারত প্রকাশকাল: ২০১০ইং	اسلام اور جدید معاشی مسائل
৮৯	**আহসানুল ফাতাওয়া** মুফতী রশীদ আহমদ লুধয়ানবী রাহ. এইচ. এম. সাঈদ করাচী, পাকিস্তান	احسن الفتاوی
৯০	**আহকামে যিন্দেগী** মাওলানা মুহাম্মদ হেমায়েত উদ্দীন দা.বা. মাকতাবাতুল আবরার, বাংলাবাজার, ঢাকা প্রকাশকাল: রবিউল আউয়াল ১৪২৮হি. ২০০৬ইং	احکام زندگی
৯১	**কাশশাফু ইসতিলাহাতিল ফুনূন ওয়াল উলূম** আল্লামা মুহাম্মদ আলী থানভী রাহ.	كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم

	মাকতাবা লেবানন নাকিরুন, বৈরুত প্রকাশকাল: ১৯৯৬ইং	
৯২	**ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা** হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলবী রাহ. (১১৭৬হি.) কদিমী কুতুবখানা, আরামবাগ, করাচী, পাকিস্তান	إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء
৯৩	**ফাতহুল কারীম ফী সিয়াসাতিন নাবিয়্যিল আমীন** আল্লামা মুশাহিদ সিলেটী রাহ. (১৯৭১ইং) মাকতাবায়ে আহমদিয়া, সিলেট প্রকাশকাল: ১৪২৫হি. ২০০৪ইং	فتح الكريم في سياسة النبي الأمين ﷺ
৯৪	**সিয়ারু আ'লামিন নুবালা** ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনে আহমদ ইবনে উসমান আয-যাহাবী রাহ. (৭৪৮হি.) দারুল ফিকর, বৈরুত, লেবানন প্রকাশকাল: ১৪১৭হি. ১৯৯৭ইং	سير أعلام النبلاء
৯৫	**যাদুল মা'আদ** শামসুদ্দীন আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর ইবনে কায়্যিম আল জাওযিয়্যাহ রাহ. (৭৫১হি.) আল মাকতাবাতুল ইলমিয়্যাহ, লাহোর, পাকিস্তান	زاد المعاد
৯৬	**ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন** আবু হামেদ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ গাযালী রাহ. (৫০৫ হি.) দারে সাদের বৈরুত, লেবানন	إحياء علوم الدين
৯৭	**লিসানুল আরব** আল্লামা ইবনে মানযুর রাহ. দারুল হাদীস, কায়রো, মিসর প্রকাশকাল: ১৪২৩হি. ২০০৩ইং	لسان العرب
৯৮	**আল মুনজিদ (আরবী-উর্দু)** মারকাজি ইদারা তাবলীগে দীনিয়্যাত, জামে মসজিদ, দিল্লী	المنجد
৯৯	**আল মুনজিদ (আরবী-আরবী)** কুতুবখানায়ে মিল্লী, ইরান প্রকাশকাল: ১৩৮০হি.	المنجد

১০০	**কামূসুল ফিক্হ** মাও. খালেদ সাইফুল্লাহ রহমানী দা.বা. যমযম পাবলিশার্স, উর্দু বাজার, করাচী পাকিস্তান প্রকাশকাল: ২০০৭ইং আগষ্ঠ	قاموس الفقہ
১০১	**আল মাদখালুল ফিকহিয়্যুল আ'ম** মোস্তফা আযযারকা রাহ. দারুল কলম দিমাশক প্রথম প্রকাশ: ১৪১৮ হিজরী	المدخل الفقهي العام

বি.দ্র. সময়স্বল্পতার করণে গ্রন্থ পঞ্জিতে শুধু বহুল উদ্ধৃত গ্রন্থগুলোর নামই উল্লেখ করা হয়েছে।

সংকলন ও প্রকাশনায়

কিসমুত্ তাখাস্‌সুস ফিল ফিকহিল ইসলামী

(সমাপনী বর্ষের ছাত্রবৃন্দ-১৪৩৫ হিজরী)